আল-কোরআন
দ্য
চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১)
কাজী জাহান মিয়া

আল-কোরআন
দ্য
চ্যালেঞ্জ
মহাকাশ পর্ব-১

রহমানের সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না।
তোমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখো–
তেমন কিছু দেখতে পেলে কি?
তোমার সে দৃষ্টি আবারও বুলিয়ে নাও
এবং আবারও–
তোমার দৃষ্টি তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে
আহত, ব্যথিত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়ে।

–আল কোরআন

www.pathagar.com

লেখক ঃ
কাজী জাহান মিয়া
৩০১/২ টালী অফিস রোড
রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯, ফোন ঃ ৮১৫৩৪০
পোস্ট বক্স নং-১০০৪৫
মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট পোস্ট অফিস
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৯।

প্রকাশনায় ঃ
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম মুদ্রণ	ঃ	জানুয়ারী ১৯৯১
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	অক্টোবর ১৯৯৩
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	এপ্রিল ১৯৯৬
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	আগস্ট ১৯৯৭
নবম সংস্করণ	ঃ	জুলাই ২০০২
দশম সংস্করণ	ঃ	জুলাই ২০০৩

প্রচ্ছদ নির্বাচন ঃ লেখক
অঙ্কনে ঃ রেখায়ন, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।

কম্পিউটার কম্পোজ
ন্যাশনাল কম্পিউটারস্ লিমিটেড
৬৯ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৮১১০৯৭-৮, ৩২৩৪৯৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AL-QURAN
THE CHALLENGE
MOHAKASH PORBA-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

তিনি ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন-'উম্মী
মুহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার কোন শিক্ষক ছিল না
অথচ-
সেই জগৎ বিখ্যাত নিরক্ষর মানুষ যা বলে গেলেন,
তা-ই স্বীকৃতি পেলো যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব
হিসেবে! তিনি হয়ে গেলেন সকল জ্ঞানীর শিক্ষক!!

!!!

আজ আমার শ্রদ্ধা ও অনুভব তাঁরই পবিত্র 'রওজার'
ধুলোয়
আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে উৎসর্গ করার অনুগ্রহ খুঁজে
ফিরছে।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক
রিভিউ রিপোর্ট
পাণ্ডুলিপির নাম- দ্য চ্যালেঞ্জ
লেখকের নাম -- মেজর কাজী জাহান মিয়া

১। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াহ্‌দানিয়াত ও রাবুবিয়াতের উপর অথবা হাশরের পুনরুত্থানের উপর যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে, সে সব যেমন একজন সাধারণ মানুষের বোধগম্য তেমনি একজন দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও তর্কের মাধ্যমে গ্রহণ উপযোগী। এ সব যুক্তি অনুধাবনে একজন সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ শাস্ত্রীয় সূত্র বা যুক্তির মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন যেমন দেখা দেয় না, তেমনি কেউ যদি এসব যুক্তি বিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্র বা দর্শনের কীর্তি দ্বারা হৃদয়ংগম করতে চান, তবে সেটাও তার পক্ষে সহজ হয়। লেখক আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে আল-কোরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং কোরআনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের প্রয়াস চালিয়েছেন। সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে অনেকে বিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে সঠিকস্থানে রেখে কোরআনের আয়াতের দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কোরআন বিকৃতির কসরত করে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ! লেখকের এ লেখাটি সে দোষ হতে মুক্ত বলেই মনে হল, এ হিসাবে তিনি নিশ্চয় ধন্যবাদার্হ।

লেখকের ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য, অবশ্য বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগের প্রাধান্য স্থান পেয়েছে।

২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করতে পারে।

৩। বইখানি প্রকাশিত হলে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী মহলের উপযোগী হবে।

৪। নামকরণে মনে হয় কিছুটা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, যথাঃ আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, এই ধরনের কিছু।

তারিখঃ ২৬/৫/৯০ইং

ইতি

স্বাঃ

(কাজী মুতাসিম বিল্লাহ)

মালিবাগ জামিয়া মাদ্রাসা

ঢাকা-১২১৯।

www.pathagar.com

দুটি কথা

সুধী পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম।

বইটিকে গুণগ্রাহী পাঠকসমাজ এত বিপুলভাবে স্বাগতম জানাবেন-বইটি যখন লিখা হয়, তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। মহান আল্লাহর কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, বইটি এখন দেশে-বিদেশে প্রভূতভাবে সমাদৃত। দেশ-বিদেশের পাঠক-পাঠিকাগণ যখন তাঁদের অনুভূতির কথাগুলো লিখে পাঠান কিংবা বলে যান, তখন সেই অদৃশ্যের মহাবিজ্ঞানীর মহাকীর্তিগুলোর গৌরব আর অসীমতার স্বাদে সিক্ত "আল-কোরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১" ও ২ এর প্রণয়ন করার মত করুণা আমাদেরকে দান করবার জন্য সে অসীম মহাবিস্তার প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অন্তহীন প্রতিকূলতা, অসহযোগিতা ও পরিবেশের বৈরিতার মধ্যদিয়ে চলতে চলতে লেখক অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছেন, তবু হাল ছাড়েন নি। ছয় বৎসর হলো, মহাকাশ পর্ব ৩ এর লেখা সম্পন্ন করা যায়নি। লেখকের দুর্ভাগ্য যে খড়কুটোর মতই তিনি এখান হতে ওখানে ভেসে চলছেন, তৃতীয় পর্বের মত জটিল কাজে হাত দেয়ার জন্য যে ন্যূনতম স্থিরত্ব, লেখকের জীবনে বিগত অর্ধযুগে তা কখনোই সম্ভব হয়নি। মহাকাশ পর্ব ৩ ও অন্যান্য পর্বগুলো সম্পন্ন করবার জন্য যে গভীর অধ্যয়ন করা দরকার তার অনুকূল পরিবেশ পাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন অপেক্ষা মহান আল্লাহ যদি দয়া করে সে সুযোগ দান করেন। তবে সত্য যে একদিন আমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হবেই ইনশাআল্লাহ। অসংখ্য পাঠক আজ অধীর আগ্রহে পর্ব-৩ এর বের হবার ক্ষণ গুনছেন। আল্লাহ দয়া করলে অনেক ক্ষতির বিনিময়ে হলেও মহাকাশ পর্ব-৩ আত্মপ্রকাশ করবেই।

কৃতজ্ঞতা রইল শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের প্রতি। তাঁর উৎসাহ আমাদের ভগ্নমনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। মহাকাশ পর্ব-৩ এর অভাব পূরণ হয়তো হবে না, তবু বর্তমান সচিত্র সংস্করণটিতে এর কাঠিন্য ও দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সংযোজিত মূল্যবান চিত্রগুলো প্রভূত সাহায্য করবে বলে আশা রাখি।

দোয়া প্রার্থী

নাহরীন পারভীন

www.pathagar.com

মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের অভিমত

পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর বিধান। মানব জাতির জন্য আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় দান।

প্রথম মানব এবং মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যেসব আসমানী প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছে, সে ধারাবাহিকতার শেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থই আল-কোরআনুল কারীম। এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না এবং তার প্রয়োজনও দেখা দিবে না। কোরআন নাযিল হয়েছে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া বা জ্ঞান চর্চার সাথে সম্পর্কহীন উম্মী নবীর (সাঃ) উপর। এ ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র গ্রন্থকে যে কোন প্রকার পূর্ব ধারণার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে আগত-অনাগত সকল জাতি গোষ্ঠীর মানবসমাজের সামনে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন যে, কোরআন অনন্য এর রহস্যময়তা অনতিক্রম্য। এর বিকল্প সৃষ্টি করা মানবীয় মেধা ও প্রজ্ঞার আওতাবহির্ভূত। প্রলয়কাল পর্যন্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যত অগ্রসর হবে, কোরআনের অশেষ রহস্যাবলীও সে পরিমাণেই মানুষের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকবে। প্রতিটি প্রজন্মের মানব গোষ্ঠীর সামনে পবিত্র কোরআনের সেসব রহস্যময়তার দ্বার একে একে উন্মুক্ত করার জন্যও আল্লাহ তাআলার একদল নিবেদিতপ্রাণ বান্দা নিয়োজিত থাকবেন। এটা মহান আল্লাহরই একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা।

বর্তমান কালকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ বলা হয়। আসলে সার্বিক বিচারে প্রচলিত বিজ্ঞান কতটুকু উৎকর্ষতার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, সে প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষতঃ মহাকাশের অনন্ত রহস্যাবলীর দ্বার কিছুটা উন্মুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একাধারে যেমন মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক থ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে, আজকের বিজ্ঞানগর্বী মানুষ এ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, এমন কি যেসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অনুধাবন শক্তি নির্বাক হয়ে আছে, সেসব জটিল প্রশ্নেরও জবাব পবিত্র কোরআন প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছে। কিন্তু বিপত্তি দাঁড়িয়েছে, বিজ্ঞান চর্চায় যাঁরা নিজেদের নিবেদিত করে রেখেছেন, তাঁদের পক্ষে কোরআন পাঠ করা বা কোরআনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া কোরআন ঠিকমত বুঝবার জন্য যেরূপ পবিত্র তন্মনের পূর্বশর্ত রয়েছে, ঈমানবিহীন বিজ্ঞান চর্চাকারীরা তা থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে কোরআনের ব্যাখ্যা ও

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানের, এর পরিভাষার এবং এর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের সাথে পরিচিতি নিতান্তই ক্ষীণ। যে কারণে সাধারণ্যে এমন একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই দিগন্ত। কিন্তু অন্ততঃ হিজরী হাজার সাল পর্যন্ত এমনটা ছিল না। সে যুগের তফসীর গ্রন্থগুলি পাঠ করলে বুঝা যায় যে, তখনকার কোরআন গবেষকগণ সমকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাথে শুধু পরিচিতই ছিলেন না বরং আরও অগ্রসর চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ছিলেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশের একজন তরুণ গবেষক কাজী জাহান মিয়াকে আল্লাহপাক তওফীক দিয়েছেন; জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বশেষ কতকগুলি জটিল উদ্ভাবনকে কোরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে, বিজ্ঞানময় কোরআন মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতারও কত সম্মুখে অবস্থান করছে। আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ গ্রন্থটি তারই বাস্তব প্রমাণ।

স্নেহভাজন কাজী জাহান মিয়ার এ বিস্ময়কর বইটি সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মন্তব্য করার মত বিদ্যা ও মেধা আমার নাই; একথা সরলভাবে স্বীকার করে ও বলতে পারি, এ বই যদি বাংলায় রচিত না হয়ে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় রচিত হতো, তবে এর প্রাজ্ঞ লেখক ইতোমধ্যেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হতেন। তবুও আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এবং নানা বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন হয়ে পবিত্র কোরআনের অনন্য মহিমা অবশ্যই উদ্ভাসিত হবে। আমি প্রাণভরে দোয়া করি; আল্লাহপাক এ তরুণ গবেষককে আরও তওফীক দান করুন!! তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সন্দেহবাদীদের ঈমান সুদৃঢ় হোক এবং এ পর্যন্ত যাদের অনুসন্ধানী মন নিয়ে কোরআন পাঠ করার সুযোগ হয়নি; তাদেরকেও এই বইয়ের কল্যাণে আল্লাহপাক কোরআন পাঠ করার তওফীক দান করুন।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক মাসিক মদীনা, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচী

আলোক পর্ব

শুরুর কথা	১৩
শর্ত-১ (কোরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক মাহাত্ম্য)	১৭
শর্ত-২	৩৮

জ্ঞান পর্ব

১। ইতিহাসের সাক্ষ্য		৪০
২। পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা		৫৬
২ঃ১	গাণিতিক ভারসাম্য	৬২
২ঃ২	দিন-রাত্রির পরিবর্তন	৬৮
২ঃ৩	বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী জীবন	৭৩
২ঃ৪	অক্ষ-তীর্যকতা ও জীবন	৮৫
২ঃ৫	আদি বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি ও জীবনের ক্ষেত্র চয়ন	৮৯
২ঃ৬	এন্টিমিউটাজেনিক আমব্রেলা	৯২
২ঃ৭	পরিবেশের ভারসাম্য	৯৫
২ঃ৮	সামঞ্জস্য ও সমন্বয়	১০১
২ঃ৯	অবাধ বিস্তার	১১২
২ঃ১০	পানিঃ দয়ার অপূর্ব নিদর্শন	১২০
৩। আকাশের সংগঠন ও স্তর বিন্যাস		১২৬
৪। মহাবিশ্বের অপরূপ রূপ		১৪২
৫। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব		১৫৬
৬। সঞ্চালনশীল সূর্য		১৬৫
৭। গ্যালাক্সির ধারণা ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সম্পর্ক বিচার		১৭৪
৮। ভিন জগতের জীবন		১৮৫

www.pathagar.com

৯। অভিকর্ষ বল ১৯৯
১০। আইনস্টাইনের সমীকরণ ২১০
১১। ব্ল্যাক হোল ২২১
১২। কসমিক স্ট্রীং বা মহাজাগতিক তার ২৩৩
১৩। সৌরজগতের ধারণা ২৫৪
১৪। মহাবিশ্বের সৃষ্টি ২৬৮
১৪ঃ১ সৃষ্টি তত্ত্ব ঃ বিভিন্ন পৌরাণিক মতবাদ ২৭২
১৪ঃ২ মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগব্যাঙ থিওরী ২৭৬
১৪ঃ৩ ছয় দিবসের বিতর্ক ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের কোরআনিক ব্যাখ্যা ২৮৫
১৪ঃ৪ টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম ও প্রাইমোরডিয়াল ফায়ারবল ঃ বিজ্ঞানের অসামর্থ্য ও কোরআনের প্রজ্ঞা ৩০৩

বিনয় পর্ব

শেষের কথা - ১ ৩২২

শেষের কথা - ২ ৩২৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোক পর্ব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুরুর কথা

Is there intelligent life on Earth?

পৃথিবীতে সঞ্চারিত প্রাণদলে কোন বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব ঘটেছে কি? বিজ্ঞানময় শতাব্দীর এ হল এক অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা। লন্ডন প্লেনেটরিয়ামের সম্মুখভাগের দেয়ালে খোদাইকৃত এই প্রশ্নটি আমাদেরকে ভাবিত করে তোলে- আমরা মানুষ কি তাহলে বুদ্ধিমান জীব নই! কিংবা আমরা কি বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ক্রমধারায় এখনো গ্রহণযোগ্যমানের নিচে পড়ে আছি! জগৎ বিজ্ঞানীগণ আজ এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন। সম্ভবতঃ তাদের এ ধারণাটি হেসে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। তার একটি বড় প্রমাণ আমরা মানুষ জাতি নিজেদের মধ্যে বহন করে যাচ্ছি।

আশ্চর্য হবার বিষয় হল পৃথিবীতে অনেকগুলো ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান। সকল তথ্য-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এক ও অভিন্ন। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের গঠন, পদার্থ, আকৃতি, প্রকৃতি, আচার, আহার, নিদ্রা, অভিব্যক্তি ইত্যাদি সকলই এক। মানুষের জন্মদান ও জন্ম গ্রহণের জীব-জৈবিক প্রক্রিয়া, জন্ম গ্রহণ করার পর স্থানীয় ভাষা শিক্ষার পূর্বে শিশুর 'আদি ভাষা', পরিণত হয়ে ওঠার পথে তার বিকাশ-চিহ্ন, পরিণত মানব-মানবীর প্রেম ও অনুভব, একটি নির্দিষ্ট বয়সে সুনির্দিষ্ট আচরণ, নির্ধারিত কাল অতিবাহিত করার পর একই নিয়মে মৃত্যু ইত্যাদির মধ্যে যে একক শৃংখলা বিদ্যমান, তা মানুষের একই উৎস হতে সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টিকে সন্দেহের চির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হতেও এ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই আমাদের স্রষ্টা কি এক না ভিন্ন? স্রষ্টা যদি ভিন্ন হবেন তবে এই একক ঐক্য এলো কোথা হতে? যদি এক হন তবে আমাদের মাঝে ধর্মের এ ভিন্নতা কেন?

পৃথিবীতে আজ কতগুলো ধর্ম বর্তমান রয়েছে তা আমরা জানি না। শত শত ধর্ম নিজ নিজ বিশ্বাসের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করে রেখেছে। সেই কাল্পনিক স্রষ্টার উদ্দেশে ধন, মান ও জীবন বিসর্জন দেয়ার ইতিহাস সকল ধর্মেই বিদ্যমান। অথচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি আমাদেরকে বলে- মানুষের স্রষ্টা শুধু এক এবং এককই হওয়ার কথা। সেই সূত্রে মানুষের ধর্মও হওয়া উচিত একক এবং বৈষম্যবিহীনভাবে শুধু একটি। তাই যদি হয়, তাহলে বাদবাকি ধর্ম পদ্ধতিগুলোতে যে অনুভব ও জীবনের বিসর্জন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা বৃথা ও অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষ তার অমূল্য জীবনকে যুক্তিহীনভাবে বিসর্জন দেয়া উচিত কি যার মাঝে প্রাপ্তি নেই- শুধু আছে ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা? আর এমনি যার জ্ঞান, সে

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় আর একটি গুরুতর প্রশ্ন- এমন ধর্ম আছে কি যা সেই এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম; যা মিথ্যা, ভ্রম ও অজ্ঞানতা হতে মুক্ত শুধু সত্য ধর্ম, যার মাঝে স্রষ্টা আছেন? কোন সে ধর্ম, কি তার পরিচয়, আর তাকে কিভাবে সনাক্ত করতে পারি? এ হবে সেই ধর্ম যা বাস্তব ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। সকল জ্ঞান ও যুক্তির নির্বাচনে যা নির্বাচিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিককে যা ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ এবং বিপরীতভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাকে ব্যাখ্যার দ্বারা তার সত্যতার সনদ প্রদান করে। এমন ধর্ম শুধু একটি – এর নাম ইসলাম।

ইসলাম শান্তি, যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যা জীবন, সৃষ্টি, স্রষ্টা সকলকেই জ্ঞানের অতিসূক্ষ্ম চুলচেরা হিসাবের মাত্রায় ব্যাখ্যা করতে পারে। আমরা এই ধর্মকে বুঝতে সমর্থ রয়েছি কি? ফ্রেড হোয়েলের একটি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য এখানে এসে যায় - Various animals are literate in various degrees. A dog has trouble in understanding a power station and man has trouble in understanding religion. একটি কুকুরের কাছে পাওয়ার স্টেশন দুর্বোধ্য, আর মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হল তার ধর্ম। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা ও উন্নাসিকতাই এর কারণ।

বিপরীত শিবিরীয়দের সোচ্চার হয়ে উঠবার আগেই বলে রাখছি, ইসলামই যে একমাত্র ধর্ম হতে পারে তার অতি বাস্তব প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে- সে আল-কোরআন। এ হলো এক মহা বিস্তার জ্ঞানের সমুদ্র, এক অতিসুবিজ্ঞ মহাপ্রজ্ঞাময়ের বিস্ময়কর কীর্তি। এ কোরআনেরই হাজার হাজার বিষয়বস্তু হতে বেছে নেয়া মহাকাশ বিজ্ঞানের অতি জটিলতম তথ্য ও উপাত্তসমূহের আলোকে রচিত বইটি আপনাকে অবশ্যই কোরআন মনীষার সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময়তার পরিচয় দান করবে। জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) এক অতিশয় মজার বিজ্ঞান, আশা করি অনেকের কাছেই বিষয়গুলো ভাল লাগতে পারে। বইটি অনেক ক্ষেত্রেই যদিও বিশ্লেষণধর্মিতার রূঢ়তা ডেকে এনেছে, তবু হয়ত তা আগ্রহ জন্মাবে এ জন্যে যে, মানুষ জন্মগতভাবে কে, কি, কোথা হতে কিভাবে তার উৎপত্তি ও আগমন, কি তার অবস্থান, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে কি তার সম্পর্ক– এ সব মৌলিক জিজ্ঞাসার সন্ধান করে। এ বইটি হয়ত আপনাকে এমনি অনেক প্রশ্নের জবাব বলে দেবে।

আমার নিজস্ব মতামত ও বড়বেশি যুক্তি তর্কে বইটিকে আমি ভারাক্রান্ত করা হতে যথাসম্ভব বিরত রাখতে চেয়েছি। বিজ্ঞানের নিখুঁত চুলচেরা আলোচনায় না গিয়ে তার পদ্ধতিটুকুই ব্যাখ্যা করেছি, যা প্রয়োজন। আমার একপাশে মহাপ্রজ্ঞাময় কোরআনের

www.pathagar.com

আমি আমার লেখাকে তথ্যভিত্তিক করার অধ্যবসায় রেখেছি, এতদসত্ত্বেও ভুল বিচ্যুতি যদি সুধী পাঠকসমাজের গোচরীভূত হয় তবে তা জানালে খুশী হব। বলা উচিত যে, বইটি বিজ্ঞানের নয়- বিজ্ঞান কতটুকু আত্মভূত তা বিশ্লেষণ করে দেখবার মাত্র। ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে যারা সন্দিহান বইটি বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশ্য করে লেখা। যারা বাস্তব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে উত্তরের সন্ধান করেন, তাদের জন্যও। যারা কোরআন নিয়ে ভাববার সূত্র খোঁজেন, যারা এ নিয়ে ভাবেন তাদের কাছে এই বই নতুন দিগন্তের আহ্বান দিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আল-কোরআন নিজে একটি চ্যালেঞ্জ। এর প্রস্তাব, ভাব, ভাষা, গতি, দৃঢ়তা এই সকলের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বিশেষভাবে কোরআনের একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে বইটি তার নাম পেয়েছে 'আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ'। জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলগণের পরিবর্তে 'তার' বা 'তাহারা' শব্দগুলো ব্যবহৃত হওয়ার সময় সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দু (যেমন 'তাঁর') ব্যবহার করা হয়েছে যা অন্য কোন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। অন্যদিকে সকল আয়াত সাধুরীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে বইটির বর্ণনা চলিত রীতিভিত্তিক।

বইটি লিখবার জন্য যার অনেক আদর ও উৎসাহ আমাকে ঘিরে রেখেছিল সেই শ্রদ্ধাধন্য অধ্যক্ষা সেলিমা বেগমের নাম স্মরণ করতেই হয়। তেমনি স্মরণ করতে হয় শ্রদ্ধেয় ডঃ আবু আহ্‌মেদকে, যার জ্ঞান আমাকে সঠিক নির্দেশনা পেতে সাহায্য করছে প্রভূতভাবে। যার প্রতি এই বইয়ের শ্রদ্ধা, তার অনুভবের অদৃশ্য প্রতিকৃতির উদ্দেশে সম্মান জানাবার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস রাখার মধ্য দিয়ে আজ তার একটি কথাকে স্মরণ করতে চাই, "বাবর! তুমি জীবনে একবারই জন্মেছ---"। এই স্বল্পায়ুর মানবজীবনের বন্ধ্যা ভূমির শস্যহীন খরাদগ্ধ ক্ষেত্র হতে মহান আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য করার একটি ফুলকে আজ আমি ফোটাবার চেষ্টা করেছি; তার রূপ-লাবণ্য, রঙ ও সৌন্দর্য দৃষ্টির অগম্য এক অনুভবের বারিসিঞ্চনে এক হৃদয়বান মালির হাতে জীবন পেয়েছিল বলে আমি এটি আজ তারই হাতে তুলে দিলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শর্ত –১
(কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মাহাত্ম্য)

আল–কোরআনে এক অত্যাশ্চর্য সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল পাতারয়েছে যা অতি অভিনব এবং অতিশয় বিস্ময়কর। এটি ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় বুনন। এ সম্পর্কে রায় দিয়েছে সর্বাধুনিক কম্পিউটার। ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বে পড়েছে এক বিপুল সাড়া। চূড়ান্ত বিশুদ্ধতায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এসেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আরব মরুর এক অক্ষরজ্ঞানহীন "উম্মীর" উপর অবতীর্ণ কোরআন সম্পর্কে। প্রকাশ পেয়েছে এক বিস্ময়কর ফলাফল – সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর সমস্ত বয়স জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যেত অনুরূপ একখানি গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে, তবু তা চিরদিন থেকে যেত সম্ভাব্যতার সীমানা থেকে অনেক বাইরে। কোরআনে যে সব নিয়ম–কানুন–শৃংখলা মানা হয়েছে , ১৯ সংখ্যার জটিল জালকে যেভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে এঁর মধ্যে – তেমনিভাবে সমশব্দে সম বাক্যসংখ্যায় সমানসংখ্যক অক্ষরে একটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত 6.26×10^{26} বছর। তাও আবার একটি মানুষ যদি এইটুকু পরিমাণগত কাজ (Volumetric work) প্রতিমাসে একটি করে করবার ক্ষমতা রাখেন, তার জন্য এই পরিমাপ। [১]

কত এর মান উল্লিখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির? এর পরিমাপ ভাষায় প্রকাশ সুকঠিন এবং তা অনুধাবনের অনেক বাইরে। সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ 626,000,000,000, 000,000,000,000,000 (৬২৬ এর পর ২৪টি শূন্য)। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে পৃথিবীর বয়স কত? তা মাত্র 450,0000000 (৪৫০ কোটি) বৎসর। জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিই শীর্ষতম। আমরা যদি আজকের দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লেখার কাজে নিয়োজিত বলে ধরে নেই , তবে উক্ত কম্পিউটার লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ জাতির এই মহাসম্মিলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মাত্রা মান হবে $450,0000000 \times 500,\ 0000000 = 225 \times 10^{17}$ কর্ম–বছর যা সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটি ভাগের মাত্র ৩৫ ভাগের সমান ; অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার সমান সংখ্যক মানুষ যদি পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকত কোরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে,

www.pathagar.com

তবে ৪৫০ কোটি বছর বয়সে আজকের দিন পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হত, তার পরিমাণ হত সমুদয় প্রকল্পটির মোট কাজকে একশ' কোটি ভাগ করে তা থেকে মাত্র ৩৫ ভাগ নিলে যতটুকু পরিমাণ হয় – ততটুকু (·000000035) যা হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি নুড়ির মত তুল্য। আর এ প্রকল্পের শর্ত হল এই যে, প্রতিটি মানুষেরই আয়ুষ্কাল ৪৫০ কোটি বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভাবাবেগহীন পক্ষপাত দোষমুক্ত ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের এই রায় ডেকে আনে কোরআনেরই দুইটি আয়াতকে তার পাশে। ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতের বক্তব্য এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের যন্ত্র বিচারকের রায় যখন এক হয়ে পড়ে, তখন বিস্ময় জাগে। মনে হয় আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে যা আল-কোরআনের ভাষায় —

(হে মোহাম্মদ) "বল, যদি এই কোরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবু তাহারা উহা সম্ভব করিতে পারিবে না (১৭ঃ৮৮)। বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হইয়া যাইবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়" (১৮ঃ১০৯)।

লেবাননের অধিবাসী ডঃ রশীদ খলিফা মিসরী সর্ব প্রথম এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। তিনি কোরআনকে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে "সেট" করেন কম্পিউটারে। তারপর শুরু হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা।[২] যারা জনাব ফরিদ উদ্দিন মাসউদ কর্তৃক অনূদিত "আশ্চর্য এই কোরআন" পাঠ করেছেন, তারা বিষয়টির একটি সহজ বিবরণ ইতিমধ্যেই অবগত রয়েছেন।

কোরআনের ৭৪ নম্বর সূরার ৩০ নম্বর আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। প্রস্তাবিত আয়াতটি হল,"আলাইহা তিসআতা আশারা"(عليها تسعة عشر)। বাংলা এবং ইংরেজী অনুবাদগুলো এর বিভিন্ন রকম অর্থ করেছে। জ্ঞানী তরজমাকারিগণের অর্থকরণে কোনরূপ মতামত পেশ না করে আমি আয়াতটির সঠিক অর্থ তুলে ধরব। ব্যবহৃত "আলা" (على) শব্দটির মূল ধাতু "আলো" (علو) যার অর্থ হয় সর্বোচ্চ, সবচেয়ে ভাল, উচ্চতা, মহত্ব ইত্যাদি (Topmost, best part, height, greatness, be high, highly situated, be at the summit of) ইত্যাদি। আলা শব্দের অর্থ হয় তুলে ধরা, উচ্চতর করা, উপর, সম্ভ্রান্ত হওয়া,

www.pathagar.com

উচ্চতর হওয়া (To rise, tower up, greatness, ascend, mount, be high, elevated, raise, lift up) ইত্যাদি অনেক। আবার এই 'আলা' শব্দের অর্থই হতে পারে সবার উপরে (On top of)।[৩] একই শব্দের সংগে ব্যবহৃত "হা" (ها) এর অর্থ হয় জেনে রাখ, ধর, সেখানে ইত্যাদি (নির্দেশ সূচক সর্বনাম বা Demonstrative pronoun এর পূর্বে), এবং তৃতীয় পুরুষে (স্ত্রী) এক বচন বাচক শব্দের শেষ অংশে শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এর ব্যবহার রয়েছে[৪] যার অর্থ দাঁড়ায় অব্যয়সূচক র, এর ইত্যাদি। অতএব, আলাইহা (عليها) এর অর্থ হতে পারে ইহার/তাহার উপরে, উহার মাহাত্ম্য ইত্যাদি। তিসআতা আশারা (تسعة عشر) এর অর্থ হল ১৯। তাহলে সম্ভাব্য যে কয়টি উপায়ে আয়াতটির অনুবাদ করা যায়, সেগুলো হল ঃ-

(ক) তাহার/উহার উপর উনিশ (১৯)।
(খ) ইহার মাহাত্ম্য (greatness of) উনিশ (১৯)।

বর্ণিত অর্থগুলো প্রচলিত ও রীতিভিত্তিক। কিন্তু মজার বিষয় যে কোরআনে কোন কোন স্থানে অত্যন্ত রহস্যঘেরা ব্যাকরণের লংঘন দেখা যায়। এমনি একটি লংঘনকে এ ক্ষুদ্র আয়াতের ক্ষেত্রে মেনে নিলে প্রচলিত অর্থসমূহের বাইরে আরো একটি রহস্যময় অর্থ আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়, তা হল – জেনে রাখ, সবার উপরে উনিশ!

এবার ফিরে চলুন একটু ইতিহাসের দিকে। কোরআন অবতীর্ণ হবার ইতিহাসের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের একটির উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। মোট ২৩ বছরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয় আল-কোরআন। এ প্রসংগে দলিল রয়েছে কোরআনেই , "আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি অল্প অল্প করিয়া" (৭৬ঃ২৩)। ২৩ বছরের এই ব্যাপ্তিতে নাযেলকৃত কোরআনে প্রতিক্ষণ যে বিন্যাস, বিভাগ ও কাঠামো রচিত হয়েছে , তাতে ১৯ – এর বিবেচনা অত্যন্ত প্রকট। কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস থেকে এগুলো প্রমাণিত সত্য। সর্বপ্রথমে নাযেলকৃত ৫টি আয়াতঃ-

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (৯৬ঃ১)
....
যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, – যাহা সে জানিত না" (৯৬ঃ৫)।

এই সুরার স্থানাঙ্ক শেষ দিক থেকে ১৯তম। এতে আয়াতের সংখ্যাও ১৯। দ্বিতীয় বার স্বর্গীয়দূত জীব্রিল নিয়ে এলেন ৬৮ নম্বর সুরার কতিপয় আয়াত।

www.pathagar.com

তৃতীয়বার ৭৩ নম্বর সূরার কিছু আয়াত। চতুর্থ বারে ৭৪ নম্বর সূরার ৩০টি আয়াত নিয়ে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) -এর নিকট অবতীর্ণ হন। এই ৩০নম্বর আয়াতটিই হল একটি ১৯ -এর প্রস্তাব - "ইহার উপরে ১৯", কিংবা, "জেনে রাখ সবার উপরে ১৯"; কিংবা "ইহার মাহাত্ম্য ১৯"।

এবার চলুন কোরআনের পাতায়। লক্ষ্য করুন এর পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোর উপর। দেখবেন অত্যন্ত স্বাবলম্বীভাবে আলাদা এই আয়াতটি "পূর্ব ও পর" এর সংগে সামঞ্জস্য এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছে। অধিকাংশ অনুবাদক ৩০ নম্বর আয়াতে ১৯ জন ফেরেস্তা মোতায়েন করা আছে বলে প্রস্তাব করেছেন। কেউ - উহার উপরে ১৯, এই অর্থেই সীমিত রেখেছেন। আয়াতটির স্বাতন্ত্র্য ধর্মটি লক্ষ্যণীয়। ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতগুলোতে শাস্তির স্থল ছাকার সম্পর্কিত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ৩০ নম্বরে এসেই হঠাৎ করে ১৯ সংখ্যার ধারণাটি এমনভাবে প্রদান করা হল যার নির্দিষ্টতা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু পরবর্তী আয়াতটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। সার্বিকভাবে এর ফলাফল যা আসতে পারে, আমরা তা দেখবার প্রয়াস পাব। সুধী পাঠককে জানিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি যে, প্রচলিত অর্থসমূহের উপর কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য করা হতে আমি অবশ্যই সংযত রয়েছি। তবে আরো কিছু যা হতে পারে তার উপর আলোকপাত করার প্রয়াস নিতে চাই।

৩১ নম্বর আয়াতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর রয়েছে ৭টি অংশ। প্রথম অংশটির নৈকট্য ২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯ আয়াতের সঙ্গে চোখে পড়বার মত। কিন্তু পরবর্তী ৬টি অংশ অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে কেবল ৩০ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে। ৩০ নম্বর আয়াত ও ৩১ নম্বর আয়াতের পরবর্তী ৬টি অংশকে মিলিয়ে পড়লে একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্বের বিষয় খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৩১ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ করলে যে অর্থ আসে, তাতে ফেরেস্তাদের দোযখের উপর মোতায়েন করার বিষয়টি প্রতিভাত হয় যা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। কিন্তু এর পরের অংশগুলোর প্রচলিত অনুবাদ ঃ-

(ক) "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরীক্ষা অথবা বিভ্রান্ত করার জন্যই আমি এই সংখ্যাস্থির করিয়াছি।

(খ) যাহাতে গ্রন্থ অনুসরণকারীগণের আস্থা সুদৃঢ় হয়। আর বিশ্বাসীগণের যেন ঈমান বাড়িয়া যায় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ না পোষণ করে।

www.pathagar.com

(গ) কিন্তু যাহাদের মন সন্দেহ দোষে ব্যাধিগ্রস্ত এবং সত্য প্রত্যাখ্যান কারীগণ যেন প্রশ্ন করে – এই অভিনব উপমা দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা প্রকাশ করেন?

(ঘ) এইভাবে আল্লাহ যাহাকে খুশী পথভ্রষ্ট করেন, যাহাকে খুশী সঠিক পথে চালিত করেন।

(ঙ) তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।

(চ) মানুষের জন্য এইগুলি উপদেশ বই কিছুই নয়।"

উপরে বর্ণিত আয়াতাংশ সমূহকে বিচার করলে আমরা ৩০ নম্বর আয়াতের সঠিক প্রস্তাবটিকে উপলব্ধি করতে পারি। ৩১ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশ ব্যতীত বাকী ৬টি আয়াতাংশের প্রচলিত অনুবাদ উপরে প্রদান করা হয়েছে যাদের ক, খ ও গ – এর প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে ১৯ সংখ্যাটি কোরআনের একটি বিশেষ মাহাত্ম্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রচলিত অনুবাদ আনুযায়ী উপরোল্লিখিত 'ক' অর্থাৎ ৩১নং আয়াতের দ্বিতীয় অংশটি সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণকে পরীক্ষা করা কিংবা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সংখ্যাটি স্থির করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। যদি 'ফিতনাত' (فتنة) শব্দের পরীক্ষা করা, বিভ্রান্ত করা ইত্যাদি অর্থের পরিবর্তে আগ্রহান্বিত করা, বিমুগ্ধ করা, বিমোহিত করা, আকর্ষিত করা (To tempt, charm by, enchant, infatuate, fascinate)[৫] ইত্যাদি অর্থসমূহকে গ্রহণ করা হয় তবে দেখতে পাই , সত্য পরীক্ষা করা বা বিভ্রান্ত করার প্রস্তাব করা হলে কোরআনের অনুবাদে যে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবটি আমরা বোধ করি, তা আর থাকে না এবং প্রদর্শিত খ ও গ – এর অনুপাতে 'বিভ্রান্ত করা' এই জাতীয় অর্থ করার চাইতে 'আকৃষ্ট করা, বিমুগ্ধ করা' ইত্যাদি অর্থসমূহের গ্রহণযোগ্যতাই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই যুক্তির পেছনে কারণ হিসাবে বলা যায় যে, কোরআন মূলতঃ আহ্বানকারী, প্রত্যাখ্যানকারী নয়, সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য, বিভ্রান্ত করা নয়। তাছাড়া প্রচলিত নেতিবাচক অর্থকরণে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় ; অতএব, যুক্তিসংগত কারণেই উল্লিখিত 'ক' – এর অনুবাদকে আমরা নিম্ন লিখিত ভাবে পেশ করতে পারি ঃ

"আমি সংখ্যা সত্যকে আরোপ করিয়াছি যেন সত্য হইতে বিমুখ লোকগণ (সত্য সম্পর্কে) আগ্রহান্বিত হয়" অথবা এভাবেও বলতে পারি – "আমি সংখ্যা সত্যটিকে সত্য হইতে বিমুখ সম্প্রদায়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা বা তাহা দ্বারা বিমোহিত করার মাধ্যমে সত্যকে যেন পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় সেই আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া আরোপ করি নাই।"

www.pathagar.com

এই অর্থ গ্রহণ করলে ক, খ, গ – এর ধারাবাহিকতা অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত হয় যা কোরআন বর্ণনার অতিশয় অনুকূলে। আর এই নতুন অর্থ গ্রহণের ভেতর দিয়ে ৩০ নম্বর আয়াতটির প্রয়োগ অবিশ্বাসীদের আকৃষ্ট করা কিংবা তাদের কর্তৃক বিষয়টিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র আহবান, অনুসারী ও বিশ্বাসীদের আস্থা সুদৃঢ় করা ও ঈমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, পরিশেষে আল-কোরআনের উৎস ও তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সন্দেহহীন ও সুনিশ্চিত হওয়ার ধারণাসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, ৩০ নম্বর আয়াতের অর্থ ১৯ জন ফেরেস্তা হতে পারে – কিন্তু তার চেয়ে বেশী হতে পারার সম্ভাবনা হল ১৯ –এর সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিরোধ যা আল কোরআনের স্বকীয়তাকে চিরদিন অক্ষুন্ন রাখবে যে ভাবে আল্লাহ কোরআনে অংগীকার করেছেন। স্বীয় সৃষ্টিকে কোন বিপর্যয় হতে নিরাপদ রাখবার জন্য তিনি যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে রেখেছেন, সেই ব্যবস্থায় নিয়োজিত বাহিনী সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় প্রদত্ত ৩১ নম্বর আয়াতের বর্ণনাংশ ঙ –এর প্রস্তাবাংশে। আমরা কেউই মহান আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে অবগত নই। হতে পারে তা ফেরেশতাদের বাহিনী, হতে পারে তা ১৯ সংখ্যার জটিল জালের প্রতিরোধও।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা শুধুমাত্র ১৯ –এর প্রস্তাব এবং কোরআনে এ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংবেদিত হয়েছে সে বিষয়টিকে তুলে ধরা। আমরা এখন দেখব, এই প্রস্তাবিত সংখ্যাটি কিভাবে কোরআনের শব্দ ও বাক্য চয়নে বিস্ময়কর ভাবে সম্পর্কিত। আপনাদের ইতিমধ্যে জানা রয়েছে যে, ৭৪ নম্বর সুরা একসাথে ৩০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এই ৩০ নম্বর আয়াতে ১৯ সংখ্যার প্রস্তাবের পর যে আয়াতটি প্রথম নাজিল হয় তা হল – "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" (بسم الله الرحمن الرحيم)। এই আয়াত নিয়ে সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হল সুরা আল – ফাতিহা (The opening)। এর সঙ্গে ৭৪:৩০ –এর রয়েছে এক অভিনব সম্পর্ক। এই আয়াতের অক্ষরের সংখ্যা ১৯। এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ৪টি শব্দ ইসম, আল্লাহ, রহমান ও রাহিম। এরা আল কোরআনে যে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্যেকেই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। নীচে এর চিত্রটি দেখুন :

(اسم)	'ইসম' শব্দটি সর্বসাকুল্যে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯ বার (১৯×১ = ১৯)।
(الله)	'আল্লাহ' শব্দটি সর্বসাকুল্যে ২৬৯৮ বার (১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮)।
(الرحمن)	'আররাহমান' শব্দটি সর্বসাকুল্যে ৫৭ বার (১৯ × ৩ = ৫৭)।

www.pathagar.com

(الرحيم)   'আররহিম' শব্দটি সর্বসাকুল্যে ১১৪ বার (১৯ × ৬ = ১১৪)।

ডঃ রাশীদ মিসরী বিষয়টিকে অতি চমৎকার যুক্তি সহকারে তার লেখায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার যুক্তি,– এত বিশাল গ্রন্থে এই ঘটনাটি একটি শব্দের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিহীনভাবে দৈবাৎ ঘটে যেতে পারে, তবে দ্বিতীয়বার নয়, তৃতীয় ক্ষেত্রে অসম্ভব, চতুর্থবার প্রশ্নাতীত। অর্থাৎ পরিকল্পনাহীনভাবে এই পরিসংখ্যানগত মিলের নিখুঁত মাত্রা একেবারে অসম্ভব। বলা দরকার, এই আয়াতের প্রতিটি অক্ষরই কোরআনের সংখ্যাজাল প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত এক একটি সৈনিক।

শুধু কি তাই?

কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি। "বিসমিল্লাহ হির রাহমানুর রাহীম" আয়াতটি ১১৩টি সূরাতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সূরাতে এর ব্যবহার নেই কিন্তু অন্য এক সূরাতে তার ব্যবহার ২ বার অর্থাৎ তার ব্যবহারও ১১৪ বার যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এখানেই তার শেষ নয়, আশ্চর্য হবার বিষয়গুলো অপেক্ষা করে আছে। এগুলি হল রহস্যময় শব্দ বা শব্দাংশ যা ভাষানীতির অধীন নয়। ডঃ রাশীদ মিসরী এদেরকে "কোরআনী কোড" নামে অভিহিত করেছেন। আলিফ, হা, রা, সীন, সাদ, তোয়া, আইন, কাফ, ক্বাফ, লাম, মীম, নূন, হা, ইয়া, (ا ح ر س ص ط ع ك ق ل م ن ه ى) এই ১৪টি বর্ণে গঠিত আলিফ লাম মীম, আলীফ লাম রা, হা মীম, তোয়া সীন, ইয়াসীন, তোয়া হা, সাদ, নূন, ক্বাফ, আলীফ লাম মীম সাদ, আইন সীন ক্বাফ তোয়া সীন মীম, কাফ, হা ইয়া আইন সাদ, আলীফ লাম মীম রা (الم - الر - حم - طس - يس - طه - ص - ن - ق - المص - عسق - طسم - كهيعص - المر) এই ১৪টি সেটে মোট ২৯টি সূরায় ব্যবহৃত হওয়ার অর্থও (১৪+১৪+২৯) = ৫৭ = (৩×১৯) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হওয়া।

এই কোরআনী-কোডগুলো সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মনগড়া, রসাত্মক ও শ্রুতিকটু মন্তব্য করেছেন। আল-কোরআনের বিভিন্ন খ্রীষ্টান অনুবাদক সেল, রডওয়েল, পামার, গোল্ডসেক, লনড্রেক প্রমূখ দাবী করেছেন, এরা কোরআনের কোন অংশ নয়। তাদের মতামত হল, এগুলো লিপিকারকগণের নামের আদ্যাক্ষরের সাংকেতিক চিহ্নমাত্র। অথচ তারা যদি জানতেন, আরবী ব্যাকরণ রীতিতে ইংরেজীর মত আদ্যাক্ষরে সংক্ষিপ্ত নাম লিখবার প্রথা কোনকালেই প্রচলিত ছিল না

www.pathagar.com

এবং এখনো নেই। তাদের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্পনা কত মারাত্মকভাবে মিথ্যা, তার প্রমাণ আমরা এখানেই মেলে ধরতে চাই।

ডঃ রাশীদ মিসরী তার লিখায় অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে এটি হল, কোন একটি সুরা কোন একটি বিশেষ কোডের দ্বারা যখন শুরু হয়, সেই সুরাতে সেই কোডের অক্ষর/অক্ষরসমূহ যতবার আসে, সে সংখ্যাটি পৃথকভাবে সকল সময়ই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য এবং সমষ্টিগতভাবেও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। ডঃ মিসরীর লেখা হতে প্রিয় পাঠকের হৃদয়ংগম করার জন্য গুটিকয়েক উদাহরণ তুলে ধরছি।

৫০ নম্বর সুরা ও ৪২ নম্বর সুরাতে ব্যবহৃত কোডগুলি যথাক্রমে একক অক্ষর ক্বাফ (ق) এবং একাধিক অক্ষর-গুচ্ছ হা-মীম; আইন-সীন-ক্বাফ (حم - عسق)। বিশেষ কোন সমস্যা ও জটিলতা ছাড়াই আপনি সুরা দু'টির ক্বাফ এর সংখ্যা নিজে গুণে বের করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্বাফ এর সংখ্যা ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার সমষ্টিগতভাবে (৫৭+৫৭) = ১১৪, সেও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯ × ৬ = ১১৪)। তার যুক্তি হল, যেহেতু ক্বাফ অক্ষরটি কেবল উল্লিখিত দু'টি সেটেই কোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেহেতু সমষ্টিগতভাবে এরা ১১৪ সংখ্যক যা কোরআনের মোট সুরার সংখ্যার সমান, সে ক্ষেত্রে ক্বাফ অক্ষরটি যদি কোরআনের প্রতীক হয় তবে কোরআনী কোড ক্বাফ - এর মধ্যে কোরআনের ১১৪ টি সুরার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোরআন অবতীর্ণ হবার বহু পূর্ব হতেই যে কোরআনের বিভক্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহর এই পরিকল্পনা ছিল এটি তারই পরিচায়ক।

আশ্চর্য হবার পালা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। ৫০:১৩ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী শব্দের ব্যবহার। কোরআনের সারা কলেবরে লুত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে মোট ১২টি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ৫০:১৩ আয়াতে 'ইখওয়ানে লুত' (اخوان لوط) শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এই আয়াতটি ছাড়া বাকী সর্বত্র 'কাওমে লুত'(قوم لوط) ব্যবহার করা হয়েছে। ৫০:১৩ আয়াতটিতেও যদি 'কাওমে লুত' ব্যবহার করা হত তবে 'সুরা ক্বাফের' মোট ব্যবহৃত ক্বাফ সংখ্যা হয়ে পড়ত ৫৭ এর স্থলে ৫৮টি। ১৯ দ্বারা বিভাজনে তা হয়ে পড়ত পরিত্যাজ্য, ৪২ নম্বর সুরার সমন্বয়ে ক্বাফ এর সংখ্যা হয়ে যেত ১১৫টি, চিরদিনের জন্য ছিড়ে যেত ১৯ এর জাল, শেষ হয়ে যেত অলৌকিক সুসামঞ্জস্য। মাত্র একটি শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগ নস্যাৎ করে ফেলত কোরআনের

www.pathagar.com

সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জালের বাহাদুরী। এই অস্বাভাবিক ব্যবহারটি এক সাবধানী প্রতীতির স্বাক্ষর বহন করে কি?

ইতিহাসের পাতায় চিহ্ন রয়েছে এমন একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। ৭ঃ৬৯ আয়াতে ব্যবহৃত 'বাসতাতান' (بصطة) শব্দটি আরবী রীতিবিরুদ্ধ। তাকে লিখবার কথা সাদ (ص) –এর স্থলে সীন (س) দিয়ে। ৭ নম্বর সুরায় ব্যবহৃত কোরআনী কোড হল আলীফ–লাম–মীম–সাদ (المص)। এই সুরার এই আয়াতটির উল্লিখিত শব্দটি যদি প্রচলিত রীতি অনুসারে অর্থাৎ সীন –এর প্রয়োগে লিখা হত, তবে কোড অনুসারী সাদ –এর সংখ্যা ৭, ১৯ ও ৩৮ সুরায় সম্মিলিতভাবে হয়ে পড়ত ১৫২টির স্থলে ১৫১ টি যা ১৯ দ্বারা অবিভাজ্য। আর একই সাথে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ত সেই সেই স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য। ভেঙ্গে যেত ১৯ এর এই জটিল জালটি মাত্র ক্ষুদ্র একটি সাদ –এর জন্য। ২৯টি সুরায় ব্যবহৃত এই প্রসার জটিল জালের কোরআনী কোড হয়ে পড়ত অর্থহীন। ইতিহাসের পাতায় অতীতের নিরপেক্ষ সাক্ষ্য বর্তমান। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য আমাদেরকে বলে দেয়, শব্দটি সীন –এর স্থলে সাদ দিয়ে লেখার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশেষ নির্দেশ প্রদান করলে সাহাবিগণ এর প্রয়োগরীতি আরবী ভাষা বিরুদ্ধ বলে জানান। উত্তরে আল্লার রসুল জীব্রিল কর্তৃক বিশেষ নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার কথা জানান এবং ব্যাকরণ বিশুদ্ধ প্রয়োগ না থাকা সত্ত্বেও 'সাদ' সহযোগে শব্দটি তখন হতে লিখা হয়। এই সকল তথ্য প্রমাণ ১৯ সংখ্যার জালটিকে আমাদের উপলব্ধির কাছে উন্মোচিত করে আর বুঝিয়ে দেয় এর নেপথ্যে এক অদৃশ্য প্রতীতি, এক মহাবিজ্ঞ মনীষার অস্তিত্বের কথা। অতিশয় জটিলতাকে অত্যন্ত সহজতর ভাবে প্রকাশ করে তিনি নিজেই স্বকৃতিত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন মাত্র।

একটি বর্ণ যতগুলো কোড এ ব্যবহৃত হয়েছে এবং যতগুলো সুরায় এই কোডগুলো ব্যবহার পেয়েছে, সেই সবগুলো সুরায় সেই বিশেষ বর্ণটির সমষ্টি সকল ক্ষেত্রে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন আলীফ–লাম–মীম, আলীফ–লাম–রা, আলীফ–লাম–মীম–সাদ (الم - الر - المص) এই তিনটি কোডের জন্য লাম (ل) অক্ষরটি একটি উদাহরণ। অনুরূপ 'সাদ' বর্ণটি ৭,১৯ ও ৩৮ নম্বর সুরায় বিভিন্ন কোডে ও বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। এই তিনটি সুরায় ব্যবহৃত সাদ অক্ষরের সমষ্টি ১৫২ তা একটু আগেই বলা হয়েছে যা ১৯ দ্বারা ভাগশেষহীনভাবে বিভাজ্য। এবার আমরা জটিলতার দিকে আরো একটি ধাপ এগিয়ে যাব। কোরআনের কোডসমূহ ও তাদের মধ্যে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর কত জটিলভাবে সম্পর্কিত তারও একটি চিত্র এঁকেছেন ডঃ রাশীদ মিসরী। ২০ নম্বর সুরায় ব্যবহৃত কোড হল "তোয়া – হা" (طه) যার মধ্যে এদের সমষ্টি ৩৪২ (১৮ × ১৯)। তোয়া (ط) বর্ণটি ২০, ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর সুরায় কোড–বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন বিন্যাসে। ১৯ নম্বর

www.pathagar.com

সুরায় ব্যবহৃত কোড –এর পাঁচটি বর্ণের একটি হল – 'হা'। এখন ২০ নম্বর সুরায় তোয়া এবং হা – এর সম্মিলনের ভিত্তিতে ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৮ ইত্যাদি সুরাগুলিতে সম্মিলিতভাবে ব্যবহৃত তোয়া – হা, পৃথকভাবে ব্যবহৃত তোয়া এবং হা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের তোয়া ও হা – এর সমষ্টি বের করে দেখুন। এদের সংখ্যা হল ৫৮৯ এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯ × ৩১)।

"অন্য কথায় বলতে গেলে একটি সুরায় আপাত দৃষ্টিতে একই ধরনের কোড সম্বলিত সুরাসমূহে এবং তাওকীফীরূপে নির্ধারিত এই ধরনের কোড সম্বলিত সুরায় বিশেষ কোন বর্ণকে যদি গণনা করা যায়, তবে এর সমষ্টি সকল সময়ই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য পাওয়া যায়। এতে আপনি আমার এই দাবী সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কোন এক স্থানে উল্লিখিত একটি বর্ণ সমশ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ণটির সাথে এমনভাবে বিজড়িত ও বিসংশ্লিষ্ট যে এটিকে ওটি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। সন্দেহাতীত ও অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণ পেশের মাধ্যমে বিশ্ব স্রষ্টার ইচ্ছাও এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে"[৭]।

উপরে যে কয়টি উদাহরণ সন্নিবেশিত করা হল তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং বিশাল ব্যাপ্তির এক অতি সংকীর্ণ খণ্ডচিত্র। যারা অধিকতরভাবে জানতে আগ্রহী, তারা জনাব ফরিদ উদ্দিন মাসউদ অনুদিত "আশ্চর্য এই কোরআন" (মূল ডঃ রাশীদ খলিফা মিসরী) এবং Al - Quran the Ultimate Miracle পড়ে দেখতে পারেন।

সুরা মুদাস্‌সির – এ প্রস্তাবিত ৩০ নম্বর আয়াতে উনিশ সংখ্যার কোরআন জোড়া বিশাল ও অতি জটিল এ জালের ইঙ্গিত আয়াতটির শানে–নজুলের সাথে সংশ্লিষ্ট। জ্ঞাতব্য যে কোরআনকে যারা মানব রচিত গ্রন্থ বলে মনে করত কিংবা করে , তাদের এই মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে এই আয়াতের অবতারণা।

এখানে একটা প্রশ্ন এসে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আল–কোরআনের নিরাপত্তা এবং তার মাঝে স্বর্গীয় প্রতীতির প্রতীক হিসাবে সংখ্যাতাত্ত্বিক এই জাল বুননের জন্য বিশেষভাবে কেন ১৯ সংখ্যাটিকে বেছে নেয়া হল? কি এই সংখ্যা ১৯? সংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সামান্যও অবগত রয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই অনুভব করেন যে ১৯ হল সর্বপ্রথম অনন্যধর্মী সংখ্যা যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা ১ এবং ৯ বিদ্যামান। ১ হল সংখ্যা–সমূহের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং শূন্য (০) বা অস্তিত্বহীনতার পরে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব। অন্যদিকে সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে ১ হল এমন এক সংখ্যা যার তুলনা নেই। এক অসীমত্ব, এককত্ব, বিরাটত্ব ইত্যাদি নির্দেশ করে। আবার ৯ হল অপর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যময় সংখ্যা, যার রয়েছে অনুপম গুণ যা অন্যকোন সংখ্যায় নেই। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

সংখ্যা যাদের সাহায্য ছাড়া কোনসংখ্যাই সম্ভব নয়। ৯ এর সঙ্গে অন্য যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা (১ হতে ৯) যোগ করুন, দেখবেন, প্রাপ্ত সংখ্যামান সকল অবস্থাতেই যোগকৃত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যার সমান (৯+১ = ১০ = ১, ৯ + ৩ = ১২ = ৩, ৯ + ৭ = ১৬ = ৭)। আবার ৯ এর সাথে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা গুণ করে তার যে মান পাওয়া যায় তা সকল সময় ৯ই থাকে। (৯ × ৩ = ২৭ = ৯, ৯ × ৯ = ৮১ = ৯, ৯ × ৪ = ৩৬ = ৯)। ১ ও ৯ এর এই গুণাগুণের আলোকে ১৯ – এর অর্থ দুটি সংখ্যার দুটি বিশেষ গুণাগুণে প্রকাশ পায় যা যোগকৃত (১+৯ =১) অবস্থায় ১ তার সত্ত্বা হারায় না ও গুণাকৃত অবস্থায় ৯ তার সত্ত্বা হারায় না। অর্থাৎ ১৯ যেহেতু আলকোরআনের নিরাপত্তার একটি প্রকাশ, তা আমাদেরকে বলে যে – "কোন মিথ্যা উহাতে অনুপ্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে (সংযোজনার্থে) কিংবা পশ্চাৎ হইতে" (বিয়োজন বা সত্ত্বা হারানোর অর্থে ৪১:৪২)। "আল্লার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই , ইহা এক মহাসাফল্য" (১০:৬৪)। অন্যপক্ষে ১৯ – এর সংখ্যাতাত্ত্বিক মান হল (১+৯) ১ ; ৭৪:৩০ আয়াতের আলোকে আমরা সহজে বুঝে নিতে পারি যে , এটি সেই অনন্য প্রতীতি মহান আল্লাহর এককত্বেরই সুদৃঢ় প্রতীক।

সুধী পাঠক, এতক্ষণ পর্যন্ত কৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়কি যে, এই কোরআন প্রথমতঃ মানুষ সৃষ্ট হতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ এক অতিবিজ্ঞ বিজ্ঞান দ্রষ্টার প্রতীতি এবং পরিকল্পনার ফসলই হল আলকোরআন, তৃতীয়তঃ এই কোরআন মানুষের চিন্তা ও গবেষণার দাবী রাখে? মহান আল্লাহ তাই বুঝি আহ্বান করছেন মানুষকে কোরআন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য – "তবে কি তাহারা কোরআন সম্পর্কে প্রগাঢ় চিন্তা (গবেষণামূলক চিন্তা) করে না? (৪৭:২৪)। ইহা কোন জ্যোতিষির উক্তি নহে , যদি তোমরা বুঝিয়া থাক (৬৯:৪২)। বরং উহা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ (৬৯:৪৩)। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এই কোরআনের কোন ত্রুটি নাই; (অতএব) তাহারা যেন সংযত হয়" (কোরআন সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ থেকে) (৩৯:২৮)।

আপনি কেন কোরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করবেন? এই প্রশ্নের জবাব হয় যুক্তিতে প্রমাণে, দর্শনে এবং হাতেনাতে পরীক্ষায়। লণ্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়ামে কিংবা তাসখন্দে কিংবা ইস্তাম্বুলের তোপকাপী মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রাচীন লিপিগুলো এবং আজকের দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত থেকে সবচাইতে নতুন মুদ্রিত একখণ্ড কোরআনের কপি যেভাবে খুশি মিলিয়ে দেখুন। এই পরীক্ষা ইতিমধ্যে শতসহস্র বার হয়ে গেছে এবং আপনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প্রত্যক্ষ করবেন যে , কোথাও কোন সামান্য পরিমাণ অনৈক্য বা অমিল নেই। ১৪০০

www.pathagar.com

বছরেরও বেশী বয়স্কালসম্পন্ন এই গ্রন্থ স্থান ও কালের ভেদে কোন পরিবর্তন হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ কোন গ্রন্থ দ্বিতীয়টি নেই। কি হতে পারে তার কারণ? হয়তো বা এ জন্যই যে - "আল্লার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহাসাফল্য" (১০ঃ৬৪)।

অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় - অনেক অমুসলমান স্ব-স্ব ধর্মকে শ্রেষ্ঠতম প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উপায় হিসাবে কোরআনকে হেয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অনেক হীনচেষ্টা করেছেন ও করে থাকেন। কিন্তু অজানা কারণে দিন দিন কোরআনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। আপনি আপনার পছন্দমত যে কোন ভিন্ন ধর্মের পুস্তক হাতে নিয়ে দেখুন এবং পাশাপাশি আলকোরআনকেও। দেখবেন আপনার বিবেক, মেধা কোরআনের ৪ঃ৮২ নম্বর আয়াতটিকেই সমাধানের জন্য উপায় এবং রায় হিসাবে বেছে নেবে - "তাহারা কি সতর্কতার সংগে কোরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন উৎস হইতে অবতীর্ণ হইত, তবে অবশ্যই উহাতে বহু অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি থাকিত।" কোরআন সম্পর্কিত এতবড় চ্যালেঞ্জিং প্রস্তাবনা ছিদ্রান্বেষীগণকে প্রলুব্ধ করে। যুগ যুগ ধরে তাদের নীরবতা কোরআন -এর পবিত্রতার এক অনন্য স্বাক্ষর ছাড়া আর কি হতে পারে?

কোরআনের অতীত প্রকাশনাগুলো, বর্তমানে যা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা প্রকাশিত হবে—সকলই কি করে এক এবং অভিন্ন হওয়া সম্ভব? কি করে সম্ভব যে "খোলাফায়ে রাশীদ্বীন" যুগের কোরআন ও আজকের দিন পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে সংগৃহীত কোরআনের যেকোন একটা কপি পরিপূর্ণভাবে এক ও অপরিবর্তিত। কি করে সম্ভব যে সামান্য পরিমাণও পার্থক্য, বিলয় বা বিরোধ এত বিশাল সময়ের দুই দূরবর্তী প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত দু'টি নকলে সামান্য পরিমাণ আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হয়নি? কোন সংযোজন বা বিয়োজন এর কাছাকাছি সীমানায়ও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এই প্রশ্নের উত্তরে কি এসে যায় এই জবাব -"কোন মিথ্যা উহাতে অনুপ্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাৎ হইতে। উহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসাসহ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ (৪১ঃ৪২)। আমিই কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, আমিই উহার নিরাপত্তা বিধায়ক (১৫ঃ৯)। ইহা এমন এক গ্রন্থ যাহার নির্দেশগুলি (আয়াত) সুদৃঢ় করা হইয়াছে; অতঃপর পরিষ্কারভাবে সহজ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এক সর্বজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞের পক্ষ হইতে" (১১ঃ১)।

www.pathagar.com

এই সব আয়াতের সঙ্গে যখন তথ্য-প্রমাণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে এক করে বিচার করা হয়, তখন আল-কোরআনকে এক মহাপরিকল্পক স্রষ্টার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হিসাবে না মেনে উপায় থাকে না। আমরা কারণ খুঁজে পাই কি করে বিরূপ ভাবাপন্ন পরিবেশে কোরআন বিস্ময়করভাবে যুগ যুগ ধরে তার স্বমহিমায় অবিকৃতভাবে বর্তমান থাকতে পারে। কি করে সম্ভব হয় পৃথিবীর অর্ধকোটি মানুষ[৮] তাকে কণ্ঠস্থ করে রাখে যার অনুরূপ উদাহরণ পৃথিবীতে একটিও বর্তমান নেই। পৃথিবীর আর কোন একটি গ্রন্থও তার সবিস্তার ও সুস্পষ্ট ইতিহাসসহ বর্তমান নেই। কোরআন অবতীর্ণের বিশাল ব্যাপ্তির স্মৃতি ও ইতিহাস দিন, ক্ষণ, পাত্র, স্থান ও পরিবেশের সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ ইসলামিক ও অনৈসলামিক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংগৃহীত অবস্থায় বিরাজমান। আরো বিস্ময়কর বিষয়গুলোর একটি হল এই যে, এত বড় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ যিনি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে, তিনি হলেন আরব মরুর নিরক্ষর মুহাম্মদ (সঃ) যাঁর পুঁথিগত বিদ্যার্জনের সুযোগ কখনো আসেনি। যিনি ছিলেন একজন অনাথ ও আশ্রয়হীন। এতসব প্রতিকূল্যের মধ্য হতে আলকোরআনের মত বিস্ময়কর গ্রন্থের উন্মেষ কোরানিক সত্যতা যাচায়ের সবচাইতে বড় সুযোগ এনে দেয়। আমরা এক বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাই কোরআনের প্রস্তাব ও বাস্তবতার মধ্যে - "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বিরূপভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির্ময় জ্ঞান (কোরআন)কে পূর্ণতা প্রদান করিবেন" (৬১ঃ৮)। ইসলামের শিশু যুগের হতাশা নিবারণকারী এই সান্ত্বনা বাণীর সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞানী পাঠক অবহিত রয়েছেন।

সত্য, যুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে ছেড়ে জীবন ও ধর্ম নয়। জ্ঞানের বাস্তবতা ও সত্যের উৎকর্ষতায় যে বিশ্বাস প্রশস্ত, জ্ঞান ও সত্যের মহামিলন বিন্দুতে যে ধর্ম এসে মিলবে - সেই সঠিক সত্য ধর্ম। সুধী পাঠক। এই বইটি আপনাকে হাতেকলমে এমনি এক মানব ধর্মের সন্ধান দেবে।

---

১ । Al - Quran the Ultimate Miracle - Ahmed Deedat, Durban. South Africa 1979.
২ । উজ্জীবন - সৈয়দ আশরাফ আলী।
৩ । Hans Wehr Arabic English Dictionary -J.M Cowan.
৪ । Arabic Eglish Dictonary - F. Steingass
৫ । Arabic English Dictionary - F. Steingass.
৬ । কোরআন শব্দের আদ্যাক্ষর কাফ (ق)।
৭ । ডঃ রাশীদ খলিকা মিসরী - অনুবাদ জনাব ফরিদ উদ্দিন মাসউদ।
৮ । কোরআন নির্দেশিকা - আবদুল মতীন জালালাবাদী।

www.pathagar.com

শর্ত – ২

আল-কোরআনের বিষয়বস্তু এবং তথ্য প্রস্তাবের পদ্ধতি কি ?

সঠিক ও সুনিশ্চিত জবাব আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর আর সকল ধর্ম পুস্তক এবং গবেষণাকর্ম থেকে কোরআনের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। সাধারণতঃ আমরা যে সকল গ্রন্থ বা গবেষণাকার্য পড়তে ও লিখতে অভ্যস্ত, সেগুলো সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ধারণাকে চিত্রায়িত করে। আল-কোরআনের পাতায় এমনি কোন ধারা অনির্দিষ্ট। বর্ণনার গতানুগতিক ধারাবাহিকতা বজায় না রাখা, আকস্মিক অবতারণা, আকস্মিক পটপরিবর্তন, অতি অল্পে বিশাল বর্ণনা, আয়াতসমূহের বহু অর্থ প্রকাশ গুণ, শব্দচয়নে বাক্যকে বহুমুখী গুণদান, অশ্রুতপূর্ব বাচনপদ্ধতি কাব্য ও সাহিত্যের সংমিশ্রণজাত সাহিত্য বিকাশ, পুনরাবৃত্তি, কঠিন শব্দ, বাক্য ও ভাবকাঠামোর মধ্য হতে অপূর্ব সহজবোধতার সৃষ্টি, প্রস্তাবের দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টতা, সুদৃঢ়তা, বাস্তবতা, অতি উচ্চাংগের উপমা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে একই বিন্দু হতে দর্শন, সর্বকালীন উপযোগিতা ইত্যাদি আরো অসংখ্য গুণাগুণের সন্নিবেশে বর্ণনায় এমন মহারাজকীয়তা ফুটে ওঠে যে, জনৈক ফরাসী গবেষক অবতীর্ণের ১৪০০ বছর পরেও অত্যন্ত জোরগলায় সারাবিশ্বের কাছে প্রস্তাব করেছেন- "কোরআনের দৃশ্যতঃ যদি কোন চরম নিখুঁত বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তবে সেটি হল তার অপরূপ প্রকাশভঙ্গী এবং অদ্বিতীয় বর্ণনাশৈলী। বিষয়বস্তুর পারিপাট্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে কোরআন সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে কোরআনের সুর গ্রীক দর্শনের সুর হতে অনেক উর্ধ্বে। এর সত্যসনাতন অনবদ্য ভাব ব্যঞ্জনা দিনের পর দিন মানুষের মনোজগতে উদ্ভাসিত হচ্ছে , এর অপরূপ তথ্য রহস্য কোনদিনই সেকেলে হবার নয়।" [১]

মূলতঃ একটি ধর্মগ্রন্থ হওয়া ছাড়াও আল-কোরআন ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় সমস্যার যে সফল সমাধান দিয়েছে , পৃথিবীর ইতিহাসে এর সমকক্ষ আর কোন একটিও নেই। আমাদের আলোচনার পরিধি সীমিত বিধায় আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাবলীর উপর দৃষ্টি ফেরাব। কোরআনে মানুষের জ্ঞাত অজ্ঞাত বহুবিধ বিষয় তালিকার একটি হল বিজ্ঞান। প্রায় সাড়ে সাতশ আয়াতে রয়েছে বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য-প্রস্তাব।

www.pathagar.com

কোরআনের বিজ্ঞানময়তার সত্যতার মাত্রা কি ? আমাদের আলোচনায় সেটি বড় হয়ে এল কোন্ কারণে ? তারপর প্রতিষ্ঠিত তথ্য-চিত্র আমাদের কোন্ সত্যাসত্যের দিকে টেনে নেয়? আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হই ?

শেষ দু'টি জিজ্ঞাসার জবাব সুধী পাঠক ও জ্ঞানী সমাজের । আমরা শুধু প্রথম দু'টি জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজার প্রয়াস নেব। এ দু'টির মধ্যে প্রথমটির একটি সীমিত বিস্তার উত্তর দেয়ার প্রয়াস রেখেছে আমার এই গবেষণা কর্মটি, সুধী পাঠককে মীমাংসো পাবার জন্য হলেও বইটি পড়তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর হল কোরআনের প্রস্তাব এবং আজকের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতার চরম মাত্রা, এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় ও বিরোধ কোথায় তা খুঁজে বের করা, আর তা দিয়ে কোরআনের মান পরখ করে দেখা। যদি প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি ও ব্যতিক্রম না দেখা যায়, তবে তাকে একান্ত ও চরম সত্য বলে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা – মিথ্যা প্রমাণিত হলে ছুড়ে ফেলে দেয়া। প্রমাণিত তথ্যসমূহ অপরাপর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সহায়ক হয় এবং কোরআনে বিজ্ঞানের যে বিশাল বিস্তৃতি রয়েছে তা সত্য জিজ্ঞাসায় চূড়ান্ত রায় সহকারে আমাদেরকে আল-কোরআন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে সাহায্য করে। তারই চিত্র পাওয়া যায় ডঃ মরিস বুকাইলি –এর তথ্যবহুল বক্তব্যে, It is impossible to explain how a text produced at the time of Quran, could have contained ideas that have only been discovered in modern times.

আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বের কোন একটি গ্রন্থ আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোর কথা কি করে এত নিখুঁত সত্যতার সাথে পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছিল এ বিষয়টি ব্যাখ্যাসাধ্য নয়। গবেষকের এই উক্তির মাঝে কিছু জিজ্ঞাসা এবং পাশাপাশি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর এসে ভিড় জমায়। এর মাঝেই যেন আমরা সিদ্ধান্ত পেয়ে যাই – "এইগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদের আহ্বান করে তাহা সত্যবিবর্জিত " (৩১ ঃ ৩০) ।

জ্ঞানী পাঠকের অনুধাবনকে সামান্য জাগিয়ে তোলাই ছিল উপরের কথাগুলোর লক্ষ্য। এ মূহুর্তে আমরা এই শর্তে কেন্দ্রীয় ধারণাগুলোকে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পাব।

কোরআনে পরিবেশিত বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কখনোই আলাদাভাবে পরিবেশিত হয়নি। এরা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র কোরআনে বিক্ষিপ্তভাবে। হঠাৎ করে যদি কেউ কোরআনের অনুবাদ পড়তে শুরু করেন, প্রথমেই তার কাছে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে

www.pathagar.com

ধরা দেবে, সে হল বর্ণনার বিক্ষিপ্ততার ধারণা। যে নামকরণ কিংবা প্রস্তাবনা নিয়ে কোন সুরার শুরু, বর্ণনার কলেবরে সেই নামকরণের বাইরের আরো অসংখ্য বিষয় ভিড় জমিয়েছে। বর্ণনার ধারাগত বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। প্রতিটি আয়াত একটির সংগে অন্যটি সুন্দর ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্য দিয়ে অপূর্ব ভংগিতে পটপরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। প্রতিটি আয়াত স্ব-স্ব বিস্তারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একটি অন্যটির সংগে যোগসূত্র বজায় রাখা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষিতার দোষে দুষ্ট নয়। কতিপয় আয়াত সমষ্টি যখন একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনে চলে, তখন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন একটি আয়াত পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে হঠাৎ সম্পূর্ণ নতুন কোন দিক বা বিশেষত্বকে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করে তোলে যে, সেই আয়াতগুলো সহজভাবে চোখে পড়ার মত আলাদা দেখা যায়। এগুলো এত সহজভাবে আলাদা যে পাঠক মাত্রই তা ধরে নিতে পারবেন। ধারাবাহিকতার এই লয় এবং ভিন্ন একটি প্রস্তাবনার অব্যাহতির পর পরই যে আয়াত এসে পড়ে, তা পূর্ব ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতেও পারে অথবা সম্পূর্ণ নতুন কোন প্রস্তাবনা কিংবা সেখান থেকে নতুন ভিন্ন ধারার সৃষ্টিও হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে এটা খুব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে যে, বিশেষ সে আয়াতটি যা গোত্রীয় আয়াতসমূহ সাপেক্ষ বর্ণনা কিংবা শানে নজুলের[১০] বিচারে দৃশ্যতঃ ভিন্ন, সেইরকম একটি আয়াত হয়ত বড় কোন তথ্য, আইন কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দাবী করেছে। কোরআনের বিপুল সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এমনি এক ধারা বা নিয়মের অনুসারী। এর সঠিক কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা একমাত্র আল্লাহরই থাকা সম্ভব। আমার ধারণায়, এর এমনও কোন যুক্তি থাকতে পারে যে, প্রকৃতই সেই সব প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোকে সহজভাবে নির্দেশিত করার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধিসীমায় পৌঁছে দিয়ে এই মহাগ্রন্থ সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভিতকে সুদৃঢ় করা।

উপরের ধারণাগুলোর সত্যতা সম্পর্কিত উদাহরন পেশ করা যেতে পারে। ৪৮ঃ২৩ আয়াতের কথা ধরা যাক। এটি এই সুরার ৩ নম্বর রুকুর অন্তর্গত। এই রুকুতে বিশ্বাসিগণের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি জ্ঞাপনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ১৮ থেকে ২২ নম্বর আয়াতের দিকে তাকালে দেখবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিজয়, যুদ্ধলব্ধ বস্তুসম্ভারের বিষয়ে নীতি , আশ্বাস, নিরাপত্তা, আল্লাহর ব্যাপ্তি ও অমান্যকারীগণের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের ফলাফল কি হতে পারত ইত্যাদি সম্পর্কে বাণী। ২৪ থেকে ২৬ আয়াতসমূহে দেখবেন মক্কা বিজয় ও তার বৈশিষ্ট্যগত দিক, ইসলাম অমান্যকারীগণের প্রতি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ও অবিশ্বাসীগণের তুলনায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং কল্যাণের আশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে , "ইতিপূর্ব হইতে আল্লাহর এইরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে এবং তুমি আল্লাহর বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন দেখিবে না" । ২২ নম্বর আয়াতের

www.pathagar.com

সংগে এর উপযুক্ত অন্বয় থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যতঃ আয়াতটি এই রুকুর অন্যান্য আয়াতের তুলনায় একটু আলাদাভাবে চোখে পড়ার মত। লক্ষ্য করুন, এটি স্বব্যাখ্যিত এবং ধারাবাহিক প্রয়োগ ও স্থানীয় অর্থের বাইরেও এর রয়েছে বিশাল ব্যাখ্যা ব্যাপ্তি। এটি একটি আইন, নীতি, চ্যালেঞ্জ এবং ঐতিহাসিক তথ্যজাতের। অনুরূপভাবে ৭২ঃ২৮ আয়াতটিও দেখুন। দ্বিতীয় রুকুর অন্তর্গত প্রস্তাবনাগুলো হল আল্লাহর তরফ থেকে মুহাম্মদ (সঃ) কে কতিপয় সুস্পষ্ট নির্দেশের তাগিদ, অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্টতা, অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর কর্তৃত্ব, আল্লাহর সুনিশ্চিত শেষ বিচার হতে নিষ্কৃতিবিহীনতার বিষয়, রসূলের কর্তব্য, প্রতিদান দিবস, অদৃশ্যের জ্ঞান, নির্বাচিত রসূরের জন্য অদৃশ্যের জ্ঞান ও তা সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। শেষ আয়াতের শেষ অংশের দিকে তাকান। দেখবেন পটভূমি হতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম প্রস্তাব অথচ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথেও সংগতি রাখতে সমর্থ এমনি এক আয়াতের অবতারণা যা মূলতঃ বিজ্ঞান সম্পর্কিত এক মৌলিক ধারণার গৌরব বহন করে। পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হল — "তিনি তাহাদের অবস্থানসমূহকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং সকল বস্তুর সংখ্যা সম্পর্কে রহিয়াছেন "। আয়াতটি তার নিজস্ব প্রয়োগ ক্ষেত্রের বাইরে সুবিস্তৃত বিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশন করে। ৭৪ ঃ ৩০ আয়াতকেও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যার যথার্থতা পূর্বের শর্তটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কোরআনে এমনি হাজারো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের প্রস্তাব নিয়ে যেসকল আয়াত রয়েছে, তাদের একটা বিশেষ শ্রেণী হল শপথের বাক্য। তা ছাড়াও শব্দ ও বাক্য প্রসারের এমন নাজুক সংকটপূর্ণ তথ্যের প্রস্তাব দেখা যায় যা চুল থেকে চুল পরিমাণ অন্য রকম হলে কোরআনের দম্ভটি বিজ্ঞানের চোখে নষ্ট হয়ে যেত। আমার মাথা মহান আল্লাহর সূক্ষ্মতার পরিমাণ মাত্রা নিরূপণ ভঙ্গি দেখে নিজ মনের অজ্ঞাতে এমনিভাবে নুয়ে আসে, মনে হয় আমি যেন শ্রদ্ধা ও বিনয় বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না যখন দেখি, ছোট্ট একটি শব্দে এমন এমন আশ্চর্য রকম শাসন মানা হয়েছে, যার স্বাভাবিক ও গতানুগতিক কিংবা আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার প্রয়োগ করা হলে তথ্যটি মহাবিশ্বের সৃষ্টিক্ষণ থেকে আজকের দিনে দূরত্ব ও সময় মাত্রার পরিমাপে (Space time continuum) মিথ্যা ও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়ে পড়ত। কি করে কোথা থেকে এত দুর্বোধ্য সতর্কতা, বিচক্ষণতা, সঠিকতা ও বিজ্ঞানময়তা এল আল-কোরআনে, বিষয়টি ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হয়ে পড়তে হয়। সর্ব আপেক্ষিকতার এই বিশ্ব-সংসারে ক্ষণিকের জন্য মনে হয় — বুঝি এরই নাম "চরম সত্য"!

সুধী পাঠক, আবেগ নয় — আবার অনুভূতিহীনতাও নয়, এই দু'য়ের অন্বয় ও বাস্তবতায় যে সত্য আমাদের লৌকিক-জগৎ জ্ঞানকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে,

www.pathagar.com

আপনি ঠিক তারই প্রশস্ততা দেখবেন কোরআন মজীদের বাণী সম্ভারে; যেন জীবন, সত্য, মহাকাল এদের গতি প্রবাহের সংগে মিলে গিয়ে এক হয়ে আছে এবং সে কারণেই সময়ের পরিবর্তনে এই গ্রন্থের বাণী পুরাতন, সেকেলে বা উপযোগীতাহীন হয়ে পড়ে না। আর ঠিক এই সুরটিই বিচক্ষণতার চরম মাত্রায় ধ্বনিত হয় কোরআনের পাতায় — "তোমার প্রভুর বাণীসমূহ বাস্তবতায় ও মধ্যপন্থায় পরিপূর্ণ, তাঁহার বাণীর কোন পরিবর্তনকারী নাই" (৬ঃ১১৫)।

অনির্দিষ্টতা কোরআনের আর একটি বিশেষ বাহ্যিক স্বরূপ। এই অনির্দিষ্টতার ধরনটি এমনি আশ্চর্য রকমের যে তা অবশ্যই এক সুদৃঢ় সুনির্দিষ্টতার মধ্যে দিয়ে অনির্দিষ্ট থেকে যায়। এই অনির্দিষ্টতা কোরআনকে সর্বযুগ উপযোগিতা প্রাপ্ত হতে সাহায্য করেছে প্রভূতভাবে। সম্ভবতঃ এই অনির্দিষ্টতা কোরআনে এমন অপূর্বভাবে গাঁথুনি নির্মাণ করেছে যে, একযুগে যা প্রতিষ্ঠিত তথ্য অথচ মূলতঃ বিষয়টি বিজ্ঞানসিদ্ধ নয় এবং শত বছর পর ধারণা পাল্টানোর ফলে মানুষ হয়ত দেখল বিষয়টি হুবহু কোরআনে প্রকাশিত রয়েছে এবং বিজ্ঞান ও কোরআনে আর কোন বিরোধ থাকছে না। অথচ একই বিষয় শত বছর পূর্বে কোরআনের সংগে যে বৈষম্যের ব্যবধান রক্ষা করে যাচ্ছিল, তার ধারায় প্রচলিত জ্ঞান তার যুগোপযোগী তথ্যসমূহ দ্বারা কোরআনের শাশ্বত ধারাকে চ্যালেঞ্জ করার কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। বিষয়টি যেন এমন যে, কোন এক জ্ঞানী প্রতীতি প্রস্তাবগুলোকে এমনিভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে, মানবীয় সিদ্ধান্তসমূহের বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা কোরআনের স্বকীয়তা ও গাম্ভীর্যকে প্রভাবিত কিংবা সংশ্লিষ্ট করে না। এক অপূর্ব নিরপেক্ষতা গুণাগুণ যুগের ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে এমনিভাবে পাশ কেটে গেছে যে, কোন সম্মুখ সংঘাত প্রকট হবার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। উদাহরণস্বরূপ মধ্যযুগীয় স্থির সূর্য কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ইতিহাসকে টেনে আনা যায়। বিজ্ঞান সূর্য মাঝখানে স্থিরভাবে বসে থাকা অবস্থায় গ্রহদের পরিভ্রমণ করার ধারণাকে তুলে ধরেছিল। চার্চ পৃথিবীকে সূর্যের স্থানে রেখে সূর্যের পৃথিবী কেন্দ্রীয় মহাযাত্রার ব্যস্ততার ধারণার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এই দুই পক্ষের টানাপড়েনে কে কাকে ঘিরে ঘুরছে এই বিষয়টি একটি নির্দিষ্টতার দাবী রাখে। এই দাবীর সঠিকতা নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে বিজ্ঞান পরে চার্চ উভয়ই পরবর্তী বিজ্ঞানের কাছে মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। কোরআন সুনির্দিষ্টভাবে সূর্যের সঞ্চালনের উপর তথ্য প্রকাশ করেছে, কিন্তু কে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল এমন কোন তথ্য প্রদান করেনি। মধ্যযুগীয় মূল বিরোধ কিন্তু এই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছে। আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে বিষয়টির সহজ বিশ্লেষণ পেতে পারি। সূর্য স্থির, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কিংবা পৃথিবীকে সূর্য কেন্দ্র করে ঘুরছে, এই দুই শিবিরের বিশ্বাসের একটিও যেখানে সঠিক নয়, সেখানে কোরআনের অবতারণা, — "সূর্য তাহার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত, ইহা মহাপরাক্রমশালীর নির্ধারিত ব্যবস্থা" (৩৬ঃ৪০)।

www.pathagar.com

এবং "ইহার মধ্যে সমস্তই (সৃষ্টিময় যাবতীয় বস্তুই) সঞ্চালনশীল" (৩৬ ঃ ৩৪)। এমনি তথ্যসমূহে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের কৌশল এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের মধ্যেই একটি সাধারণ তত্ত্ব অর্থাৎ মানুষের চাহিদামাফিক কোন ক্ষুদ্র গণ্ডি সীমাকে নির্দেশ করবার জন্য ব্যাখ্যা প্রদান হতে বিরত থেকে এইসব ক্ষেত্রের জন্য একটি সাধারণ সূত্র প্রয়োগ করেছে। এই পথটি অবলম্বন করায় কোরআনের মাহাত্ম বেড়েছে, এটি উপযোগী হয়েছে সকল যুগের চাহিদার কাছে।

কোরআনের চৌকস ঔদার্য্যের চিহ্নস্বরূপ উদ্ধৃতি পেয়ে যায় আয়াতটি, "দ্বীনের (ধর্ম) পথে কোন জোর জবরদস্তি নাই, নিশ্চই সত্য মিথ্যা হইতে পৃথক রহিয়াছে" (২ ঃ ২৫৬)। আয়াতটির শেষাংশে একটি দৃঢ় অবস্থা প্রকাশ পায় যার পাশাপাশি ৭৬ ঃ ২৯ আয়াতটিকে দাঁড় করিয়ে দেখা যায় — "এই হইতেছে উপদেশপূর্ণ বিবরণ, অতএব যাহার খুশী নিজ পালনকর্তার দিকের পথ গ্রহণ করুক।" আয়াতগুলো পাশাপাশি বিচার বিশ্লেষণ করলে যে ধারণাটি ফুটে ওঠে তা অধ্যাপক মোমেরি তুলে ধরেছেন এইভাবে— "শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর ভাষায় এমন কোন উক্তি নাই যা মানুষের উপাসনার দিকে কোনরূপ অনুরোধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।" ১১। অধ্যাপক মোমেরি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উক্তি বলতে কোরআনকেই বুঝিয়েছেন। সত্যের প্রকৃত দম্ভই প্রকাশ পায় এই আয়াতগুলো থেকে। অনুরূপ আরো আয়াত আল-কোরআনে আরো কয়েক স্থানে এসেছে যেগুলো নির্দেশদান করছে কোরআনকে বিশ্বাস করবার জন্য, মান্য করার জন্য, পালন করার জন্য। যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, প্রস্তাবে কোনরূপ অনুরোধ, ছলনা, প্রাণঢালা আবেগ ইত্যাদির বিন্দুবিসর্গও আপনি প্রত্যক্ষ করবেন না, তা সুনিশ্চিত। সুনির্দিষ্টভাবে যে কেউ অনুধাবন ও জ্ঞানের বিচারে একে গ্রহণযোগ্য দেখবে — সেই যেন তা গ্রহণ করে। কেন এমনভাবে বলা ? কোথা হতে এ দম্ভের উৎসরণ ? বিচার বিশ্লেষণ করলে আপনিই দেখবেন— মূলতঃ তা সত্য থেকে। সত্য, শুধু সত্যই কোরআনের দম্ভ। কারণ হল— " তাঁহার মহাবাণী সত্য" (৬ ঃ ৭৩)।

কোরআনের বর্ণনা নৈপুণ্য, ভাবচরিত্র বিচার, পরিধি নিরূপণ এইগুলো কখনো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা জানি না, তবে আমার মত অল্প জানা মানুষের তা সাধ্যসীমার অনেক বাইরে। আমিও শেষ ভাগে সবার সংগে একমত হয়ে বলতে চাই, কোরআন মূলতঃ তত্ত্বধর্মী ধারণার প্রস্তাবক, পদে পদে এর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য। পূর্বেকার আলোচনায় (শর্ত) আপনারা কম্পিউটার কর্তৃক কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে যৎসামান্য ধারণা পেয়েছেন তার আলোকে বলতে চাই, এতবড় গ্রন্থের এত সুবিশাল জটিল গাঁথুনি এবং তথ্য প্রস্তাবনার নাজুক ও সংকটপূর্ণ অবস্থায়ও একটি মাত্র শব্দ বাক্য বা তথ্যের প্রয়োগ

www.pathagar.com

নেই যা কোন কারণে বিন্দুবৎ পরিমাণও স্বরিরোধ বা বৈপরীত ঘটিয়েছে। কোথাও একটি অসংগতি বা অসামঞ্জস্য খুঁজে পাবেন না, যা কোরআনেরই নিজ দলিলে প্রতিভাত, — "তাহারা কি সতর্কতার সংগে কোরআনকে অনুধাবন করে না ? আর যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষ হইতে হইত, তবে তাহারা উহাতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি প্রত্যক্ষ করিত" (৪ঃ৮২)।

আপনারা আরো জেনে রাখুন— "উহা মহা সম্মানিত কোরআন (৮৫ঃ২১), লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত (৮৫ঃ২২)। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (২৬ঃ১৯৬); বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে, উহা কি উহাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন নহে ?" (২৬ঃ১৯৭)। ইতিহাস এই সকল আয়াতসমূহের সত্যতা বহন করে। উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদে জ্ঞান-বৃদ্ধ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম পণ্ডিত ওয়রাকা বিন নওফেল "কুদ্দুসুন! কুদ্দুসুন! নামুসুল আকবর"[১২] বলে যে আনন্দ চিৎকার দিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় আজো তা অক্ষত সত্য হয়ে গাঁথা রয়েছে। এ সত্য উল্লিখিত আয়াতটির সত্যতার অনেকগুলি প্রাপ্ত নমুনার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

সবশেষে সুধী পাঠককে একটি জরুরী বিষয়ে অবগত করতে চাই। আমরা জানি যে, কোরআনে এমন আয়াত রয়েছে যারা একটি আয়াতে একাধিক তথ্য প্রদান করার জন্য নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র আয়াতাংশ সৃষ্টি করে। এই আয়াতাংশগুলো নিজেরা নিজেদের মধ্যে স্বাবলম্বী। আমি আমার বর্ণনার ধারাস্রোতকে বজায় রাখবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আয়াতটি ব্যবহার না করে তার প্রয়োজনীয় আয়াতাংশ ব্যবহার করেছি যা মোটেই দোষের নয়। আপনি কোন নির্দিষ্ট অনুবাদের সংগে এই বইটিতে প্রদত্ত আয়াতের নম্বরসমূহের হয়ত কখনো অমিল পেতে পারেন। বিভিন্ন উৎস হতে ছাপানো বিভিন্ন কপির মানবীয় ভ্রান্তির কারণে দেখা যায় যে, কেউ একটি আয়াতকে দুটি আয়াতে ভাগ করে ফেলেছেন, কেউ দু'টি আয়াতকে একটি করে দিয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে আপনি যে কপি অনুসরণ করবেন, প্রতিপাদ্য আয়াত নম্বরের আগে-পিছে লক্ষ্য করলে অবশ্যই সে আয়াতটি পেয়ে যাবেন (কোরআনের সকল অনুবাদই কোন না মাত্রায় অসফলতার দোষে দুষ্ট[১৩])। মূলতঃ কোরআনের বর্ণনাভংগি এমনি অভিনব যে, এ অভিনবত্বকে স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচলিত ভাষা ও শব্দসমূহ সম্পূর্ণভাবে সক্ষম নয়। এমন বহু আয়াত রয়েছে যাদের অর্থ আমাদের কাছে এখনো সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট নয়, এমন বহু আয়াত আছে যাদের অর্থ পূর্বের তুলনায় আজকের দিনে আমরা অধিকতর সুস্পষ্টতার সাথে ব্যাখ্যা পেতে দেখি। কালজয়ী এই গ্রন্থের বাণীর বহুমুখিতা, সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তাকে নব নব তথ্যে আমাদের কাছে হাজির করে।

www.pathagar.com

আমি যে সকল আয়াত/আয়াতাংশ ব্যবহার করেছি, তাদের অনুবাদকে সাধু ভাষায় পেশ করা হয়েছে। বলে রাখা জরুরী যে, সকল অনুবাদক, তফসীরকারীগণের জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-বিনীত এবং তাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। কোরআনের অনুবাদ কয়েকশ' বছর পূর্বে হওয়ায় এর যে সকল তথ্য সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহের নির্দেশ করে, তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য কখনো আমাকে প্রচলিত অর্থের বাইরে যেতে হয়েছে। যিনি বিজ্ঞান পড়েন, তিনি কোরআন পাঠ করেন না এবং যিনি কোরআন পাঠ করেন, তিনি বিজ্ঞান পড়েন না ঃ আমি এ দুই-এর মাঝে সেতুবন্ধন রচনার একটি যৎসামান্য প্রয়াস রেখেছি মাত্র।

---

৯ । ডঃ মরিস বুকাইলি — বাইবেল কোরআন এন্ড সায়েন্স।

১০ । কোরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হবার প্রেক্ষাপট।

১১ । স্যার সৈয়দ আমীর আলী — দ্য স্পিরিট অব ইসলাম।

১২ । স্যার সৈয়দ আমীর আলী — দ্য স্পীরিট অব ইসলাম।

১৩ । কোনআনের বিভিন্ন অনুবাদের আয়াত সংখ্যা ভিন্নতা চোখে পড়বার মত। এই বৈষম্য মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট — যদিও কোরআনের কোন অক্ষর, শব্দ, বাক্য ও প্রস্তাবের সংগে এর কোন সম্পর্কই নেই। আয়াতের বিভাজন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কোন একটি অনুবাদে যে স্থানে দেখতে পাই, অন্য কোন অনুবাদ পুস্তকে তা হয় এক আয়াত পূর্বে কিংবা এক আয়াত পরে অবস্থান করে। কোন অনুবাদ সংস্থা দু'টি আয়াতকে এক করে দেখিয়েছে, অন্য কেউ একটিকে দু'টি করে ফেলেছে বলেই এমন ঘটে। মূলতঃ কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি, ইস্তাম্বুলের তোপকাপী মিউজিয়ামে রক্ষিত দু'টি স্বর্ণ নির্মিত "ক্যান্ডেল ষ্টীক" -এর গায়ে খুদিত পাথর-সংখ্যা এর ঐতিহাসিক প্রমাণ। কোরআনের প্রত্যেক আয়াতের নিদর্শন হিসাবে একটি করে মোট ৬৬৬৬টি মূল্যবান পাথরে অলংকৃত দু'টি বাতিদানী কাবা শরীফে উপহার হিসাবে প্রেরণের জন্য তদানীন্তন তুরস্কের শাসনকর্তাগণ নির্মাণ করেছিলেন যা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক রহিত করা হয়। সে বাতিদানীগুলির পাথরের সংখ্যা হতে আমরা জানতে পারি যে কোরআনের সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬। প্রচলিত অনুবাদসমূহের আয়াতের সংখ্যা ভিন্নতা থাকলেও কোরআনের কোন শব্দ, অক্ষর বা বাণী এতে ছুটে যায়নি বা বাদপড়েনি।

www.pathagar.com

জ্ঞান পর্ব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১
ইতিহাসের সাক্ষ্য

What is most destructive in the world is time —কথাটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য হল সময়ের রক্ষণশীলতা। সময় ধরে রাখে ঘটনার প্রবাহকে, লেখা হয় ইতিহাস। নিষ্ঠুর সে ইতিহাস নির্ভেজালভাবে নিরপেক্ষ। এর কারো প্রতি নেই অনুকম্পা, কারো প্রতি নেই দুর্বলতা, ভয় ও সমীহ। আপন গতিতে বয়ে চলে সে মহাকালের দুর্নিবার শাসনে। মানুষের একক অথবা সমষ্টি কেউ কখনো ইতিহাসকে স্খলিত করতে পারে না তার অনবদ্য যাত্রাপথ হতে। সময়ের এই নিরপেক্ষ গুণাগুণের জন্যই নিউটন তার তত্ত্বে বলেছেন, — "চরম সত্য সময় (absolute true time) তার আপন গতিতে বয়ে চলে মহাকালের টানে, কারো সাথে এর কোনরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না"[১৪]। ইতিহাস তার মহামাতা সময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাত্র। আর তার যাত্রাপত্রে চিহ্নিত হয়ে পড়ে ঘটনার দাগগুলো অমর, শাশ্বত, অবিকৃত ও সত্য।

১৪০০ বছরেরও বেশী হয়ে যায় ইসলামের উদিত সূর্যের বয়সকাল। তার নির্দেশিকা হিসাবে অবতীর্ণ হয় আল-কোরআন। সর্বমোট ২৩ বছরে সহজ ও বোধগম্য আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থ নিজেই এক অনন্য ইতিহাস। তার পাশাপাশি বয়ে যাওয়া সময়, রচনা করেছে আরেক ইতিহাসের প্রবাহ। এই দুই ধারাকে পাশাপাশি রেখে আমরা বিচার করতে পারি একেবারে হাতের তালুয় পৃথিবী গোলক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাত সমুদ্দুর আর সাত মহাদেশ দেখার মত। আমরা সুদীর্ঘ ইতিহাসের পেক্ষাপটে কোরআনের প্রস্তাবসমূহকে পাঠ করতে পারি আমাদের ঈপ্সিত বিষয় 'মহাজগৎ' সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে। আমাদের আলোচনা জ্ঞানী পাঠকের উপলব্ধি ও বিচার শক্তিকে জাগ্রত করবে বলে বিশ্বাস রাখি।

জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের সবচাইতে পুরাতন শাখা।[১৫] মানুষের জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার কাছে আকাশ ও স্বর্গীয় আলোকময় বস্তুগুলো চিরদিনই ছিল কৌতুহলের বিষয়। আকাশকে মানুষ কল্পনায় গড়েছে, ভেঙ্গেছে, নিজের বল্গাহীন চিন্তাশক্তির দৌরাত্ম্য দিয়ে যতদুর সম্ভব, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে আর তাদের সবগুলোই ধর্মীয় রং-তুলিতে পৌরাণিক কাহিনীর চমৎকার রূপ পেয়েছে। বেলমারদুকের ড্রাগন কাটা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, ছন্দোগ উপনিষদের 'কসমিক ডিম' আদিম চীনের ইন (Yin) এবং ইয়্যং (Yang) -এর সৃষ্টি ধারায় বিপরীত

www.pathagar.com

প্রকাশ হিসাবে তাও (Tao)-এর স্বর্গ ও ভুলোক তৈরী করার কীর্তিতে বিশ্বাসী আদিম মানুষের বুদ্ধি বিবেকের অপ্রসারতা ও জ্ঞানের দীনতার কথা আমরা জানতে পারি।[১৬]

প্রাচীনকালীন দু'একটা ধারণা প্রদান না করা হলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ৩০০০ বছর আগের কথা। তখন মিসরীয়রা মনে করত, আকাশদেবী (Nut) প্রত্যেক সন্ধ্যায় মরুর নির্জন প্রান্তরে সূর্যকে গিলে ফেলত। তারপর তার নক্ষত্র খচিত দেহকে উত্তাল আকাশের বক্রগোলকে (dome of the sky) এলিয়ে দিয়ে ঘিরে ফেলত ভুমণ্ডল। দেবী ওপড় হয়ে তার শায়িত দেহের নীচে ঘুম পাড়িয়ে দিত পৃথিবীকে। রাতভর সূর্য তার দেহের নিম্নভাগের উদ্দেশ্যে পথ চলতে থাকত। প্রতিদিন উষায় দেবী পৃথিবীবাসীর কল্যাণের জন্য প্রসব করত একটি নূতন সূর্য।[১৭]

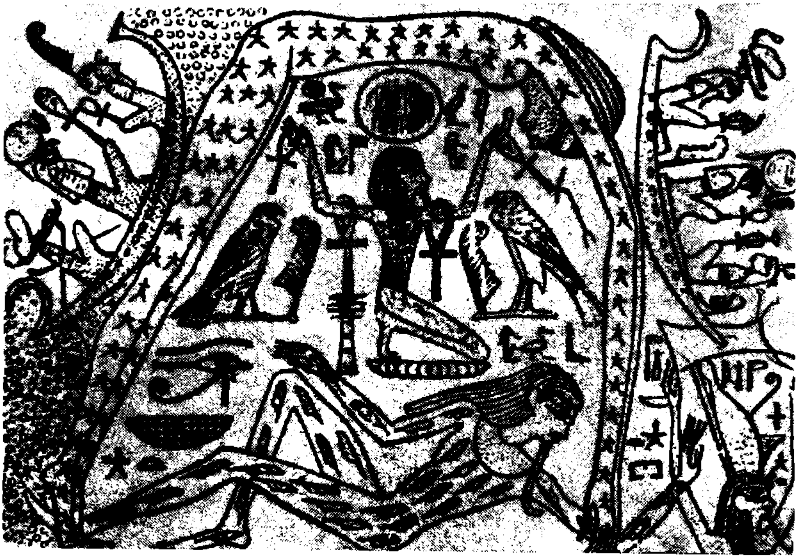

সূর্যদেবী 'নাট' নির্জন মরু প্রান্তরে সূর্যকে গিলে ফেলতো; ফলতঃ নেমে আসতো রাত। আবার সে সকালে প্রসব করতো নূতন সূর্য এবং সৃষ্টি হতো দিন। এ বিশ্বাস ছিল ৩০০০ বছর আগের মানুষের।

ব্যাবিলনবাসীদের বিশ্বাস ছিল, সূর্য হল রা-দেব (Ra-God)। রা-দেব প্রতিদিন আকাশের সমুদ্র পাড়ি দিত একটি সুন্দর নৌকায় করে, আর রাতের বেলায় গ্রহরাও নৌকা বেয়ে পাড়ি দিত সেই সমুদ্র[১৮]। জগৎ সংসারে সতর্ক প্রহরী

www.pathagar.com

হিসেবে তাদের এই নৌকা ভ্রমণ জনজীবনকে নিশ্চিত করত সকল প্রকার ধ্বংস আর অনিষ্ট থেকে। হিব্রুদের ধারণা ছিল আরো চমকপ্রদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঊর্ধ্বজলের নিম্নতলে বক্রতলের আকাশে অবস্থান করছে গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য, সঞ্চালনমান বস্তুগুলো ছাড়া বাকী সব শক্ত, মজবুতভাবে ঠেসে আছে আকাশের দৃশ্যমান তলে। বড় বড় খুঁটি দিয়ে ঈশ্বর ধারণ করছেন আকাশ। পৃথিবী হলো নিম্নজলের উপরিস্থিত ভাসমান দ্বীপের মত। তাকেও ধারণ করা হয় খুঁটির সাহায্যে।[১৯] প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা ছিল, চারটি অতিকায় হাতির পৃষ্ঠে বাহিত হচ্ছে পৃথিবী।[২০] এভাবে প্রাচীন ধারণাগুলোতে

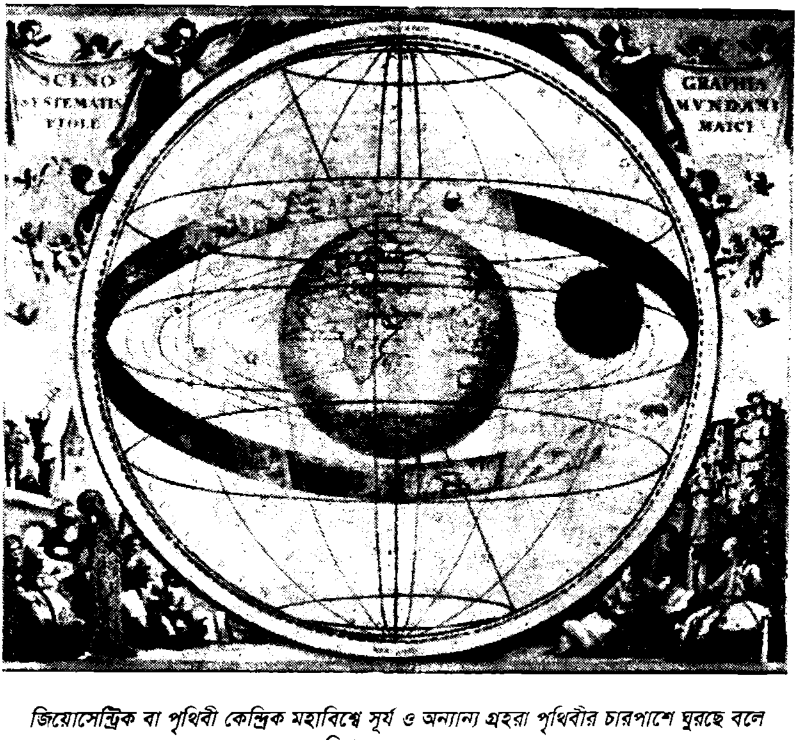

জিয়োসেন্ট্রিক বা পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহরা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলে বিশ্বাস করা হতো।

পৃথিবী পেয়ে বসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্র অবস্থান। হাবার্ট ফ্রেডম্যান বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, "In such fashion did ancient man see earth at the centre of the universe" —এভাবেই

www.pathagar.com

প্রাচীন মানুষ পৃথিবীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে নিল। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারায় এর পরিচয় ঘটে Geocentric theory নামে।

তারপর আস্তে আস্তে বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করতে লাগল মানুষ। সর্বপ্রথম গ্রীক একজিমাণ্ডার (৬১০-৫৪৬ বি সি) অনুধাবন করলেন, পৃথিবী একটি প্রসারিত সমতল বস্তু নয়, এর পৃষ্ঠতল বক্র। এরপর পীথাগোরাস এসে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল পৃথিবী যা একটি স্থির এবং গোলাকার বস্তুপিণ্ড। পীথাগোরাস একই সাথে মতবাদ পেশ করলেন— সূর্য, চন্দ্র, তদানীন্তন জানা পাঁচটি গ্রহ স্বর্গীয় বাজনা বাজিয়ে মহাকাশের পথ পরিক্রম করে থাকে। দার্শনিক এরিষ্টটলের (৩৮৪-৩২২ বি সি) হাতে পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রথম সার্থক উদ্বোধন ঘটে। এই জ্ঞানবৃদ্ধের রায় একে চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলত সকলেই বিনাবাক্যে তত্ত্বটি মেনে নেয়। বিশেষত ধর্ম গুরুরা একে স্বাগত জানায়। অন্যরা দেখলেন, পীথাগোরাসের সঙ্গে এরিষ্টটলের কোন সংঘাত নেই। এভাবেই ভূ-কেন্দ্রিক ধারণার প্রসার ও দীর্ঘজীবন সহজসাধ্য হয়ে যায়।

এরিষ্টটল প্রচার করলেন, — পৃথিবী শক্ত ও মজবুতভাবে মহাবিশ্বের মাঝখানে স্থির ও অনড় হয়ে বসে আছে, আকাশ হলো একটি নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ এবং অপরিবর্তনশীল সৃষ্টি (Perfect sky) অন্যপক্ষে পৃথিবী ঘুরছে, এমনি ধারণা শুধু অলীক কল্পনা বিলাসিতা মাত্র। যাহোক, খৃস্টপূর্ব ২৪০ অব্দে গ্রীসের বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করে বসলেন যা প্রায় সঠিক ছিল। ইতিমধ্যে এ্যারিষ্টারকাস (Aristarchus)কর্তৃক চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব সম্পর্কিত ধারণার প্রথম অধ্যবসায়ে চন্দ্রের সঠিক ব্যাস নিরূপণ করা সম্ভব হল। তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণার বিরোধিতা করে সূর্য কেন্দ্রিকতার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণের অভাবে তা কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই আপনি হতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যায় সর্বশেষ ল্যান্ডমার্ক টলেমি (১০০- ১৭৮ এ ডি) কর্তৃক প্রণয়নকৃত আলমজেস্ট (Alamgest) নামক তদানীন্তন সর্ববৃহৎ এনসাইক্লোপেডিয়া পৃথিবীর মানুষের কাছে বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্য প্রকাশ করল। দুঃখের বিষয়, তিনিও অনুসারী হলেন পূর্বসূরিগণের। বিশ্ব সংসারের কেন্দ্রস্থল হলো এই পৃথিবী; স্থির ও অনড়, আকাশ অনড়, তার সংগঠন স্থির। শুধুমাত্র আকাশের দৃশ্যমান বক্রতল প্রত্যেক রাতে একবার করে সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে

www.pathagar.com

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যায়। টলেমির পর হতে ১৫০০ বছর অর্থাৎ ষোল শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ এই ধারণার বিশ্বাসী ছিল। Ian Ridpath তার লেখায় এর চিত্রটি যেভাবে তুলে ধরেছেন -For neatly 1500 years after ptolemy, astronomy in Europe, entered a period of total eclipse- the Dark-age. জ্যোতির্বিদ্যার " গ্রহণী অন্ধকারের যুগ" টলেমির মৃত্যুর ১৫০০ বছর পর্যন্ত যে দীর্ঘ স্থায়িত্বও আধিপত্য সৃষ্টি করেছিল,তাকে এসে সর্বপ্রথম আঘাত হানলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস, তার সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার বিষয়বস্তু দ্বারা। তিনি পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণাকে উল্টিয়ে দিয়ে দাবী করলেন, পৃথিবী মহা-বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়, সেটি হলো সূর্য, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। ইতিহাসের পাতায় একে লিখা হলো হেলিও সেন্ট্রিক তত্ত্ব (Helio-centric theory) নামে। ১৫৪৩ সালে মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত তার on the Revolution of the Celestial Spheres - এর ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি কোপার্নিকাসের হেলিও সেন্ট্রিক থিওরীর চিত্রটি অঙ্কন করে-As if seated upon a royal thome, the sun rules the family of the planets as they circle round, [২১] সূর্য তার রাজকীয় সিংহাসনে স্থির হয়ে বসে আছে— বক্তব্যের এই অংশটিকে পাঠকের মনে থাকলেই চলবে। সূর্যের স্থিরত্বের শাসনে সঞ্চালিত সৌরজগৎকে এ্যান্ডিজ সীলারিয়াজ (Andreas Cellarius) নামক এক ওলন্দাজ ভুগোলতত্ত্ববিদ ১৬৬০ সনে চিত্রায়িত করেন যা পরবর্তীতে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা জ্যোতির্বিদ্যায় রেঁনেসার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ক্যাথলিক চার্চের প্রচারিত পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাটির বিরোধ সৃষ্টি হওয়াতে চার্চ খুবই মনক্ষুণ্ন হয়। সুযোগ বুঝে মার্টিন লুথার একটি শ্লেষাত্মক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন, — The fool wants to turn whole science of Astronomy upside down.[২২] 'বোকার সম্রাট জ্যোতির্বিদ্যার বিজ্ঞানকে উপুড় করে দিতে চাচ্ছে' —এই কথাটি চার্চ ও অন্যদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে পড়ে। অথচ কোপার্নিকাসই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যাকে বন্দীত্ব মোচন করে মুক্তির পথ দেখালেন।

প্রতি বছর ঘুরেফিরে আমরা একই আকাশকে দেখতে পাই। অপ্রতিরোধ্য যুক্তি এসে যায় পৃথিবী চলমান নয়, —স্থির। কোপার্নিকাস যখন যুক্তি দেখালেন, নক্ষত্র রাজ্য হতে অনেক অনেক দূরের পৃথিবীর সামান্য স্থান পরিবর্তনে তাদের অবস্থানগত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয় —তখন কেউ তাকে বিশ্বাস করল না।

মহকাশের পর্যবেক্ষণ থেকে সর্বপ্রথম টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe১৫৪৬-১৬০১) ১৫৭২ সালে এক মহাজাতিক বস্তুর বিস্ফোরণলব্ধ জ্ঞানের

www.pathagar.com

দ্বারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এতদিনের বিশ্বাসে চেনা মহাবিশ্ব কখনোই অপরির্বতনশীল কিংবা নিঁখুত নয়। কোপার্নিকাসের সূর্যের স্থিরত্ব তিনি গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, কোন কিছুই স্থির নয়, সূর্যও ঘুরছে তবে এই ঘুর্ণি পরস্পরের চারদিকের পরস্পরের। জোহান্স ক্যাপলার (১৫৭১-১৬৩০) যদিও টাইকোকে প্রথম দিকে অনুমোদন দান করলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাকে বাদ দিয়ে সমর্থন করলেন কোপার্নিকাসকেই। তারপর এলেন গ্যালিলিও। ১৬০৯ সালে তিনি আবিস্কার করলেন টেরিস্কোপ। এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যায় খুলে দিল এক নতুন দুয়ার। চাঁদের জ্বালামূখ তার পূর্ববর্তী নিখুঁত আকাশ (Perfect sky) -এর ধারণা পাল্টিয়ে দিল।

ছায়াপথের দিকে দূরবীণ ঘুড়িয়ে তিনি বিস্ময়ে তাক হয়ে গেলেন। রহস্যময় আকাশ সর্বপ্রথম গ্যালিলিওর চোখের সামনে আপন বিশালতার যৎসামান্য উন্মোচন করল। শুক্রগ্রহের তীব্র গতির সঞ্চালন এবং ক্যাপলারের গাণিতিক হিসেব এই দুয়ের সমন্বয়ে তিনি সিদ্ধান্ত পেলেন, মহাবিশ্বে স্থির বলতে কিছু নেই। পৃথিবী এক অতি নগণ্য বস্তু যা মহাবিশ্বের হিসাব-মাপে কোন মর্যাদার দাবি রাখে না। ক্ষমতাশীল চার্চের অনুকম্পা পাবার জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। নিজ ধারণায় অনড় ও তা প্রচার করার জন্য গ্যালিলিওকে ১৬৩৩ সালে " হলি ইনকুইজিশন"-এর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। প্রাণের হুমকি, অত্যাচার ও হীনতার মুখে ক্যাথলিক চার্চের গুরুজনরা গ্যালিলিওকে একটি টানা শকটে চড়িয়ে সারা শহরময় প্রদক্ষিণ করাল এবং তাকে তার সত্য প্রস্তাব মিথ্যা বলে প্রচার করতে বাধ্য করা হলো। সত্য উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচার করা সম্ভব হলো না। অতঃপর ১৬৮৭ সনে নিউটনের Philosophiae Naturalix Principia Mathematica প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি মহাজাগতিক অভিকর্ষের চিত্র তুলে ধরেন এবং তিনি তার তত্ত্বের বিশ্লেষণে বিশুদ্ধ তথ্য, প্রমাণ ও গণিতের ভিত্তিতে হেলিও সেন্ট্রিক থিউরীর অনুমোদন প্রদান করেন। নিউটন তার অভিকর্ষ তত্ত্বকে গতিতত্ত্বের সাথে তার নব উদ্ভাবিত ক্যালকুলাসের প্রয়োগ এবং টাইগো ব্রাহের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের দ্বারা মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ প্রস্তাব পেশ করেন যে, সৃষ্টিতে কোথাও কোন বস্তু স্থির নয়, প্রতিটি নিরন্তর গতি নিয়ে চলছে। জানা দরকার যে, নিউটনই সর্বপ্রথম স্বার্থকভাবে আধুনিক ধ্যান-ধারণার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

উপরের সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদেরকে যে সকল নিশ্চিত তথ্য সরবরাহ করে তা হলো ঃ —

www.pathagar.com

ক. ১৬৮৭ সনে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্বের ক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিচারে হয় সূর্য কিংবা পৃথিবী "স্থির" বলে বিবেচিত ছিল। দু'টির একটি ধারণার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে গণ্য। উল্লেখ্য, পশ্চাৎ পৃষ্ঠের নক্ষত্রমালাসমেত শূন্য আকাশকে "স্থির সংগঠন" মনে করা হত।

খ. সঞ্চালনশীল বস্তু বলতে শুধুমাত্র ৬টি গ্রহকে মনে করা হত। এই মনে করার বিষয়টিও ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ছিল।

গ. সৌরজগতের জানা পরিসরের বাইরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মনে করা হত বক্রতলের উল্টানো বাটি, প্রতিরাতে পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে যেত তার হাজারো স্থির ও অনড় নক্ষত্র সহকারে। গ্রহগুলো হলো কেবল চলমান বস্তু যারা তাদের সঞ্চালনশীলতার জন্য প্লেনেট (Planet) নামটিও বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

এবার আমরা কোরআনের পাতা উল্টালে দেখতে পাব ১৬৮৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান সূর্যকে "রাজকীয় সিংহাসনে স্থিরভাবে" বসে থাকতে দেখেছিল, তার হাজার বছরেরও বেশী কাল পূর্বে খৃষ্টীয় সাত শতকে আরব মরুতে যে কোরআনের আহ্বান আসে, তাতে বিংশ শতাব্দীর উৎকর্ষতার বৈজ্ঞানিকব তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল অতি অল্প বক্তব্যের পরিসরে — "সূর্য তাহার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত ব্যবস্থা" (৩৬ঃ৩৮)। "তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত" (৩১ঃ২৯)। অনুরূপ ধারণার সমাবেশ ঘটেছে ২১ঃ৩৩, ১৩ঃ২, ৩৬ঃ৪০, ৩৫ঃ১৩ এবং আরো অনেকগুলো আয়াতে। ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে "কুল" (كل) শব্দটির অর্থ হলো 'যা কিছু, প্রত্যেক এবং প্রকারান্তরে সমস্তই' এবং এর পরিসর থেকে কোন কিছুর অস্তিত্বই বাইরে নয়। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে অতি অতিকায় গ্যালাক্সি এই "কুল" শব্দটির আওতাভুক্ত এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো যে আপনি সমস্ত বিজ্ঞান ঘেঁটে এমন একটি প্রমাণও আনতে সক্ষম হবেন না যে, কোন কিছু সত্যই স্থিরতা কিংবা নিশ্চলতার উদাহরণ হবার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই; এক দুর্বোধ্য গতিবেগের স্বাক্ষর ক্ষুদ্র ইলেকট্রন কণাগুলো। অণু কিংবা তদাপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুদের গঠনের ব্যাখ্যায় যে নিউক্লিয়াসের বল কিংবা বন্ধনশক্তি অথবা আদান-প্রদান বলের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে, তাদের সবগুলোতেই বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর আণবিক গঠনের শূন্যস্থানে ক্ষুদ্র বস্তুকণাদের

www.pathagar.com

দ্রুত কম্পনশীলতার প্রমাণ পেশ করে থাকেন। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই ডি ব্রগলী (Luis De Brogli)-এর অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির তরঙ্গ প্রকৃতির মতামত, হাইসেনবার্গের (Heisenberg) আদান প্রদান বলের মতবাদ, জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া (Yukawa)-এর মেশন তত্ত্ব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলো আমাদেরকে নিষ্প্রাণ দ্রব্য নিচয়ের প্রাণময় স্পন্দনের কথা জানিয়ে দেয়;[২৩] বলে যায়, "প্রত্যেকেই সঞ্চালনশীল (বিচরণশীল) বিলয়কাল পর্যন্ত" (কিংবা প্রত্যেকই সঞ্চালনশীল একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ৩১ঃ২৯)[২৪]। সূর্যের গড় কক্ষগতি প্রতি মুহূর্তে ২৫০ কিঃ মিঃ —এর অর্থ হলো আপন অক্ষের ওপর কমপক্ষে এই গতিতে আমাদের ছায়াপথও ঘুরে চলছে। আর নিশ্চয়ই আমরা অবগত রয়েছি যে, ছায়াপথ তথা গ্যালাক্সিসমূহই আমাদের জ্ঞানের আওতায় সর্ববৃহৎ অস্তিত্ব। তাহলে বলা যায়, সর্বক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ সকল বস্তুই গতিময়তার মহাশাসনের অন্তর্ভুক্ত; এই মহাবিশ্বে কোথাও কোনখানে কোন কিছুরই স্থির হয়ে বসে থাকবার অধিকার নেই। মহাবিশ্বে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হয়ে পৃথিবীর কিংবা অনুরূপভাবে রাজকীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট সূর্যের স্থবিরতা অজ্ঞ মানুষের কল্পনারই ফসল হওয়া সম্ভব। যুগের ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কাঠামোয় থেকে মানুষ সবচাইতে যতদূর ভাল বুঝতে পেরেছে, তাকেই যুগে যুগে সত্য বলে প্রকাশ করেছে। পরিণামে ধরে নেয়া এই "সত্যগুলো" মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কারণ, — "ইহাই তাহাদের জ্ঞানের সীমারেখা" (৫৩ঃ৩০)। "এই সম্বন্ধে তাহাদের আদৌ কোন জ্ঞান নাই, তাহার কেবল কল্পনার অনুসরণ করে এবং নিশ্চিত যে সত্যের সম্মুখীন হইয়া কল্পনা আদৌ ফলপ্রসূ হইবে না" (৫৩ঃ২৮)। আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষের কল্পনার বিলাসিতা সত্যের কঠোরতায় চূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞান আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে কোরআনের সত্যকে — " আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়েছেন রাত্রি ও দিবস, চন্দ্র ও সূর্য; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চালনশীল" (২১ঃ৩৩)।

উপরের ও কোরআনের অন্যান্য আয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ ফালাক (فلك) -এর অতি সহজ ধারণা কক্ষপথকে বুঝে নিতে আমাদের আজ কোন অসুবিধাই হয় না। কিন্তু অনুভব করুন, ১৭ শতাব্দীতে জোহান্স ক্যাপালারের গ্রহদের সঞ্চালন সম্পর্কিত আইন (Law of planetary motion)-এর পূর্বে কক্ষপথ সম্পর্কিত কোন শুদ্ধ ধারণাই মানুষের ছিল না। অথচ খৃষ্টীয় সাত শতকে, প্রায় হাজার বছরেরও বেশী সময় পূর্বে কোরআন চন্দ্র, সূর্য ও অনুরূপ মহাজাগতিক বস্তুদের সঙ্গে "ফালাক" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল, যার ধাতুগতত ও আভিধানিক অর্থ হলো গোলাকার অথবা উপবৃত্তাকার হওয়া [২৫] (Be round or be spherical)। অত্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, এই প্রস্তাবনায় প্রকাশ পেয়েছে একটি সূত্র বা

www.pathagar.com

আইন। এই আইনটি হলো প্রত্যেকের সঞ্চালনের গণ্ডীর স্বরূপ নির্ধারণ করা, আর, সেটি হলো এমন কক্ষপথ যা গোলাকার কিংবা উপবৃত্তাকার। "ফালাক" শব্দের এই উভয়ধর্মীতা কিন্তু এক অপূর্ব বাস্তবতার শর্ত পূরণ করে। আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বনিম্ন একক যে পারমাণবিক কণার কথা জানি, তার কক্ষপথ সত্যি সত্যিই গোলাকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকারও। অন্য পক্ষে গ্রহদের কক্ষপথকে গোলাকার বলা যায় না। তারা উপগোলকের সৃষ্টি করেই ঘুরে। কোরআন কক্ষপথ বুঝবার জন্য সবখানেই "ফালাক" শব্দের ব্যবহার আমাদেরকে প্রশ্নের সামনাসামনি করে যে, একবারও কি ভুল করে 'মাদারু কাওকাব' (مدار كوكب) বা 'তাজভীফুল আইন ' (مجويف العين)[২৬] অথবা অন্য কোন শব্দ ব্যবহার হতে পারেনি? 'কুল' শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যের উপর যে মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, তার সঠিকত্ব বজায় রাখার জন্য একমাত্র এই "ফালাক" শব্দটিই উপযোগী ছিল, নইলে প্রস্তাবের গরমিল হয়ে পড়ত। সৃষ্টি হত এই ক্ষুদ্র বাক্য গণ্ডীর মধ্যেই এক বিরাট রকমের বৈপরীত্য। নষ্ট হয়ে যেত কোরআনের চ্যালেঞ্জ আর অসাধারণত্বের দাবী। কি করে সম্ভব হলো এমন একটা সঙ্কটপূর্ণ সঙ্গতি? এর জবাব,— "ইহা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নহে" (৩৫ঃ১৭)।

পূর্বে কক্ষপথ সংক্রান্ত যে আইনের কথা বলা হলো, সে আইনটি আরো সুস্পষ্টভাবে দেখবার সুযোগ পাই অন্য একটি আয়াতে, — "সূর্যের সাধ্য নাই চন্দ্রকে সীমার মধ্যে পায়, রাত্রির সাধ্য নাই দিবসকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকে স্ব - স্ব কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমাণ" (৩৬ঃ৪০)। এই আয়াতে কক্ষপথের যে চিত্রটি আমরা পেতে পারি, সেটি হলো অনেক বড় সূর্য ও অনেক ক্ষুদ্র চন্দ্র এই দুয়ের শক্তি ও ব্যাপ্তির বৈষম্যমাত্রা অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিতে প্রচলিত নিয়মকানুনের স্খলন বা লংঘনজনিত কারণে চন্দ্রকে সূর্যের দানবিক আকর্ষণের করালগ্রাসে আত্মসমর্পণ করতে হবে না; সূর্যের অভিকর্ষ চন্দ্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে পাঠাবে না। চন্দ্র বস্তুতপক্ষে প্রতীকধর্মী এবং গুণগত দিক দিয়ে গ্রহদের পরিবারভুক্ত। এই আইনের বিশ্লেষণে আমরা পৃথিবীর নিরাপত্তার প্রতি আশ্বাসের গন্ধ খুঁজে পাই। সমস্ত মহাবিশ্ব যেখানে গতির এক মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ নাজুক ভারসাম্যের উপর বিরাজ করছে, সেখানে প্রতি দিনের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চাঁদের মঞ্জিলসমূহ, আকাশে নক্ষত্রদের ফিবছর ঘুরে ঘুরে পুনঃ একই অবস্থানে দর্শন করবার সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি অসামান্য ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এক অদৃশ্য সাবধানী মাত্রা পরিমাপের আইনে। সদা পরিবর্তনশীল সৃষ্টি থেকে পরিবর্তনহীনতার এতবড় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে দাবী রাখে যে, — "আমি ঐ সব মানুষের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করিয়া থাকি যাহারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল" (৬ঃ১২৬)।

www.pathagar.com

গ্রহ ও নক্ষত্রের বিভেদ সম্পর্কিত জ্ঞানও মানুষের ছিল না। আজ আমরা সহজভাবে এই পার্থক্যের মৌলিকতা আলোক বিচ্ছুরণ (নক্ষত্র গুণ) ও আলোক প্রতিফলন (গ্রহ গুণ) গুণাগুণের মানদণ্ডে বিচার করতে পারি। লাটিন শব্দ Planete এর অর্থ "ভ্রমণকারী" থেকে প্লেনেট বা গ্রহ শব্দের উৎপত্তি।[২৭] তৎকালীন মানুষ গ্রহদের দ্রুত স্থান পরিবর্তন করার গুণাগুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করত, তাই "প্লেনেটি" হতে "প্লেনেট" শব্দটি ইংরেজী ভাষায় অন্তর্ভূক্তি পেয়েছে। জ্ঞানের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এই নামকরণে স্বার্থকতা নষ্ট হয়ে পড়লেও কেউ অনুভবের চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখেনি। আল-কোরআন ১৪০০ বছর পূর্বে গ্রহ ও নক্ষত্রের সংজ্ঞা ও পার্থক্যকারী গুণাগুণকে চিহ্নিত করেছে নির্ভূলভাবে – "এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন জ্যোতির্ময় আর সূর্যকে করিয়াছেন প্রদীপ্ত উজ্জ্বল" (৭১ঃ১৬) কিংবা, "কত মহান তিনি যিনি আকাশে সংস্থাপন করিয়াছেন দুর্গ এবং উহার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ সাদৃশ্য সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র" (২৫ঃ৬১)। একটি প্রদীপ সাদৃশ্য এবং উজ্জ্বলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অন্যটি জ্যোতির্ময়, আলোকময়তার সঙ্গে জড়িত। একটি বিকিরণ করে, অন্যটি প্রতিফলন ঘটায়। এই সত্য মানুষ জানতে পেরেছে কেবলমাত্র টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর অর্থাৎ সতেরশ' শতকের প্রথম দিকে। তার পূর্ববর্তীগণের ধারণা ও বাস্তবতার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে Ian Ridpath যে তথ্য পরিবেশন করেন, বিজ্ঞান ও কোরআনের প্রেক্ষাপটসমূহ বিচার করলে আমরা একটি সহজ ও সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এই তথ্যপূর্ণ বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন, – "Astronomers of the time did not know the true nature of the stars nor did they realize that planets are nonluminus bodies like the Earth that shine by reflecting sunlight. This fact did not emerge untill after the invention of telescope in 17th centuries.[২৮] একটি গ্রহ আলোকহীন ও প্রতিফলনকারী বস্তু, এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানতে মানুষকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় সতের শতক পর্যন্ত। অথচ সাত শতকের নিরক্ষর মুহাম্মদ (সঃ) হাজার বছরের বেশী পূর্বে এই পার্থক্যের উপর কতইনা সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছিলেন, – "আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও জমীনের আলো। তাঁহার আলোর উপমা যেন একটা তাক যাহা কুলঙ্গী ; যাহার মধ্যে রহিয়াছে একটা আলোক বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ সাদৃশ্য বস্তু ; এই আলোক বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ সদৃশ্য বস্তুটি রহিয়াছে একটি কাঁচপাত্রের মধ্যে, আর সেই কাঁচ পাত্রটি যেন একটি গ্রহ , যাহা উজ্জ্বলতায় ঝকমক করিতেছে" (২৪ঃ৩৫)। প্রিয় পাঠক, আলোক বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ থেকে কাঁচপাত্রে পতিত আলোক হতে প্রতিফলনজনিত উজ্জ্বলতার প্রস্তাবটি এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে কে অস্বীকার করবেন? আর প্রদীপ সাদৃশ্য আলোকের উৎসটি কোথায়? কাঁচপাত্রের ব্যবস্থাকে যদি গ্রহের উপমা ধরা হয় তবে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় সৌর জগতের ছবি ; গ্রহদের কক্ষপথ দ্বারা অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ ব্যবস্থার ঠিক

www.pathagar.com

মধ্যখানে বসে সেই আলোক বিচ্ছুরণকারী সূর্য যেভাবে আলোকিত করছে গ্রহদেরকে, ঠিক যেন এমনি কোন বক্তব্যকে তুলে ধরে উল্লিখিত আয়াতটি। নিঃসন্দেহে এমন কোন উপমা গ্রহের সঙ্গে আলোকের প্রতিফলনের সম্পর্কটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করে বসতে পারেন, সূর্যের দ্বারা নক্ষত্র বুঝানো হলেও গ্রহদের কথা না বলে একটি উপগ্রহ , অর্থাৎ চাঁদের উপমা কেন কোরআনে গ্রহ বুঝানোর জন্য টেনে আনা হলো? দৃশ্যমান আরো গ্রহ ছিল যারা সঠিক উপমা ও অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হতে পারত, কিন্তু হয়নি কেন? যদি তা হলো না তখন চাঁদকে দিয়ে গ্রহকে বুঝাবার তাগিদ কোথা থেকে আসল? এর উত্তর অতিশয় সাধারণ। কোরআন অবতীর্ণের দিন কেন, আজকের দিনের মানুষের বিবেচনায়ও সূর্যের পাশে চাঁদের অস্তিত্বটি অত্যন্ত প্রকট। বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রভূতভাবে চাঁদের প্রভাব বুঝতে শিক্ষা দিয়েছে। প্রভাব, উপযোগিতা, দৃশ্যমান আকার ইত্যাদি সকল কারণেই পৃথিবীবাসীর কাছে চাঁদের বিবেচনা সূর্যের পর পরই। সে হিসেবে যেকোন গ্রহের অনেক পূর্বেই চাঁদের বিবেচনা চলে আসে যদিও চন্দ্র একটি উপগ্রহ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে গ্রহ ও উপগ্রহ তথা গ্রহ ও চন্দ্রের মৌলিকতার কোন পার্থক্য নেই। উভয়ই আলোকের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। চন্দ্র কেবল সূর্যকেন্দ্রিক গতির পরিবর্তে পৃথিবীকেন্দ্রিক গতি বলয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর চারদিকে না ঘুরলে আমাদের চাঁদ হতে পারত পুটোর চাইতেও বড় গ্রহ। আলোকের বিচ্ছুরণ ও প্রতিফলন বিচারের মানদণ্ডে শুধু দুটি অস্তিত্বই থাকতে পারে। প্রথমটি আলো বিচ্ছুরণকারী তেজময় প্রকার ও অন্যটি আলো প্রতিফলনকারী শীতল প্রকার। দ্বিতীয় প্রকারে পড়ে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ। অতএব, সমস্ত নক্ষত্রের প্রতীক হিসাবে সূর্যকে বিবেচনা করার পাশাপাশি চাঁদের গ্রহ বিবেচনার বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ততা বহন করে। অর্থাৎ চাঁদ গ্রহদের প্রতীক হিসাবে আমাদের বিবেচনার দাবীদার। এ ছাড়াও কোরআন অবতীর্ণ হবার সময়ের মানুষ, তৎসময়ে জানা ৫টি গ্রহকে কখনোই আজকের বিজ্ঞানে গ্রহের যে সংজ্ঞা সে অর্থে গ্রহণ করেনি, নক্ষত্রের অর্থটিও ছিল একেবারে ভিন্নতর। এই সকল তথ্য ও পারিপার্শ্বিকতা বিচার করলে তখন আর কোন যুক্তিতর্কের বাড়াবাড়ি আসে না, যখন বলা হয় - "চন্দ্রকে করিয়াছেন জ্যোতির্ময় আর সূর্যকে করিয়াছেন প্রদীপোজ্জ্বল" (৭১:১৬)। আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টতায় গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভেদ পেয়ে যাই।

তেমনি উদ্ধৃতি দেয়া যায় প্রতিবস্তুর (Antimatter)। প্রতিবস্তুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কিত তথ্যটি এখানে তুলে ধরা হলো, - Historically the first evidence of antiparticles was the discovery of positron in 1932 by CD Anderson.[২১] এ্যাণ্ডারসনের এই পজিট্রন আবিষ্কারের চার বছর পূর্বে

www.pathagar.com

(১৯২৮) বিজ্ঞানী ডিরাকের তত্ত্ব থেকে পজিট্রনের কথা জানা যায়। তার কিছুদিন পর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ এবং তার বিখ্যাত ভর-শক্তি সমীকরণ প্রতিবস্তুর ধারণাকে আরো দৃঢ়তর করে। আজকের দুনিয়াতে মানুষ প্রোটন-প্রতিপ্রোটন, ডয়টেরন-প্রতিডয়টেরন ইত্যাদি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। ডয়টেরন হলো হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ ডয়টেরিয়ামের নিউক্লিয়াস, যা, একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ একটি প্রতিডয়টেরন মূলতঃ একটি স্থিরতাপ্রাপ্ত প্রতিবস্তুর মৌলিক উদাহরণ। তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রতিবস্তু রয়েছে সত্যতার সাথে প্রমাণ সহকারে। আপনারা জানেন কি যে, কোরআন এই প্রতিবস্তুর কথা বলে রেখেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে খ্রীষ্টীয় সাত শতকে যখন পৃথিবীর কোন মানুষ তা কল্পনাতেও আনতে যায়নি? কোরআন প্রতিবস্তুকে প্রকাশ করেছিল এক বলিষ্ঠ প্রস্তাবনায়, - "আমি প্রত্যেক বস্তুর যুগ্ম সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা নির্দেশ ও নিদর্শণ পাইতে পার" (৫১ঃ৪৯)। "প্রশংসো তাঁহারই যিনি প্রত্যেক বস্তুর যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন" (৩৬ঃ৩৬)। আপনি হয়ত ব্যবহৃত শব্দ মূল 'জাওজ' (زوج) এর যুগল অর্থের বঙ্গানুবাদ দেখে প্রশ্ন করতে পরেন যুগল, বিপরীত বা প্রতিবস্তু হয় কি করে? জাওজইনে (زوجين) বা আজওয়াজ (ازواج) উভয় শব্দের মূল জাওজ। এই 'জাওজ' শব্দটি মূলতঃ Couple বা Spouse এর প্রকাশ করে যা নিঃসন্দেহে একটি বৈপরীত্যের দাবী রাখে। এর অন্য একটি অর্থ incite one against another[৩০] বা একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে সক্রিয় করা। এখানেও আমরা যে বৈপরীত্যের ধারণা পেয়ে থাকি তাতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের যুগল বা বিপরীত যেকোন অর্থই প্রসারিত। মূলত 'জাওজ' শব্দটিই বিপরীতের সম্মিলনকে প্রতিভাত করে। এই ধারণার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা আরো প্রশস্তভাবে অবগত হই ৩৬ঃ৩৬ আয়াতের শেষ অংশে এসে, -"প্রশংসো তাঁহারই যিনি প্রত্যেক বস্তুর বিপরীত বা যুগল করিয়াছেন তাহা মাটি হইতে উৎপন্ন হউক, তাহাদের মধ্য হইতে (মানুষ হইতে) হউক কিংবা হউক সেইসব হইতে যাহা তাহারা অবগত নহে", এবং সত্যই মানুষ ১৯৩২ সালের পূর্বে কখনো সেইসব যুগল বা বিপরীত বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিল না। পজিট্রন বা এন্টিইলেকট্রন আবিষ্কারের পর এন্টি-প্রোটন, এন্টি-ডয়টেরন ইত্যাদির আবিষ্কার আমাদেরকে আল্লার বাণীর সত্যতা হাতেকলমে প্রমাণ করিয়ে দিয়ে বলে -"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এমন আরো অনেক কিছু যাহা সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (১৬ঃ৮)। অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই (১০ঃ২০)। তিনি মানুষকে জ্ঞাত করিয়াছেন ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না (৯৬ঃ৫)। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (১৫ঃ৭৫)।

অনুরূপভাবে অত্যন্ত ব্যাপকতার সঙ্গে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রতিবেদিত হয়েছে আল-কোরআনে। ইসলামের অদৃশ্যবাদিতা ও নিরাকার আল্লাহ বাদে অনেক ধর্মের পণ্ডিতগণ অনেক মুখরোচক বক্তব্য পেশ করেছেন অতীতে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

তাদের এই কটাক্ষ থেকে বিমুক্ত নয়। এই অদৃশ্যবাদিতার সীমাবদ্ধতা (?) থেকে ধারণাকে মুক্ত করার প্রয়াসে অনেক ধর্মে সাকার প্রভু ও দেবতাদের প্রতিমূর্তি গড়া হয়। চোখে দেখা যায় না, এমন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয় – এমন ধারণার জ্ঞানপক্কতা যে জ্ঞানহীনতার একটা উদ্ভট ফসল মাত্র, আজকের দুনিয়ায় বিষয়টি বহুলভাবে প্রমাণিত। আমাদের জানা উচিত যে কোন মানুষ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জ্ঞানী বলে বিবেচিত হতে পারে। সেই মাত্রার পর মানুষটি এক নিরেট অজ্ঞ মাত্র। মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারিত জ্ঞান বিস্তারের কতটুকুরই আমরা খবর রাখতে সমর্থ? প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মানুষের চোখে ধারণা সক্ষম আলোর ব্যাপ্তি ৩৮০ – ৭৫০ নেনোমিটার (Nanometer)। আমাদের জ্ঞানে সুপরিচিত অতিবেগুনি রশ্মি কিংবা ইনফ্রারেড–রশ্মি যথাক্রমে ৩৮০ – ৭৫০ নেঃ মিঃ ব্যাপ্তির কম এবং বেশী হওয়াতে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না।[৩১] আমরা কতদূর দেখতে পাই তা জানেন কি? "We see only a minute fraction of the total light exists in this physical world; more than 99 percent remaining invisible to our eyes."[৩২] বস্তুজগতে আলোকের সুবৃহৎ ব্যাপ্তির শতকরা এক ভাগেরও কম আলো আমাদের দৃষ্টিতে অনুভূতি জাগাতে সক্ষম, ৯৯ ভাগের বেশী আলোকেই অদৃশ্যজাত। এদের পরিচিত উদাহরণ হলো এক্স–রে, গামা–রে, লেসার–রে ইত্যাদি। আমরা রাতের আকাশে যে নক্ষত্রমালা দেখতে পাই , তার দৃশ্যপট আমাদেরকে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করে – এসবের পরে আর কি আছে। বস্তুত আমরা যা দেখতে পাই , তাদের সকলই শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি, আমাদের ছায়াপথের পরিবারভুক্ত সদস্য। এই গ্যালাক্সির ব্যাস ১,০০,০০০ আলোক বছর। [৩৩] এ পর্যন্ত দৃশ্য গ্যালাক্সির যে সংখ্যা জানা গেছে তা 10^9 বা একশ কোটি। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড় নক্ষত্র সংখ্যা ১০০ মহাপদ্ম, বিলিয়ন) বা দশ হাজার কোটি (10^{11} বা ১০০০০০০০০০০০)[৩৪]। আমাদের সূর্য এক অতি অনুল্লেখযোগ্য নক্ষত্র, গ্যালাক্সিতে যার বিশেষ কোন স্থান নেই। এমনি স্থান নেই মহাবিশ্বের পরিমাপে আমাদের ছায়াপথেরও। আমাদের দোরগোড়ায় সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি 'এণ্ড্রোমিডা', প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আর তাতে নক্ষত্রের বসবাস ছায়াপথের ৩ গুণ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার কোটি [৩৫]। এই ধারণা চিত্র থেকে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে, তাতে দেখা যায় যে, মহাবিশ্বে বস্তুর অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রকট। এই দৃশ্যবস্তুর অস্তিত্ব ১৯২০ সালের পূর্বেও মানুষের কাছে অদৃশ্য ছিল। আর ঠিক এমনি একটি তথ্য যখন আমাদের জানা হয়ে গেল, তখন আল–কোরআন তাঁর পাতা খুলে মেলে ধরল আমাদের অনুভবের কাছে , "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই" (১৬ঃ৭৭) – বল তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ–মণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ প্রদান করিবে যাহা তিনি অবগত নহেন? তিনি অজ্ঞানতা হইতে অতিশয়

www.pathagar.com

পবিত্র এবং তোমরা যে বিষয়ে তাঁহার অংশীস্থির করিতেছ , তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে"(১০ঃ১৮)।

এতক্ষণ বিশ্বজগতের সঙ্গে অদৃশ্যের সম্পর্ক আলোক রশ্মির বিচারে জানতে পেরেছেন। আপনারা অবগত রয়েছেন কি যে বস্তুর বেলায়ও বিষয়টি খাটে? শুনে বিস্মিত হবেন যে, অতিকায় শক্তিশালী টেলিস্কোপে দৃশ্য আলোয় ধরা জ্যোতিষ্কসমূহের ভর সমষ্টি অদৃশ্য পদার্থ ভরের তুলনায় মাত্র ১০ ভাগ, বাকী ৯০ ভাগ পদার্থ পড়ে রয়েছে মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাইরে।[৩৬] অত্যাধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি মোট পদার্থ ভরের মাত্র ১০ ভাগ পদার্থকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে , আর এই দশ ভাগের দৃশ্য গ্যালাক্সির সংখ্যা হলো ১,০০০,০০০,০০০। এরা চিরদিন মানুষের দৃষ্টিসাধ্যের বাইরে থেকে যাবে। অদৃশ্যের এই বিশাল ব্যাপ্তিকে প্রতিভাত করেই বুঝি আল-কোরআন তার শুরুর দিকেই প্রস্তাব করেছে - "এই সেই গ্রন্থ যাহার উপর সন্দেহের অবকাশ নাই , সদাচারী ও নিয়মানুবর্তিগণের জন্য ইহা পথপ্রদর্শক, আর তাহাদের জন্য যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে" (২ঃ২-২ঃ৩)।

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে কিংবা যারা বিশ্বাস করে না, উভয় সম্প্রদায়ের আজ জানা উচিত যে কোয়াসার (Qusar) অতিমাত্রায় দূরবর্তী এক একটা গ্যালাক্সি আকারের মহাজাগতিক বস্তু, প্রতি সেকেণ্ডে যাদের প্রায় প্রত্যেকটি কমবেশী ২,৪০,০০০ কিঃমিঃ বেগে (আলোর গতির ৮০%) ধাবিত হয়ে ছুটছে অজানার পানে। এক একটি সম্ভবত এক অদৃশ্য দ্বীপ জগৎ , মানুষের চোখের সাধ্য ও সম্ভাব্যতা যাদের কখনো খুঁজে পাবে না। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে প্রায় ১০ মহাপদ্ম-আলোক-বছর দূরে (হাজার কোটি) অবস্থিত কোয়াসার, এ পর্যন্ত জানা বস্তুদের সবচাইতে দূরবর্তী অস্তিত্ব। এই কোয়াসারটি হলো OQ - 172, কমপক্ষে ১০০টি বিশাল বৃহৎ গ্যালাক্সির সমশক্তিসম্পন্ন। সূর্যের তুলনায় এর উজ্জ্বলতা ১০ হাজার মহাপদ্ম (১০,০০ ০০০ ০০০০০০০ বা দশ লক্ষ কোটি) গুণ বেশী।[৩৭] এত বিশালকায় অস্তিত্ব ও এত বিশাল উজ্জ্বলতা নিয়েও OQ - 172 কোয়াসার চিরদিন আমাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ে থেকে কোরআনের অদৃশ্যের দাবী পূরণ করেছে - "অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁহারই , তাঁহার জ্ঞানের নিরূপণ কাহারো সাধ্যের মধ্যে নয় (৭২ঃ২৬)। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নাই" (২৭ঃ৭৫)।[৩৮]

সুধী পাঠকের জানা আছে কি যে ব্ল্যাকহোল, নিউট্রনষ্টার (পালসার) কসমিক ষ্ট্রিং ইত্যাদি সকলই অদৃশ্য জগতের অধিবাসী আর তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সঠিক সূক্ষ্মতায় তথ্য রয়েছে আল-কোরআনের জ্ঞান ভাণ্ডারে? এই বইটির একটি মৌলিক

www.pathagar.com

দিক হলো অদৃশ্য, অজানা, অশ্রুত বিষয়গুলো যা আল-কোরআনে রয়েছে তার সন্ধান দেয়া এবং তা কতদূর সঠিকতা ও সূক্ষ্মতায় রয়েছে তা নিরূপণে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পেশ করা। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে বিষয়গুলো অজ্ঞানতার পাষাণ ভারে ও অপব্যাখ্যায় ম্রিয়মান ছিল, জ্ঞানের আলো পৌঁছার সাথে সাথে জগৎবাসী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় কোরআনের বাণীর সত্যতার স্বরূপ - "এই সকল অদৃশ্য জগতের তথ্য, আমি তোমাকে ওহীযোগে অবগত করিতেছি , যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না কিংবা জানিত না তোমার সম্প্রদায়" (১১ঃ৪৯)।

আরব মরুর এক নিরক্ষর নবী খ্রীষ্টীয় সাত শতকে যে ঐশী গ্রন্থের, দাবী করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়করভাবে অবিকৃত সেই গ্রন্থটি আজ ১৪০০ বছর পরেও প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আশ্চর্যজনক নির্ভুলতা ও সঠিকত্বে জগৎবাসীর সামনে এক জিজ্ঞাসা এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে , - আল্লাহ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি যে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? (১৪ঃ১০); তাহারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হইয়াছে , অথবা নিজেরাই তাহারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করিয়াছে? (৫২ঃ৩৫)। অথবা তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? (৫২ঃ৩৬)। উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহাদের প্রতি লক্ষ্য করে না? আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি আজ্ঞাবহের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে (৩৪ঃ৯)। তোমাদের কি হইল যে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করিতেছ না? (৭১ঃ১৩)। তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন ; অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ঃ৮১)।

"হে লোক সকল, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক সনদ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদিগের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি (৪ঃ১৭৪)। এই কোরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহা পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সমর্থন ও বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। সন্দেহ নাই ইহা জগৎসমূহের প্রভু আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ (১০ঃ৩৭)। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে (১৪ঃ৫২)। বল, তোমরা কোরআন বিশ্বাস কর কিংবা নাই কর, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে , তাহাদের নিকট উহা যখনই পাঠ করা হয়, তখনই তাহারা সিজদায় অবনত হয়" (১৭ঃ১০৭)।

সুধী পাঠক। পরবর্তী পাঠ সমূহে আপনার জ্ঞান জিজ্ঞাসার সত্যনিষ্ঠ জাগরণ হউক। তখন আপনার অনুভূতিও হয়ত শ্রদ্ধায় নুয়ে আসবে কোরআনের সঠিকতার

www.pathagar.com

অভাবিত মাত্রা দেখে। আপনি অভিভূত হয়ে বলবেন, – "এইগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ তায়ালা সত্য" (৩১ঃ৩০)।

---

১৪ । Space Time Physics- Edwin F. Taylor; John Archibald Wheeler.

১৫ । Junior Oxford Encyclopedia, Vol-3.

১৬ । পৌরাণিক ধারণাসমূহ চতুর্দশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৭ । National Geographic Vol 128 Nov 65.

১৮ । Stars and Planets- Ian Ridpath.

১৯ । Nature, Spirituality and Science- Sukhraj Tarneja.

২০ । Stars and Planets- Ian Ridpath.

২১ । National Geographic Vol - 128 No 5, Nov 1965.

২২ । National Geographic Vol - 145 No 5. May 1974.

২৩ । পারমানবিক পদার্থ বিজ্ঞান – আহমদ হোসেন, গাজী সিরাজুল ইসলাম।

২৪ । "আজলিন" (اجل) শব্দটির অনেকগুলি অর্থের The hour of death অর্থটি গ্রহণ করা হল। শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত "ইলা" (إلى) হরফের ব্যবহারের দ্বারা এই অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

২৫ । Arabic English Dictionary - F Steingass.

২৬ । Wortabet's Dictionary - John Wortabet.

২৭ । Oxford Junior Encyclopedia Vol -3.

২৮ । Stars & planets-Ian Ridpath.

২৯ । The new Kexton Encyclopedia Vol - 1.

৩০ । Arabic English Dictionary - F. Steingass.

৩১ । Science in the USSR 1988 No. 5.

৩২ । Light Upon Light - Md. Ferdous Khan.

৩৩ । ১ আলোক বছর = ৩০০০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৪·২৫ কিঃ মিঃ = ৯৪৪১৩৬০০০০০০০ কিঃ মিঃ।

৩৪ । Galaxies and Quasars-William J. Kaufmann, (Statistics in American System).

৩৫ । The Expanding Universe-John Gribbin.

৩৬ । দেশ, ২৩ জুলাই '৮৮।

৩৭ । National Geographic Vol 145 No 5 May 74.

৩৮ । সুস্পষ্ট কিতাব 'লওহে মাহফুজে' রক্ষিত গ্রন্থ যাহা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নাই।

www.pathagar.com

২
পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা

জীবন এক মহাসাফল্যজনক সমন্বয়ের শীর্ষতম ফলশ্রুতি। এই দৃশ্য জীবমন্ডল যে কত অযুত দৃশ্য ও অদৃশ্য ব্যবস্থার এক অতি নাজুক সমন্বিত পরিণতি – তা শতাব্দীর সকল বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাকে বিস্ময়ে তাক লাগিয়ে দেয়। "অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি নিকটে পানির যে বিন্দুটির প্রতি লক্ষ্য করি আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশে যে নক্ষত্রই আমরা পর্যবেক্ষণ করি না কেন, সর্বত্র সঠিক নিয়ম শৃংখলা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। বিজ্ঞান জগতের যে দিকেই আমরা দৃষ্টি ফিরাই না কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা , আইন ও শৃংখলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সাক্ষ্য দেখতে পাই" ।[৩৯] কিভাবে অণু আর পরমাণু প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য একত্রে মিলিত হয়, – কেবলমাত্র দৈব আইনের উপর বিজ্ঞান তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাই প্রদান করতে পারে না।[৪০] মহাবিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে যখন আমরা এ সকল গভীর দর্শন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই , আমাদেরকে অভিভূত করে দিয়ে তখন কিছু হতবুদ্ধিকর সমস্যা উদ্ভূত হয়। মহাবিশ্ব যেমনিভাবে আছে তা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে কিংবা লালন করতে উপযোগী নয়। অন্ততঃ আমাদের পরিচিত পরিবেশকে আমরা যেভাবে জানি তা থেকে আমাদের পরিচিত চারিপাশ আদর্শ পদার্থ বিজ্ঞানের আইন কানুনের দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্নতর। [৪১] সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, – বিশ্ব প্রকৃতি যেন ব্যাপকভাবে আমাদের কল্যাণের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায়, বিশ্বপ্রকৃতি তার নিজের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক তথ্য বহন করে । [৪৩] বিজ্ঞানীদের এ সব বক্তব্য যেন আল্লার কোরআনকেই তুলে ধরে, – "নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পর্যায়ক্রম অনুবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে" (৩ঃ১৯০)। বিজ্ঞানীদের ভাষায় কথিত তথ্য কিংবা কোরআনের দাবীকৃত এসব নিদর্শন সম্পর্কে আমরা কতদূর জ্ঞাত রয়েছি? আমাদের কতদূর অবগত হওয়া সম্ভব ? এ জিজ্ঞাসার জবাবে একটি প্রসারিত উত্তর আমরা মানুষ নিজেই নিজেদের মধ্যে প্রতিক্ষণ বহন করে চলি। জীবনের মূল শর্ত প্রাণ কি ? সৌন্দর্য্যবোধ কি ? প্রেম, ভালবাসা, হিংসা কি ? ভয় ও সাহস কি ? কোথায় এদের অস্তিত্ব – কিভাবে এদের সৃষ্টি, কেন এদের সৃষ্টি ? এ সব অতি পরিচিত অনুভবের সংগে মানুষের পরিচয় সুদূর জন্ম-লগ্ন থেকে হওয়া সত্ত্বেও শতাব্দীর উৎকর্ষতম বিজ্ঞান কিংবা যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কোনটার আলোকেই পৃথিবীর মানুষ আজ পর্যন্ত এ সব বিষয়ে সঠিক কোন জ্ঞান লাভ করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়নি। প্রাণের সংজ্ঞা বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন উপায়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে; কিন্তু সঠিক সত্যটি আজো আমরা জানতে পারিনি। যে প্রাণ জীবনের সর্ব প্রধান অপরিহার্য শর্ত - তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের এ দীনতার চিত্রটি কোরআনে এসেছে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে, - "উহারা রুহ (প্রাণ) সম্পর্কে প্রশ্ন করে ? বল , রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত ব্যবস্থা এবং উহাদিগকে (মানুষ) অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে" (১৭ঃ৮৫)।

যে মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে জরুরী শর্ত প্রাণ সম্পর্কে এত অল্প জ্ঞান রাখে, সে মানুষ তার স্রষ্টা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে কতদূর জ্ঞান রাখতে সমর্থ? এমনি স্বল্প-জ্ঞান মানুষের প্রতিনিধি বার্ট্র্যান্ড রাসেল এক সময় প্রশ্ন করেছিল,- "স্রষ্টাকে (God) কে সৃষ্টি করেছে ? " তিনি যখন এই প্রশ্নের জবাবে কোন সদুত্তর পাননি, তখন সহজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফলাও করে প্রচার করে দিলেন – স্রষ্টা বলতে কেউ নেই , সবই কারণের ফল"। পৃথিবীর কাছে এই তত্ত্বটি অনেক বাজার পেয়েছিল। অথচ ফ্রান্সিস বেকনের উক্তি দিয়ে যদি রাসেলের রই প্রশ্নের জবাব দিতে চাই , বলতে হয়,- "সামান্য দর্শন জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান মানুষকে ধর্মের দিকে টেনে আনে।" এরিষ্ট্যটল নিজেও অনুভব করেছিলেন, – "জ্ঞান চর্চায় কারণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা , অনুভব বিবর্জিত হওয়ার কারণে মারাত্মক পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়। "[88] বার্ট্র্যান্ড রাসেলই কি জ্ঞানের চূড়ান্ত সনদ ? একজন বার্ট্র্যান্ড রাসেলের এমন উক্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতার কোথাও ঘাটতি পড়েনি । আজকের পৃথিবী সত্য ও মিথ্যাকে অনুভব, পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম। সুধী পাঠকের কাছে আমার এ প্রবন্ধটির নিবেদন হল, পৃথিবী ও তার জীবন বিস্তার ব্যবস্থায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্য হতে কত আশ্চর্যজনকভাবে এক অভাবিত সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষার পরিকল্পিত রীতি-নীতি, বিধান-ব্যবস্থার অকল্পনীয় সমাবেশ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করা হয়েছে যা এতই নাজুক যে, একটির উপর অপরটির নির্ভরশীলতায় কিংবা কার্য পরিচালনায় কোন কারণে কোন অবস্থায় কোনখানে যৎসামান্য ব্যর্থতার সৃষ্টি হলে সমস্ত জীবন ব্যবস্থা কল্পনাতীত দ্রুতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ত। প্রণিধানযোগ্য যে, প্রকৃতিকে মানুষ 'কারণের ফলাফল', 'বিশৃংখলার মধ্যে সৃষ্টি', ' আপন হতে সৃষ্টি' ইত্যাদি আরো বহুবিধ তত্ত্ব যোগে বিচার ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিয়েছে যুগে যুগে। বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুর অবাধ বিস্তারকে ভুল বুঝে এসেছেন। আমাদের যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বিপুল প্রাচুর্যের যোগান দেখতে পাওয়ায় মানুষ বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেনি যে,- অবাধ বিস্তৃতি নিয়ে অনাদিকাল হতে 'থেকে যাওয়া' বস্তু নিশ্চয়ের অবাধ মেলামেশায় জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয় যে, আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান এসবের সঠিক

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হওয়ায় অধুনা আমরা এমন সব বিস্ময়কর তথ্যাদি পাচ্ছি যে It evokes our sence of wonder, it speaks to us of who we are.[৪৫] এমনি বিস্ময়কর একটা তথ্য আমরা পেতে পারি ফ্রেড হোয়েলের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ হিসাব নিকাশ থেকে, "I estimated..The chance of random shuffling of aminoacids producing a workable set of enzymes to be less than $10^{-40,000}$. The minuteness of this probability wipes out any thought of life having orginated on the Earth[৪৬] স্রষ্টাহীন, পরিকল্পনাহীন এবং অবাধ বিস্তৃতিরক্ষ লশ্রুতিতে যে 'ভাবনার ভুবন' সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে জীবন সৃষ্টির একান্ত পূর্বশর্ত প্রাণরস বা এনজাইম এর একটি কার্যক্ষম-দল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ১ হলে সম্ভাবনাহীনতা হবে $১০^{৪০,০০০}$(১ লিখার পর চল্লিশ হাজার শূন্য বসিয়ে যে দানবীর সংখ্যা পাওয়া যায়, তত। এটি ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়)। এ রকম একটি অবিশ্বাসযোগ্য অনুপাত পৃথিবীতে আদৌ জীবন রয়েছে এই সত্যটিকে মিথ্যা করে দেয়। একই বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে স্যার বার্নাড লোভেল জানিয়েছেন, - It strikes me as extraordinary that life emerged so early in the Earth's history[৪৭].

'বিবর্তিত প্রটোজোয়া শেষ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছে' - এই তথাকথিত বিবর্তনবাদ বিশ্বাস এমনি একটি প্রশ্নের সামনে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আজকের জ্ঞানী মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এসে দাঁড়িয়েছে - পৃথিবীতে কি করে জীবন আবির্ভূত হয়েছে? কি ছিল এর প্রক্রিয়া ? কোথা হতে এসেছিল আদিম প্রাণের স্পন্দন ? পৃথিবীর কোন মতবাদ এর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। পৃথিবীর কোন ডারউইন একে সঠিক তথ্য-প্রমাণে বিশ্লেষণ করতে পারে না। কারণ, - "এতদবিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষগণেরও তাহা ছিল না। " (১৮ঃ৫)।

স্যার বার্নাড লোভেলের এই জিজ্ঞাসার মূল উৎস 'অবাধ প্রসার' ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা এবং তার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গণিতের সূক্ষ্ম হিসাব, যার উপর সমস্ত বিজ্ঞানকুলের কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়ের সঙ্গে মিলে যায় অধ্যাপক জে,বি লেথস -এর অনুসন্ধানের ফলাফল। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে প্রাণের পূর্বশর্ত হল আমিষ অণু। এই আমিষ উপাদানের একটি বিস্তৃত-অণু সৃষ্টি করবার জন্য যে পরিমাণ পদার্থ নড়াচড়ার প্রয়োজন রয়েছে , তার পরিমাণ সমগ্র মহাবিশ্বে যে পরিমাণ পদার্থ মজুদ রয়েছে সে অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ বেশী। অথচ একটি সাধারণ আমিষ উপাদান তৈরীর যতগুলো সম্ভাব্য উপায় রয়েছে , সে উপায়ের সংখ্যা হল 10^{48} (১ এর পর আটচল্লিশটি শূন্য)। এতগুলো অযুত -লক্ষ-কোটি উপায়ে আমিষ অণু তৈরী হওয়ার সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও একটি অতি সাধারণ আমিষ

www.pathagar.com

অণু অবাধ বিস্তারের স্বাধীন ও কোন প্রকার প্রভাবমুক্ত প্রক্রিয়ায় তৈরি হবার জন্য পৃথিবীর সমভরসম্পন্ন পদার্থকে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হবে ক্রমাগত 10^{243} বছর কাল। (১ এর পর দুইশত তেতাল্লিশটি শূন্য দিলে যে মহাসংখ্যা তৈরী হয়)। এই

বয়সের অনুপাতে পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে সম্ভাব্য সময়ের বহু আগে। ডি.এন.এ, আর.এন.এ, জিন, এনজাইম ইত্যাদির চরিত্র ও গঠণ মহাবিশ্বে মহাবিস্তার ও মহাশক্তিধর কোন স্রষ্টা ব্যতীত জীবনের এত বিপুল সমাবেশকে কোনভাবেই অনুমোদন করে না।

www.pathagar.com

বিপুল সম্ভাবনার প্রশস্ততায় বিপুল পরিমাণ পদার্থের প্রক্রিয়াজাত অংশ গ্রহণে বিপুল পরিমাণ সময়ের ব্যপ্তিতে যে একটি আমিষের অণু তৈরী হবে, তার প্রক্রিয়ায় যদি কোন কারণে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে, তবে আর জীবন রক্ষা সম্ভব হবে না, এটি পরিণত হবে বিষদ্রব্যে। তারপরও রাসায়নিক প্রক্রিয়াজত আমিষ অণুটি প্রাণহীন ; এক রহস্যজনক প্রাণ এ উপাদানে অজ্ঞাত কোন উৎস হতে প্রবিষ্ট হলেই আমরা একে জীবিত বলে থাকি [৪৮]। জীবন সৃষ্টি হবার এত সব জটিলতার দিকগুলোকে নির্দেশ করেই বুঝি কোরআন মানবকুলের জ্ঞানের কাছে এ জিজ্ঞাসা রাখে, - "(ওহে মানুষ।) তোমরা কেমন করিয়া আল্লাহকে অস্বীকার কর। তোমরা ছিলে জীবনহীন - অতঃপর তোমাদের মধ্যে তিনি জীবন দান করেন। অতঃপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যানত হইবে" (২ঃ২৮)।

এ অধ্যায়ের দশটি পৃথক পৃথক প্রবন্ধে আমরা পৃথিবী জীবনের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার বিষয়গুলো অধ্যয়ন করব। আপনারা বিনয়ের সঙ্গেই অনুভব করবেন যে, - "মহান আল্লাহ্ অতিশয় সুনিপুণ স্রষ্টা" (২৩ঃ১৪)।

মূল আলোচনায় প্রবিষ্ট হবার পূর্বে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোরআনের কিছু ভাবচিত্র এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। মহান আল্লার ভাষায়, "পৃথিবী ও উহার প্রসারতার শপথ (৯১ঃ৬)। তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বিধান করিয়াছেন আবাসযোগ্যতা, প্রতিরোধ্যতা, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য [৪৯] (৪০ঃ৬৪)। এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য করিয়াছেন আয়ত্বাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন (৪৫ঃ১৩)। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে । তাঁরই আদেশে সেবাদানে নিয়োজিত নক্ষত্ররাজিও। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য" (১৬ঃ১২)।

পরবর্তী পাঠসমূহে আমরা এই আয়াতগুলোর সত্যতা প্রত্যক্ষ করব।

---

৩৯ । সি সিল বয়েস হ্যাম্যান ঃ The Evidence of God in Expanding Universe ; Edited by John Clover Monsma.

৪০ । ইরভিং উইলিয়াম নবলচ ঃ The Evidence of God in Expanding Universe.

৪১ । To The Edge of Eternity-John Gribbin.

৪২ । Alan Mac Robert-Sky & Telescope, Nov. 83.

www.pathagar.com

৪৩ । To The Edge of Eternity-John Gribbin.

৪৪ । The Study of The Physical World - Cheronis, Parsons & Ronneberg.

৪৫ । The Encyclopedia of space & Astronomy : Forewarded by Carl Sagan.

৪৬ । John B. Irwin - Sky & Telescope Jul 83.

৪৭ । Dawn of A New Era - Sir Bernard Lovell.

৪৮ । ফ্রাঙ্ক এ্যালেন : The Evidence of God in Expanding Universe ;

৪৯ । 'কারার' (قرار) – শব্দটির পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পূরক অর্থগুলো নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

২ঃ১
গাণিতিক ভারসাম্য

সারা সৃষ্টিময় এক রহস্যজনক পরিমাপমাত্রা এবং গণিতের চুলচেরা সূক্ষ্মতার বিধান ও সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানকে বিমূঢ় ও বিস্মিত করে। এ সূক্ষ্মতম পরিমাপমাত্রা অতি সূক্ষ্ম কৈশিক প্রাণী থেকে শুরু করে অতি বৃহৎ গ্যালাক্সি পর্যন্ত জীব ও জড়ের সমস্ত অস্তিত্বকে ঘিরে বিরাজ করছে। ফ্রেড হোয়েল এ পরিমাপমিতি এবং তাদের কার্যোপযোগী বিধান –বিস্তৃতিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন -- "There is an enormous intelligence abroad in the universe ..... some supercalculating intellect must have designed the properties of ....[৫০]

লোকাতীত কোন অজানা অজ্ঞাত জগতের অতিশয় বিজ্ঞ এক মহাপরিমাপ জ্ঞানী তাঁর অপরিমেয় সূক্ষ্মতায় বস্তুনিচয়ের গুণাগুণ নিশ্চিত করেছেন, বিষয়টির আজ বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি যেন কোরআনের জ্ঞানগর্ভ বাণীরই সংগে এক হয়ে মিলে যায় একটি প্রশস্ত বিন্দুতে, " তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে" (২৫ঃ২)। আল্লার বিধানে প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি আনুপাতিক পরিমাপ (১৩ঃ৮), রহমানের সৃষ্টিতে অনুপাত ও সামঞ্জস্যের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না" (৬৭ঃ৩)। পৃথিবীর বাহ্যিক সৃষ্টিতে এই পরিমাপমিতির একটা অতি সংক্ষেপ চিত্র তুলে ধরতে চাই।

"দেহজনিত আয়তনে পৃথিবী যদি চাঁদের সমান হত কিংবা তার নিজস্ব ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ হত – তবে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানে যতটুকু রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ। এমনি একটা মাধ্যাকর্ষণ বল কখনো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলীয় পানিকে ধরে রাখতে সমর্থ হত না। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে পড়ত পৃথিবী পৃষ্ঠের সমুদয় জলের মজুদ। বাতাসের জলীয় বাষ্পমাত্রা বায়ুমন্ডলীয় বলয় হতে বিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলত তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে পৌঁছুত এক অবিশ্বাস্য মাত্রায়। সূর্যের জীবনঘাতী অবলোহিত রশ্মি (Infrared ray) সরাসরি এসে জীবমন্ডলকে ভস্মীভূত করে দিত চিরদিনের জন্য। পৃথিবী হারিয়ে ফেলত তার জীবন সংরক্ষণ ক্ষমতা। বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের চার গুণ হত।[৫১] এমন একটি পরিস্থিতিতে

www.pathagar.com

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বৃদ্ধি পেত বর্তমানের দ্বিগুণ যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৃষ্টি করত ৩০ পাউন্ড চাপ। মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়ে বসত বায়ুমন্ডলের স্তরগত উচ্চতাসমূহ। এ উচ্চতা হ্রাসের জন্য অনিবার্য ধ্বংস নেমে আসত পৃথিবীতে। প্রতিদিন পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে প্রায় ২০ লক্ষ উল্কা বিপুল গতিতে ছুটে আসে। আমাদের অনুভবের অজ্ঞাতে একমাত্র বায়ুমন্ডলই তার পুরুত্ব ও ব্যাপ্তি দিয়ে জীবমন্ডলকে ধ্বংসকারী উল্কাপতন হতে রক্ষা করে চলে। পৃথিবীর দেহজনিত বৃদ্ধি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করে

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে বিপুল এষ্টিরয়েড ও মিটিওরিটি বেল্ট। সেখান হতে প্রতিনিয়তই উল্কা পতন হয়। বায়ুমন্ডল তার স্তর বিন্যাসের দ্বারা এদেরকে ভষ্মে পরিণত না করলে এই পৃথিবী বহু আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

দিত, তবে নীচে নেমে আসত বায়ুমন্ডলের এ অদৃশ্য প্রতিরোধী ব্যবস্থার বিস্তার। পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছার পূর্বে বায়ুমন্ডলীয় ঘর্ষণে ভস্মীভূত হবার ঘটনাটি না ঘটে সরাসরি উল্কাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানবার পথ হয়ে পড়ত সুগম। আর এমনি একটি অবস্থা পৃথিবীর জীবমন্ডলের জন্য হত এক অনিবার্য ধ্বংসের কারণ। একই কারণে ভূ-ভাগের শীতপ্রধান অঞ্চলের বৃদ্ধি পেত অকল্পনীয়ভাবে, বসবাসযোগ্য এলাকার ঘাটতি হত প্রকট, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-রীতি কখনো আর সম্ভব হত না আজকের মত। ভ্রমণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে পড়ত প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর এই আয়তন যদি সূর্যের সমান হত (অপরিবর্তিত ঘনত্বে) – তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত আজকের প্রায় ১৫০ গুণ, বায়ুমন্ডলের উচ্চতা নেমে আসত চার মাইলের কমের মধ্যে ; বাষ্পীয় ভবন কখনো সম্ভব হত না। এমনি একটি পরিস্থিতিতে জলচক্রের সাধারণ গতি প্রবাহ বিনষ্ট হয়ে ভূ-ভাগের জলসিঞ্চন হত কোন কল্পনার বিষয়, এমতাবস্থায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এই চাপ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ পাউন্ডের স্থলে হত ২ টন আর মানুষের আকৃতি হত একটি কাঠ বিড়ালীর সমান বা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র। কোন বুদ্ধিদীপ্ত জীবের উন্মেষ হত একেবারে অসম্ভব।

পৃথিবীকে সূর্য থেকে বর্তমান অবস্থানের দ্বিগুণ দূরত্বে সরিয়ে নিলে পৃথিবী তার প্রাপ্য উত্তাপের পেত মাত্র এক-চতুর্থাংশ। এতটুকু দূরত্বে বার্ষিক গতির মাত্রা হত বর্তমানের অর্ধেক কিন্তু অক্ষ পরিধির পরিমাপ হত বর্তমানের দ্বিগুণ। ফলত একটি বছরের পরিমাপ হত চারটি বছরের সমান। এতে যে ফলাফল হত তা হল দূরত্ব জনিত কারণে তাপমাত্রার এক মারাত্মক হ্রাসপ্রাপ্তি যা বর্তমানের এক-চতুর্থাংশে কিংবা তারও কম মাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। শীতকালের ব্যাপ্তি বর্তমানের চারগুণ দীর্ঘতর হয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল জীব ও উদ্ভিদ জমাটবদ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত – এমনকি গ্রীষ্মেও উদ্ভিদের গ্রহণের জন্য কোন মুক্ত পানির অস্তিত্ব থাকত না। অন্যপক্ষে পৃথিবীর সৌর দূরত্ব বর্তমানের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসত অর্ধেকে কিন্তু গতিবেগ হত দ্বিগুণ। ফলত একটি সৌর বছর হত মাত্র ৩ মাস বা ৯০ দিনের। এমনি অবস্থায় সূর্য থেকে আগত তাপের পরিমাণ হত বর্তমানের কমপক্ষে ৪ গুণ, এক একটি ঋতুকাল হত মাত্র ১৫ দিনের (৬টি ঋতু বিবেচনায়)। এমনি একটি ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে সর্বদা যে পরিমাণ তাপমাত্রা বিরাজ করত – তা স্ফুটনাঙ্ক হতে হত অনেক বেশী। জীবনের কল্পনা হত এক অলীক স্বপ্ন।

পৃথিবী যদি শুক্র গ্রহের অবস্থানে অবস্থান করত, তবে তার সম্মুখ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত ৪৮০° সেঃ ও পশ্চাৎ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত -৩৩°সেঃ । যদি মঙ্গলের স্থানে অবস্থিত থাকত, তবে সম্মুখ পৃষ্ঠে – ৩১° সেঃ ও পশ্চাৎ পৃষ্ঠে তাপমাত্রা হত -৮৬° সেঃ। উল্লিখিত ডাটাগুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে পৃথিবীর অবস্থান

www.pathagar.com

যেখানে রয়েছে এটিই তার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত স্থান Rick Gore - এর ভাষায়- We are very smart, we humans, but are we intelligent enough to absorb the lesson our grand glimpses of our sister planets have given us ? [৫২] - আমরা সুচতুর মানুষ কি বুঝতে পরি যা আমাদের প্রতিবেশী গ্রহগুলো শিখাতে চায় ?

জীব ও জড়ের যে বিকাশ পৃথিবীতে এক কল্যাণময় প্রসারতায় বিস্তৃত রয়েছে ফ্র্যাঙ্ক এ্যালেনের ভাষায়, "সূর্য থেকে এর দূরত্ব, আকার এবং কক্ষপথের গতিবেগ এমনিই যে, পৃথিবী প্রাণীকে রক্ষা করে চলতে পারে এবং সেই সঙ্গে যেন মানুষ জাতির আজকের মত শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত ও আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ করতে পারে - পৃথিবীতে তারও ব্যবস্থা রয়েছে"।

পৃথিবীর গোলকের আয়তন , প্রসার ও পুরুত্বে অনুরূপ তথ্যাদি মিলে। পৃথিবীর কেন্দ্র ভাগে লৌহ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ গলিত অবস্থায় বিরাজমান। কেন্দ্র ভাগের এই তাপমাত্রা ৪০০০°-৫০০০° সেঃ এবং ভূ-পৃষ্ঠ হতে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব ৩৯৬৩.৫ মাইল। ভূ-ত্বক থেকে যদি কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে প্রতি ১০০০ ফুট গভীরতার জন্য ১৬° ফারেনহাইট হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে চলে। অর্থাৎ মাত্র ২.৪০ মাইল গভীরতায় পানির স্ফুটনাঙ্ক মাত্রাকে পেয়ে যাওয়ার কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবণগুলো এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বিশেষ বিশেষ স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণগুলোর উৎপত্তি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েকশ গজ নীচে ধরা পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠের দেড় মাইল গভীরতায় পানির বাষ্পীয়-ভবন হতে থাকে।[৫৩] অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীর অধিবাসী, তার দেহের আকৃতি ব্যাসার্ধে মাত্র দেড় মাইল ছোট হলে আমরা আর তার অধিবাসী হতাম না - জীবন টগবগ করে ফুটন্ত পানির বুদবুদের উপহাসে তিরস্কৃত হত। অন্যপক্ষে যদি এটি সমপরিমাণে পুরুত্বপ্রাপ্ত হতে পারত - তবে আজকের চেনা পৃথিবীকে আমরা কখনো খুঁজে পেতাম না। জীবন বাঁচিয়ে রাখার অত্যন্ত জরুরী শর্ত উদ্ভিদের খাদ্যরস হিসেবে মাটি যে পানি সরবরাহ করে থাকে, সঠিক পরিমাপে ততটুকু বর্তমান থাকা সত্বেও মৃত্তিকার সামান্য গভীরতায় পানি জমতে শুরু করত কঠিন বরফে। খাদ্যাভাবে উদ্ভিদকুলের মৃত্যু হত অনিবার্য। আর এমনি একটা অবস্থা হত সমস্ত জীবকুলের বিলুপ্তির জন্য যথার্থভাবেই যথেষ্ট।

পৃথিবীর অন্যান্য অবস্থা ও শর্তাদি অপরিবর্তিত থেকে জলভাগের উন্মুক্ত তল যদি বর্তমানের দ্বিগুণ হত, তবে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পেয়ে হত দ্বিগুণ। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের এই বৃদ্ধি সূর্যের ইনফ্রারেড-রশ্মির জীবন রক্ষাকারী মাত্রাকে কমিয়ে দিত আশঙ্কাজনকভাবে। পচনশীল রোগের প্রকোপ বেড়ে যেত তীব্রভাবে ; মানুষ তার মধ্যে

www.pathagar.com

বেঁচে থাকতে পারলেও মেধার বিকাশ হত অত্যন্ত নিম্নতর। অন্যপক্ষে জলভাগের উন্মুক্ত তল বর্তমানের অর্ধেক হলে জীবন রক্ষাকারী ইনফ্রারেড-রশ্মি হত জীবনঘাতী। সে অবস্থায় বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নেমে হত অর্ধেক। সূর্যের সমস্ত জীবন-ঘাতক (lethal) রশ্মিদের ঠেকিয়ে রেখে জীবনকে রক্ষা করবার মত দুরূহ কাজটি বায়ুমন্ডল কর্তৃক আর সম্ভব হতনা কোন দিন।

চাঁদের প্রভাব পৃথিবীর জীবনে অনস্বীকার্য। চাঁদের অভিকর্ষ প্রভাব না থাকলে পৃথিবীর মহাসমুদ্রের জলস্রোতধারা হতো এমন কিছু যার সাথে আমরা অপরিচিত — তা হতে পারত সমুদ্রের জীবদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থা এবং পৃথিবীবাসীর জন্য এক চরম দুঃসংবাদ। চাঁদের অভিকর্ষ প্রভাবের জন্যই জোয়ার-ভাটার বর্তমান পরিস্থিতি আমরা আজকের মত করে জানি। আয়তনে এ চাঁদটি দ্বিগুণ হলে কিংবা বর্তমান আয়তন মাত্রায় দূরত্বের হিসেবে অর্ধেক নেমে আসলে সমুদ্রের জলের উপর চাঁদের আকর্ষী প্রভাব কমপক্ষে বর্তমান অবস্থার দ্বিগুণ হত। এমনি পরিস্থিতিতে লবণাক্ত এলাকার বৃদ্ধি, আবাসযোগ্য ভূমির হ্রাস, আবাদী ক্ষেত্রের ঘাটতি এবং জলোচ্ছ্বাসজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেত। চাঁদের আয়তন বর্তমানের অর্ধেক কিংবা বর্তমান আয়তনের দ্বিগুণ দূরত্বসীমায় অবস্থান করলে এ বল মাত্রা বর্তমানের অর্ধেক হয়ে যাবার কথা। এমনি পরিস্থিতিতে যে পরিমাণ পানি নদ-নদীগুলোতে প্রবিষ্ট হত - সে পরিমাণটি সেচ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পানির তুলনায় হত অনেক নীচে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমনি একটি পরিস্থিতি সৃষ্ট করত মারাত্মক রকমের অচল অবস্থা।

এ সব তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা যে জ্ঞানটি লাভ করি, তা এ্যালেন মাইকেল রবার্টের ভাষায় - It is as if the universe were deliberately designed for our benifit. [৫৪]

পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানকে নিশ্চিত ও সুখময় করবার জন্য, আমাদের কল্যাণকে সুপ্রশস্ত করবার জন্য এই মহাবিশ্বকে যেন কেউ হাত দিয়ে গড়ে রেখেছেন। নইলে এত হাজার সমন্বয়ের সম্ভাবনা আর সূক্ষ্ম পরিমাপ নির্ধারণ কখনো সম্ভব হত না। কোথা হতে এল এ পরিমাপমিতি ? আল-কোরআন দিয়েছে এর যথাযথ জবাব "ইহা মহা প্রতাপশালী মহাজ্ঞানীর পক্ষ হইতে নির্ধারিত পরিমাপ (৬ঃ৯৭)। আমি সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলাম পরিমাপ, আমি কত সুনিপুণ পরিমাপ বিধান কর্তা" (৭৭ঃ২৩) । আমাদের জীবনময় গ্রহ পৃথিবীর জন্য পরিমাপের বিবেচনাটি যে অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে আয়াতগুলো যেন সে বিশেষত্বেরই ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

www.pathagar.com

(ওহে মানুষঃ) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর (১০ঃ১০১)। তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন ?" (৩১ঃ২০)।

সুধী পাঠক, আপনার কাছে এ জিজ্ঞাসার কি উত্তর পাবেন আপনার প্রভু,- "যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, সমন্বিত করিয়াছেন এবং সামঞ্জস্যের সাথে পরিমিত করিয়াছেন (৮২ঃ৭), অতঃপর আপন ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠিত ও রূপায়িত করিয়াছেন (৮২ঃ৮)। অতঃপর নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমূহকে তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে তোমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহাতে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে শিক্ষণীয় নিদর্শনাবলী ও নির্দেশ" (৪৫ঃ১৩)।

আপনি জানেন কি যে, - "আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব তাহার, যাহারা (বিবেকসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) জ্ঞান খাটায় না, যাহারা (সবাক হওয়া সত্ত্বেও) মূক এবং (শ্রুতি শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বধির (৮ঃ২২)। আল্লাহ তাহাদের মন, শ্রুতি ও দৃষ্টির উপর মোহরাঙ্কন করিয়া দিয়েছেন - তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (২ঃ৭)।

---

৫০ । Annual Review of Astronomy and Astrophysics Vol-20 1982 USA.
৫১ ঃ ফ্র্যাঙ্ক এ্যালেন : The Evidence of God in Expanding Universe.
৫২ । National Geographic Vol 167 No. 1 Jan 1985.
৫৩ । The Story of our Earth-Richard Carrington.
৫৪ । Alan Mac Robert - Sky & Telescope May 1983.

www.pathagar.com

২ঃ২
দিনরাত্রির পরিবর্তন

রাত ও দিনের পরিবর্তনের উপর জ্ঞান-তত্ত্বের দাবী কোরআনের সর্বত্র চোখে পড়বার মত। প্রস্তাব করা হয়েছে, এ এক অন্যতম নিদর্শন ও নির্দেশ যা জ্ঞানবানদের জন্য আল্লাহের মহিমা বুঝবার একটি সহজ উপায়। রাতের পর দিন আসছে এবং নির্ধারিত নিয়মে দিনরাত্রির পরিবর্তন হচ্ছে, এ অতি সাধারণ ঘটনাটিকে এত বৃহৎ করে দেখবার প্রয়োজন কোথায় – এ জিজ্ঞাসাটি মনের অজান্তেই এসে যেতে পারে। এ প্রশ্নের জবাবই হল এ প্রবন্ধটি। আলোচনা শুরুতেই আমরা কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি গ্রহণ করব – "আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন। রাত্রিকে করিয়াছি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকময় (১৭ঃ১২); দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লার আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীস্থিত সমূহ সৃষ্টিতে নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য" (১০ঃ৬)।

আশা করি, আমরা সবাই অবগত রয়েছি যে, পৃথিবীর দু'টি গতির একটি হল বার্ষিক গতি। ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী একটি পূর্ণ ঘূর্ণি সমাপন করে। আবার আরেকটি, আহ্নিক গতির জন্য নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান পৃথিবী দিন ও রাত্রির সৃষ্টি করে চলে। এই কক্ষগতির সঙ্গে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য আছে বলেই দিন, রাত্রি ও ঋতুর সৃষ্টি সম্ভব। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কেবল অনুমানলব্ধ ; সম্প্রসারণশীল এ মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন-রাত্রি সৃষ্টিকারী এই আহ্নিক গতি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও আমরা আমাদের আলোচনায় সে বিষয়টিকে বিবেচনা করব না। [আমাদের বিবেচ্য বিষয় হল দিন-রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য কি তথ্যের প্রস্তাবকে কোরআন তুলে ধরতে চায় – সে বিষয়ে একটু তলিয়ে দেখা।]

সৌর জগতের বিন্যাস নিয়ে বসুন। পৃথিবীর এক পার্শ্বে রয়েছে শুক্র ও অন্য পার্শ্বে মঙ্গল। শুক্রের একটি আহ্নিক গতির পর্যায় কাল ২৪৩ দিন, পৃথিবীতে ২৩ ঘঃ ৫৪ মিঃ, মঙ্গলের বেলায় ২৪ঘঃ ৩৭ মিঃ। অর্থাৎ শুক্র গ্রহের একটা 'দিনের' পরিমাণ ১২১.৫ পৃথিবী-দিন আর মঙ্গলে তা ১২ ঘন্টা ১৮.৫ মিঃ। বুধ এর পূর্ণ আহ্নিক গতিকাল ৫৪ দিন ১৫ ঘন্টা ; সেখানেও দিনের পরিমাণ ২৭দিন ৭·৫ ঘন্টা। তাপমাত্রার হিসেবে বুধের আলোকিত পৃষ্ঠে ৩৫০° সেঃ অন্ধকার পৃষ্ঠে –১৭০° সেঃ। শুক্রের আলোকিত পৃষ্ঠের তাপ ৪৮০° সেঃ ও অন্ধকার পৃষ্ঠে তাপ – ৩৩° সেঃ। এ উপাত্তগুলো

www.pathagar.com

আমাদেরকে অতি সুন্দর তথ্য সরবরাহ্ করে । সূর্যের এত ক্যছাকাছি গ্রহ বুধের অন্ধকার তলে -১৭০° সেঃ তাপমাত্রা সৃষ্টি হতে পারার অর্থে মহাবিশ্বের পরিবেশসমূহের প্রবণতা চরম শীতলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার তথ্য প্রকাশ পায়। অন্যপক্ষে তার উল্টোপিঠের তাপমাত্রা ৩৫০° হলেও তার চেয়ে দূরবর্তী গ্রহ শুক্রের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা কিন্তু বুধের চেয়ে অনেক বেশী। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহের তাপমাত্রা ৩৫০° সেঃ এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী গ্রহের তামাত্রা ৪৮০° সেঃ কেন? লক্ষ্য করুন, বুধের আহ্নিক গতিজনিত সৃষ্ট দিনটি শুক্রের ঐ দিনের সাড়ে চারগুণ বড় ; অর্থাৎ বুধ তার আলোকিত পৃষ্ঠে তাপ গ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর দিনের পরিমাপে ২৭ দিন ৭.৫ ঘন্টা, যেখানে দূরবর্তী গ্রহ শুক্র এ তাপ গ্রহণ করে থাকে ১২১.৫ পৃথিবী-দিনের সমান একটি শুক্র দিনের ব্যাপ্তি নিয়ে। ভর ও দূরত্ব বিবেচনা বাদ দিলে সাধারণ গাণিতিক হিসেবে শুক্রে উপরোল্লিখিত কারণে সাড়ে চারগুণ বেশী তাপ সঞ্চিত হবার কথা। অর্থাৎ কোন একটি গ্রহের তাপমাত্রা পরিস্থিতি তার কোন পৃষ্ঠের উপর আপতিত সূর্য রশ্মি স্থায়িত্বকালটির সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ স্থায়িত্বকালটি আবার তাদের অক্ষ ঘূর্ণির বিষয়টিকে নির্দেশিত করে।

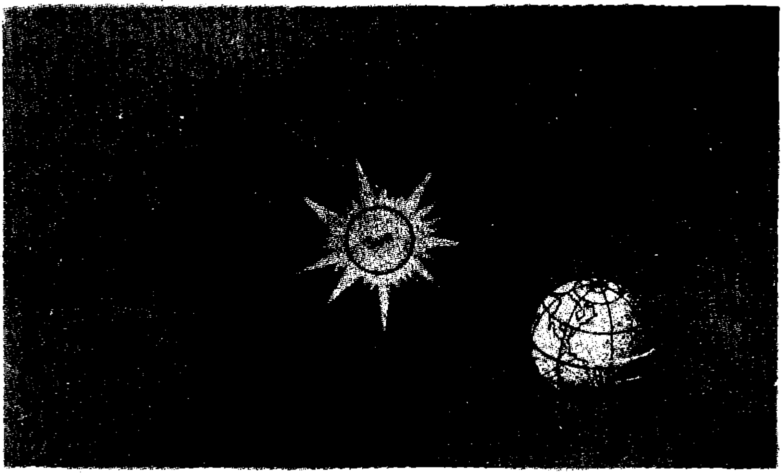

দিনরাত্রির পরিবর্তনের জন্য কক্ষগতি ও অক্ষগতি এক বিস্ময়কর সুসামঞ্জস্যতায় বিন্যাস্ত। শুধু এর মাঝে ব্যক্ত রয়েছে পৃথিবীর জীবনযোগ্যতার হাজার রহস্য যার সামান্য ব্যতিক্রম এই পৃথিবী হতে বহু পূর্বে জীবনকে বিলীন করে দিত।

www.pathagar.com

যা হোক, আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আহ্নিক গতির কারণেই বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল ইত্যাদিতে তাপের তারতম্য হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মঙ্গলের আহ্নিক গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দিনের বেলায় – ৩১° সেঃ ও রাতের পৃষ্ঠে – ৮৬° সেঃ তাপমাত্রা বিরাজ করছে এবং এ কারণটির জন্য জীবন সেখানে কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমমানের দিনরাত্রির হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র দূরত্বের জন্যই এ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি মঙ্গল রাজ্যের অভিশপ্ত তাপমাত্রার জন্য দায়ী। বুধ ও শুক্রের বেলায় অক্ষ ঘূর্ণির যে স্থায়িত্বকালকে আমরা তাপমাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, পৃথিবীর বেলায় সেটিকে সময় দৈর্ঘ্যের পরিমাপে জীবন সৃষ্টি ও রক্ষণের জন্য সবচেয়ে সহায়ক দেখতে পাই – ঠিক সে জ্ঞানগুলো, কারণগুলো ও পরিমাপগুলো মঙ্গলে এসে চরম অহিতকর ও ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে দেখে বিজ্ঞান–মস্তিষ্কে এক ভীষণ জ্বালাকর প্রশ্নবোধক চিহ্ন অঙ্কিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি – কেন ?

বিষয়টিকে আমরা আরো সুনির্দিষ্ট বিশুদ্ধতায় দেখতে পারি চাঁদকে আমাদের আলোচনায় টেনে আনলে। স্বপ্নের সুরম্য রাণী চাঁদ বহু প্রেমিক মনের খোরাক হলেও বস্তুতঃ সত্য জিনিসটি কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। তাপ–মানে চাঁদের সমমাত্রা পরিস্থিতির কোন নারীকে যদি সেই প্রেমিক আলিঙ্গন করত – যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুই হত তার একমাত্র প্রাপ্য। দূরত্বের হিসেবে চাঁদ ও পৃথিবী সূর্যের কাছে একই তলের অধিবাসী। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় – পৃথিবীর উপর সূর্য রশ্মির তেজ মাত্রা আর চাঁদের উপর এ তেজ মাত্রা একেবারে সমান । অথচ আপনি জানেন কি যে চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রাটি কখনো জীবনের জন্য উপযোগী ত নয়ই , বরং অতিশয় ধ্বংসাত্মক ? চাঁদের সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১১৭° সেঃ। অন্যপক্ষে আঁধার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা –১৬৩° সে । একই তল, একই দূরত্ব, একই মহাজাগতিক পরিবেশ, একই সূর্য তেজ হওয়া সত্ত্বেও এ পৃথিবীতে বসে আপনি চাঁদের কথা পড়ছেন, কিন্তু চাঁদে বসে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যকে দেখবার মত কেউ নেই। একটি জীবন সৃষ্টি করেছে , লালন করে চলেছে , অন্যটি কখনো কোন জীবন সৃষ্টি করেনি, করার সম্ভাবনাও রাখে না। এখানে এসে পাই কতগুলো তথ্য। অনুভব আর হৃদয় দিয়ে তার বিচার করবার প্রয়োজন আছে। যে অক্ষগতি জীবনের জন্য সহায়ক, সেই অক্ষগতি মঙ্গলের তলে হলে হবে না, হতে হবে পৃথিবীর তলে ; পৃথিবীর তলে আবার বুধ, শুক্র ও চাঁদের অক্ষগতি হলে চলবে না – হতে হবে পৃথিবীর জন্য নির্ধারিত গতি ব্যবস্থাটিই। চাঁদের পৃষ্ঠের দু'টি বিপরীতমুখী অসম তাপমাত্রা আমাদেরকে জানিয়ে যায়, স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত মাত্রার কম অক্ষগতিসম্পন্ন হলে পৃথিবীর সমস্ত জীবন এক পৃষ্ঠে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, অন্য পৃষ্ঠে শৈত্যে জমাট বেঁধে তুষার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। চাঁদ, মঙ্গল, বুধ, শুক্র এরা সবাই যেন সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে - "তিনিই মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ, যিনি পৃথিবীকে আবাসযোগ্য করিয়াছেন (৪০ঃ৬৪)। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা রাখে, তাহাদিগের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস, পরস্পরকে পরস্পরের অনুগামী হিসেবে " (২৫ঃ৬২)। আল-কোরআন এখানে রাত-দিনের পরিবর্তনজ্ঞানের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি জুড়ে দিয়ে আবারো দাবী রাখল আমাদের বিশ্বাসের যে, "ইহা (কোরআন) মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহের পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ গ্রন্থ" (৪০ঃ২) জ্ঞানের প্রসার, যুক্তির দৃঢ়তা ও তথ্যের নির্ভুলতায় "ইহা এমন গ্রন্থ যাহার উপর কোন সন্দেহ নাই" (২ঃ২)।

আমাদের জানবার বিষয়টি কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। আরো দু'টি আয়াতের প্রেক্ষাপটে আমরা আলোচনাকে প্রসারিত করতে পারি। কোরআনে দিন রাত্রি সম্পর্কে যে সকল আয়াত রয়েছে , তাদের একটি বিশেষ সংখ্যক আয়াতের দাবী হল, আল্লাহর দিন রাত্রির মাঝে মানুষের বিশ্রাম ও ঘুম যাওয়ার বিবেচনা। রাত্রি হলে মানুষ ঘুম যাবে, বিশ্রাম করবে এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি মোটেই ততটা স্বাভাবিক নয়। সূর্যের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ (10^{13} বা 10,000,000,000,000) উজ্জ্বলতা সম্পন্ন কোয়াসার আকাশে আলোকের মহাবিস্তৃতির স্বাক্ষর।[৫৫] অন্যপক্ষে এত উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহে অধ্যুষিত আকাশ অন্ধকার থাকবার নিগূঢ় অর্থ হল মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ের মহা দূরত্ব ও তাদের সম্প্রসারণ জাত কারণ।[৫৬] আমরা অনুমানে ধরে নিতে পারি যে, যদি একপার্শ্বে সূর্য ও অন্য পার্শ্বে সূর্য কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সমান কিংবা বড় আলোর উৎস নিয়ে কোন গ্রহ অবস্থান করে, তবে সে গ্রহে কোন দিন রাত্রি সৃষ্টি হবে না। দিনের উজ্জ্বলতা, তাপ ইত্যাদির কারণে আরামদায়ক রাতের আমেজ কখনো সম্ভব হবে না এমনি কোন পরিস্থিতি প্রাপ্ত গ্রহের দুনিয়ায়।

অনেক জ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞতার দাঁড়ি গোঁফের স্পর্শমাখা সংবাণী দিয়ে থাকেন - 'যা নেই তা নিয়ে ভাবতে যেয়ো না, যা আছে , তা নিয়ে ভাবো'। অথচ আমরা থাকা বা না থাকার কতদূর কি জানি ? উপরে যে পরিস্থিতি কথা বলা হল, এটা খুবই সম্ভব। আপনারা কি বাইনারী সিষ্টেম (Binary System) বা নক্ষত্রের যুগ্ম ব্যবস্থার কথা শুনেছেন ? মহাবিশ্বের পরিমাপে সূর্য অত্যন্ত নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত নগণ্য। বাইনারী সিষ্টেম হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র , উজ্জ্বলতায় যারা সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী, এমনিভাবে এমনি কৌণিক পার্থক্য অবস্থান করে যে, - সেখানে কোন গ্রহে কোন কালে রাত্রি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এমনি ব্যবস্থার বহুল জানা উদাহরণ হল Betacygni যার মধ্যে দুটি সূর্য এবং Alpha centauri যার সূর্য সংখ্যা ৩টি।[৫৭] এ যুগ্ম-সূর্য ব্যবস্থার কথাই কি কোরআন বলতে চেয়েছে সম্ভাবনার নির্দেশে মহাজ্ঞানময় ভাষায় স্রষ্টার বর্ণনাতীত শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, " (ওহে মানুষ) বল, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামত (মহাধ্বংস) পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন

www.pathagar.com

উপাস্য আছে কি যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইতে সক্ষম , যাহাতে বিশ্রাম লইতে পার ? (এত সুস্পষ্টভাবে বলার পরেও) তবু কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না" ? (২৮ঃ৭২)।

অনুরূপভাবে দীর্ঘস্থায়ী রাত্রির যুক্তি এসেছে আল-কোরআনে। সম্ভবত চাঁদকেই আমরা অন্যতম নিদর্শন হিসেবে দেখাতে পারি। চাঁদের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে যে ব্যবস্থার নির্ধারণ, এটি এমন যে, চাঁদের যে পিঠ পৃথিবীর দিকে মুখ করে রয়েছে , সেটি আজীবন এমনিভাবে থাকবে। চিরদিন চাঁদের একই পিঠ পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকার মধ্যে দিয়ে আমরা যে যোগসূত্র পাই তা হল, - হয়তবা হতে পারত আমাদের পৃথিবী, আজীবন সূর্যের দিকে একই মুখ করে রয়েছে। এক পৃষ্ঠে চিরস্থায়ী দিবস, অন্য পৃষ্ঠে চিরস্থায়ী অন্ধকার ; মহাদীর্ঘতম এ রাত্রিকে শুধুমাত্র মহাধ্বংসের মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি টানা সম্ভব। আর এমন কোন অভিশপ্ত পরিস্থিতির কথাটিকে বুঝি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য কোরআন তার ক্ষুরধার বক্তব্যে জগৎবাসীকে জানিয়ে দেয়, "বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে কি - যে, তোমাদেরকে আনিয়া দিতে পারে আলোকময় দিন (সুস্পষ্টতার সাথে জানার পর) তবু কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না ?" (২৮ঃ৭১)

গতিময় এই মহাবিশ্বের সবচাইতে স্বাভাবিক ঘটনা হবার কথা বিচ্যুতি। প্রবল গতিও দুর্বার অভিকর্ষ টানে পৃথিবী যদি তার কক্ষকে ছেড়ে প্লুটো কিংবা তারও পরের কোন কক্ষপথে স্থান নেয়, অক্ষঘূর্ণি থাকা সত্ত্বেও, চাঁদের মত না হওয়া সত্ত্বেও সে অবস্থানে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শুধু অন্ধকার। চিরস্থায়ী সে অন্ধকার শুধু কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীই হবে না - সমস্ত জীবকুলকে নিঃশেষে মুছে দেবে অস্তিত্বহতে। আল্লাহ্র বাণীকে চ্যালেঞ্জ করে সেদিন পৃথিবীকে মহারাত্রির মহামায়া থেকে মুক্ত করবার মত কোন উপাস্য থাকবে না।

"চলমান রাতের শপথ "(৮১ঃ৪)।

"চিন্তাশীল মানুষের জন্য এ উপযুক্ত শপথ নয় কি " (৮৯ঃ৫)? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে একমাত্র তিনিই আল্লাহ , তিনি তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন (৬ঃ৩)। অতএব, হে জ্ঞানী সমাজ, আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও, যাহাতে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পার" (৫ঃ১০০)।

---

৫৫ । National Geographic Vol. 145 No. 5.May 1974

৫৬ । The Expanding Universe - John Gribbin.

৫৭ । The Stars - Roger Hall.

www.pathagar.com

২৩
বায়ুমন্ডল ও পৃথিবী–জীবন

পৃথিবীর আজকের বায়ুমন্ডল, জীবমন্ডলের জন্য এক বিশাল ও বিস্ময়কর কৃপা। বায়ুমন্ডল জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে এক অপূর্ব মহিমায়। এর সৃষ্টি, এর অবস্থান, ব্যাপ্তি ও গুণাগুণের মাঝে প্রমাণিত হয় এক বিরাট সমন্বয়। গাণিতিক বিজ্ঞতায় জীবন রক্ষাকারী এই পৃথিবী ও তার মহাজাগতিক পরিবেশ সৃষ্টির মূলে ফ্রেড হয়েলের সেই "Enormous intelligence" এবং "Supercalculating intellect" এর মত কোন স্রষ্টার হস্তক্ষেপ যে প্রয়োজন হয়েছিল তার অযুত প্রমাণ মিলে।

আপনারা হয়তো জানেন যে প্রতি মুহূর্তে সূর্যে হাজার হাজার বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। এক একটা বিস্ফোরণ ও শিখা প্রায় এক বিলিয়ন হাইড্রোজেন বোমার শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সূর্য–করোনাতে সৌর গ্যাস–ধূলি–কণা নিক্ষেপ করে।[৫৮] 'করোনা' হল সূর্যের প্রান্তসীমার অব্যাহতির পর প্রসারিত বিশাল শূন্য, পুটো কিংবা তারও পরে পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। নিক্ষিপ্ত গ্যাস–ধূলিকণায় অধ্যুষিত করোনায় উৎক্ষিপ্ত সৌর–ধূলি সূর্যের অন্তঃস্থ বিস্ফোরণ হতে প্রাপ্ত শক্তি ও করোনার অবিশ্বাস্য উত্তাপের ফলশ্রুতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ গ্যাস– ধূলিকণা এক তীব্র বেগ নিয়ে সমভাবে চারিদিকে প্রসারিত হয় ; এ ধাবমান গ্যাস–ধূলিকে সৌর বায়ু বা Solar Wind বলে। সৌর বায়ু প্রতি সেকেন্ডে প্রায়–৫০০ মাইল বেগে ধাবিত হতে থাকে এবং পৃথিবী ও সূর্য–দূরত্বের ৪০ গুণ দূরত্বে অবস্থানরত পুটো পর্যন্ত এগুলো স্বাচ্ছন্দে পৌছে যায়। একটি সৌর–বিস্ফোরণের কমবেশী ১০ দিনের মধ্যে সৌরবায়ু পৃথিবী এলাকায় আঘাত হানে। সৌরবায়ু জীবদেহের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ; দেহের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে সে দেহ–কোষের অনিবার্য মৃত্যু কিংবা বিকৃতি ঘটাতে সক্ষম, যার ফলশ্রুতিতে ক্যান্সার অবশ্যম্ভাবী। এ সৌরবায়ু পৃথিবী তলকে আঘাত করে প্রচন্ড শক্তিতে ; আমাদের জানার বাইরে থেকে বায়ুমন্ডল এ সৌরবায়ুকে প্রচন্ড প্রতাপে ফিরিয়ে দেয়, ফলতঃ অভিশপ্ত এ বায়ু জীবমন্ডলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। নিশ্চিত মৃত্যু প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ পৃথিবীর চারপাশে খেলে যায়, খেলতে থাকে। মহাকল্যাণকর এ বায়ুমন্ডল আমাদেরকে তা একটুও বুঝতে দেয় না ।। বেঁচে থাকে জীবন ।।।

মহাশূন্য থেকে প্রতিদিন ২০ লাখ উল্কা পৃথিবীকে আঘাত হানার জন্য ছুটে আসে। রাতের আকাশে মাঝে মাঝে আমরা উল্কা পতনের দৃশ্য দেখে আনন্দিত হই ;

www.pathagar.com

আমরা জানি না, এক একটা উল্কা পতন যে কত বড় দুঃসংবাদের তথ্য-নির্দেশ আমাদেরকে জানিয়ে যায়। বায়ুমন্ডলের গঠন এমনি যে, সে তার সুদীর্ঘ প্রসার ও ব্যয়বীয় বস্তু ধারণের দ্বারা সেকেন্ডে ৩০ মাইল বেগে পতনশীল উল্কার উপর সৃষ্টি করে এক অদৃশ্য প্রতিরোধ্যতা। উল্কাটি ঘর্ষণের ফলশ্রুতিতে নিঃশেষ ভস্মে পরিনত হয়। প্রমাণ পেয়ে যায় আল্লাহর মহাবাণী,-"তিনি আকাশকে নির্মাণ করিয়াছেন সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ" (৪০ঃ৬৪)[৫৯] " তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন দানের কথা অস্বীকার করিবে" ? (৫৫ঃ১৩)। মঙ্গলের পরিধি তলের অব্যাহতির পর যে বিপুল এষ্টিরয়েড ও মেটিওরিটি বেল্ট রয়েছে, তা থেকে প্রতিদিন একই হারে সৃষ্টির পর থেকে উল্কা পতনের ব্যাপারটি অব্যাহত থাকার পরেও জীবকূলের বেঁচে থাকায় আবারও প্রমাণিত হয়, - " তোমরা প্রতিপালক, তিনিইতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (২৬ঃ৯)। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী বস্তু নিচয়ের প্রতিপালক - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও" (২৬ঃ২৪)।[৮]

আমাদের জানা এখানেই শেষ নয়। মহাজাগতিক রশ্মি হতে পারে এ জন্য আরো একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। মহাশূন্যকে যদি শুধু শূন্য ধারণা করা হয়, - করা হবে এক মারাত্মক ভুল। মহাশূন্য মূলতঃ অসংখ্য শক্তিকণা বা অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার এক মহা-বিশাল সমুদ্র। বায়ুমন্ডলের শক্তিশালী আবরণকে যদি ভেদ করে কখনো বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন - তবে সেখানে আপনার দেহের প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রতি সেকেন্ডে ৪ থেকে ৫টি কসমিক তেজকণা আঘাত হানবে। তীব্র গতিবেগে ও তেজস্ক্রিয়তার গুণে তারা আপতিত পদার্থ-তলের স্পর্শিত কোষকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দেবে। জীবদেহে মহাজাগতিক রশ্মির এমনি সরাসরি আপাতন দেহকোষ-কলায় অযুত লক্ষ ক্যান্সার কোষ তৈরি করে ফেলবে অল্প সময়েই। পৃথিবী যদি সত্যিই কোন কারণে এ জীবনঘাতক মহাজাগতিক রশ্মির পতনের প্রতি উন্মুক্ত হত, তবে এ পৃথিবীর জীবমন্ডল বহু পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ত চিরন্তন মৃত্যু শয্যায়। এটাই হবার ছিল, অথচ আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবজগৎ বেঁচে রয়েছে কত স্বাচ্ছন্দে! কি করে ? জবাব দিয়েছেন হার্বার্ট ফ্রেডম্যান - The streams of invisible radiation and immense clouds of solar gas strike the high atmosphere above us. Shielded by porotective blanket of air, our sense receive no inkling of storm above"[৬০]

বায়ুমন্ডলের অপ্রতিরোধ্য নিরাপদ রক্ষাবর্মের আচ্ছাদনের আশ্রয়ে বসবাসকারী পৃথিবীর জীবমন্ডলের সকল প্রাণ, তাদের উপরে ঘটে যাওয়া হাজার হাজার ঝড় ও প্রলয়ঙ্কর মৃত্যুর প্রসারিত থাবার তীব্রতা সম্পর্কে কোন খবরই পায় না। সত্য হয়ে আসে আল্লাহর বাণী - "শপথ সেই সমুন্নত ছাদের (৫২ঃ৫) ; তোমাদের উর্ধ্বে নির্মাণ

www.pathagar.com

করিয়াছি বহু সুদৃঢ় স্তর " (৭৮ঃ১২)[৬১] মহান আল্লাহ ছাদ হিসাবে আমাদেরকে এ বায়ুমন্ডলের কথাই অবগত করতে চান ; জানাতে চান এর মাঝে রয়েছে বহু ভাঁজ বা স্তর যারা প্রতিরোধ্যতায় সুদৃঢ়। সুদৃঢ় এ প্রতিরোধ্যতার রহস্যমুলে জীবনের অস্তিত্ব বিকশিত হয়েছে এই পৃথিবীতে, লালিত হচ্ছে আর বেঁচে আছে অনন্তকাল।

আমরা এ প্রসংগে মহাজাগতিক রশ্মির কিছু রহস্যজনক গুণাগুণের বিশ্লেষণ করতে পারি। বায়ুমন্ডলের গুণাগুণ, পৃথিবীর চৌম্বক গুণাগুণ আর মহাজাগতিক রশ্মিদের গুণাগুণে রয়েছে এক অপূর্ব সমন্বয়। এ গুণাগুণ ও সমন্বিত চরিত্র মহাজাগতিক রশ্মিদের প্রবেশ অনুমোদন কিংবা বানচাল করে। আপনারা হয়ত অবগত রয়েছেন যে, তীব্র গতিসম্পন্ন (আলোর গতি) অতি সূক্ষ্ম এ সকল চার্জযুক্ত কণিকাগুলো পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির আশ্চর্য গুণাগুণের সংগে অপূর্বভাবে সমন্বিত ও বিসংশ্লিষ্ট। পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি মহাজাগতিক ক্ষতিকর কণাগুলোকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক প্রভাবে মানুষ ও জীবমন্ডলের বসবাসকারী এলাকা অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিক হতে টেনে ও ছেঁকে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলদ্বয়ের দিকে যেখানে জীবন নেই। জীবনকে নিরাপদ করবার জন্য মহাজাগতিক কণা আর পৃথিবীর চৌম্বকত্বের এ সমন্বয় কত বিস্ময়কর। তারপরেও যে সকল শক্তিকণা ভূচৌম্বকত্বের প্রভাব অগ্রাহ্য করে ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে, তাদের জন্যও রয়েছে আরো একটি অনন্য অথচ অদৃশ্য ব্যবস্থা। বায়ুমন্ডলের এক একটি স্তর বা মাত্রা গভীরতায় এক এক ধর্ম ও গুণাগুণ সম্পন্ন শক্তিকণাগুলো বিশোষিত হয়ে পড়ে। এভাবে অতি ভয়ঙ্কর মহাজাগতিক রশ্মি কণাগুলোর প্রভাব থেকেও জীবনকে নিরাপত্তা দানের যে পৃথিবী জোড়া ব্যবস্থা , সেটি আমাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে যেন কোরআনের ভাষায় বলে যায়, -"(বল), আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করি নাই এক উপযুক্ত আবাসস্থল হিসাবে" ? (৭৭ঃ২৫)।

আমাদেরকে আরো বিস্ময়ে অভিভূত করার জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে রয়েছে আরো অসংখ্য তথ্য। ইতিপূর্বে শক্তিশালী রশ্মিদের যে উল্লেখ করা হয়েছে , তারা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিতে আকর্ষিত হয়ে পথ পরিবর্তন করে না। কিভাবে জীবমন্ডল তাদের হাত থেকে বেঁচে থাকে তাহলে? মহান স্রষ্টার সৃষ্টিতে রয়েছে তার জন্যও এক অতি আশ্চর্য ব্যবস্থা। আমাদের বায়ুমন্ডলের প্রকৃতি এমন যে, তার পুরুত্ব ভেদ করে কেবল কল্যাণকর রশ্মি তরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছাবে। জীবন রক্ষার জন্য যে রশ্মিগুলো না হলেই নয়, তাদের এ বায়বীয় আস্তরণ ভেদ করতে বাধা নেই ; কিন্তু মানুষ ও জীব জগতের জন্য যেগুলো ক্ষতিকর, - সে রশ্মিসমূহের কোন প্রবেশ অধিকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, দূরবর্তী অতি বেগুনী রশ্মি (ফার আলট্রাভায়োলেট-রে) বায়ুমন্ডলীয় F-region -এ এসে বায়ুমন্ডল কর্তৃক (ওজোন গ্যাস) শোষিত হয়ে যায়। এক্স-রে E-region -এ এসে বিশোষিত হয় ও মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ

www.pathagar.com

স্ট্রেটোস্ফিয়ারে এবং ট্রপোপজে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। কোটি কোটি মাইলের মহাযাত্রা মাত্র মাইলের পথকে অতিক্রম করতে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিঃশেষ হয়ে যায় ; আর এ ব্যবস্থার মাঝেই রয়ে গেছে জীবন রক্ষার সকল রহস্য। কত অপূর্ব ! "মহান আল্লাহ কত সুনিপুণ স্রষ্টা ! " (২৩:১৪)।

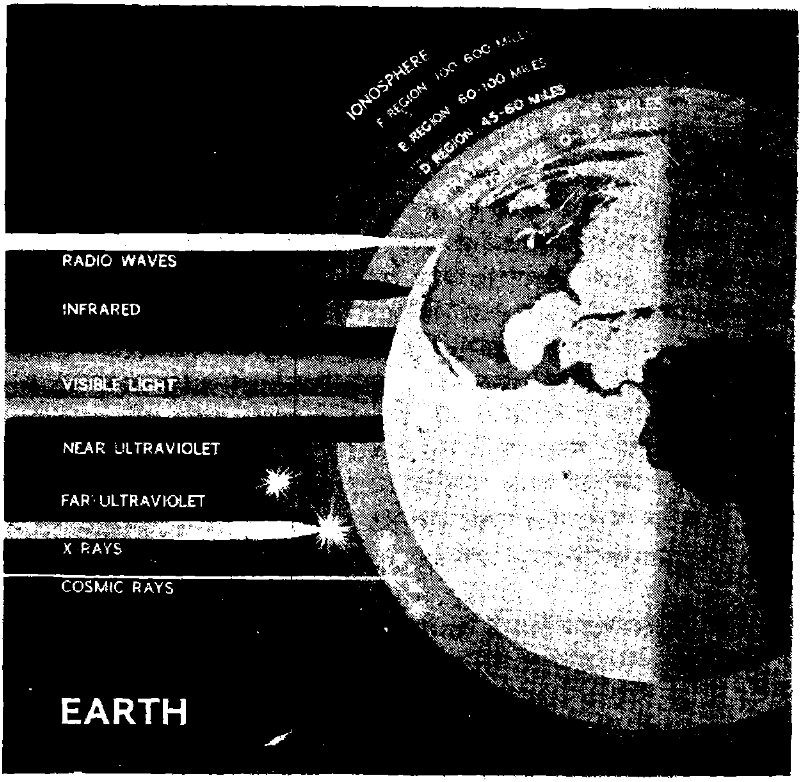

অদৃশ্যের অতি সূক্ষ্ম শাসন ও বিধান ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই বায়ুমন্ডল। লক্ষ লক্ষ উল্কাপতন, জীবন বিঘাতী মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর ঝঞ্ঝা আর সূর্যের অবলোহিত রশ্মির উত্তাপ থেকে জীবনকে অভিনব কৌশলে রক্ষা করে চলছে এই বায়ুমন্ডল। সৃষ্টিতে এর চাইতে সুরক্ষিত ছাদ আর নেই।

www.pathagar.com

শুধু কি তাই ? আশ্চর্য হবেন যে, প্রাণদানকারী অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রারেড-রে এর পৃথিবীতে প্রবেশ এর মধ্যে নিরূপিত রয়েছে এক অতি সূক্ষ্ম মাত্রা। এ প্রাণদানকারী ইনফ্রারেড-রে নিজেও কিন্তু প্রাণ-বিঘাতী। এ সৃষ্টি ব্যবস্থায় একে অতি অপূর্বভাবে ছেঁকে দেয়া হয় ; কমিয়ে আনা হয় একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপে। Kenth F. Weaver -এর লেখা থেকে আমরা তার চিত্রটি পাই , - In case of infrared, much of the radiation is blocked by water vapour in the atmosphere, but significant wavelengths in infraed still get through.[৮২]

জীবনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকু ইনফ্রারেড-রে বায়ুমন্ডলীয় ছাঁকুনি পেরিয়ে আমাদেরকে প্রতিদিন জীবন্ত করে যায়। এ ব্যবস্থ্যাটি না থাকলে পৃথিবীর জীবমন্ডল সূর্যের অত্যন্ত লয়কারক (lethal) রশ্মির উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ত। আবার যেটুকু রশ্মি আমরা আজ পেয়ে থাকি, সেটুকু থেকে কমতি হলে জীবন মৃত্যু-শীতলতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকত আস্তে আস্তে ; নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র পানি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যেত ; পৃথিবীর চেহারা হত এমন একটি যার সাথে আমাদের পরিচয় নেই ; যার কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

বিজ্ঞান আমাদেরকে আরো জানতে সাহায্য করেছে যে, বায়ুমন্ডল , বিশেষতঃ ওজোন স্তর পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষতিকর রশ্মি , সৌর-বায়ু কিংবা উল্কা পতন রোধ অথবা জীবনী শক্তি ইনফ্রারেড-রে, দৃশ্য আলো , বেতার তরংগ ও নিকটবর্তী অতিবেগুনী আলোর অনুমোদন ইত্যাদি কাজ ছাড়াও জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পালন করছে আরো অনেক প্রতিরক্ষা দায়িত্ব। দিনের বেলা সূর্য তাপ যে উত্তাপের সঞ্চয় করে - পৃথিবীর কোন পৃষ্ঠ যদি রাতের বেলা তা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে বসে , তবে সে পৃষ্ঠটি দ্রুত চলে যাবে বরফ জমে যাওয়ার তাপাঙ্কে। এ ক্ষতিকর পরিস্থিতি যাতে না সৃষ্টি হতে পারে , তার জন্য বায়ুমন্ডলকে পালন করতে হয় এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা। পৃথিবী হতে বিকরিত তাপের ২০% ভাগ বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরের কারণে আটকা পড়ে যায়। আর এ উত্তাপ আমাদের জানার ও বুঝবার অজ্ঞাতে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে।

সোলার উইন্ড বা সৌরবায়ু, উল্কা পতন, সৌর ও মহাজাগতিক ক্ষতিকর রশ্মি, মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ, দূষণের চাপ ইত্যাদি সবই বায়ুমন্ডলকে একা বইতে হয়। এ সব তথ্যগুলো কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফসল। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে এদের অস্তিত্ব, এসব প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান কোন মানুষেরই থাকা সম্ভব নয়। অথচ আপনার বিশ্বাস হবে কি যে, এসব তথ্য আল-কোরআনের পাতায়

www.pathagar.com

রয়েছে অবিকল সেভাবেই যেভাবে বিজ্ঞান বিষয়টিকে দেখতে পেয়েছে ? চলুন আমরা সন্ধান করি।

৫১ নং সুরার প্রথম চারটি আয়াত রহস্যজনক এবং প্রচলিত জ্ঞানে তাদের পুর্ণাংগ ও যথোচিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা বলা মুশকিল। প্রচলিত যে সকল ব্যাখ্যা রয়েছে তা এবং আভিধানিক অর্থে শব্দসমুহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত অনুবাদ ও তফসিরগুলো কোথায় যেন অপূর্ণাংগতার কথা বলে যাচ্ছে। আভিধানিক অর্থের সূক্ষ্ম প্রয়োগ ও প্রচলিত অনুবাদসমূহের অস্থিরতা বিচার বিশ্লেষণ করে আমি যে চিত্র পেয়েছি , তাতে অত্যন্ত সঠিকতার সাথে বায়ুমন্ডলীর পূর্ণাংগ ধারণা পাওয়া যায় যা সর্বশেষ বিজ্ঞানের রায়-চিত্রেরই অনুরূপ। বায়ুমন্ডল সৃষ্টি কৌশলের এক রহস্যজনক উৎকর্ষতা, যার কতগুলো অনুপম চরিত্রের সংগে মানুষের পরিচয় অতিসাম্প্রতিক। আল-কোরআন বায়ুমন্ডলের সে অনুপম ও অত্যাশ্চর্য চরিত্রগুলোকেই এ চারটি আয়াতে অতিশয় অভিনব উপায়ে তুলে ধরেছে , যার প্রতি দৃষ্টি পড়লে বায়ুমন্ডলের স্তরগুলোর বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিত কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রস্তাবগুলোতে বায়ুমন্ডলের এক নিখুঁত চিত্র পাবে। মহাবিজ্ঞ কোরআন মনীষা যে বায়ুমন্ডলীয় বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার অভিপ্রায়ে এ প্রস্তাবগুলো ১৪০০ বছর আগে কোরআনের পাতায় মুদ্রিত করে রেখেছেন, আমরা তা দ্বিধাবিহীন ভাবে নিশ্চিত হতে পারি।

বিভিন্ন অনুবাদকগণ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দিয়ে এ আয়াত চতুর্ষ্টির যে অনুবাদ করেছেন, তার একটা চিত্র শেষের দিকে তুলে ধরা হয়েছে।[৬৩] তবে সকলেই একবাক্যে "বায়ু" (wind) কে প্রতিভাত করছেন। এ ধারণার বশবর্তীতায় জনাব ইউসুফ আলী তার Translation of The Holy Quran এর ৪৯৮৬ থেকে ৪৯৯০ টীকা সমূহে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা পেশ করার প্রয়াস রেখেছেন যা অপ্রতুল। তিনি এক রহস্যঘেরা আধ্যাত্মিকতার দাবীও করছেন। অথচ আয়াতগুলোর অতি সহজ সাধ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী বায়ু বা আবহাওয়ার ধারণা প্রদান করতে গিয়ে জ্ঞানের অগভীরতা এবং তথ্যের গাম্ভীর্যহীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে কোরআনের গাম্ভীর্যের সাথে তা যেন কেমন খাপছাড়া ও অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাখার এ শূন্যতা একটি বড় রকমের তথ্য প্রদান করে যে, সম্ভবতঃ এখানে অধিকতর বাস্তবধর্মী কোন ব্যাখ্যা হবার সুযোগ রয়েছে।

'আযযারিয়াত' শব্দটির মূল হল 'যারিউন' কিংবা 'যারউন' (ذرى) যার অর্থ হল লয় ঘটানো, প্রাপ্ত হওয়া, জয়লাভ করা, কোন সমাবেশ বা দলের চলতে বা পার হতে দেয়া, গোপনভাবে নিশ্চিতির সাথে পার হতে দেয়া , আশ্রয় দেয়া, রক্ষা

www.pathagar.com

করা, জলবায়ু হতে রক্ষার জন্য প্রসারিত ছাদের মত হওয়া ইত্যাদি (carry off)[৬৪] : To cause death, to gain, to win, to cause to pass muster, to make to pass by assurance or dissimulation ; to shelter, to protect, to provide projecting roof to shelter from weather).[৬৫]

৫১ঃ১ আয়াতের অপর শব্দ 'যারওয়া' (ذروا) এর অর্থ হতে পারে কোন কিছুর প্রভাব বিমুক্ত করা, অদৃশ্য করে দেয়া, বিক্ষিপ্ত করে দেয়া, (আলোকাদি) বিকীর্ণ করা, অবাঞ্ছিত কিছু হতে পৃথক করা, শস্যকণাদের বাতাসের প্রবাহে মেলে ধরে পরিষ্কার করা ইত্যাদি। (Throw off, carry off, disappear, winnow, scatter, shed, throw the corn against wind to clean it).

প্রচলিত অনুবাদগুলোর দ্বারা প্রস্তাবিত বাতাস বা বায়ু (wind) অর্থে যদি প্রথম আয়াতের অনুবাদকে গ্রহণ করা হয়, তবে সেই বাতাসের যে সকল গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয় তা শব্দার্থগুলোর ভাবাবেগ অনুযায়ী নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন ঃ

(ক) ৫১ঃ১ আয়াতের 'যারিয়াত' (ذريت) শব্দ এর অর্থ বিচারে এ বায়ু কোন কিছু হতে আশ্রয় দান করার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া চাই। এর প্রতিরোধ্যতা ও প্রতিরক্ষা গুণাগুণ থাকতে হবে। গঠণগত দিক দিয়ে তা একটি প্রসারিত ছাদ সাদৃশ্য হওয়া উচিৎ যা শক্তি, সামর্থ্য ও গুণাগুণের দ্বারা আশ্রিতদেরকে অবাঞ্ছিত প্রভাব হতে রক্ষায় সমর্থ। তা যথার্থভাবে ঘাতসহ হওয়া চাই (well tempered [৬৫])। তার আর একটি অনন্য বিশেষত্ব হওয়া উচিৎ যা দৃশ্য অদৃশ্য কোন বস্তু বা শক্তির প্রকৃত অবস্থা ও গুণাগুণকে অপ্রকাশিত রেখে অদৃশ্যভাবে চলাচল করতে দেয় বা তার কারণ সৃষ্টি করে।

(খ) 'যারওয়ান' (ذروا) শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, আরোপিত কোন প্রভাব হতে বিমুক্ত করার প্রক্রিয়া, কোন কিছুকে অদৃশ্য বা অস্তিত্বহীন করে দেয়া, বিক্ষিপ্ত করে দেয়া, ছাদের মত আচ্ছাদন দিয়ে রাখা, শস্যকণাদের বাতাসের প্রবাহে মেলে ধরে পরিষ্কার করা, বিক্ষিপ্ত করা, অবাঞ্ছিত প্রভাব হতে মুক্ত করা ইত্যাদি।

ক ও খ – এ উল্লিখিত গুণাগুণসমূহের একটি অতিশয় সীমিত মাত্রা সম্ভবতঃ বায়ুর বা বাতাসের সংগে সম্পর্কিত হতে পারে। কিন্তু প্রদত্ত অর্থ সমূহের সমষ্টি চিত্রটি পূর্ণাঙ্গভাবে বায়ুমন্ডলের সকল গুণাগুণের সংগে স্বার্থকভাবে মিলে যায়। এশব্দগুলোর ধারণা চিত্রের দিকে নজর দিলে মনে হয়, বায়ুমন্ডলকেই নির্দেশ করবার জন্য যেন এ আয়াতগুলোর প্রস্তাব। আমাদের পরিচিত সবচাইতে ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের চাইতেও

www.pathagar.com

বহুগুণ প্রলয়ঙ্করী সৌরবায়ুর অতি তান্ডব থাবার মারাত্মক ছোবলগুলো প্রতিদিন প্রতিক্ষণ এ বায়ুমন্ডলই তার প্রসারিত ও অদৃশ্য বায়বীয় প্রতিরক্ষা ধর্মটি দ্বারা আত্মভূত করে চলেছে আমাদের একান্ত অজান্তে। তার নীচে জীবমন্ডল নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকে, জীবমন্ডল তা আঁচ করতেও সক্ষম হয় না। এর চাইতে নিরাপদ ছাদ আর কি হতে পারে ? আল্লাহর বাণী, - "তিনি আকাশকে নির্মাণ করিয়াছেন সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ" (৪০ঃ৪৬) – এ আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করা আমাদের কাছে অতিশয় সহজ হয়ে পড়ে যদি কিনা আমরা "সামায়া" বা 'আকাশ' শব্দ এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। বায়ুমন্ডল তার নিজস্ব গুণাগুণে মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের প্রভাব হতে পৃথিবীকে বিমুক্ত করে, ছাকনির ন্যায় শুদ্ধ করে শুধুমাত্র হিতকর রশ্মি বা বিকিরণসমূহের প্রবেশ অনুমোদন করে, কিন্তু ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মিসমূহকে, প্রতি সেকেন্ডে ৩০ মাইল বেগে ছুটে আসা পতনশীল প্রায় ২০ লাখ বিধ্বংসী উল্কাকে এ বায়ুমণ্ডলই তার স্তর সমূহের বিন্যাস-দৃঢ়তা ও অপ্রতিরোধ্যতা দ্বারা অস্তিত্বহীন ও ভস্মে পরিণত করে দেয় ; আর তাতে প্রমাণিত হয়ে পড়ে আল্লাহর অমোঘ বাণী, – "শপথ সে সমুন্নত ছাদের (৫২ঃ৫), আমি তোমাদের উর্ধ্বে নিমাণ করিয়াছি সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত অনেক স্তর" (৭৮ঃ১২)।

বায়ুমন্ডলীয় গুণাগুণের পাশাপাশি প্রস্তাবিত আয়াতগুলোর শব্দ বিশ্লেষণ হতে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বায়ুমন্ডলের ধারণা পেয়ে যাই। যখন আমরা তাকে বায়ুমন্ডল বলে গ্রহণ করি তখন আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপটে "বায়ু" অর্থের অবতারণায় যে ফাঁকা বা শূন্যতা সৃষ্টি হয়, সেটি আর অবস্থান করে না। ৫১ঃ১ আয়াতের অর্থে বায়ুমন্ডলীয় যে অস্তিত্বটি কল্পনা করা যায় – তা ৫১ঃ২ আয়াতে এসে সুদৃঢ় হয়। এ আয়াতে বোঝা বহন করার যে ধারণা পাওয়া যায়, তাতে তর্কবিহীনভাবে আমরা বয়ুমন্ডলকেই খুঁজে পাই। আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় আমরা একমাত্র বায়ুমন্ডলকেই চূড়ান্তভাবে বোঝা বহনকারী হিসাবে জানি। মহাজাগতিক পরিবেশে বোঝা বহনকারী হিসাবে বায়ুমন্ডলের সমকক্ষ আর একটি উদাহরণও আমাদের অভিজ্ঞতায় নাই। ৫১ঃ৩ আয়াতে–'সহজভাবে প্রবাহিত হয়' কিংবা 'স্বাচ্ছন্দ্য গতিসম্পন্ন' যে অস্তিত্বের ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে , – তাকে আমরা বায়ুমন্ডলীয় আবরণ ভেদ করে বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ সম্পন্ন রশ্মি ও মহাজাগতিক বস্তুকণাদের প্রবেশের সমানুপাতিক দেখতে পাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে অসংখ্য রশ্মি সমূহের মাঝে কতিপয় পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছার সুযোগ পায় না মোটেই , বায়ুমন্ডল এদেরকে অস্তিত্বহীন করে ফেলে। এদের মাঝ হতে কতিপয় রশ্মি যা জীবন রক্ষার জন্য অতি জরুরী –তারাই নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত। এ ঘটনাটি আপাত দৃষ্টিতে যেমনই মনে হউক, – এটি একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা, আর এ বিষয়টি কোরআনের ৫১ঃ৩ শপথ বাক্যের সমানুপাতিক বলে আমরা সিদ্ধান্ত পেয়ে যাই। ৫১ঃ৪

www.pathagar.com

আয়াতটিও বায়ুমন্ডলীর অত্যাশ্চর্য গুণাগুণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ আয়াতটিতে বায়ুমন্ডলের কার্যপ্রণালীজাত সূক্ষ্ম বন্টন ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। বায়ুমন্ডলীয় বিভিন্ন স্তর সমূহের কার্যপ্রণালী মূলত একটি সূক্ষ্ম গাণিতিক বন্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে। আপনারা ইতিমধ্যে অবগত রয়েছেন যে , বায়ুমন্ডলীয় স্তরসমূহ , বিশেষভাবে ওজন স্তর সকল দৃশ্যমান আলো, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরংগ , নিকটবর্তী অতিবেগুনী রশ্মি , অবলোহিত রশ্মি ইত্যাদির একটি বিশেষ উপকারী মাত্র নির্ধারণ করতঃ প্রবেশ অনুমোদন করে , যার অত্যন্ত নাজুক ও অনিশ্চিত ভারসাম্যের উপর জীবমন্ডল প্রতিদিন নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করে যাচ্ছে। এ রশ্মি সমূহের কতকের মাত্রা নির্ধারণে কোথাও কোন ত্রুটি ঢুকে পড়লে জীবন নিঃশেষ হয়ে পড়বে। একটু কম ও একটু বেশী যে কত মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তা আপনি কল্পনায়ও আঁচ করতে ব্যর্থ হবেন। বুঝি এ অতি উচ্চাঙ্গের ও উৎকর্ষতম সফলতার বন্টন-রীতির শপথই আল্লাহ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে মানুষের কৃতজ্ঞতার উপলব্ধিকে জাগ্রত করতে চান। পরবর্তী আয়াত ৫১ঃ৫ - এ এসে আল্লাহ একটি অঙ্গীকারের সত্যতা ও তার পূর্ণাঙ্গতা দানের দৃঢ়তার উপর যে সুস্পষ্ট সনদ প্রদান করেছেন, তার বিশ্লেষণটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ অঙ্গীকারটি মূলতঃ বিচার-দিবস ও তার পরবর্তীতে কর্মফল ভোগের সত্যতার উপর মানুষের প্রতি ঐশী ইঙ্গিত। আপাতঃ দৃষ্টিতে অদৃশ্যবাদীতা একটি সংশয়ের সাথে সংমিশ্রিত এবং রূঢ় বস্তুবাদীগণ তা বিশ্বাস করার বিষয়ে শুধু অনুদারতাই ডেকে আনেন না, তারা বিষয়টির উপর তীব্র কটাক্ষও করে থাকেন প্রায়শই। অথচ অদৃশ্যবাদীতার সুস্পষ্ট ও মহাবিস্তার প্রমাণ এ বায়ুমন্ডলের প্রণয়ন করে মহাকুশলী আল্লাহ তাঁর বিজ্ঞতার চূড়ান্ততায় কোরআনের ৫১ সূরার প্রথম চারটি আয়াতের রেশ টেনে ৫১ঃ ৫ আয়াতে এসে আতি সুস্পষ্টতার সাথে প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, - বায়ুমন্ডলের একটি অদৃশ্য ব্যবস্থা যেমন পৃথিবীতে একটি বাস্তব জীবনের সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছে সত্যতার সাথে তেমনি কোন সত্যতায় মহান আল্লাহ অদৃশ্য-দর্শন কোন ব্যবস্থা হতেই বিধান করবেন আর একটি বাস্তব-পরিবেশ যা প্রতিশ্রুত পুনঃরুত্থান এবং পরকালের অনন্ত জীবনের অঙ্গীকার। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আজ বায়ুমন্ডল ও তার গুণাগুণ সম্বলিত অদৃশ্য ব্যবস্থার কথা জানি। আরো জানি, এ অদৃশ্য ব্যবস্থা না হলে সম্ভব হত না আমাদের উপভোগ্য এ বাস্তব জীবন। অতএব, সত্যদৃষ্টে বলা যায় - এ দৃশ্যমান বাস্তবজীবনটি একটি অদৃশ্য ব্যবস্থারই ফলাফল মাত্র এবং সে অর্থে আমাদের বাস্তব জীবন যতদূর বাস্তবতার দাবী রাখে, অদৃশ্যের ব্যবস্থাগুলো ঠিক ততদূর বরং তার চাইতে অধিকতর 'বাস্তব' স্বীকৃতি পাবার দাবী করে। সে দৃষ্টিকোণ হতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রস্তাবিত ৫১ঃ৫ আয়াতের প্রতিশ্রুতি যে সত্য, তা বায়ুমন্ডলের অবস্থানিক সত্যতার আলোকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই ৫১ সূরার প্রথম চারটি আয়াত যেন কোরআনের মহাভান্ডারে এক রহস্যপূর্ণ বক্তব্যের আবরণে মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে। অন্ততঃ পক্ষে প্রথম চারটি আয়াতের

www.pathagar.com

বায়ুমন্ডলীয় অত্যাশ্চর্য গুণাগুণকে প্রতিভাত করে পঞ্চম আয়াতে প্রতিফল দিবসে কিংবা পরকালের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণতা বিধানের উপর এ অকস্মাৎ আলোকপাত যে এমনি একটি ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট হতে পারে, তা সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-তর্কেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫১ সূরার ১-৪ আয়াতে বায়ুমন্ডলের অদৃশ্য ব্যবস্থার জ্ঞানটি উন্মুক্ত করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ তাঁর যে প্রতিশ্রুতির সত্যতার পূর্ণতা প্রদানে প্রত্যয় ঘোষণা করছেন ৫১:৫ আয়াতে, তার অর্থ দাঁড়ায় যে, আগত "প্রতিশ্রুত-দিনে" আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির অদৃশ্য বিষয়গুলোকে মানুষ তার বাস্তব জীবনের মতই দৃশ্যমান সত্যে প্রত্যক্ষ করবে। কারণ তার এই বাস্তব জীবনও যে এক অদৃশ্য ব্যবস্থারই দান মাত্র। অদৃশ্যই যে সকল দৃশ্যের উৎস তা বিশ্বাস করার অতিশয় শক্তিশালী যুক্তি এসে আমাদের সমানে দাঁড়িয়ে যায় ; আমাদেরকে ভাবতে শিখায়, এক অদৃশ্য কল্যাণকর ব্যবস্থা বায়ুমন্ডলের অদৃশ্য বলয়ে এঁটে দিয়ে মহাকুশলী আল্লাহ্ যেমন পৃথিবীতে একটি বাস্তব জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করে রেখেছেন, - তেমনি অনুরূপ অথবা ভিন্নতর কোন ব্যবস্থায় আল-কোরআনে প্রস্তাবিত প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলো যা আপাতঃ দৃষ্টিতে কাল্পনিক মনে হয়, হয়তবা তাদের অস্তিত্বকে তিনি এমনি ভাবে বাস্তব করে তুলবেন। "তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য" (৫১:৫), আয়াতটি পূর্বের চারটি আয়াতের প্রেক্ষাপট হতে আনীত যুক্তির গাম্ভীর্যে আমাদেরকে সাবধানী হবার জন্য বলে যায়, - "স্মরণ কর, তিনি তোমাদিগকে সম্মিলিত করিবেন পুনরুত্থান দিবসে (৬৪:৯)। মৃত্যুর পর আবার তন্মধ্য হইতে তোমাদিগকে বহির্গত করিবেন (৭১:১৮)। তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি দ্বিতীয়বার ও তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইবে (৭:২৯)। যেখানেই তোমরা অবস্থান কর না কেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে টানিয়া আনিবেনই (২:১৪৮)। তোমাদিগের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান, একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ (৩১:২৮)। নিশ্চয়, তিনি পুনঃ সৃষ্টি করিতে সমর্থ (৮৬:৮)। সেইদিন প্রত্যেকের নিজ নিজ কৃতকর্মের স্বরূপ প্রতিদান পাইবে - কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে অতিশয় তৎপর"(৪০:১৭)।

আমরা এতক্ষণ যে বায়ুমণ্ডলকে কোরআনের ৫১ সূরায় আবিষ্কার করেছি , তার যে বিজ্ঞানভিত্তিক গুণাগুণ রয়েছে যা সকল যুগে উদ্ধৃতি পাবার দাবি রাখে, সে বিষয়টি যে কোরআন মনীষা তাঁর বিজ্ঞতা হতে মানুষকে অবগত করার জন্য ১৪০০ বছর পূর্বে এক অজ্ঞ যুগে এত বিশাল বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা মানুষকে জানিয়েছেন , তার প্রমাণ মিলে অন্য একটি আয়াতের প্রস্তাবনায়, - "আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (২:১৬৪)। "আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুপুঞ্জকে খেলা ছলে সৃষ্টি করি নাই " (২১:১৬)। আপনাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেব কি যে "মধ্যস্থিত" বস্তু বলতে

www.pathagar.com

যা বুঝানো হয়েছে , তার সন্ধান সে যুগের মানুষ কোনদিনই জানত না, এমনকি প্রস্তাবিত বস্তুসমূহ থাকার সম্ভাবনাটিও ছিল মানুষের জ্ঞানের অজ্ঞাতে। আর এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি , – "আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত (৯ঃ১১৫)। দৃষ্টি তাঁহাকে দর্শন করে না, কিন্তু তিনি সমস্ত দৃষ্টিসমূহকে দর্শন করেন। তিনি সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন" (৬ঃ১০৩)।

---

৫৮ । Herbert Friedman - National Geographic Vol - 128 No 5, 1965.

৫৯ । ব্যবহৃত শব্দ সামায়া (السماء) আল্-কোরআনে সুবিশাল ব্যাপকতার দাবী নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে এর অর্থ পৃথিবী সংলগ্ন শূন্য – তথা বায়ুমণ্ডলকে প্রতিভাত করে। আসসামায়া এর অর্থের ব্যাপকতা পরবর্তী গ্রন্থ 'মহাকাশ পর্ব – ২'–এ দেখানো হবে।

৬০ । National Geographic Vol 128. No5Nov 1965.

৬১ । শিদাদান শব্দটি মূল শাদ্দান (شدا) বিশ্লেষণ গৃহীত অর্থের সাথে সাবআ', (سبع) শব্দটি গ্রীক ভাবাভাবীদের মত আরবী রীতিতেও বহু স্তরের ধারণা দেয়। আল্কোরআনে 'সাবআ সামাওয়াতে' এর প্রয়োগের অনুকরণার্থে এ আয়াতেও ব্যাখ্যাকারীরা আকাশকে firmament অর্থে গ্রহণ করেছেন। আকাশ শব্দটি কোরআনে এক ব্যাপক অর্থ নিয়ে প্রস্তাবিত হয়েছে। তফসীরকারীগণ শিদাদান (شدادا) এর অর্থ আকাশ গ্রহণ করে থাকলেও মূলতঃ তা স্থানীয় আকাশ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় অঞ্চল।

৬২ । National Geographic Vol-145 No-5. May1974.

৬৩ । কয়েকটি অনুবাদের তুলনামূলক চিত্র।

(৫১ঃ১)

ক । By (the wind) that scatter broadcast.

খ । শপথ সেইঝড়ো হাওয়ার যে সবকিছু উড়াইয়া নিয়া যায়।

গ । শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার।

ঘ । Consider these scattering broadcast.

ঙ । By these that winnow with winnowing.

চ । বায়ুমণ্ডলের শপথ যা প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়দানকারী।

(৫১ঃ২)

ক । And those that lift and bear away heavy weights.

খ । তারপর ঘনঘোর মেঘমালা বয়ে বেড়ায়।

গ । শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের।

ঘ । Then those bearing the load.

ঙ । And those that bear the burden.

চ । অতঃপর/শপথ যাহা অতিশয় গুরুতর বোঝা বহন করে।

www.pathagar.com

(৫১:৩)

ক । And those that flow with ease and gentleness.
খ । তারপর ধীরে ও মন্দ মধুর গতিতে বয়ে যায়।
গ । শপথ স্বচ্ছন্দ গতি নৌ-যানের।
ঘ । Then those running easily.
ঙ । And those, that glide with ease.
চ । অতঃপর যাহা স্বাচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় কৃতকার্যতার সাথে।

(৫১:৪)

ক । And those that distribute and aportion command.
খ । অতঃপর সব জিনিস ভাগবন্টন করে দেয়।
গ । শপথ কর্মবন্টনকারী ফিরেশতাগণের।
ঘ । The those dividing the affair.
ঙ । And those who distribute by command.
চ । অতঃপর সূক্ষ্ম বন্টন পদ্ধতির যাহা আদেশকৃত/নির্ধারণকৃত।

নোট ঃ

ক । Translation of The Holy Quran - A.Yusuf Ali
খ । কোরআন শরীফ- তাজ কোম্পানী লিঃ নভেম্বর ' ৭০।
গ । আল কুরআনুল করীম – ইসলামিক ফাউন্ডেশন – ১৯৮৬।
ঘ । Translation of Holy Quran - Mohammad Ali.
ঙ । The Meaning of Holy Quran -Mohammad Marmaduke Pickthall.
চ । প্রস্তাবিত বিজ্ঞানসম্মত কাছাকাছি অনুবাদ।
৬৪ । Chembers 20 Century Dictionary অনুযায়ী Carry off এ অর্থ করা হয়েছে।
৬৫ । Arabic-English Dictonary - F.Steingasss

www.pathagar.com

২৪
অক্ষ-তির্যকতা ও জীবন

জীবনের উপযুক্ততা নিশ্চিত করতে কত হাজার বিষয়কে যে সমন্বিত করে আনতে হয়েছে , তারপর সে সব বিধি-বিধানকে ধরে রাখতে হয়েছে , তার কোন খবরই আমরা যথার্থভাবে রাখতে সমর্থ নই। এগুলোর প্রতি নির্দেশ করেই কানাডার রয়েল সোসাইটির টোরী গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত জীব-পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক এ্যালেন বস্তুবাদীদের "এমনি থেকে হঠাৎ করে পৃথিবী ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি" ধারণাটিকে সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী করে এ পৃথিবীকে এমনিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এতে এমনি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, সেগুলো বিচার করলে কোন অবস্থাতেই বলা চলেনা যে নিজ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।" [৬৬] হাঁ পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কখনোই আপন হতে সৃষ্টি হয়নি , একে সৃষ্টি করতে হয়েছে , একজন মহাবিজ্ঞ হাজার সমন্বয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে এ সৃষ্টিকে উপযুক্ত করেছেন আমাদের আজকের জীবন ও সুখ শান্তির জন্য। এ আলোচনাটিও এমনি একটা সমন্বয়কে তুলে ধরবে যার অনুভব পাঠককে তার প্রভুর সমন্বয় কৌশল ও কৃতিত্বের ধারণা প্রদান করবে , বেঁধে রাখবে তাকে অদৃশ্যের কৃতজ্ঞতার পাশে।

আমরা ইতিমধ্যেই অবগত রয়েছি যে সূর্যকে পরিভ্রমণকালে পৃথিবীর অক্ষ, তার বার্ষিক গতির কক্ষের সংগে ২৩ $\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণ করে ঘুরে। এই ২৩ $\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণটি একটি যাদুর খেলার মত। এই ২৩ $\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণই হল পৃথিবী-জীবনে ঋতুসমূহের আশীর্বাদের কারণ। এর উপস্থিতি না থাকলে পৃথিবীর এক অংশে সৃষ্টি হত প্রচণ্ড উত্তাপ, অন্য অংশে চরম ঠাণ্ডা ; বঞ্চিত হত পৃথিবীবাসী সময় উপযোগী বৃষ্টির আশীর্বাদ থেকে। পিটার ফ্রেন্সিস এ ২৩ $\frac{১}{২}^{\circ}$ তির্যকতার কথা বলতে গিয়ে তুলে ধরেছেন, The tilt ....without which, the Earth would be a strange place, not at all we know it.[৬৭]

এ তির্যকতা আমাদের পরিচিতি অভ্যাসের সাথে খাপ খাওয়া ঋতুচক্রের সূচনার জন্য অতীব প্রয়োজন - যার অবর্তমানে পৃথিবী হত এক অতিশয় অজ্ঞাত স্থান, যার সাথে আমরা কখনো পরিচিত নই।

www.pathagar.com

আমাদের আশেপাশে রয়েছে এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এ তির্যকতা ৯০° বা তার বেশী হওয়ার জন্য ইউরেনাসে সৃষ্টি হয়েছে এক অতি উদ্ভট ও সংকটজনক চরম ভাবাপন্নতা। পৃথিবীর সীমিত মেরু অঞ্চলে যে কয়েক মাস অন্ধকারাচ্ছন্নতায় কাটে, ইউরেনাসের বেলায় সেটির পরিমাণ পৃথিবীর সময়মানে ২০ বছর ; অর্থাৎ একনাগাড়ে ২০টি বছর পর্যন্ত একই অঞ্চলে রাত্রি যাপিত হয়। মংগলের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা একই কারণে অস্থির ; মংগল আমাদের দ্বারগোড়ার প্রতিবেশী।

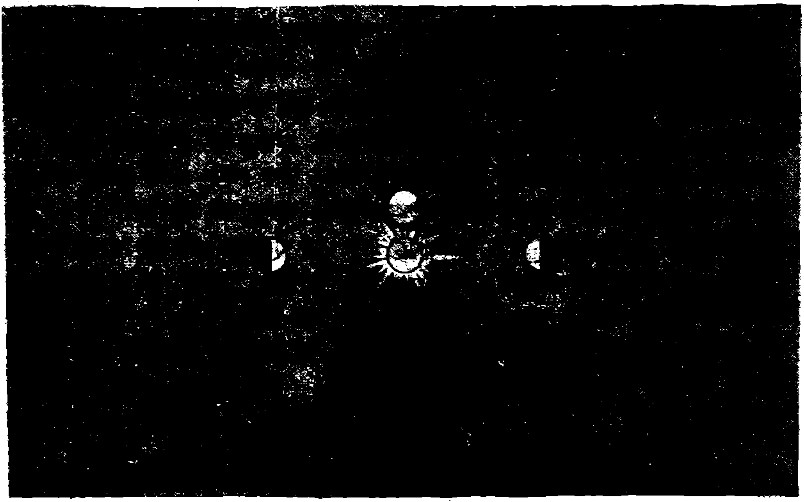

২৩.৫ ডিগ্রীর অক্ষ তীর্যকতা পৃথিবীর জীবন যোগ্যতার সাথে অতি নাজুকভাবে সম্পর্কিত। এই টুকু না হলে পৃথিবী কখনো জীবন ধরে রাখতে পারতো না।

পৃথিবীর অক্ষ ঘূর্ণির অগ্রগমন চক্র (Precessisonal Cycle) মানটি ২৬০০০ বছর সময়ের। প্রতি ২৬০০০ বছর পর এ চক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ অগ্রগমন চক্রের পৃথিবীর তির্যকতার উপর কোন প্রভাবই নেই বলে মনে হয়। বর্তমানে পৃথিবীর তির্যকতার মান ২৩°২৬´ ২৯˝এবং ২০০০ সালে তা হবে ২৩° ২৬´২১˝ । হাজার বছরে এ তির্যকতা মাত্র ১°–২° পরিবর্তিত হতে পারে। এটা মোটেই কোন অভিভূতকর সংবাদ নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ একটি অতি সাধারণ সংবাদের সংগে আপনার আমার অস্তিত্ব ও জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। মহাবিশ্বের মহাগতির সংগে পৃথিবীও তাল মিলিয়ে চলবার মত একটি সামর্থ্যবান গ্রহ। এত তীব্র গতিমাত্রা (২৯.৮ কিঃমিঃ/সেকেণ্ড) নিয়ে চলার পর সেখানে মাত্র ১° – ২°

www.pathagar.com

পরিমাণ তির্যকতার পরিবর্তন আসতে প্রয়োজন হয় হাজার হাজার বছর (Over millennia)। আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে পরিবর্তন তাতে আসতে পারে, তাকেও সংশোধন করার জন্য রয়েছে ব্যবস্থা।[৬৮] প্রতি ২৬০০০ হাজার বছরের একটি আবর্তন চক্রের ফলস্বরূপ বর্তমান থেকে যায় এক এবং অভিন্ন আবহাওয়া। গতির এক অদৃশ্য শক্তি

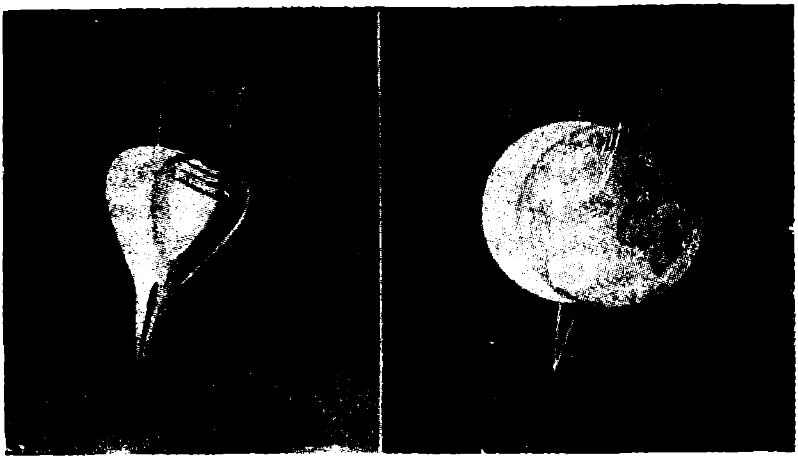

অক্ষ ঘূর্ণির অগ্রসমণ চক্র (Precessional cycle) প্রতি ২৬০০০ বছরের চক্রে পুণঃসংশোধিত হয়ে অভিনব কৌশলে পৃথিবীতে জীবনের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখছে। ছোট লাটু যেমন ঘুরবার সময় ক্ষুদ্র একটি বৃত্তে আবর্তিত হয় — পৃথিববীর জন্য ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। কিন্তু তার মাঝে রয়েছে পৃথিবীর আবাস যোগ্যতার নিগুঢ় রহস্য।

উত্তর মেরুকে একটি ছোট বৃত্তে ঘুরাতে বাধ্য করে যেখানে দক্ষিণ মেরুটি একটি অনেক বড় চক্রে আবর্তিত হয়। ব্যাপারটি একটি লাটিমের টলমল করা ঘূর্ণির মত ; আপন অক্ষের উপর সারা দেহটি ঘুরছে , আবার অক্ষটিও ঘুরছে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের পরিমণ্ডলে। গতি ধর্মের এ ব্যবস্থাটি অতি জটিল আহ্নিক ও বার্ষিক গতির সাথে খাপ খাইয়ে ২৬০০০ বছরের যে বৃত্তটিতে ঘুরছে, যদি তার ব্যবস্থাটি সুনিশ্চিত না করা হত, তবে পৃথিবী যে তলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে - সে তলটি বহু পূর্বে হারিয়ে ফেলত। এর ফলশ্রুতি হত মারাত্মক। জীবনের সকল উপযোগিতাই হারিয়ে ফেলত পৃথিবী। তল থেকে সরে সূর্যের দিকে পৃথিবীর স্খলিত হওয়ার অর্থ হত এর পৃষ্ঠের উত্তাপ মাত্রা বেড়ে যাওয়া আর তল হতে সূর্যের বিপরীত দিকে স্খলিত হলে এর অর্থ

www.pathagar.com

দাঁড়াত এর জীবন উপযোগী তাপমাত্রার মানকে হারিয়ে ফেলা। এমন কোন অবস্থায় জীবন কখনো টিকে থাকতে পারত না। ২৬০০০ বছরের এই ঘূর্ণিটি পুনঃ পুনঃ তার তল-মান ঠিক রেখে যাচ্ছে এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যার কাছে জীবন কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না।

আরো একটি মজার ব্যাপার হল যে , চাঁদের প্রভাবময় ঘূর্ণি (torque) যদি পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হয়, তবে অগ্রগমন চক্র ২৬০০০ বছরের স্থলে হবে ৮১,০০০ বছর। এমনি একটা বিশাল সময়ে পৃথিবী যে পরিমাণে তির্যকতা অর্জন করার সুযোগ পাবে, কিংবা তাতে যে পরিমাণ কম্পাংক (Oscillation) সৃষ্টি হতে পারে, তা আজকের মানের নূন্যতঃ পক্ষে দশগুণ, যা সমগ্র বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া পরিস্থিতির আমূল সর্বনাশ ডেকে আনবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক রকম প্রভাব সৃষ্টি করবে অন্যান্য গ্রহের ধ্বংসাত্মক প্রভাব (perturbational influence) যার মাত্রা ও ক্ষতির পরিমাণ আমরা এ অবস্থাপটে বসে কল্পনাও করতে সমর্থ নই।

অতএব, দেখতে পাচ্ছি , ক্ষুদ্র সে সংবাদটি অর্থাৎ হাজার হাজার বছরে অগ্রগমন ব্যবধান ১°–২° হওয়ার ঘটনাটি তার ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীতে জীবজগতের বেঁচে থাকবার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা সম্ভব হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, "আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নহি" (২৩ঃ১৭) প্রমাণিত হয়, "ইহা আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন সুসম ও পরিমিত" (২৭ঃ৮৮)। অতএব, "নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্যই তাঁহার প্রাপ্য" (১৬ঃ৫২)।

---

৬৬ । The Evidence of God in Expanding Universe.
৬৭ । The Solar Family - Peter Francis.
৬৮ । Sky & Telescope Jan 1983.

www.pathagar.com

২৫
আদি বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি
ও
জীবনের ক্ষেত্র চয়ন

পৃথিবী যেদিন জন্ম নিয়েছিল, সেদিন সে আজকের বায়ুমণ্ডলকে সাথে করে এনেছিল কি? এর জবাব দিয়েছেন পীটার ওয়েন, It seems unlikely that the Earth captured an atmosphere when it was formed. জন্মলগ্নে কোন বায়ুমণ্ডল বিশেষত মানুষ বা যে কোন প্রাণীর বসবাস উপযোগী আবহাওয়া সহযোগে পৃথিবীর মহাবিশ্বে পদার্পণের যুক্তি কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। এ বায়ুমণ্ডলকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে হয়েছিল। সকল প্রকার জীবনের জন্য অক্সিজেন এক জরুরী শর্ত এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে এ অক্সিজেন আদি বায়ুমণ্ডলের কোন অংশই ছিল না। বায়ুমণ্ডলের একটা বিশেষ অংশ হওয়া সত্ত্বেও এ বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন পৃথিবীর বাইরের স্তরে সৃষ্টি হয়নি – এর সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোথা হতে এল এত বিপুল অক্সিজেন এতটা সঠিক মাত্রায়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকুল যার উপর সরাসরি নির্ভরশীল? অধুনা বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে অক্সিজেন মূলত ভূ-অভ্যন্তরের যৌগ স্তরসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। পৃথিবী আদিকালে গলিত পদার্থ ছিল এবং সে সময় উত্তপ্ত তরল পদার্থ থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসে বায়ুমণ্ডলের এ সুবৃহৎ অংশ। পরবর্তীতে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বিভিন্ন অক্সিজেন যৌগ, বিশেষতঃ কার্বন-ডাই অক্সাইডকে মুক্ত করে বাতাসে প্রদান করে। আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবনের আগমন ঘটে। অণুজীবী প্রটোজোয়া ও সমগোত্রীয় অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদ সবই বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্বে অস্তিত্বে আগমন করে[৬৯]। এ ধারণার মূল ভিত্তি হল যে, মুক্ত অক্সিজেন অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল বিধায় ঐ সকল কৈশিক প্রাণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সমস্ত এককোষী আনুবীক্ষণিক জীবগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবার কথা ছিল। অতএব, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সরল প্রাণ প্রকাশের পর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় এবং সম্ভবত আজ থেকে ১৮০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোন মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। সম্ভবত আদি উদ্ভিদ গোত্র বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড, পানি ইত্যাদি ভেঙ্গে অক্সিজেন সৃষ্টি করে ও বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করতে থাকে। কতিপয় উদ্ভিদ নিজেরা চুনাপাথর, কয়লা, জৈব জ্বালানি ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত হবার পথে বায়ুমণ্ডলকে দান করে যায় মুক্ত অক্সিজেন। এভাবে বায়ুমণ্ডলীয় মুক্ত অক্সিজেন সৃষ্ট হয়.এক

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ সময়ের প্রসারে। এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার সার্বিক ফলশ্রুতিই হল আমাদের আজকের বসবাস উপযোগী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। পিটার ওয়েন-এর কথায় বলতে গেলে The Earth was not a readymade home for creatures like us. It was to be modified by earlier forms of life before it was suitable[৭০].

আমাদের পৃথিবী কখনো একটি সদা তৈরী হয়ে থাকা আবাসস্থল ছিল না। একে পরিবর্তিত করতে হয়েছে , তৈরী করতে হয়েছে ; আমাদের বহুপূর্বে প্রাচীন জীবন এর জন্য পালন করছে এক বিরাট ভূমিকা। এরা সৃষ্টি করেছে এমনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি, সেখানে মানুষের মত জীব আজকের পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করে যাচ্ছে যদিও আমাদের পৃথিবীর মহাজাগতিক পরিবেশ প্রাণ সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য একান্তই বৈরী। কোথাকার কোন অণুকোষী জীব ও কৈশিক উদ্ভিদ আমাদের আজকের জীবনের ক্ষেত্র রচনা করে যায় – ভাবতেও অবাক লাগে। এমনি সব তথ্যগুলো আমাদেরকে ভাবতে শিখায় যে, সৃষ্টির যাবতীয় কিছু দৃশ্য অদৃশ্যভাবে কোন না কোন কারণে আমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাত কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে। এমনি সব বিষয় মনে করিয়ে দেয়ার জন্যই বুঝি আল-কোরআনে ধ্বনিত হয়, – "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমূহকে? (২২:৬৫) ; তিনিই মহান আল্লাহ , যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন আবাসযোগ্য স্থল (৪০:৬৪); যাহারা দাঁড়াইয়া, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করিয়া থাকে (তাহারা বলে), হে আমাদের প্রতিপালক তুমি অর্থহীনভাবে কোন কিছু সৃষ্টি কর নাই , তুমিই পবিত্র "(৩:১৯১)" । এ আয়াতের রেশ ধরে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়, আমাদের আজকের এ দুনিয়া আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে জন্ম নেয়া কৈশিক ও আণুবীক্ষণিক প্রাণ ও উদ্ভিদের কাছে অস্তিত্বের ঋণে আবদ্ধ।

এতদপ্রসঙ্গে স্যার বার্ণাড লোভেলের একটি অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা টেনে আনতে হয়। তত্ত্ব অনুযায়ী যে সুপারণোভা বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে এ পৃথিবীর যাবতীয় ভারী মৌলের সৃষ্টি হয় যার অবর্তমানে জীবন অসম্ভব ছিল, সে ভারী মৌল সৃষ্টিকারী প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ উত্তর পরিবেশ, যা জীবন গ্রহণ করার জন্য সামান্য পরিমাণেও উপযোগী নয় , সেই সময়কার বায়ুমণ্ডলটি গেল কোথায়? সম্ভবত কোন অজ্ঞাত প্রলয়ঙ্করী শক্তি একে ঝেড়ে, ছেকে, শুষে নিয়ে যায় – যার ফলশ্রুতিতে বায়ুমণ্ডলীয় আদি দোষণ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। "আমরা জানি না, অনুরূপ ঘটনা অন্যান্য গ্রহ-ব্যবস্থায় বর্তমান রয়েছে , নাকি শুধু আমাদের পৃথিবীর জন্য এটি এক অনন্য ঘটনা।"[৭১]

আমরা দিতে পারি কি এর জবাব?

www.pathagar.com

হয়ত পারি শুধু আল-কোরআনের ভাষায় ,-"তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে , সমস্তই তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে। তাহাদের না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ "(৩১ঃ২০)।

---

৬৯ । অণুজীবিরা সরাসরি পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে এবং বাঁচার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের দরকার হয় না।

৭০ । Planet Earth - Peter Owen.

৭১ । Dawn of New Era - Sir Barnard Lovell.

www.pathagar.com

২ঃ৬

এন্টিমিউটাজেনিক আমব্রেলা
বা
পরিবর্তন নিরোধী ছাতা

জগতের হাজার বিস্ময়ের অনন্য আর একটি হল বংশ পরম্পরায় মানুষের শিশু অবিকৃত মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে – যেমন হচ্ছে আর অন্য প্রাণীদের বেলায়ও। ক্রোমোজোম, জীন, ডি এন এ, আর এন এ, বিভিন্ন প্রাণরস বা এনজাইম ইত্যাদির চরিত্র এবং তৎসাপেক্ষে তাদের বিকৃত হবার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যখন অবিকৃত থেকে যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানীগণও সবিস্ময়ে মেনে নিতে বাধ্য হলেন যে, A hen is only an eggs' way of making another egg[৭২] , যদিও কিনা মাত্র সেদিনও মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে মানুষ বিবর্তণের ফসল, পূর্ব পুরুষ বানর থেকে লেজ খসিয়ে সরাসরি মানুষে পরিণত হওয়ার পেছনে বিবিধ সাদৃশ্যকে এ ভাবনার ভিত্তি ধরা হয়েছিল। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হল – "একটির সাথে আরেকটির সাদৃশ্য এবং (এরই মধ্যে) সাদৃশ্যহীনতা" (৬ঃ১০০)। বিবর্তনবাদের প্রস্তাব আজ বিজ্ঞানের চৌকস প্রমাণ ও উপাত্তে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে আল্লাহর বাণীর সত্যতাকে প্রমাণ করেছে যে, "আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই (৩০ঃ৩০) ইতিপূর্ব হইতে আল্লাহর এইরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে। তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন দেখিবে না" (৪৮ঃ২৩)।

৭০ দশকের মাঝামাঝি আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Dr. Beatrice Mintz, Dr. Donald Brown প্রমুখ হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, প্রত্যেকটি প্রজাতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে নিজেদের মধ্যে এমন সব উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি অবলম্বন করতে সক্ষম যে, তাদের প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে না। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, বংশ পরম্পরায় মানুষের রং , প্রকৃতি, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য ক্রোমোজোমস্থ জীনের ভূমিকাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনৈক H.J.Muller এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে , মানুষের ক্রোমোজোমে জীনের বিতরণ পদ্ধতি এবং তাদের বিন্যাসে পরিবর্তন সম্ভাব্যতা ২৫৬ এর পর ২·৪ বিলিয়ন সংখ্যক শূন্য যোগে যে বিপুল জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য সংখ্যা সৃষ্টি হতে পারে ততটি উপায়ে সম্ভব।[৭৩] জিন বিদ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মুলার দাবী করেন যে, উল্লিখিত পরিবর্তন

www.pathagar.com

সম্ভাবনা নির্দেশক সংখ্যাটির বিশালতা এত অচিন্তনীয় যে, দৈনিক ২৪ ঘন্টা বিশ্রামহীনও এক নাগাড়ে পরিশ্রমরত কোন মানুষকে তার জীবনের ৪৫টি বছর কাটিয়ে দিতে হবে শুধুমাত্র সংখ্যাটিকে লিখে শেষ করবার জন্য। বিজ্ঞানের নিশ্চিত প্রাপ্তির আলোকে এত বিপুল ও মহাপ্রশস্ত সম্ভাবনার পরেও অপরিবর্তিত মানব শিশু এবং বংশক্রমের অপরিবর্তিত ধারা কি আমাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, - " আমি তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতাম এবং এরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারি, যাহা তোমরা মোটেই অবগত নহ" (৫৬ঃ৬১)। আমাদের আলোচনার পরিধি এতদ প্রসঙ্গে সীমিত বলে আমরা মহাবিশ্বের পরিবেশে পৃথিবীর জীবন ও তার সাথে বংশ পরম্পরায় এক প্রজাতি হতে একই প্রজাতির সৃষ্টি কিংবা জীবমণ্ডলের নিরাপদ জীবনযাপন করে যাবার পেছনে বিস্ময়কর অদৃশ্য অনেকগুলোর একটি প্রভাব চিত্র তুলে ধরতে চাই।

মহাবিশ্বের পরিবেশের ঝুঁকি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের বড় বেশী ধারণা না থাকলেও পৃথিবীর আজকের পরিবেশ ও তার সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর সচেতনতা এখন আর অজানা কথা নয়। B. Kuznetsov, V. Sevastyanov, A. Anshits এবং A Isayev এর একটি যৌথ সমীক্ষায় তাদের একটি মন্তব্য পরিবেশ সম্পর্কে যে সতর্ক হুশিয়ারি প্রদান করে তা হল, We do know now what's be done to achieve ecological stability. The generations to come will never forgive us if we fail to translate this knowledge into reality.[৭৪] পরিবেশের উপর মানুষের সাধ্যমত যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ মানুষ করে যাবে। কিন্তু যার উপরে মানুষের হাত নেই? এমন অনেক অজানা অজ্ঞাত কারণ রয়েছে যা জীবমণ্ডলের চেনামুখকে একেবারে অচেনা করে দিতে পারে, তাদের বেলায় করবে কি মানুষ?

U. Alekperov এর প্রদত্ত তথ্যটি এখানে তুলে ধরছি, The Earth's biosphere has experienced tremendous pressure of foreign factors which are potentially hazardous for genetic apparatus.[৭৫] বংশধারাকে সমুন্নত ও অপরিবর্তিত রাখার পথে শরীরের বিবিধ প্রজনন যন্ত্রাদির জন্য অতিশয় ঝুঁকিপূর্ণ যে সকল কারণ রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি সবচাইতে বেশী দায়ী করেছেন শিল্প, কৃষি, ওষুধ ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক বা খনিজ হতে উদ্ভূত ধোঁয়াসমেত বিভিন্ন অপদ্রব্যাদিকে। এরা জীবমণ্ডলের বংশ বিস্তারকে প্রভাবিত করে জীবমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার পথে হতে পারে মারাত্মক ঝুঁকি। বয়ে আনবার কথা হাজার ক্যান্সারঘটিত রোগ।

www.pathagar.com

আমরা জানি সৌর পরিমণ্ডলে একমাত্র সূর্যই পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। অতিকায় এই নিউক্লিয়ার-ফার্ণেস তার কেন্দ্র ভাগের প্রায় ১৬,০০০,০০০ সেঃ তাপমাত্রা দিয়ে যে পরিমাণ পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার দক্ষতা রাখে তার আনুপাতিক হার ১৫০ : ১[৭৬] অর্থাৎ ১৫১ টন পদার্থের মধ্য হতে মাত্র ১ টনকে শক্তিতে পরিবর্তিত করতে পারে ; বাকী ১৫০ ভাগ পদার্থই পদার্থ হিসেবে থেকে যায়, তবে রূপ বদল করে মাত্র। বর্তমান পৃথিবীর খনিজ তেলের চাহিদা বছরে ৬০০ কোটি টনের উপরে। কাঠের জ্বালানী প্রায় তার দ্বিগুণ এবং কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানীর পরিমাণ তাদের কাছাকাছি অনুপাতের।[৭৭] এখন পৃথিবীর পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার যোগ্যতা যদি আমরা সূর্যের সমমানেরও ধরে নেই , তবে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে প্রতিবছর ৫৯৬ কোটি টনের বেশী গ্যাসজাতীয় পদার্থ শুধুমাত্র খনিজ তেল থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ অব্যাহত রেখেছে। প্রতিবছর এ হারে যদি বায়ুমণ্ডলে দূষিত পদার্থ প্রবেশ করতে থাকে, তবে পৃথিবীর অবস্থা অচিরেই শোচনীয় হবার কথা। উল্লেখ্য যে, এসব পদার্থ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে জমা হতে থাকে ; পৃথিবীর অভিকর্ষ তাদের মুক্তভাবে বেরিয়ে পড়বার কোনরূপ অনুমতি প্রদান করে না। অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিস্থিতি হল যে, পৃথিবীর দূষণাদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই অবস্থান করে। মানুষ সৃষ্টির পর যেদিন থেকে জ্বালানি ও আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, সে ক্ষণ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত কোটি কোটি টন গ্যাসীয় দূষণ শুধুমাত্র খনিজ তেল হতেই আসা সম্ভব। এ সম্ভাবনা, তার পেছনে টেনে আনে আরেকটি প্রশ্ন, – মানুষ কি করে বেঁচে আছে কিংবা বিস্ময়করভাবে প্রকৃতিকে হার মানিয়ে জীবমণ্ডলের বেঁচে থাকা সম্ভব হল কি করে? জীবকূলের প্রজাতিসমূহের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কি করে টিকে আছে? চারিদিকে ক্যান্সার-জাতীয় রোগ মহামারি আকারে বিস্তার করছে না কেন? বৃহৎ আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলে শতকরা এক ভাগের কম পরিবর্তনকারী প্রভাব (mutagenic elements) রয়েছে যা সমস্ত মানব ও অন্যান্য জীবকূলের প্রজাতি রক্ষার ধারায় হুমকিস্বরূপ। বিজ্ঞানীগণ দাবী করেন – মাত্র এ পরিমাণটিই মানুষ প্রজাতির ধারা প্রবাহকে পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও হাজার হাজার বছর ধরে আমরা কি করে ঝুঁকিহীনভাবে জেনেটিক্সের কোন পরিবর্তন ছাড়াই বেঁচে রয়েছি?

U. Alekperov জবাবটিও তুলে ধরেছেন তার লেখায় – Underlying these mutagenic controls is antimutagenesis, or the ability of some substance, called antimutagenes, to bring down the rate of genetic mutation.They provide an antimutagenic umbrella to shield all living organisms against carcinogens and other harmful factors.

www.pathagar.com

আমাদের চারিপাশে রয়েছে এক বিস্তীর্ণ পরিবর্তনবিরোধী 'বস্তু-কনিকা-বিস্তার' যারা বংশধারা রক্ষায় এবং ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকবার প্রক্রিয়ায় একটা রক্ষাবর্ম বা আবরণ হয়ে ছাতার ন্যায় বিস্তৃত থেকে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করে যাচ্ছে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। ১৯৫০ সালে সর্ব প্রথম এ অতীব জীবন রক্ষাকারীদের সম্পর্কে মানুষ ভাল করে জানতে পায়। বিশ্বজোড়া পরিবর্তন নিরোধক (Universal antimutagenes) দের উদাহরণ হল টোকোফেরল (tocopherol) এস্‌কারবিক (ascorbic) এসিড বা ভিটামিন সি, সোডিয়াম সেলিনাইট ইত্যাদি প্রায় ২০০ টি জ্ঞাত এজেন্ট ছাড়াও অসংখ্য অজ্ঞাত সূক্ষ্ম ও কৈশিক বস্তুকণা জীবদেহের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভাব্যতাকে আশ্চর্যজনকভাবে কমিয়ে নিয়ে আসে, আর জীবদের অপরিবর্তিত বংশধারা রক্ষার কাজে শুধু সাহায্যই করে না, ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রকোপকে অভাবিত মাত্রায় হ্রাস করে এনে জীব-জগতের জন্য অদৃশ্য আশীর্বাদের হস্ত প্রসারিত করে রাখে।

তথ্য প্রমাণ হিসেবে এ সব জ্ঞানকে তুলে ধরা আর সে আলোকে মানুষকে সাবধান করার জন্যই কি কোরআনের মাঝে হুশিয়ারি বাণী,- "আমি তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতাম এবং এই রূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারি যাহা তোমরা অবগত নহ (৫৬ঃ৬১)। আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ, মহান (৩১ঃ৩০), যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উপযোগী করিয়াছেন (৮৭ঃ২), তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন (৩১ঃ২০); অতএব, তোমার প্রতি পালকের কোন দান ও করুনাকে অস্বীকার করিবে?" (৫৫ঃ১৬)।

মানুষ ও অন্যান্য জীবদেহের জীন-বিন্যাস ও অযুত লক্ষ কোটি উপায়ে তাদের পুনঃ বিন্যস্ত হতে পারার সৃষ্টিগতভাবে মহাবিপুল সম্ভাবনা এবং তার উপরে পৃথিবীর পরিবেশ ও মহাজাগতিক পরিবেশের মহাপ্রশস্ত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত মানুষ কিংবা যেকোন জীব শুধু কোরআনের এ সত্যকেই তুলে ধরে প্রভূতভাবে, - "আল্লাহর প্রকৃতি! যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই (৩০ঃ৩০), আল্লাহর বিধানে তুমি কখনো কোন পরিবর্তন দেখিবে না" (৪৮ঃ২৩)।

---

৭২ । National Geographic Vol - 150 Sep. 1976.
৭৩ । National Geographic Vol - 150 Sep. 1976.
৭৪ । Science in USSR Vo 1. 1989.
৭৫ । Science in USSR Vol 5. 1988.
৭৬ । Stars and Planets - Ian Ridpath.
৭৭ । দেশ (কলকাতা), ৫৫ বর্ষ ৬সংখ্যা ১২ ডিসেম্বর '৮৭।

www.pathagar.com

২ঃ৭
পরিবেশের ভারসাম্য

উদ্ভিদের বংশ বিস্তার পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করলে আমরা অসংখ্য তথ্য পাই। উদ্ভিজ্জ বংশ বিস্তার পদ্ধতিতে (Vegetative propagation) মূল উদ্ভিদের দেহের কোন অংশ নতুন উদ্ভিদের সূচনা করে। অযৌন বংশ বিস্তার পদ্ধতি (Asexual reproduction) কেবল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যা মূল উদ্ভিদের দেহের বিশেষ কোষকলাকে নতুনভাবে একটি নতুন বৃক্ষ জন্মাতে সাহায্য করে। এই উভয় প্রকরণ নীচ শ্রেণীর সীমিতসংখ্যক উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উচ্চশ্রেণীর আড়াই লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ বংশবিস্তারে যৌন প্রক্রিয়া (Sexual reproduction) অবলম্বন করে। বলা যেতে পারে, আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত দুনিয়ায় যে উদ্ভিদের বিস্তার তা মূলতঃ যৌন বংশ বিস্তারের ফলশ্রুতি।

এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির যে অদ্ভুত নিয়মকানুন পরিলক্ষিত হয়, তা একদিকে যেমন সুদৃঢ়, তেমনই জটিল এবং চিত্তাকর্ষক। অথচ পুরো ব্যবস্থাটিকে একটা অনিশ্চয়তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত সুনিশ্চয়তার প্রক্রিয়ায় সামান্যতম বাঁধাবিপত্তি বা পরিবর্তন ঘটলে প্রকৃতি মারাত্মক অস্তিত্বের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে। এমনি কোন পরিস্থিতিতে কোন প্রজাতি কোন কোন সময়ের পরিব্যাপ্তিতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বৈচিত্র্যের কিছু নয়।

উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের মৌলিক সাহায্যগুলো আসে বাতাস, কীটপতঙ্গ, পাখি ও পানি থেকে। ফুলের পরিণত পুংকেশর লক্ষ লক্ষ পরাগ রেণুকে উপযুক্ত করে রাখে। এই পরাগ রেণু কেবল সঠিকভাবে গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই নিষিক্তকরণ সম্পন্ন হতে পারে ও নিশ্চিত হতে পারে ভবিষ্যতের বংশ বিস্তার ব্যবস্থা। এর জন্য চাই এক সাথে অনেক কিছুর সমন্বয়। সে সমন্বয়ের বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানি না বলেই বিষয়টি আমাদের ততটা মনোযোগ আকর্ষন করে না। অত্র অধ্যায়ের 'অবাধ বিস্তার' প্রবন্ধটির রেশ ধরে এখানেও বলছি যে, পুংকেশরের লক্ষ লক্ষ পরিণত পরাগ রেণু অবাধভাবে সৃষ্ট হয়ে অবাধভাবে কোন মাধ্যমে বিশেষতঃ বাতাসে প্রবেশ করে। এই লক্ষ লক্ষ পরাগ রেণুর মধ্য হতে হয়ত মাত্র একটি কিংবা দু'টি ফুলের গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হয়ে নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, বাকীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অথচ এই লক্ষ লক্ষ পরাগ রেণু সৃষ্টি না হলে যে একটি নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে , তার সৌভাগ্যের দুয়ার খুলত না।

www.pathagar.com

যাহোক, আমরা আবার সমন্বয়ের বিষয়টিতে ফিরে আসছি। যে সময়ে পরাগ রেণু পরিপক্ক হয়ে উঠবে ঠিক সেই সময় গর্ভকেশর তার দেহ থেকে আঠালো পদার্থ বের করে তার অঙ্গটিকে আঠালো করে রাখবে – এ হল শর্ত। সে সময় আবার বাতাসকে বইতে হবে উড়ন্ত পরাগকে আশে-পাশের ফুলে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সে বাতাস সৃষ্টি করার জন্য আবার সূর্যকে তার তেজময় দীপ্তি দিয়ে পৃথিবীর কোন স্থানে বায়ুর শূন্যতা সৃষ্টি করতে হবে। সে শূন্যতা সৃষ্টি করবে বায়ুর প্রবাহ। অর্থাৎ শত শত মাইল দূরে কোন সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপটি তার প্রান্তিক প্রভাব মণ্ডলে যে ধীরগতির বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে , সে প্রবাহটি আমাদের জ্ঞানের অজ্ঞাতে পৃথিবী পৃষ্ঠের যাবতীয় ফুলের বহনযোগ্য পরাগ রেণু তুলে নিয়ে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে ছুঁইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এ ছোঁয়াটুকু না পেলে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ হয়ত বঞ্চিত থেকে যেত গর্ভাধান থেকে। গর্ভাধান না হলে জন্মাত না লক্ষ লক্ষ নতুন উদ্ভিদের সুবিশাল বিস্তৃতি। প্রকৃতির খাদ্য ভাণ্ডার এ উদ্ভিদের ফলন হতে বঞ্চিত হলে জীব জগতের খাদ্য মজুতে পড়ত এক বিরাট ঘাটতি, পরিবেশগত দূষণ দূর করার প্রক্রিয়ায় পড়ত এক বিরাট ভাটা। এদের দু'টিই জীবজগতের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সৃষ্টি করত এক মহাঅন্তরায়। অতএব, বলা যায়, ক্ষতিকর এ নিম্নচাপটি আমাদের অজান্তেই কত সুচারুভাবে জীবজগৎ তথা পৃথিবীর জীবন-পরিমণ্ডলকে সাহায্য করে যাচ্ছে এক সুবিশাল উদার হাতে। নিম্নচাপের এমনি উপযোগিতার উদাহরণ, আল্লাহর বাণী শৈলীর সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্চারণ করতে বাধ্য হই – "হে আমাদের প্রতিপালক তুমি কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমিই মহান, পবিত্র" (৩:১৯১)।

উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছিল। বিভিন্ন ফুলে রয়েছে বিভিন্ন স্বাদ, মাত্রা, গন্ধ ও বর্ণ। কোন কোন ফুলের বর্ণের চেয়ে গন্ধ প্রকট, কোনটি রং এর চেয়ে স্বাদে প্রকট। কীটপতঙ্গরা বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন বিশেষত্বে বিভিন্ন ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফুলে ফুলে তারা ঘুরে বেড়ায় ক্ষুধা নিবারণ, আশ্রয় সন্ধান ও ডিম ফোটানোর প্রয়োজনে। ফুলে আগত কীট পতঙ্গ তাদের মনের অজান্তে মাখিয়ে নেয় পরাগ রেণু। তারপর স্বভাবজাত প্রয়োজনে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় সেই অবুঝ প্রাণীগুলো তারা জানতেও পারে না, – তাদের এ অজ্ঞাত প্রেষণায় ফুল হতে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর স্বভাবটি কত অমূল্য ফসলে পরিণত হল। তা নিশ্চিত করে গেল অনাগত ভবিষ্যতের এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা!।

অত্র অধ্যায়ের 'এন্টিমিউটাজেনিক আমব্রেলা বা পরিবর্তন নিরোধক ছাতা' শীর্ষক অনুধ্যায়ের রেশ টেনে এখানেও বলতে ইচ্ছা করে যে, আলোচিত বিবর্তনবাদ এখানে এসে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে । কীটপতঙ্গসমূহের ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় কোন এক জাতিয় ফুলের পরাগ অন্য কোন অতি কাছাকাছি প্রজাতির ফুলের গর্ভকেশরে স্বার্থকভাবে প্রতিস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এবং দু'য়ের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বংশ রূপান্তরে তিলটুকু পর্যন্ত ঘটে না। "প্রাকৃতিক ও মানবীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া দ্বারা, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকতা, পরিবর্তন অথবা জৈবিক শত্রুদের দ্বারা উপর্যুপরি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সকল যুগের উদ্ভিদের প্রজাতির কোন পরিবর্তন হয় না, তা একই এবং অপরিবর্তনীয় থাকে।" এ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার যেন মূলতঃ আল্লাহর কথাটিই তুলে ধরে, - "আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই। (৩০ঃ৩০) ইতিপূর্ব হইতে আল্লাহর এইরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে, আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না" (৪৮ঃ২৩)। বিবর্তনবাদের অসারতার প্রতি কটাক্ষ করে ফরাসী উদ্ভিদবিদ দ্য জাসিয়া তার প্রজাতি সম্পর্কিত তথ্যচিত্রে দাবী করেন যে, "ইহা (প্রজাতি) প্রজনন দ্বারা চিরস্থায়ী একই রকম উদ্ভিদের বহু বর্ষজীবি পর পর অনুগমন মাত্র"।[৭৮] বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর কোরআনের বক্তব্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না।

তাহলে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে যে একটি ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ পৌঁছানোর জন্য সমন্বয়ের ব্যাপারটি এত সুবিশাল এবং এত ব্যাপক যে, ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। ফুলের স্বাদ, বর্ণ, সূর্যের তেজ, সমুদ্র, বাতাস, কীটপতঙ্গ, ফুল ইত্যাদি অসংখ্য জ্ঞাত অজ্ঞাত বিষয় যখন এক সাথে সমন্বিত হয়, তখনই কেবল একটি ফুলের গর্ভকেশর গর্ভাধানের গৌরব লাভ করে ও জীবজগতের বেঁচে থাকার সনদ দিয়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে বিষয়টি চিত্তাকর্ষক, অনুভূতি জাগানোর মত বিস্ময়কর ও নিদর্শনমূলক। এ সব রহস্যের দাবী নিয়েই বুঝি কোরআন তার বানীমালায় ঝংকার তুলে, - "বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রহিয়াছে অসংখ্য নিদর্শন (৫১ঃ২০) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যই আমি ঐসব নিদর্শন ব্যক্ত করিয়া থাকি" (৬ঃ১২৬)।

এখন আমরা প্রকৃতির ভারসাম্যের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করব। এত সমন্বয়ের ফসল এ উদ্ভিদ কোন্ বিশেষত্ব বহন করে? আজকের বিশ্বের প্রায় সকলই ইকোলজি শব্দটির সাথে পরিচিত। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীকুল আজ শঙ্কিত। বৃক্ষ নিধনের সাথে সাথে মরু প্রকোপ মাত্রা (Desert effect) বৃদ্ধি আজ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবিকা, চাষাবাদ, নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ অজুহাতে গাছপালা নিধন করা হচ্ছে নির্মম হাতে। প্রকৃতিতে যদি বনবাদাড়, দুর্গম পাহাড়, পর্বত, ঘন জঙ্গল ইত্যাদি না থাকত তবে সমস্ত পৃথিবীতে অক্সিজেনের যে বিপুল ঘাটতি সৃষ্টি হত এবং বিপরীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর যে আধিক্য দেখা দিত তাতে জীবমণ্ডলের উপরে সৃষ্টি হবার কথা ছিল এক প্রচণ্ড চাপ,

www.pathagar.com

অবশিষ্ট থাকত শুধু মৃত্যু। আমরা আজকের পৃথিবীর জানা চেহারাকে খুঁজে পেতাম না। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, এ সকল বনবাদাড় আবার দুর্গম পাহাড়, নদী, অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক দ্বারা মানুষের সহজ গমনসীমার বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। তার পরেও সেগুলো মানুষ সংহারক হিংস্র জীব-জন্তুতে অধ্যুষিত করা হয়েছে। বাঘ, হাঙ্গর, কুমির, সর্প ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকুল দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এক প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এ প্রতিরোধকে আরো নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের দুর্গমতা দ্বারা। মানুষ ইচ্ছা করলেই বিধ্বংসী অস্ত্র ও উপায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে এমন কোন সম্ভাবনাকে করা হয়েছে অত্যন্ত ক্ষীন। এদের ভয়সংকুলতা ও প্রাকৃতিক দুর্গমতার অনুপস্থিতির অর্থ হত মানুষ কর্তৃক এদের অতি সহজ আহরণ, যার অপর নাম হত জীবমণ্ডলের জন্য ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিজনিত মৃত্যু। বিষয়টির যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, দূর-দূরান্তের গহীন অরণ্যে প্রকৃতির বন্যতায় লালিত প্রাণ সংহারক জীবজন্তুসমূহ, প্রাকৃতিক দুর্লংঘতা ইত্যাদি সকলেই মূলত জীবমণ্ডলের সেবাকার্যে নিরত। তথ্য প্রমাণ ও প্রাপ্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, সমস্ত জীবমণ্ডল ও উদ্ভিদমণ্ডল মূলত মানুষের কল্যাণ কার্যই করে যাচ্ছে প্রতিদিন। চূড়ান্ত বিচারে দেখা যায় – পৃথিবীর দৃশ্য অদৃশ্য সকলই মানুষকে সেবা করে যাচ্ছে, ঠিক যেভাবে কোরআনে বলা আছে, তেমনি ; – "তিনিই, হইতেছেন যিনি, পৃথিবীকে করিয়াছেন তাহাদের (মানুষ) প্রতি অনুগত – তাঁহারই কাছে পুনরুত্থান (৬৭ঃ১৫) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তদসমূহকে?" (২২ঃ৬৫)।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার কাজে উদ্ভিদের উপযোগিতার বিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাতের পাশপাশি বিধিদত্ত সামগ্রিক ভারসাম্যের বিষয়টিও আলোচনা করা যেতে পারে। "এই বিশ্বের যেখানে যা সাজে তা দিয়েই যেন সাজানো"[৭৯] আছে। আর তার ফলেই জীবজগতের জন্য যে পরিবেশ উপযোগী, তার চেয়ে অনেক ভিন্নতর, অনেক বৈরী মহাজাগতিক পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী ; আর তাতে সৃষ্টি হয়েছে জীব-কুলের জন্য এক বিস্ময়কর ভারসাম্য। "স্রষ্টা প্রকৃতিতে যে ভারসাম্য রক্ষা করছেন, তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং মানুষ অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই ভারসাম্য ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে"[৮০]। জন উইলিয়াম ক্লটস এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন তার এক বিখ্যাত প্রবন্ধে। মানুষ যে ভারসাম্যের পরিবর্তন আনতে গিয়ে সমপরিমাণ বিশৃঙ্খলাই আনয়ন করে তাই নয়, সে সঙ্গে নিজেদেরও বিপর্যয় ডেকে আনে। এমনি একটা বিপর্যয় এনেছিল ইউরোপ ত্যাগী অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বসতি স্থাপনকারিগণ। ডিঙ্গো নামক এক প্রকার বন্য শুয়োর ছাড়া অন্য কোন প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব সেখানে ছিল না। প্রকৃতির এ দীনতা দেখে তারা এর অভাব মোচনের কাজে লেগে যান। ১৮৫৯ সালে থমাস অষ্টিন নামক এক সদয় ব্যক্তি ইউরোপ থেকে

www.pathagar.com

২৪টি খরগোস এনে পাহাড়ী এলাকার অবাধ অঞ্চলে ছেড়ে দেন। এ সব নতুন খরগোসের জন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক কিংবা বংশ নিরোধী প্রাকৃতিক শত্রু ছিল না। ফলতঃ অত্যন্ত অল্পদিনে এদের সংখ্যায় আশাতীত বৃদ্ধি ঘটল। এর ফলাফল হল মারাত্মক। যে ঘাস খেয়ে অস্ট্রেলিয়ার মেষপাল জীবন ধারণ করত, খরগোস তা শুধু নষ্ট করেই ছাড়েনি, অত্যন্ত লাভজনক মেষভিত্তিক অর্থনীতিকে মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি করে দিল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হল খরগোস প্রতিরোধের চিন্তা-ভাবনা। এতদকল্পে প্রথমে ৭০০০ মাইল দীর্ঘ খরগোস নিরোধী বেড়া তৈরী করা হল শুধু কুইন্স লেণ্ডে। এ প্রচেষ্টা কোন সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হল না। চরম হতাশা মুহূর্তে সরকারীভাবে পুরস্কৃত করার ভিত্তিতে চলল খরগোশ নিধন অভিযান। তাও বড় রকমের কোন সাফল্য আনতে সক্ষম হল না। পাহাড়গুলোর সবুজ অংশ খরগোশ কর্তৃক অনাবৃত হয়ে ধূসর মাটি বেরিয়ে পড়ল। মেষ শিল্প চরমভাবে বিঘ্নিত হয়ে জনগণকে বিপুল আয় থেকে বঞ্চিত করল। অতঃপর শতাব্দীর মধ্যভাগে 'মিক্সোমেটায়িস' নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা কৃত্তিম উপায়ে খরগোস প্রজাতিতে সংক্রামক রোগের মড়ক সৃষ্টির মাধ্যমে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী অর্থবছরে (৫২-৫৩) মেষ শিল্পের আয় ৮৪০,০০০,০০০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এদিকে খরগোসের সহসা মড়ক সৃষ্টি করল অন্য আর একটি নাজুক পরিস্থিতি। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ খরগোসের মাংসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী খাদ্যের ব্যাপারে নির্ভরশীলতা গড়ে তুলল। হঠাৎ করে সরবরাহের বিপর্যয় অবিশ্বাস্যরকম হতাশা ও আর্থিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি করে দিল জনজীবনে। বেকার হয়ে পড়ল এক বিপুল কর্মজীবি শ্রেণী। এভাবে মানুষ কর্তৃক ভারসাম্য ভঙ্গের বিষয়টি পৃথিবীময় হয়ে পড়ল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে এসে খুলে যায় কোরআন। জ্ঞানগর্ভ ঐশী বাক্যের সর্তক বাণী শুনতে পাই আমরা - "আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটির জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি পরিমাপ (১৩ঃ৮), তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ঃ২)। দয়াময়ের সৃষ্টিতে কখনো সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখিবে না (৬৭ ঃ ৩)। আমারই নিকটে রহিয়াছে প্রত্যেক বস্তুর পর্যাপ্ত ভাণ্ডার এবং আমি তাহা এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে সরবরাহ করিয়া থাকি" (১৫ঃ২১)। আমরা সে পরিমাপের শাসনকে ভঙ্গ করে ভুল করি, বিপর্যয় ডেকে আনি।

---

৭৮ । The Evidence of God in Expanding Universe.

৭৯ । সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র - শারদীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ৪১ বর্ষ নবম-দশম সংখ্যা - ১৯৮৮।

৮০ । The Evidence of God in Expanding Universe.

www.pathagar.com

২৪

সামঞ্জস্য ও সমন্বয়

পায়ের নীচে তুচ্ছ দুর্বাদলের কাছে আমাদের জীবন কত বিপুল ঋণের দায়ে বাঁধা – তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

জীবমণ্ডল প্রকৃতির কাছে তার অস্তিত্বের ঋণে আবদ্ধ। এ প্রকৃতি তার অসংখ্য জীব শিশুর জন্য সাধন করেছে এক বিপুল সমন্বিত ব্যবস্থা ও সামঞ্জস্য। একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা, বিনিময় ও বিরোধ এমনি যে সবকিছু মিলে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এক অতি নাজুক পরিস্থিতি, যার সামান্য বিচ্যুতি কোন কোন প্রজাতিকে অতি দ্রুত নির্বংশ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এমনি সামান্য বিচ্যুতি হতে পারে সমস্ত জীবমণ্ডলের জন্য মহামৃত্যুর কারণ। প্রকৃতি যে অকল্পনীয় জটিলতার মাঝখানে আমাদেরকে একটি অতি স্বাভাবিক জীবন উপহার দেয়, তার কাছে মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সমস্ত এসে এমনি ভাবে ম্লান হয়ে পড়ে, যার উদাহরণ 'মহাসমুদ্রের কাছে গোষ্পদ'- এর চেয়েও তুচ্ছ।

সমন্বিত ভারসাম্য ব্যবস্থায় দেখা যায়, এক একটি প্রক্রিয়া অন্যটির সঙ্গে অন্বয় ও বৈষম্য রক্ষার ব্যাপারে এত চুলচেরা হিসাব ও সুক্ষ্মতর ব্যবধানকে মেনে চলে যা কোনক্রমেই দৈব ঘটনা হতে পারে না। আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই এমন এক মহাশক্তিশালী মনীষার কল্পনা করতে বাধ্য হই , আমাদের লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির তুলনায় যাঁর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমরা এবারের অনুধ্যায়ে এমন ক'টি সমন্বয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যার প্রতিটি আমাদের জ্ঞানের অতি কাছাকাছি , কিন্তু সুক্ষ্মভাবে যার পেছনে স্রষ্টাকে ভাবা হয়না। আমরা দেখব আমাদের এ আলোচনায় স্রষ্টা আসেন কি না।

নাইট্রোজেন চক্রের কথা আমরা সকলেই অবগত আছি। জীবজগতের বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত হল উদ্ভিদের বেঁচে থাকা – এতে আজকের দিনে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পানির পরই উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন। জীব ও উদ্ভিদের জন্য আমিষ উৎপাদন ও তা দ্বারা উভয়ের দেহ কোষ কলাকে (Tissue) বর্ধন ও সচল রাখাই হল নাইট্রোজেনের কাজ। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ নিজে গ্রহণ করে ও পরবর্তীতে প্রাণীদেহে সরবরাহ করে জীবনকে সচল ও নিশ্চিত রাখে। উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন নাইট্রোজেন যৌগ থেকে। এ নাইট্রোজেন যৌগগুলোর অধিকাংশই মাটিতে অবস্থান করে। উদ্ভিদ নিজ প্রয়োজনে

www.pathagar.com

মাটি থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে নেয়। আড়াই লাখের বেশী প্রজাতির কোটি কোটি উদ্ভিদ মাটি থেকে ক্রমাগত শুষে নেয়ার জন্য যে বিপুল পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে, তার জন্য যদি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ করতঃ একটি সর্বকালীন নির্দিষ্ট মজুদ নিশ্চিত না হতে পারত – তবে জীবন

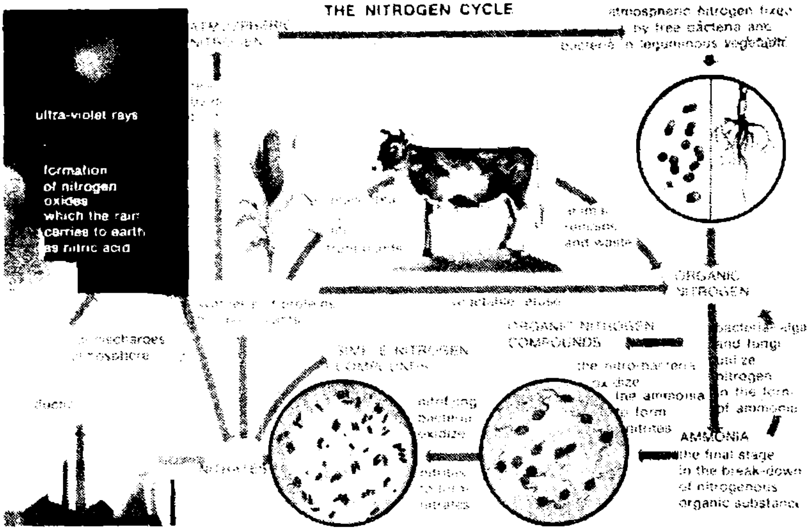

জীব ও উদ্ভিদকুলকে বাঁচিয়ে রাখতে নাইট্রোজেন চক্র অপরিহার্য। কিন্তু তাকে একটি সুষম ও সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থিত করার যোগ্যতা প্রকৃতির নিজের কিংবা মানুষের নেই — তার জন্য চাই এক মহা বিশাল সমন্বয় কারী স্রষ্টার।

নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত বহু পূর্বে। এ অতি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন জীব ও উদ্ভিদ দেহের রেচন প্রক্রিয়ায় নিষ্কৃত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, জীব ও উদ্ভিদ দেহের মৃত দেহাবশেষ ইত্যাদি থেকে নাইট্রোজেন ও তার বিভিন্ন যৌগ হিসাবে আবার মাটি ও বায়ুতে ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডলে কমবেশী ৭৮% ভাগ নাইট্রোজেন এ ভাবে সদাবর্তমান। বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন বিদ্যুৎক্ষারণের ফলে নাইট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে। এ যৌগগুলো বৃষ্টি ভর করে নেমে আসে মাটিতে। মাটিতে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা বাতাস হতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ ও বিভিন্ন যৌগে পরিবর্তন করতে সমর্থ। মাটি এমনি সব পদার্থ সংরক্ষণ করে যে, মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন যৌগ এবং বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন যা

www.pathagar.com

ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে থাকে – সে সবকে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবর্তনের দ্বারা উদ্ভিদের কৈশিক মূল কর্তৃক গ্রহণোপযোগী করে তুলে। সামগ্রিকভাবে এ প্রক্রিয়াটি যা, মাটি ও বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রেটকে উদ্ভিদ দেহে প্রেরণ করে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে যায় ও পরবর্তীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে পুনরায় মাটি ও বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে একটি স্থির নাইট্রোজেন মজুদ নিশ্চিত করে, সেই প্রক্রিয়াটিকে নাইট্রোজেন চক্র বলে। প্রকৃতিতে জীবিত প্রজাতিসমূহ একটি বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ও জীবন নির্বাহের কার্য চালু রাখে। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জগৎ পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে যে অতি নাজুক, কঠিন ও জটিল সম্পর্ক রক্ষা করে সে সম্পর্ককে বলে মীথো – জীবিত্ব প্রক্রিয়া (Symbiosis)।

উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, মাটির বিভিন্ন যৌগ, বায়ুমণ্ডল, বিদ্যুৎক্ষারণ, বৃষ্টিপাত, সৃষ্টি ও ধ্বংস ইত্যাদি অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রক্রিয়া এক সাথে মিলে কি করে একটি অত্যন্ত আনুপাতিক ও পরিমিত মিথোস্ক্রিয়া সম্পাদন করে যার ফলস্বরূপ মাটি ও বায়ুমণ্ডলে একটি সর্বকালীন সুনির্দিষ্ট মজুদ রক্ষিত হয় – তা এক অতি আশ্চর্যের বিষয়। এ প্রক্রিয়ায় কোন একটি শর্তের অভাব বা আধিক্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে সমস্ত জীব-জীবন ব্যবস্থাটি। হারিয়ে যেতে পারে জীবন। বায়ুমণ্ডলকে জানতে শুরু করার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এর প্রত্যেকটি অনুপাত কেন অভাবনীয় ভাবে এক ও অভিন্ন এবং জীবমণ্ডলের জন্য উপযোগী, তা জ্ঞানী মাত্রকে স্তম্ভিত করে। বায়ুমণ্ডলের উপর যুগে যুগে মানুষের হাজার অত্যাচার সত্ত্বেও এ স্থিরতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সৃষ্টির প্রতি "আল্লাহর অনুগ্রহ রদ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই"(১০:১০৭)। এই বায়ুমণ্ডলই তার চাক্ষুষ মহাপ্রমাণ।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার আর একটি সহজ অথচ অত্যন্ত ভাবনা উদ্দীপক উদাহরণ হল উদ্ভিদ জগতের সালোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) যার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় জীবন ঋণী। উদ্ভিদ মূল দিয়ে বিপুল পরিমাণ খনিজ সমেত খাদ্যরস শোষণ করে পাতায় ও অন্যান্য সবুজ অংশে পৌছায়। সবুজ অংশের ক্লোরোফিল সূর্যের রশ্মির উদ্দীপনায় কার্বনডাই-অক্সাইডকে গৃহীত খাদ্যরসের সঙ্গে মিশিয়ে শর্করা (Sugar) ও শ্বেতসার (Starch) জাতীয় খাদ্য তৈরী করে যা হল সকল জীবনের জন্য খাদ্যের মূল উৎস। কি ভাবে আলোক শক্তি ক্লোরোফিল কর্তৃক বিশোধিত হয়ে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখে, কি ভাবে কার্বনডাই-অক্সাইড ও শোষিত জলীয় উপাদান পাতার ক্ষুদ্র কোষে সম্মিলিত হয়ে খাদ্য তৈরী করে, বিজ্ঞান তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না।[৮১] প্রণিধানযোগ্য যে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন নিজেদের মধ্যে এক অতি সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে ও অক্সিজেন

www.pathagar.com

গ্রহণ করে। ক্ষতিকর কার্বনডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের তথা জীবজগতের খাদ্য-মজুদ সৃষ্টি করার কাজে সালোক-সংশ্লেষণে ব্যবহার হয়, - সে প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় সমপরিমাণ অক্সিজেন যা জীব ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য আর একটি মৌলিক উপাদান। এমনি এক পরস্পর অতি নির্ভরশীল আবর্তন চক্র জীব ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার মৌলিক ভিত্তি প্রতিনিয়ত রচনা করে যাচ্ছে এমনি এক সূক্ষ্ম সাবধানী অনুপাতে, যার অতি সামান্য তারতম্য ও মাত্রা বিকৃতি কালের আবর্তে সমস্ত জীবমণ্ডলের জন্য নিঃশেষ মৃত্যুঝুঁকি হয়ে পড়ার কথা।

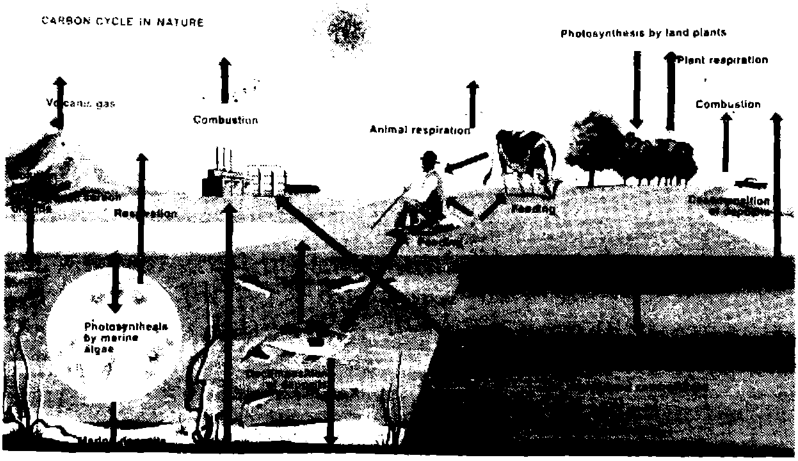

জীবনকে সৃষ্টি ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য কার্বন একটি অনন্য উপাদান। সালোকসংশ্লেষণ এবং জীবনের অপরাপর ব্যবস্থাপনার প্রতিটি প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হচ্ছে কার্বণ চক্র ; আর তা পৃথিবীতে বজায় রাখছে কার্বনের সঠিক মজুদ যেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন প্রবাহ সুনিশ্চিত হতে পারে।

পরস্পর নির্ভরশীলতার এত বড় নিবিড় সম্পর্ক আর প্রকৃতির জন্য ভারসাম্য সৃষ্টির জটিল ও বিস্ময়কর বিষয়টি মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। কোথায় সে নয় কোটি তিরিশ লাখ মাইল দূরের সূর্য, তার শক্তি, সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল, উদ্ভিদের মূল ও দেহকোষ কলার অদ্ভুত অভিশ্রাবণ গুণ যা খাদ্যরসকে পাতায় পৌছায়, জলচক্রের জটিল ব্যবস্থা, উদ্ভিদ মূলের নাগালে পানির নিশ্চিত মজুদটি রক্ষা হওয়ার ব্যবস্থা, অত্যন্ত নাজুক, দুর্বল ও সূক্ষ্ম মূল রূমের আশ্চর্য নির্বাচন ক্ষমতা ইত্যাদি বহুবিধ বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার এক অপূর্ব অন্বয় ঘটিয়ে যে জীবনের ভিত্তি রচনা করা রয়েছে -

www.pathagar.com

সেই ব্যবস্থাটি আমাদেরকে এক অকল্পনীয় মহাশক্তিধর বিধানকর্তার অস্তিত্বেরই ধারণা দান করে যায়।

উল্লিখিত শর্তসমূহের সাথে দিন-রাতের পরিবর্তনের বিষয়টি মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আরও এক বিস্ময়কর সমন্বয় ব্যবস্থা। পৃথিবীর অক্ষঘূর্ণি দিন-রাতের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি এ পরিবর্তন মাত্রায় অন্য রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হত তাহলে হারিয়ে যেত আমাদের চেনা পৃথিবী। যদি ঘূর্ণিটা না থাকত (তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত বিপত্তিকে বিবেচনা না করে) তবে সূর্যের ক্রমাগত আলোক ও তাপে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলীয় সমুদয় কার্বনডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে সবকিছুকে অক্সিজেনে ভাসিয়ে দিত। আমাদের এ জ্ঞাতমাত্রার অধিক অক্সিজেনের উপস্থিতি হত প্রাণী জগতের জন্য নিশ্চিত মৃত্যু । অন্যদিকে নতুন খাবার তৈরীর জন্য পৃথিবীতে কার্বনডাই-অক্সাইডের পড়ত এক মারাত্মক ঘাটতি। উদ্ভিদ দেহে ক্রমাগত জমতে থাকত বিপুল খাদ্যের ভাণ্ডার। এর ফলশ্রুতিতে কি হতে পারত তা আমরা জানি না। তেমনিভাবে অপর পৃষ্ঠের দীর্ঘ রাত্রি বয়ে আনত অক্সিজেনের ঘাটতি আর কার্বনডাই-অক্সাইডের আধিক্য, সাথে খাদ্যের চরম অভাব ও তুষারমৃত্যু।

দীর্ঘ রাত কিংবা দীর্ঘ দিন কোনটাই প্রকৃতিতে জীবন রক্ষাকারী পরিবেশকে বজায় রাখতে সক্ষম হত না। যেমনি রয়েছে , কেবল তেমনটি হওয়া দরকার, এর কম ও বেশী নয়। সমন্বয়ের এ চূড়ান্ত মাত্রাজ্ঞান মানুষের জন্য এক অতি প্রসারিত দীক্ষা, জ্ঞান ও নির্দেশের নিদর্শন হয়ে থেকে যায়। অভিজ্ঞতার এমনি মাত্রাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আল-কোরআন ব্যক্ত করে - "অনন্তর মানুষ তার স্বীয় খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক (৮০ঃ২৪)। অবশ্যই আল্লাহ্ বীজের অঙ্কুরোদগম করিয়া থাকেন। তিনি প্রাণহীন হইতে জীবনের বিকাশ ঘটান (৬ঃ৯৬)। আমি আকাশ হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করি যাহা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবেশিত হইয়া উদগত হয় - যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে (১০ঃ২৪)। আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ (১৩ঃ৮)। দয়াময়ের সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না" (৬৭ঃ৩)।

খাদ্যের বিষয়ে জীবজগৎ যে শুধুমাত্র উদ্ভিদের উপর এককভাবে নির্ভরশীল তার চিত্রটি ১০ঃ২৪ আয়াতের শেষাংশে দেখতে পাই। অনুধাবন করুন, আজ থেকে চৌদ্দ শ'বছর পূর্বে কোরআন এ তথ্যটি প্রকাশ করেছিল যার হাজার বছরেরও বেশী সময় পর বিজ্ঞান তথ্যটিকে লব্ধজ্ঞানের মাত্রায় ব্যাখ্যা করেছে। ৮০ঃ৩২ আয়াতেও অনুরূপ সত্যটি আমরা দেখতে পাই। জীবমণ্ডলের সকল উপযোগিতায় একচ্ছত্রভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উদ্ভিদের জন্মকে মহান আল্লাহ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বলেছেন -

www.pathagar.com

"তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের কল্যাণের জন্য"। ১০ঃ২৪ ও ৮০ঃ৩২ আয়াতগুলো আমাদেরকে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন কোন পূর্ণজ্ঞানী বিজ্ঞান স্রষ্টার সন্ধান দেয় কি?

আমরা দেখছি সালোক-সংশ্লেষণের অতিশয় নাজুক পরিস্থিতির উপর আমরা সমস্ত জীবজগৎ নির্ভর করে রয়েছি। আমরা পারি কি সালোক-সংশ্লেষণের যিনি বিধানকর্তা, তাঁর উপর নির্ভর করতে? তিনি দিয়েছেন এক অতিশয় সুস্পষ্ট জবাব, - "যাহারা নির্ভর করিতে চাহে, তাহারা আল্লাহে নির্ভর করুক"(১২ঃ৬৭)।

এবার আমরা জলচক্র সম্পর্কে আলোকপাত করব। ডঃ মরিস বুকাইলির 'দি বাইবেল দি কোরআন এণ্ড সায়েন্স' বইটি জলচক্র সম্পর্কে সুবিস্তীর্ণ আলোচনা করেছে। ইউনিভার্সেল এনসাইক্লোপেডিয়ার উদ্ধৃতি সহকারে তিনি দাবী করেছেন যে, পৃথিবীর জল ব্যবস্থায় যে একটি চক্রাকৃতির পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি কাজ করে যাচ্ছে অতি সুষম ও পরিমিত আইনের আওতায়, এই বিষয়টি ১৭ শতাব্দীর পূর্বে মানুষ সঠিকভাবে জানত না। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে অর্থাৎ যে শতাব্দীতে আল-কোরআনের প্রকাশ, মানুষের অজ্ঞতাই ছিল সে যুগের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত ধারণায় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে উর্ধ্বজল, আকাশ গোলকের ছিদ্রপথে গড়িয়ে এসে নিম্নে পতিত হয়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করত। ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ছিল না।

সূর্যের উত্তাপ ও তজ্জনিত কারণে সমুদ্রের পানির বাষ্পীভবন, পরবর্তীতে ঘণীভবন, তারপর বৃষ্টি, ফলশ্রুতিতে শুষ্ক অঞ্চলে বর্ষণ, প্লাবন, নদীর প্রবাহ এবং সে পানির সাগরে পতন ; আর এটুকু আবর্তন সম্পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে ভূ-ভাগে জীব ও উদ্ভিদের জন্য দৃশ্য ,অদৃশ্য জলের মজুদ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির ঘটনা চক্রটিই হল জলচক্র। এ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত চক্রাকারে একই নিয়মে সৃষ্টির পর হতে ঘুরে ফিরে পৃথিবীর সকল জীবন ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া তার নিজস্ব গতিতে চলার সময় আবার বিপুল পানিকে মেরুদ্বয়, পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা, উচু শৃঙ্গ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি অনেক জ্ঞাত-অজ্ঞাত স্থানে বরফ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এর কিছু অংশ কোন কোন ঋতুতে গলিত হয়ে বৃষ্টিহীন সময়েও পানির সরবরাহের ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখছে। কতিপয় অংশ গলিত হবার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে ভবিষ্যতে যেন বরফ তৈরী হতে পারে সে ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করছে। গলিত বরফ দিবসকালে প্রাপ্ত বিপুল সূর্য তাপকে শুষে নিয়ে পৃথিবীর তাপ ব্যবস্থাকে করছে নিরাপদ। জলচক্রের আর একটি বিপুল দান হল পাহাড়, বন, জঙ্গল, দুর্গম অঞ্চল ইত্যাদিতে ছোটবড় সকল প্রকার উদ্ভিদ জন্ম দেয়া ও এদের ধ্বংস হতে রক্ষা করা।

www.pathagar.com

এ সব দুর্গম অরণ্যে জন্ম নেয়া উদ্ভিদকূল আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের জীবনের এক মহাকল্যাণী অভিভাবক। দৃশ্যতঃ খাদ্য, বাসস্থান এবং পৃথিবীর যাবতীয় সেবা এ জলচক্রের বিপুল ব্যবস্থার কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঋণী। আজকের দিনের প্রতিটি সরল ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ জলচক্রের অসীম উপকারীতার কথা এক বাক্যে স্বীকার না করে পারেন না।

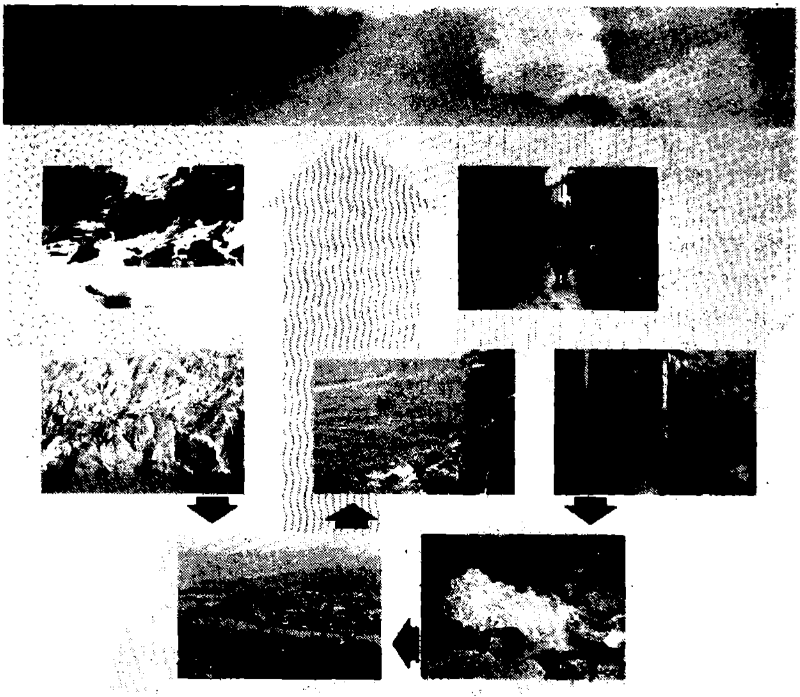

পৃথিবীতে জীবন লালন পালন করতে জলচক্রের প্রয়োজন অসীম। শুধুমাত্র এই জলচক্রকে নিশ্চিত করার জন্য স্রষ্টাকে সমন্বিত করতে হয়েছে সূর্যের ভর, দূরত্ব, পদার্থ, উত্তাপ, পৃথিবী আকৃতি, ভর, উন্মুক্ত সমুদ্রতল পৃথিবীর অক্ষ ও কক্ষ ঘূর্ণি, মাধ্যাকর্ষণ, পানির দুর্লভ হাইড্রজেন চেইন ও এর উদ্বায়ী গুণাগুণ এবং আরো অসংখ্য কিছু।

www.pathagar.com

অথচ জীবনপালনকারী জলচক্রটি কত কিছুর সমন্বয়ের এক মহাফলশ্রুতি, – তা কখনো ভেবেছেন কি? সমন্বয়ের দিকটি এমনি যে আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় তাক লাগিয়ে যায়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে পানির এক আশ্চর্যরকম গুণাগুণ, যা পৃথিবীর আর কোন পদার্থে নেই। তার সাথে রয়েছে পৃথিবীর ভর, ঘনত্ব, আকার, জলের পরিমাণ, উন্মোচিত জলভাগ, বায়ুমণ্ডলীয় গুণাগুণ, পৃথিবীর তীর্যকতা, অক্ষঘূর্ণি, কক্ষঘূর্ণি মধ্যাকর্ষণ, সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব 'সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী' দূরত্ব, পৃথিবীর গঠন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা, মাটির সমুদয় গুণাগুণ ইত্যাদি আরও অসংখ্য জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়, যার একটির মাত্রাধিক্য বা মাত্রাস্বল্পতা অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কি করে সম্ভব হল এত বিপুল সমন্বয়? এর উত্তর আমরা জানি না। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, উন্মোচিত পানির তল এর কম বা বেশী হলে কি হত, দিন ও রাতের সময় মান যা আছে তার কম বা বেশী হলে কি হতে পারত, পৃথিবীর ভর, ঘনত্ব, ব্যাস, চন্দ্র-দূরত্ব ইত্যাদি যা যেখানে যতটুকু রয়েছে, তার কম কিংবা বেশী হলে জীবন রক্ষা পেত না। এমনভাবে আমরা যার উপর অভ্যস্ত, এত সব সমন্বয়ের এত অনুপম মিলন ঘটিয়ে যিনি এই জলচক্র সৃষ্টি করেছেন, বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনি বলতে পারেন কি "নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্যই তাঁহার প্রাপ্য" ? (১৬ঃ৫২)।

যে কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারেন, জলচক্রের কৃতিত্বের সাথে জোর করে কোরআনের বর্ণনাকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে কেন? এর জবাব আমি আপনার কাছ থেকেই গ্রহণ করতে চাই। লক্ষ্য করুন, আল-কোরআনের বহু আয়াতের কিছু তুলে ধরলাম, – "তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন – যাহা উত্থিত করে মেঘমালা, তিনি উহাদের ছড়াইয়া দেন আকাশে যেমন ইচ্ছা, এবং উহাদের ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করেন, পরে তুমি দেখিতে পাও যে, উহাদের মধ্য হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে থাকে। তিনি তাহার সৃষ্টদের কাছে উহাদের পাঠাইয়া দেন যেমন ইচ্ছা – অতঃপর তাহারা উল্লাসিত হয় (৩০ঃ৪৮)। তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন এবং উহাদেরকে বিভিন্ন সূত্রে ভূ-গর্ভের ভিতরে প্রবেশ করান। তারপর তিনি শস্যক্ষেত্রগুলিতে উৎপন্ন করেন নানা ফসল নানান রঙ্গের (৩৯ঃ২১)। তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত ঘটান, ফলে নদীসমূহ উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হয়, বেগবান প্রবাহ ভাসাইয়া নিয়া যায় বর্ধমান ফেনিল আবর্জনা, এইরূপে ফেনিল আবর্জনা উপরিভাগে আসে যেমন অলংকার অথবা তৈজসপত্রাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় – যাহা মানুষের উপকারে আসে, তাহা ভূমিতে থাকিয়া যায়। এইভাবেই আল্লাহ্ উপমা দিয়া থাকেন (১৩ঃ১৭)। উহাদের মধ্যে আমরা সংস্থাপন করিয়াছি খেজুর বৃক্ষের বাগান এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহ এবং

www.pathagar.com

উৎসরিত করি প্রবাহমান প্রস্রবণ (৩৬ঃ৩৪)। তিনিই তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন বিদ্যুৎতের ঝলক, সঞ্চার করেন যুগপৎ ভয় ও আশার এবং তিনিই মেঘ সৃষ্টি করেন (১৩ঃ১২)। আমি আকাশ হইতে জল বর্ষণ করি পরিমিতভাবে – অতঃপর উহা আমি মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি ; আমি উহাকে অপসারণ করিতেও সক্ষম (২৩ঃ১৮)। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি (২৫ঃ৪৮)। যদ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে সঞ্জীবিত করি এবং সৃষ্টির মধ্যে জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই" (২৫ঃ৪৯)।

উপরের আয়াতসমূহ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত কোরআনে জলচক্রের পরিস্কার বর্ণনা প্রদান করে থাকে। এখানে উদ্ধৃত আয়াতের আলোকে জলচক্রের যে নিখুত চিত্রটি পাই , তাতে আমরা অনুধাবন করি যে, কোরআনের তথ্য মেঘ সৃষ্টি (১৩ঃ১২), মেঘমালায় উত্থান, বহন খণ্ডায়ন, ছড়িয়ে দেয়া এবং তাকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে পরিণত করা (৩০ঃ৪৮), তাকে বর্ষণ করা (২৩ঃ১৮), সেই বর্ষণকে পরিমিত মাপে সীমাবদ্ধ রাখা (১৩ঃ১৭,২৩ঃ১৮), বৃষ্টি জলে নদীর প্রবাহ সৃষ্টি (১৩ঃ১৭), প্রবাহ কর্তৃক অপদ্রব্য ভূমি থেকে অপসারণ করা কিন্তু প্রয়োজনীয় জৈবশক্তি ভূমিতে রেখে যাওয়া (১৩ঃ১৭), সঞ্চিত পানিকে ফেনিল – বেগে প্রবাহিত করা (১৩ঃ১৭), বিভিন্ন উপায়ে বৃষ্টির পানি ভূমিতে সংরক্ষণ করা ও তাহাতে শস্য উৎপাদন ও উদ্ভিদের জন্য মজুদ রাখা (৩৯ঃ২১), সংরক্ষিত জলকে মৃত্তিকা থেকে পুনঃ অপসারণ করা (২৩ঃ১৮), এবং সংরক্ষিত জলভাগ থেকে ঝরণা সৃষ্টি করা (৩৬ঃ৩৪) ইত্যাদি সকল শর্তগুলোকে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। শুধু তাই নয় – বৃষ্টির জল যে বিশুদ্ধ, তাও প্রকাশিত হয়েছে ২৫ঃ৪৮ আয়াতে। এ জলচক্রের সঙ্গে পৃথিবী তথা জীবনের কি সম্পর্ক, – তাও নির্ণীত হয়েছে ২৫ঃ৪৯ আয়াতে। আপাতদৃষ্টিতে আপনার কাছে বিষয়টি খুবই সরল ও সহজ মনে হবে। কিন্তু মোটেই তা ততটুকু সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি , – জলচক্র সম্পর্কে মানুষ কেবল ১৭ শতাব্দীর পরই নিশ্চিত তথ্য জানতে পেরেছে। কোরআন তার বর্ণনায় যা পেশ করেছে তাকে আপনি ভুল প্রমাণিত করতে সমর্থ হবেন না। অন্যপক্ষে যুগোপযোগী বিজ্ঞানের দৃশ্যপট অবশ্যই আপনাকে এমন একটি তথ্য সরবরাহ করবে যে আপনি আল-কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবেন। আল-কোরআনে জলচক্রের ধারণাটি কিভাবে এসেছে তা আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। ঠিক সেই সময়ে প্রচলিত বিজ্ঞান ও দর্শনের ধারণাগুলো ছিল খুবই মজার। খ্যাতনামা দার্শনিক পুটো শিক্ষা দিতেন যে, সমুদ্রের পানি বাতাস-তাড়িত হয়ে সঞ্চালিত হয়, দ্রুত গতিতে ভূ-ভাগে আছড়ে পড়ে বিভিন্ন উপায়ে (নদী, হ্রদ, ইত্যাদি)। সে পানি ভূ-গর্ভের "টাইটারুস" নামক গহ্বরের পথে সমুদ্রে ফিরে আসে। এ ধারণাটি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, দার্শনিকগণ এ ধারণাটিতে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। এ্যারিষ্টটল বিশ্বাস করতেন, ভূ-ভাগের পানি বাষ্প হয়ে ঠাণ্ডা পর্বতের গভীর গহ্বরে জমা হয়, ফলত ভূ-গর্ভে সৃষ্টি হয় গভীর হ্রদ।

www.pathagar.com

এ হ্রদের পানিতেই ঝরণা ও বিভিন্ন ধারাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওয়াটার সাইকেল সম্পর্কিত প্রথম সুস্পষ্ট মতবাদ চালু হয় বার্নাড প্যালিসির দ্বারা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও ১৮৭৭ অব্দ পর্যন্ত এ্যারিষ্টটলীয় মতবাদ দার্শনিক ও ভালগার সহ আরো অনেকেই দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন। মাটি চোঁয়ানো বৃষ্টির পানিই যে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস, তা – বার্নাড প্যারিসির পূর্বে কেউ দাবী করেননি। সতের শতাব্দীতে ম্যারিয়াট এবং পি প্যারলট কর্তৃক বিষয়টি সঠিক ও সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও মানুষ এ ধারণাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে চায়নি। অথচ হাজার বছর পূর্বে কোরআন এতথ্য কত নিখুঁতভাবে পেশ করেছিল তা পাঠক অবহিত হয়েছেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাপারে ডঃ মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত বই – এ কোন মন্তব্য করতে পাশ কাটিয়ে গেলেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী করা এ আয়াতে প্রস্তাব হয়েছে , – "তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ , যে পানি তোমরা পান কর? মেঘ হইতে কি তোমরা উহাকে নামাইয়া আন, নাকি আমি? যদি আমি ইচ্ছা করিতাম – উহাকে লবণাক্ত করিতে পারিতাম। তাহা হইলে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" (৫৬ঃ৬৮,৬৯,৭০)। উপরোক্ত আয়াতের উপর আলোকপাত করতে চাই। আপনারা অবগত রয়েছেন যে সমুদ্রের পানি অপেয়, – লবণাক্ততার দোষে দুষ্ট। এ পানি পৃথিবীর পানির মূল উৎস। অন্যপক্ষে মাটিই মূলত সকল প্রকার লবণের ভাণ্ডার। জলচক্রের প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের অপদ্রব্য বাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয় যার বিপুল প্রকাশ ঘটে লবণাক্ততায়। কি এক আশ্চর্য ব্যবস্থা যে, যে মাটি লবণের উৎস, সে মাটি থেকে প্রাপ্ত পানি আশ্চর্যজনকভাবে সুপেয় যদিও কিনা এ মাটি ধৌত পানিই সমুদ্রের লবণাক্ততার সবচাইতে বড় একটি কারণ। "যাহা অপদ্রব্য তাহা (জলচক্রের প্রক্রিয়ায়) ফেলিয়া দেওয়া হয় (তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রে) – যাহা মানুষের উপকারে আসে, তাহা মাটিতে থাকিয়া যায়" (১৩ঃ১৭); বেগে ধাবমান ফেনিল আবর্জনা বলতে কি আমরা ধরে নেব যে মহান আল্লাহ এ লবণের ভাগকে অপসারিত করে সমুদ্রে প্রেরণের প্রক্রিয়াটির কথা আমাদের অনুভব সীমায় পৌঁছে দিতে চান? মূলত নদীবাহিত এই ফেনিল বস্তু সাগরে এসে যে বিস্তীর্ণ ফেনামণ্ডল সৃষ্টি করে, তাহল সামুদ্রিক লবণের এক প্রসারিত উৎস। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, আমাদের পানি সুপেয় না হয়ে প্রাকৃতিকভাবে লবণযুক্ত হবারই কথা ছিল। এ না হওয়াটা কি এক অসীম করুণা নয়? এই করুণা কি আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে না?

"আল্লাহ আকাশ হইতে জল বর্ষণ করেন, তদ্দারা তিনি ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে (১৬ঃ৬৫)। তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা নামাইয়া থাকেন, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার তরুলতা উদ্ভিদ জন্মাইয়া থাকেন, এবং ইহাতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পৃথিবীর উন্মুক্ত জলের তল যদি তার চেয়ে কম বা বেশী হত, তা হত এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঝুঁকি। জীবমণ্ডলের বেঁচে থাকার জন্য এ টুকু জলের প্রকাশিত তল-পরিমিতি কত প্রয়োজন, তা পূর্বের একটি অনুধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বেই অবগত হয়েছি যে , এ জলের উন্মুক্ত তল বর্তমানের অর্ধেক হলে হীন বাষ্পীভবন জনিত কারণে জলীয় বাষ্পের যে ঘাটতি হত – তার ফলশ্রুতিতে জীবন রক্ষাকারী অবলোহিত রশ্মি বা 'ইনফ্রারেড রে'-এর মাত্রায় পড়ত এক অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি, সম্ভব হত না আজকের পরিচিত জীবন পদ্ধতি। এ রশ্মির মৃত্যুময় (Lethal) তেজমাত্রায় ভস্মীভূত হয়ে পড়ত সব। এ তথ্যটা কি অনুভবের জন্য যথেষ্ট নয় যে, এ অবারিত সমুদ্র – মহাসমুদ্রগুলোর এটুকু বিস্তৃতি এক সূক্ষ্ম হিসাবের কল্যাণীমাত্রা? তথাকথিত বস্তুবাদ বিশ্বাসীদের কাছে জ্ঞানের ঘাটতিই কি তাহলে একটা তত্ত্বদাঁড় করিয়ে দেয়ার ভিত্তি? অর্থাৎ অবাধ প্রসারের যে তথ্য-দাবীর সাথে আমরা পরিচিত, এ সমুদ্রের প্রসারতার ক্ষেত্রে তা মিথ্যা হয়ে যায়, যা আমরা হিসাব -নিকাশ করে দেখতে পাচ্ছি।

আসুন এবার অন্য আলোচনায়। সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর একটা হিসাব নেয়া যেতে পারে। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য যে বিপুল অক্সিজেনের প্রয়োজন, তার এক বিশাল অংশ আসে সমুদ্র-উদ্ভিদ থেকে। অবাধভাবে প্রসারিত উদ্ভিদগুলোর এ দানে বেঁচে রয়েছি আমরা মানুষ ও প্রাণী কুল। সমুদ্রের প্রাণী কিংবা স্থলজ জীব খাদ্যের ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে থাকে। বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক প্রাণীর একাংশ মানুষের ভোগ্য মৎসের কথা ধরা যাক। এটা সত্য যে, সমুদ্রে যে মৎসের প্রাচুর্য রয়েছে, তা থেকে মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশকে আমরা আহরণ করে থাকি। আমাদের এ আহরণ ক্ষেত্র সমুদ্রের উপকূলবর্তী কাছাকাছি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি মানব জাতির চাহিদা দশ হাজার কোটি টন হয়, [৮২] তবে আহরণ এলাকায় এ মৎস্যের যোগান অনেক বেশী থাকতে হবে, ধরে নেই তা কমপক্ষে দশ গুণ – অর্থাৎ একশ' হাজার কোটি টন মাছ সেই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হবে। এ আহরণ ক্ষেত্র সমুদ্রের বিশালতার কাছে এক অতি অনুল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। তবু ধরে নেই, আহরণী এলাকায় একশ হাজার কোটি টন মাছ নিশ্চিত করার জন্য বাদবাকী সমুদ্র মহাসমুদ্রের যোগান, আহরণ এলাকার ১০০গুণ। এ হিসাবে ১০ হাজার কোটি টন সরবরাহ [মানুষের চাহিদা] নিশ্চিত করার জন্য মহাসমুদ্রকে যে বিপুল পরিমাণ মৎস্য উৎপন্ন করতে হয় – তার পরিমাণ দাঁড়ায় চাহিদার হাজার গুণ, অর্থাৎ কোন একটি প্রজাতির একটি মাছকে এক বৎসর সময়ের মধ্যে মানুষের আহরণ সীমায় পাওয়ার জন্য সমুদ্রে সে সময় কালের সবটুকুতে কম পক্ষে হাজার সংখ্যক মাছ বর্তমান থাকা চাই, অন্যথায় সে প্রজাতির সে মাছটি কখনো নাগালের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা এখানে যে ডাটা পেলাম, তা নিতান্ত অনুমানভিত্তিক। বাস্তবের চেহারা কিন্তু অনেক অনেক বেশী অনুদার। এ ধারণার বশবর্তিতায় আমি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৮৭

www.pathagar.com

মনের বৃষ্টি ঋতুতে রংপুরের একটি ডোবা পুকুরে প্রত্যহ এক ঘন্টা করে জালটানার পরীক্ষা করি। সমুদ্রে যেভাবে জাল ফেলা হয় তা থেকে অনেক বেশী দক্ষতায় আমার এ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রায় ২০০ ভাগ পুকুরের একভাগ জালটি দিয়ে দীর্ঘ ৩০ দিনের পরিশ্রমে মাত্র পাঁচটি শোল জাতীয় মাছকে ধরা সম্ভব হয়। ডোবা পুকুরে সর্বোচ্চ পানির গভীরতা সাড়ে চার ফুটের বেশী ছিল না। অন্যদের কর্তৃক মাছ ধরা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। তার প্রায় তিন মাস পর পুকুরটি সেচ করে ৯" থেকে উপরে শোল জাতীয় মাছের সংখ্যা ২৫৭ টি দেখে অবাক হই। এ পরীক্ষা করার জন্য আমি বিশেষ এক পদ্ধতি অবলম্বন করি যা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি হতে ভিন্ন, অথচ সমুদ্রে যে আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা থেকে কার্যকর। এ পরীক্ষাটি আমাকে নিশ্চিত হতে সাহায্য করেছে যে, সমুদ্রের মত বিশাল পরিসরে অবারিত ব্যাপ্তিতে এ অনুপাতের আহরণ কার্য যেখানে কখনোই সম্ভব নয়, – সেখানে আহরিত মাছের মাত্র দশগুণ যোগান হলে কখনোই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অর্থ্যাৎ আমরা যে পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে তার উপর জীবিকা অর্জন করি, – সে পরিমাণ মৎস্য পাবার জন্য সমুদ্রকে যে পরিমাণ মৌলিক যোগান নিশ্চিত মজুদ হিসাবে রাখতে হয় তা অবশ্যই হাজার গুণের বেশী। অন্য কথায় হাজার গুণের চাইতে বেশী পরিমাণ মাছের মূল যোগান না থাকলে আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ মাছ আহরণ করতে পাই , – তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছে না। বাকী ৯৯৯ ভাগেরও বেশী যদিও আপাত দৃষ্টিতে অযথা নষ্ট হয়ে যাবার প্রতীক্ষা করে, মূলত তাদের উপযোগিতা হল আমাদের হাতের নাগালে সে প্রয়োজনীয় এক ভাগের মজুত নিশ্চিত করা। আর এ ৯৯৯ ভাগ বা তার বেশী পরিমাণকে প্রকৃতিতে অবাধভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখে মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে, অথচ মানুষ জানে না – এ অবাধভাবে সৃষ্টি করার রহস্যের পাশে তার জীবন কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা আছে। মানুষ জানে না, – "আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি পরিমাপ"(১৩:৮), মানুষ জানে না, আল্লাহর বিধানে পরিমাপের পাশাপাশি রয়েছে অফুরন্ততা – সরবরাহ প্রদ্ধতিতে রয়েছে একটি অফুরন্ত অথচ পরিমাপের শাসন। বিষয়টিকে আল্লাহ ব্যক্ত করেন আল–কোরআনের ভাষায়, – "আমারই নিকট রহিয়াছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং আমিই তাহাদের সরবরাহ করি এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে (১৫:২১)। যাহাই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য – তাহা করিয়াছেন অগনিত অগাধ, উহাতে রহিয়াছে নিদর্শন তাহাদের জন্য, যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে" (১৬:১৩)।

পৃথিবীতে মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ ও অন্যান্য তরঙ্গের উপযোগিতার ফল সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। এ সব তরঙ্গ আমাদেরকে উন্নততর জীবনের আস্বাদ দিয়েছে। পৃথিবীর নিজস্ব উৎস হতে উৎপাদিত তরঙ্গমালার পাশাপাশি মহাকালের অতি দীর্ঘ প্রসারিত দূরত্ব বাঁধার ওপার থেকে মহাজগতের লক্ষ

www.pathagar.com

কোটি মহাজাগতিক বস্তু প্রতিটি মুহূর্তে প্রেরণ করছে এ সব তরঙ্গমালা পৃথিবীকে। দৃশ্য প্রয়োজনের বাইরে পড়ে থাকা এ সব মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে বলেই আজ সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহজাত বিশ্বজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা। মানবজীবনের উন্নতি ও নিরাপত্তায় আজ তাদের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব মহাজাগতিক বস্তুগুলো যদি অবাধ ও অফুরন্তভাবে শক্তি-তরঙ্গকে উৎপন্ন না করত, তবে কোটি কোটি মাইল দূরের পৃথিবীতে তাদের এত বিপুলপ্রাপ্তি সম্ভাব্যতার বাইরে পড়ে থাকত। যদি এমন কোন কারণ সৃষ্টি করা যেত যে, সমস্ত মহাবিশ্বের সকল তরঙ্গ উৎপন্নকারী উৎসগুলো মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, ঠিক সে মুহূর্তে সমস্ত মহাবিশ্বে অন্যান্য প্রবাহমান তরঙ্গকে যদি ধ্বংস করে মহাবিশ্বের বেতার ও অন্যান্য তরঙ্গমান শূন্যে আনা যায় এবং পর মুহূর্তে যদি পুনরায় ঐসব উৎসগুলোকে চালু করে দেয়া যায়, তবে আলোর গতিতে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে নতুন তরঙ্গ পৌঁছাতে লেগে যাবে শত লক্ষ বছর। পৃথিবীর প্রযুক্তির মান পিছিয়ে যাবে শত লক্ষ বছর অতীতের অজ্ঞাত কন্দরে। এখন, যাঁর দয়ার অবাধ প্রসার কারো মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুভব না জাগিয়ে তাঁরই অস্তিত্বসম্পর্কিত গর্হিত প্রশ্ন তুলতে উৎসাহিত করে, তারও নিশ্চিয়ই সে স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এক সুবিশাল ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা, "দ্বীনের (বিশ্বাসের) বিষয়ে কোন জোর জবরদস্তি নাই, নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হইতে পৃথক রহিয়াছে (২ঃ২৫৬)। বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতেই প্রেরিত। সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক (১৮ঃ২৯)। তুমি যতই চাহনা কেন, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করিবার নহে (১২ঃ১০৩)। আল্লাহই তাহাদের অনুভবকে, শ্রবণশক্তিকে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, আর দৃষ্টি শক্তিকে করিয়াছেন আচ্ছাদিত - তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মান্তিক শাস্তি"(২ঃ৯)।

হয়তো কেউ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবেন যে মাইক্রো বা রেডিও ওয়েভগুলোর প্রসঙ্গকে এখানে টেনে এনে কি লেখক বলতে চায় যে, শুধু এটুকুর জন্যই মহাজগতের মহাব্যবস্থাটি? অবশ্যই নয়, তবে উদাহরণ হিসাবে আমরা জ্ঞাত বিষয়গুলোর উদ্ধৃতিকেই আনতে পারি মাত্র। ফরাসী দার্শনিক ফনটেনেলী মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে একবার বলেছিলেন - I think they were made but to little purpose[৮৩]; অজানার এ শূন্যতাটি সমানভাবে আমাদেরকেও জানতে আগ্রহী করে - এত বিশাল গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, অন্যান্য মহাজাগতিক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তু - এসব কি সত্যই উদ্দেশ্যবিহীন? সৌর জগৎকে আমরা যেভাবে জানি, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনটিতে জীবনের অস্তিত্ব নেই। আমরা এ কথাও জানি, ২৫০ কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড গতিবেগের সূর্য তার পরিবার সমেত মহাগতিতে ছুটে চলেছে। প্রতিটি গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপার্শ্বে তাদের নিজ গতিতে, এরমধ্যে পৃথিবীর গতি হল প্রতিমুহূর্তে ২৯.৮ কিঃ মিঃ।

www.pathagar.com

অন্যান্য গ্রহগুলোর গতি একটি অন্যটি হতে ভিন্ন। স্বাভাবিক ভাবেই একটি চিন্তা - চিত্র আমাদেরকে বলে, গতির এ ভিন্নতা, বিপুলতা, মহাবিশ্বের প্রসার ইত্যাদির পরিবেশে সবচেয়ে স্বাভাবিক যা আমরা আশা করতে পারি, তা হল ভারসাম্যহীনতা। অথচ, কতইনা অদ্ভুত এ পৃথিবীর ভারসাম্য পরিস্থিতি ! কি করে সম্ভব? পূর্বের একটি অনুধ্যায়ে আপনারা পৃথিবী- জীবনে চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। সেখানে আরো জানানো হয়েছে যে, সমস্ত গ্রহসমূহ পৃথিবীর উপর কিছু না কিছু মাত্রার প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীতে কল্যাণকর প্রভাব বজায় রাখার জন্য যেমন চাঁদের গতি ও দূরত্বের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় থাকা চাই - তেমনি চাঁদকে সেই পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত ধরে রাখার জন্য চাই তেমনি কোন হিসাব করা প্রভাব। এটা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেকটি গ্রহই পৃথিবীর গতি ও তীর্যকতার উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন না কোন মাত্রার প্রভাব বিস্তার করে আছে। জরুরী শর্ত আহ্নিক গতি ও অক্ষতীর্যকতায় অন্যান্য গ্রহদের রয়েছে এক বিশাল প্রভাব। এ প্রভাব মণ্ডলকে নিশ্চিত করার জন্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়েছিল সৌর পরিবারের অন্যান্য গ্রহগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায়। ব্যবস্থাটি একটি চেইন ওয়ার্ক, অর্থাৎ একটি গ্রহ যদি সরাসরি কোন প্রভাব বিস্তার করে, তবে অন্য আর একটি গ্রহ সেই প্রভাব বিস্তারকারী গ্রহের অনুকূল অবস্থাটি বজায় রাখার জন্য কাজ করেছে। এভাবে আমরা পেয়ে যাই যে, শুধুমাত্র পৃথিবীকে তার জীবনপালনকারী পরিবেশ বিধান করবার জন্য প্রত্যেকটি গ্রহের এক অদৃশ্য প্রভাব কাজ করে যাচ্ছে , গ্রহদের অবস্থান সমূহকে আবার নিশ্চিত করবার জন্য চলে আসে সূর্য, সূর্যকে তার অবস্থায় রক্ষা করবার জন্য চলে আসে অন্যান্য নক্ষত্রের হিসাব। বিজ্ঞান এদের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে পারে অত্যন্ত সঠিকভাবে। আমাদের হিসাবের এ ধারাটি কেবল একটি পৃথিবীর। একটি পৃথিবীর সুখ -শান্তির পেছনে সূর্য পরিবারের সবগুলো গ্রহ, সূর্য, সূর্যের সমপর্যায়ের প্রতিবেশী আরো অনেক নক্ষত্র এবং পরিশেষে গ্যালাক্সির অবস্থানকে প্রয়োজনের ব্যাখ্যায় ডেকে আনে। তেমনিভাবে প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে রাতের আকাশের মিটিমিটি তারাগুলো। এদের অবস্থান আমাদের জীবনকে কতটুকু সুখময় করে তা আমরা যদি অনুভব করতে চাই , তবে ঘনঘোর রাতের বিদ্যুৎ ঝলকবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্নতার উপমাটি আনতে পারি। এমনি একটা অন্ধকারে মানুষ নিজের দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গকেও দেখতে পায় না। নক্ষত্রদের না থাকায় অর্থ ছিল তেমনি, অথবা তার চাইতে অনেক বেশী অন্ধকারাচ্ছন্নতা বা চরমমাত্রার অন্ধকার যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। যদিও উপযোগিতার এ সীমিতমাত্রায় আমরা মহাবিশ্বের মহাবিশালতার বিচার করতে পারি না, তবু রাতের আকাশের এ সব মিটিমিটি তারাগুলো আমাদের জীবন পালনে রেখে যাচ্ছে এক অপূর্ব অবদান, যাদের সেবা না আসলে রাতের পৃথিবী হত নিকষকালো অন্ধকার। কোরআন তার বাণীর বিজ্ঞতায় হয়ে উঠে উদ্ভাসিত , ঘোষণা করে, - "যাহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করিয়া থাকে এবং আসমান ও

www.pathagar.com

পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে (আর বলে) হে আমাদের প্রতিপালক, কোন কিছুই তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমিই পবিত্র" (৩ঃ১৯১)। আল্লাহর সৃষ্টি বাহুল্যতা বিবর্জিত। যেখানে যা সাজে সেখানেই তা রয়েছে। যেখানে যা যত পরিমাপে থাকা প্রয়োজন, সেটি ততটুকু পরিমাপ নিয়েই বিস্তৃত থেকেছে। "দয়াময়ের সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না" (৬৭ঃ৩)।

যিনি অবাধ বিস্তৃতির সাথে স্রষ্টার অস্তিত্বখুঁজে পান না, তার কাছে এই জিজ্ঞাসাটি যথেষ্ট যে, – তিনি তার নিজকে কি ভাবে দেখতে চান? তিনি কি অনুভব করেন যে, লক্ষ পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু কেবল তার জন্মটিকে নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই বয়ে গেছে? তিনি কি অনুভব করেন যে, তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদীদের এবং দাদা পুরুষের অন্যান্য সন্তানদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা? একই ভাবে তার স্ত্রী, অতঃপর দুই -এর সম্মেলন, পুত্র-পুত্রী ও তদীয় সন্তান, সে থেকে আত্মীয়তার বিশাল প্রসার, তার ও তাদের সুখের জন্য সৃষ্ট সমাজ, বিভিন্ন সেবা দানকারী সংস্থা ইত্যাদি। আজকের পৃথিবীর জ্ঞানপূর্ণ জীবন ব্যাবস্থাকে এইটুকুতে পৌছে দেয়ার পিছনে কতটি কল্যাণকর হাতের দান এসেছে সেটি ভাববার বিষয় কি? আপনি একটি মানুষের জন্য যদি এতটুকু বিশালতার প্রয়োজন হয়, – আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও তেমনি প্রয়োজন রয়েছে সমভাবে। এ ভাবে বড় হয়ে যাচ্ছে মাত্রাটি, ছিদ্র সন্ধানী জন কি তখনও বললেন, – এ অবাধ প্রসারটি একটি অপ্রয়োজনীয় ও অপরিকল্পিত এমনিতে হয়ে যাওয়া এক হিসাবহীন ব্যবস্থা? "তাহারা কি আসমান ও জমিনের ব্যবস্থার প্রতি তাকায় না এবং তাহাদের প্রতি যাহা আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন?(৭ঃ১৮৫)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে, তাহার সমস্তই প্রত্যক্ষ করে – কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তাহারা উদাসীন" (১২ঃ১০৫)।

আপনি জানেন কি যে, আজকের দুনিয়ায় আর অবাধ প্রসারতার পেছনে স্রষ্টা না থাকার সেই ধারণাটি কোন মতেই কার্যকরী নয়। প্রকৃতির অবাধ প্রসার যে বস্তুর স্রষ্টা নয়, বিষয়টিকে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন সুইজারল্যাণ্ডের গাণিতিক চার্লস ইউজীন গাই, আমেরিকার ফ্রেড হোয়েল, ইংল্যাণ্ডের স্যার বার্ণাড লোভেল ও আরো অনেকেই। গাণিতিক হিসাব চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে অত্র অধ্যায়ের সূচনাপত্রে। তারা প্রমাণ করেছেন, – অবাধ রীতিতে যদি বস্তুকে তৈরী হবার প্রয়োজন হত এবং কোন বর্হিজগতের স্রষ্টার উপস্থিতি যদি না থাকত, তবে শুধুমাত্র একটি আমিষ অণু তৈরী হওয়ার জন্য যত সময়ের প্রয়োজন হত, তা মহাবিশ্বের বয়সের সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি গুণের চাইতেও অনেক বেশী, যদিও একটি আমিষ অণু তৈরী হবার অযুত – লক্ষ কোটি উপায় রয়েছে। আর তেমন একটি অণু তৈরীর জন্য যে পরিমাণ পদার্থকেনড়াচড়া করার প্রয়োজন হত এ দীর্ঘ সময় ধরে, সে পদার্থ, পরিমাপে জানা

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের দৃশ্য–অদৃশ্য পদার্থ সম্ভারের চাইতে লক্ষ কোটিগুণ বেশী। তারা সকলেই একমত হয়ে রায় দিয়েছেন যে, এমনি একটা ধারণা সমস্ত মহাবিশ্বে আসলেই কোন প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়, আমাদের বেঁচে থাকার বিষয়টি মিথ্যা হয়ে যায়।

আমার কয়েকজন কলিগ এ সব "গাঁজাখুরি গল্পকে" বিজ্ঞানিদের খেয়ালখুশীর বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের কাছে এ সব তথ্যগুলো নিতান্ত মুখরোচক মনে হয়েছে মাত্র। তারা যদি চাঁদে মানুষ যাওয়ার বিষয়টিকে অবিশ্বাস করে থাকেন – তবে এ বিষয় গুলোতে বিশ্বাস না থাকার জন্য আমি তাদেরকে কোনভাবেই দায়ী করব না। কিন্তু চাঁদে মানুষ পদার্পণ করেছে , এটাকে কেউ অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়। আপনারা জানেন কি যে, সেখানেও ছিল গণিতের নির্ভরশীলতা, গণিত মিথ্যা হয়ে গেলে মানুষ হয়ত কখনোই চাঁদকে ধরতে পারত না কিংবা পৃথিবীতে ফিরে আসবার বিষয়টি হত সম্পূর্ণ অসম্ভব। একটি রকেট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ গতি নিয়ে চলে, তার কমপক্ষে আড়াইগুণ বেশী গতিসম্পন্ন এ পৃথিবীকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টস্থানে পাবার জন্য রকেটকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিকে চলতে শুরু করতে হয়েছে যেখানে সে সময় পৃথিবী নেই , তা থেকে অনেক দূরে। চুলচেরা ভুল ভ্রান্তির ফসল হতে পারে পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলা এবং কক্ষ মণ্ডলকে হারিয়ে ফেলার অর্থ হতে পারে চিরদিনের জন্য যানটির নিখোঁজ হয়ে যাবার আশঙ্কা। গণিতের সূক্ষ্মতা ও সঠিকতা উপরের স্তবকের উপাত্তগুলোকে মেনে নিতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়।

আরো অসংখ্য উদাহরণ, উপাত্ত, প্রমাণ রয়েছে যে অবাধ প্রসার বলতে বস্তুবাদীগণ যা বুঝে থাকেন, তা সত্য নয়। সঠিক অর্থে কোন অবাধ প্রসারের অস্তিত্ব আসলে মহাবিশ্বের কোথাও নেই। জন গ্রীবিনের একটা উদ্ধৃতি এখানে বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবে ঃ We know from physical experiments that most likely state of any system is one of Uniformity, which would correspond to a random spread of matter across space, with no clumps of galaxies, stars and planets to provide order among chaos[৮৪] পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জানায় যে, সবচাইতে বেশী সম্ভাব্য কোন ব্যবস্থাই হল সুসমতা – যা অবাধ প্রসারেরই সমানুপাতিক ; আর এমনি কোন ব্যবস্থার অধীনে যে সৃষ্টিকে কল্পনা করা যায়, তাতে কোনদিন সম্ভব হতনা একটি গ্যালাক্সির জন্ম নেয়া, একটি নক্ষত্রের দানা বাঁধা, একটি গ্রহের সৃষ্টি হওয়া। আমাদের চেনা পৃথিবী ও অখিল সংসারের জানা অস্তিত্ব কি তাহলে এ প্রশ্নটিই রাখে – "Does it mean that the universe is not the result of chaos? Have cosmologists rediscovered the God ? May be - হয়তো জগৎ বিজ্ঞানিগণ আজ নতুন করে

www.pathagar.com

আবার এ মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছেন। তারা আবিষ্কার করেছেন জগৎসমূহের প্রতিপালককে।

"জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কি?"(২৬ঃ২৩)

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও (২৬ঃ২৪)। তোমার প্রতিপালক, তিনিইত পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (২৬ঃ৯)। উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী (২২ঃ৭৪)। তিনিই দয়াময়, তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ (২৫ঃ৫৯)। তিনিই মহান আল্লাহ, তোমাদের পালন কর্তা, স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। অতএব (ওহে মানুষ) তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছ? (৪০ঃ৬২)।

---

৮২ । এ ডাটাটি একটি উপমা দেয়ার জন্য ধরে নেয়া হয়েছে, প্রকৃত চাহিদার সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

৮৩ । The Living Void - Ian Ridpath

৮৪ । To The Edge of Eternity - John Gribbin

www.pathagar.com

২ঃ১০

পানি – দয়ার এক নিদর্শন

গ্লাসের যে উচ্ছিষ্ট পানিটুকু তাচ্ছিল্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আপনি আভিজাত্যের স্পর্শদূষণতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস নিয়ে থাকেন – একবারও কি ভেবেছেন যে, আপনার রক্ষিত আভিজাত্যের মূল্যের চেয়ে সে পানি টুকুর মূল্য বহুকোটি গুণ বেশী ? আপনি হয়ত জানেন না যে, এই উচ্ছিষ্ট পানি টুকুর মূল্য কত অসীম আর এর এত সহজলভ্যতা আপনার প্রতি সৃষ্টির কত দুর্লভ আশীর্বাদ। আমরা কেহই অনুভব করি না কোরআনের সারগর্ভ বাণী, – "আমিই আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি – আমি উহাকে অপসারণ করিতেও সক্ষম" (২৩ঃ১৮)। আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার জন্য কস্মিনকালেও অনুভব করি না, কি মহা সতর্ক বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে এ পানির স্রষ্টা মহান আল্লাহ আমাদের সামনে এক ভয়ংকর হুশিয়ারি উপস্থাপন করেছেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এ আয়াতে সন্নিবেশিত প্রস্তাবটি খুবই সরল ও অত্যন্ত সাদামাটা মনে হবে আপনার কাছে। কেউ হয়ত কথাটিকে নিরেট ধর্মীয় নীতিবাক্য বলে এক পাশে ফেলে রাখবেন। কেউ কেউ হয়ত পাশ থেকে বলবেন,–"এর মধ্যে বিজ্ঞান এলো কোথা থেকে?" কেউ হয়ত জোর করে বিজ্ঞান চাপানো হল কি না সে বিষয়টি সন্ধান করতে মনোনিবেশ করবেন। অথচ তারা জানেন কি যে – "কোরআন মূলতঃই মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ" (৩৬ঃ২)। বিজ্ঞান এর শব্দে শব্দে বর্ণনার মাহাত্ম্যে বুনে দেয়া হয়েছে। তাই বুঝি শুধু বিজ্ঞানের সাবধানী ছাত্ররাই যখন পানির অসংখ্য গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য করেন, তারা সবিস্ময়ে বলেন, " অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য (১২ঃ৩১)। ইহা আল্লাহ তালার সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সব কিছুকে করিয়াছেন সুসম ও পরিমিত" (২৭ঃ৮৮)। সুধী পাঠকের কাছে আমি এ প্রবন্ধে পানি কেন বিস্ময়কর পদার্থ, সে তথ্যটি তুলে ধরতে চাই।

১৮৬৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রখ্যাত রসায়নবিদ মেন্ডেলিফ সমস্ত মৌলসমূহের ভরের সঙ্গে তাদের ধর্ম ও গুণাগুণের একটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যা করে একটি সারণি তৈরি করেন যা পৃথিবীতে মেন্ডেলিফের পর্যাবৃত্ত সারণি (Mendelleff's Periodic Table) নামে পরিচিত। এরই উপর পরবর্তীতে উন্নতি সাধন করা হয় এবং বর্তমানে সামান্য পরিবর্তিত রূপে এটি আধুনিক পর্যাবৃত্ত সারণি (Modern Periodic Table) নামে সমাধিখ্যাত। এ সারণির উপযোগিতা সমস্ত

www.pathagar.com

পৃথিবীর উন্নততর প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সংগে এত নিবিড় যে, জলের সংগে মাছের সম্পর্ক যতদূর। ভরের সংগে বিভিন্ন মৌলের ধর্ম ও গুণাগুণ পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যাবৃত্ত আইনের সত্যতাকেই এ সারণি বিশ্লেষণ করে।

মৌলের ভর, ধর্ম ও গুণাগুণ অনুসারে মেন্ডেলিফ সমস্ত আবিষ্কৃত মৌলসমূহকে বৈশিষ্ট্যগত ধারাবাহিক গুণাগুণের মানে একটি ছকের উপর সাজিয়ে নিলেন। পর্যায়ক্রম ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে ছক তৈরীর সময় মেন্ডেলিফ তার সারণিতে কিছু কিছু ঘর শূন্য রেখে যান এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ছকের শূন্যঘরসমূহের উপর–নীচে এবং আগে ও পরের মৌলদের গুণাগুণ দেখে তিনি ঐ সব শূন্যঘরে ভবিষ্যতে আবিষ্কার হবে এমনি সব মৌলের ভর, গুণাগুণ ও ধর্ম ইত্যাদি বলে দিলেন। কয়েক অব্দ যেতেই এক এক করে শূন্য ঘরগুলো শুধু পূর্ণই হল না, মেন্ডেলিফের ভবিষ্যৎ বাণীর সংগে হুবহু মিলে গেল। বিজ্ঞানিগণ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, সৃষ্টির মাঝে একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা রয়েছে আর এ ধারাবাহিকতা সৃষ্টিকে একটি অদৃশ্য আইনের সুকঠিন বাঁধনে শৃংখলায়িত করে রেখেছে। থমাস ডেবিস পার্কাস, রিচার্স কেমি ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়, মেন্ডেলিফের সারণির সংশোধিত পর্যায় তালিকা বা পর্যাবৃত্ত সারণিকে মূল্যায়ন করেছেন, – "আজকের দিনে রসায়নবিদগণ অজ্ঞাত নতুন যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এবং এই সারের উপাদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য তাদের কাজের সহায়ক হিসেবে এই পর্যাবৃত্ত সারণির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। এই গবেষণা ও ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে তাদের সাফল্য, অজৈব বিশ্বে যে সুন্দর ক্রম ও ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, তারই অভ্রান্ত প্রমাণ" ৮৫।

আজকের দিনে সমস্ত বিজ্ঞান, বিশেষতঃ এ আলোচনার পরিধিতে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সকল ছাত্রই বিনাবাক্যে স্বীকার করে নেন যে, দৃশ্যজগতে পদার্থের সৃষ্টি, পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস এক সুকঠিন দুর্লংঘ্য আইন ও শৃংখলায় বাঁধা । এই আইনকে অমান্য করার অর্থ একটি অস্বাভাবিকতার নির্দেশ বা উদাহরণ ; অথচ আপনি অবগত রয়েছেন কি যে, আপনার হাতের কাছে এই মূল্যহীন পানি যা অতি অনাদরে উচ্ছিষ্ট হওয়ার দোষ নিয়ে পড়ে আছে , সে এক সাংঘাতিক অস্বাভাবিকতার ফসল ? প্রকৃতি মাঝে মধ্যে এমনিভাবে চিরাচরিত আইন বা ধারাবাহিকতাকে লংঘন করে যার স্বাভাবিকতাই হতে পারে জীবমন্ডলের জন্য সবচাইতে বড় দুঃসংবাদ। শুধু মান্য করার খাতিরে যদি পানি প্রকৃতির আইনকে লংঘন না করত, তাহলে কখনোই জীবনের সঞ্চার হত না পৃথিবীতে। দৃশ্যতঃ এই অতিশয় স্বাভাবিক বস্তুটি কত উল্লেখযোগ্যভাবে অস্বাভাবিক, তা বিজ্ঞানকে তাক লাগিয়ে দেয়! মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে দু'দন্ড ভাবিয়ে তোলে!!

www.pathagar.com

চলুন, আমরা পানি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি। পানির সূত্রাগত ওজন ১৮। এই তথ্যটি বিজ্ঞানীদের কাছে বুঝে নেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, পানি সামান্য চাপ ও তাপেই গ্যাসে পরিণত হবে। এ্যামোনিয়ার সূত্রাগত ওজন পানির তুলনায় ১ কম হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপ ও তাপে (৩০° সেঃ) এটি তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পর্যাবৃত্ত সারণির অবস্থানের দিক থেকে পানির সংগে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল হাইড্রোজেন সালফাইড যার সূত্রাগত ওজন ৩৪। এই পদার্থটি 0° চেয়ে ৫৯° কম তাপমাত্রায় (–৫৯° সেঃ) বাষ্প হয়ে যায়। পানির চারপাশের অন্যান্য যৌগগুলোর তুলনামূলক চিত্রটির দিকে তাকিয়ে দেখুন ঃ –

হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড	+ ১৯.৫°	সেঃ তাপমাত্রায় বষ্প হয়ে যায়।
হাইড্রোজেন ব্রোমাইড	– ৬৬.৪°	সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে যায়।
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	– ৮৫°	সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে যায়।
হাইড্রোজেন সায়ানাইড	+ ২৬°	সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে যায়।
হাইড্রোজেন সালফাইড	– ৫৯°	সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে যায়।

সূত্রাগত ওজনের ক্রম, অন্যান্য যৌগদের মত পানির উপর সমভাবে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও কেন পানি সাধারণ তাপমাত্রায় নিঃশেষে বাষ্পায়িত না হয়ে ১০০° সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয় এবং তৎপূর্বে নিজ অস্তিত্বকে অতিশয় অস্বাভাবিকভাবে বজায় রাখে, তা বিজ্ঞানীদেরকে অবাক করে দেয়। অজৈব বিশ্বে যেখানে এতবড় অভ্রান্ত ও দুর্লংঘ্য ক্রম বিদ্যমান, সেখানে পানি এককভাবে হঠাৎ করে কেন ক্রমের শাসন ভেংগে এক অস্বাভাবিক মাত্রায় জানা অস্তিত্বে বজায় থাকে [৮৬] ? চারিদিক হতে যেখানে সকল উপাত্ত একত্রে এক গলায় বলেছে ,– এটি হবার নয়,স্বাভাবিক তাপমাত্রার আগেই পানির উবে যাবার কথা, সকল সময় বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকাই ছিল পানির জন্য স্বাভাবিক, সেখানে পানি যে অবস্থায় যে সকল গুণাগুণ নিয়ে বিদ্যমান থাকে, থমাস ডেবিস পার্কাস তার লেখচিত্রে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, – "এমনি সাধারণ তাপমাত্রায় যে পানি তরল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তা এমনি একটি ব্যাপার যা নাকি মানুষকে থমকে দিয়ে নির্নিমেষ ভাবতি করে তোলে"। তাহলে কি কোরআন এই তথ্যটিই মানুষের বিজ্ঞতার সামনে তুলে ধরতে চায় এক জ্ঞানগর্ভ ভংগিতে, – "ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি ভূতলের সকল পানি অদৃশ্য হইয়া যায়, (অর্থাৎ উবিয়া যায়) তবে কে তোমাদের জন্য আনয়ন করিবে এই ভূবনে প্রবাহমান জল" ? (৬৭ ঃ ৩০)। পানির এই বিশেষ গুণসচেতন ও অন্যান্য পদার্থ হতে একে ব্যতিক্রমধর্মীতা বিধানকারী কোন মহাজ্ঞান মনীষাই কি তাহলে আল-কোরআনে পানি সম্পর্কিত এই চিন্তা উদ্রেককারী তথ্যের প্রস্তাবক ? তাহলে কি ২৩ঃ১৮ আয়াত যে

www.pathagar.com

সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, - "আমি উহাকে অপসারণ করিতেও সক্ষম", তা কি মানুষকে পানির এমনি অসাধারণ গুণাগুণের স্রষ্টা আল্লাহের মহাক্ষমতার তথ্য প্রদান করার সাথে তার করুণার বিশালতাকে বুঝবার আহবান জানায়? যদি পানি আসলেই উবে যাবার মত হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত হাইড্রোজেন - চেইনের ব্যবস্থা যদি অবলুপ্ত থাকে অথবা অচল হয়ে পড়ে, আমাদের তখন আর কোন সাধ্য থাকেবে না যে জীবনের জন্য পানিকে আমরা আমাদের হাজারো প্রযুক্তি খাটিয়ে উপযোগিতার নাগালে রাখতে পারি। পানির তরল রূপ হবে এক স্বপ্নের বিষয়।

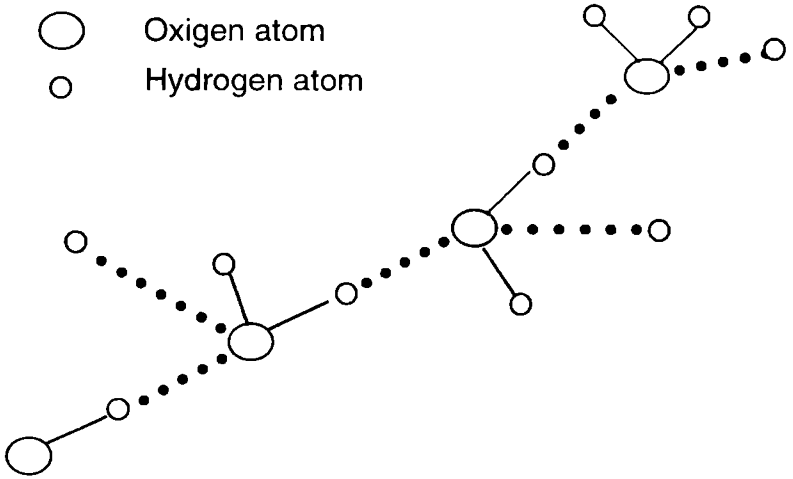

হাইড্রোজেন চেইন। সৃষ্টিতে-এ হল স্রষ্টার এক সুবিশাল দয়া ও বিস্ময়কর কৃতিত্ব যার কাছে পৃথিবীর প্রতিটি অণু পরমাণু কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।

পানির এই দুলর্ভ গুণাগুণকে প্রতিভাত করে আল-কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে আরো অনেক আয়াত। পরীক্ষা করলে আপনি যে বক্তব্যটি পাবেন, মূলতঃ তা পানির অস্তিত্ব ও বিশেষ এই ধর্মগুণ সম্পর্কিত। "তাঁহারই অনুগ্রহের প্রতীক স্বরূপ প্রদর্শিত রহিয়াছে সমুদ্রের ভাসমান জাহাজগুলি (৫৫ঃ২৪)। তাঁহার নিদর্শন সমূহের অন্যতম একটি হইল, জাহাজসমূহ সমুদ্রে চলাচল করে (৪২ঃ৩২)। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যাহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞচিত্তের জন্য" (৩১ঃ৩১)।

www.pathagar.com

সমুদ্রের জলে জাহাজ ভেসে থাকা ও যাতায়ত করা এতই স্বাভাবিক যে, কোন কারণে তা বৃহত্তর কোন শিক্ষণীয় নিদর্শন হওয়ার দাবী রাখে না, এতদসত্ত্বেও আল-কোরআনের মত কম্পিউটার বিশুদ্ধ মহাপ্রজ্ঞাময় গ্রন্থে এই ক্ষুদ্র বিষয়টি অনেক বড় হয়ে প্রস্তাবিত হওয়ার কারণ কি ?

কোরআনের ভাবগাম্ভীর্য, উচ্চাংগতা, তথ্যের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিত উপাত্তের আলোকে বলতে পারি যে, নিঃসন্দেহে পানি সম্পর্কিত উদ্ধৃত আয়াতের প্রস্তাবগুলো আমাদের সৎচিন্তার দাবী রাখে। বিজ্ঞানের আলোকে যখন আমরা তাকাই , দেখতে পাই-পানির সেই অস্বাভাবিকভাবে অবস্থান ও অস্তিত্ব বজায় রাখার গুণগুলোই এই সকল আয়াতের প্রস্তাবের মুল ভাষ্য। পানির এই গুণাগুণ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহকে আমরা আর একটি বারের জন্য বস্তু জগতের আশেপাশে দেখতে পাই। সত্য হয়ে আসে - " তিনি সকল কিছু (বস্তু/অবস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত (৬ঃ১০২)। তাঁহার হস্তেই সকল বস্তুর কর্তৃত্ব (৩৬ঃ৮৩)। তিনি , যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযোগ্য আকৃতি প্রদান করিয়াছেন (২০ঃ৫০) ; আর, প্রভু তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন" (৭ঃ৮৯)। বুঝি তাই , পানি আমাদের চেনা পানির আকৃতি ও গুণাগুণ নিয়ে বর্তমান। পানির সেই ব্যতিক্রমধর্মী হাইড্রোজেনের চেইন সমস্ত নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে পৃথিবীর জীবজগৎ ও মানুষের মহা কল্যাণের ভিত রচনা করে রেখেছে। "তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ঃ৮১)। এই প্রশ্নের জবাব আপনার কাছে মজুত আছে কি ?

বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পানির রয়েছে আরো অনেক আশ্চর্য গুণাগুণ। পৃথিবীর ৭৫% শতাংশ পানি আমরা সকলেই তা জানি যেমনি জানি, জীবদেহের ৬০ ভাগই হল জল। উদ্ভিদেও তার দেহভরের বিপুল অংশ পানির ভাগ। পানির আশ্চর্য রকম দ্রবণীয় গুণাগুণ জীবনকে সম্ভাব্যতার মধ্যে ধরে রেখেছেন। পূর্বোল্লিখিত আশ্চর্য তরলীয় গুণাগুণ আছে বলেই জীবকোষ বা উদ্ভিদ কোষের সংকট-কালীন জীবন বজায় রাখা সম্ভব। খাদ্য ও অপদ্রব্যের বহনের জন্য কেবল পানিই একমাত্র মাধ্যম। পানির আর একটি অপূর্ব গুণ হল তার বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পন্ন তিনটি স্থায়ী অবস্থা। সূর্য উত্তাপে পানি জলীয় বাষ্পের কণা সৃষ্টি করে স্ফুটনাংকের পূর্বে - এটিও একটি বাড়তি গুণ। এ প্রক্রিয়ায় তৈরি জলকণা ক্রমে ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে মেঘ ও বৃষ্টির ফোঁটা সৃষ্টি করে, এবং আবার পৃথিবীতে নেমে আসে। জলচক্র জীবন সঞ্চার করে যায় পৃথিবীতে। পানির মত এত অদ্ভুত কোন পদার্থ না হলে জলচক্রহীন মৃত্যুময় ভূবন হত আমাদের ঠিকানা।

www.pathagar.com

পানির বরফ হওয়ার ধর্ম এবং বরফ অবস্থায় এর বৈশিষ্ট্য হল আর একটি অনন্য দিক। তাপমাত্রা যে সকল অঞ্চলে শূন্যের কোঠায় পৌছায়, যেখানে পানির তাপ আদান-প্রদানের এক বিস্ময়কর ধর্ম না থাকলে সমুদ্রের জলজ প্রাণ ও উদ্ভিদ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে পড়ত। পানি যখন বরফে পরিণত হতে থাকে, তখন সে নিজ দেহ হতে বিপুল পরিমাণ তাপ বের করে দেয় (৮০ ক্যাল/সিসি)। এই সুপ্ততাপ সমুদ্রের নীচের জীবন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার এক অপরিহার্য শর্ত। কোন কারণে সমুদ্রের নিম্নতলে বরফ জমতে শুরু করলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়, ঘনত্ব কমে আসে, ফলতঃ তাকে ভেসে উঠতে হয় উপরে। এই প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসা তাপমাত্রা আশেপাশে পানিকে হিমাংকের উপরে থাকতে সাহায্য করে। উপরে জমে যাওয়া পানির আস্তরণের নীচে তাই চলে জীবনের ধারা । পানির এই গুণটি না থাকেলে মেরু অঞ্চলীয় নদনদী বা সাগর উপসাগর হয়ে পড়ত এক একটা আস্ত বরফের টুকরো। সংক্রামিত হয়ে পড়ত ব্যবস্থাটি অন্যান্য অঞ্চলে। মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে পড়ত জীবন।

"ওহে মানুষ! তোমাদের কি হইল যে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেছ না? (৭১ঃ১৩) ; তোমাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি - তুমি কি উহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা ক্ষীনতম শব্দ শুনিতে পাও ?(১৯ঃ৯৮)। বল, রহমান হইতে কে তোমদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? (২১ঃ৪২)। তবে কি আমি ব্যতীত উহাদিগের এমনি দেবদেবী আছে , যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ? উহারা তো নিজদেরকেই নিজেরা সাহায্য করিতে সক্ষম নয়। এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্যকারী নাই (২১ঃ৪৩)। তাহাদিগকে বলিয়া দাও, এই পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং প্রত্যক্ষ কর, অবিশ্বাসীদের কি পরিণতি দাঁড়াইয়াছে (৬ঃ১১)। ইহা হইতেছে উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার পালন কর্তার দিকের রাস্তা গ্রহণ করুক" (৭৬ঃ২৯)।

---

৮৫ । The Evidence of God in Expanding Universe.

৮৬ । কারণটি 'হাইড্রোজেন-বণ্ড' জনিত ; অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিশেষ আকর্ষণের কারণে বিভিন্ন H_2O অণু একত্রিত হয়ে বিরাট অণু গঠন করে। ফলে বাষ্পীভূত করতে অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এটি একটি অনন্য ধর্মী ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র পানির যৌগ সৃষ্টিতেই প্রয়োগ হয়েছে।

www.pathagar.com

৩
আকাশের সংগঠন ও স্তর বিন্যাস

আকাশ ! এই অতি ক্ষুদ্র শব্দটির অর্থ কি ?

আমার বলতে দ্বিধা নেই যে এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আমরা জানি ন। কথাটি শুনে নিশ্চয়ই আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন। এতদসত্ত্বেও আপনাকে জানাতে দুঃখ বোধ করছি যে, আমরা সত্যিই এর সঠিক সংজ্ঞা পেতে এখনও অপেক্ষায়।

মনে যখন অনুভব তরঙ্গ জোয়ারে উদ্বেলিত হয় - শুধু সেই মুহূর্তগুলোই বিশেষ করে আমাদের চোখকে মর্ত্যের গণ্ডিসীমা থেকে হরণ করে অসীম শূন্যতার দিকে নিয়ে যায়, এক অচেনা ও অজ্ঞাত অনুভব আমাদের মনে সুখের কিংবা দুঃখের খোরাক হয়ে নিঃসঙ্গতার সখ্যতা দান করে। জন্ম থেকে বিলয়কাল পর্যন্ত এ সব সহজাত অনুভূতি আমাদের হৃদয়ের অনুভব কন্দরে লালন করলেও কল্পনার এই আকাশ কল্পিত ভুবনের রম্যতায়ই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। মহাকালের শাসনে সেই অজ্ঞাত মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে আমরা অনুভূতি প্রবণ মন নিয়ে যত বেগে হারিয়ে যেতে পছন্দ করি – তার তিলার্ধও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাস্তবতা সন্ধান করতে ব্যয় করি না। আমরা আমাদের আপেক্ষিকতার সীমানায় দুঃখ ও সুখ বোধকে পাশ কাটিয়ে আকাশ এর প্রকৃত অর্থ কি – এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করিনা, সম্ভবতঃ তা আমাদের প্রয়োজন নেই বলেই।

আকাশের সঠিক সংজ্ঞা আমাদের জানা না থাকলেও আকাশ বলতে আমরা একটি অতি সরল ধারণা পোষন করে থাকি। একটি শূন্যতা যা রোদ বৃষ্টি দেয়, একটি পরিসর যা গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ধারণ করে থাকে। অধুনা আকাশ, মহাকাশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আরো প্রসারিত ধারণা । বিজ্ঞানীরা সুপার স্পেস নিয়ে হাজারো প্রস্তাব করেছেন সারা বিশ্বজুড়ে। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে 'মহাকাশ পর্ব – ২' এ যা আকাশ ধারণার জটিলতা ও বৃহত্তর প্রসার সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরে)। প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় ভাবাবেগের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের বর্ণনাকে এখানে সীমিত করার প্রয়াস নিয়ে সার বক্তব্য হিসাবে আপনাদের অবগত করতে চাই যে, আল্-কোরআনে আকাশ সম্পর্কিত বহুবিধ প্রস্তাব প্রধানতঃ আঞ্চলিক ধারণা, মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা, বিশাল গ্যালাক্সির ধারণা এবং সুপার স্পেস – ইত্যাদির আনুপাতিক প্রস্তাবে অত্যন্ত ভাস্বর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এতদ প্রসংগে আরো বলে নিতে চাই যে, জনাব ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথাল, মোহাম্মদ আলী প্রমূখ এর বিখ্যাত

www.pathagar.com

ইংরেজী তফসীর/অনুবাদ সমূহ সহ সকল বাংলা তফসীর ও অনুবাদে একটি অতি বদ্ধমূল ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে যে, আল্‌কোরআনে আকাশ সংখ্যার দাবী হ'ল সাতটি। সাত আসমান ও সাত জমীনের জ্ঞান অনেকটা পৌরানিক রীতিতেই আমাদের কাছে এসে থাকে। গ্রীক ও রোমানদের মত আরবগণ সাতকে একটি প্রতীক সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, যার অর্থ হতে পারে বহু কিংবা অসংখ্য।[৮৭] বাংলা রীতিতে অনুরূপ প্রচলনের সন্ধান আমরা পাই রূপক শব্দ গুচ্ছ - 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' অথবা 'সাত রাজার ধন' ইত্যাদির ব্যবহারে যার প্রত্যেকটি প্রাচুর্য অর্থকে প্রতিভাত করে। আরবী রীতিতে সার্ব'আ (سبع) শব্দটি যখন সমাস বদ্ধ পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় - তখন তার অর্থ বহু কিংবা অসংখ্য হতে পারে। অনির্দিষ্ট সংখ্যা-বিপুলতা অর্থে এই শব্দের প্রচলন অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, আল্-কোরআনে প্রস্তাবিত সমাসবদ্ধ শব্দ 'সার্ব'আ সামাওয়াতি' (سبع السموات) মূলতঃ অসংখ্য আকাশের দাবী রাখে , - কোন সীমাবদ্ধ সাত সংখ্যায় সীমিত নয়। এইটুকু ভিত্তি আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের মূল প্রকল্পের সন্ধান করতে পারি।

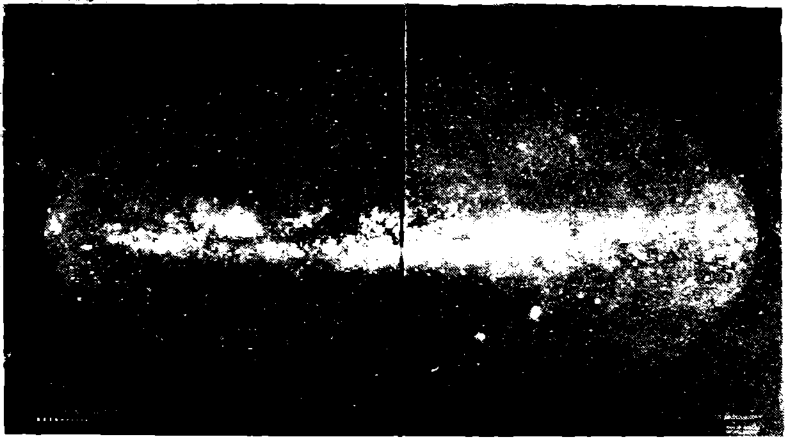

আমাদের ছায়াপথ একটি দীনহীন গ্যালাক্সি মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। তবু এর ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত আর দশ হাজার কোটি নক্ষত্র এই গ্যালাক্সিতে বসবাস করে।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক মানুষের অভিজ্ঞতায় উন্মোচন করে জ্ঞানের এক প্রসারিত দুয়ার। উনবিংশ শতাব্দীর জগৎ বিজ্ঞানীগণ যখন ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, আমাদের পৃথিবী অতি নগণ্য অবস্থানের এক নগণ্য গ্রহ - কিন্তু তা কত

www.pathagar.com

অকল্পনীয়ভাবে নগণ্য তা মানুষ জানতে শুরু করে শুধুমাত্র ইডুইন হাবেলের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর। ইতিপূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে, রাতের দৃশ্য অসীম আকাশই হ'ল বিশ্ব-জগৎ। কিন্তু ২০ এর দশকে এসে মানুষ স্তম্ভিত হ'ল। মানুষ দেখতে পেল, দৃশ্য জগতের অগণিত অযুত নক্ষত্রমালা শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি, আমাদের ছায়াপথেরই অন্তর্ভূক্ত। মহাবিশ্বের মানে আমাদের দোর-গোড়ায় সব চাইতে নিকটতম যে প্রতিবেশী – সে আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের আর এক বিপুল বিরাট জগৎ , নক্ষত্র ধারণ ক্ষমতায় যা ছায়াপথের তিনগুণ এবং সেই বিশাল জগৎখানিও লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তে অবস্থিত একশত কোটির মধ্যে একটি অতি অনুল্লেখযোগ্য গ্যালাক্সি মাত্র ![৮৮]

বিশ দশকের 'দ্বীপ জগৎ' পৃথিবীময় যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে ছিল, তা নূতন করে বলার কিছু নেই। ইডুইন হাবেলের আবিষ্কার মানুষকে এই দ্বীপ জগৎ বা Island universe এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরই শুরু হ'ল মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিল যে মহাবিশ্বে নূন্যতম গ্যালাক্সি বা দ্বীপ জগত সংখ্যা হ'ল এক মহাপদ্ম বা 10^9; অর্থ্যাৎ ১০০ কোটি।[৮৯] সমস্ত মহা বিশ্বের এ দ্বীপ জগত সমূহ আবার দলগতভাবে গুচ্ছায়িত (Clustered)। প্রতিটি গুচ্ছ কয়েকটি হতে কয়েক সহস্র উপগ্রহ গ্যালাক্সি (Satellite galaxies) নিয়ে তাদের স্থানীয় গ্যালাক্সি দল (Local groups) তৈরী করে।[৯০] প্রতিটি গ্যালাক্সি পরস্পর থেকে গড়ে এক মেগা পারসেক দূরত্বে অবস্থান করে (প্রায় ৩৩ লক্ষ আলোক বৎসর) যার আয়তন ও আনুপাতিক 'বিন্যাস-দূরত্ব' হল অতিশয় বড় কোন খাবার টেবিলে প্রতি পাঁচ মিটার দূরে দূরে একটি খাবারের থালার অবস্থানের ন্যায়। গুচ্ছ-দলের মধ্যে এই অনুপাত-দূরত্ব কমে হয় ২০০,০০০ পারসেক।[৯১] জানা গ্যালাক্সি সমূহের মধ্যে সর্ব বৃহৎ দলের গ্যালাক্সি গুচ্ছ হ'ল হারকিউলাস ক্লাষ্টার (Hercules cluster) যার পরিবারের গ্যালাক্সি, উপ-গ্যালাক্সির সংখ্যা হ'ল ১০,০০০। আমাদের অবস্থান থেকে এর দূরত্ব ৩০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর (৩০০,০০০,০০০)। আমাদের গ্যালাক্সি যে গুচ্ছের অধিবাসী, সেই পরিবারে গ্যালাক্সির সংখ্যা হ'ল ২০টি।[৯২]

প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় ব্যাস ১০০,০০০ আলোক বৎসর। তার চেয়ে ছোট ও তার চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড় গ্যালাক্সির অস্তিত্ব ইতিমধ্যে মানুষ জানতে পেরেছে। আমাদের ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ দীন হীন গ্যালাক্সি, মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। জন গ্রাইবিন এই ছায়াপথ অর্থ্যাৎ রাতের যে মহাকাশ আমরা অবলোকন করি , তার সম্পর্কে জানিয়েছেন – Our Milky way is but one modest galaxy with on special place in the universe.[৯৩] এমনি একটি অতি সাধারণ গ্যালাক্সি সম্পর্কিত সর্ব প্রথম সঠিক তথ্য প্রদান করেন

www.pathagar.com

আমেরিকান আকাশবিদ হারলো শেপলে (Herlow Shapley)। তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ১০০,০০০ আলোকবর্ষ পরিমাণ ব্যাস–ব্যাপ্তির এ গ্যালাক্সির নক্ষত্রের সংখ্যা ১০,০০০ হাজার কোটি (১০০,০০০,০০০,০০০)। তারমধ্যে সূর্য অত্যন্ত অনুল্লেখযোগ্য নক্ষত্র যা গ্যালাক্সির কেন্দ্র হতে ৩০,০০০ আলোক বৎসর দূরের কোন সীমায় পড়ে আছে।

আলোক বৎসর। দূরত্বের স্কেলে কতটুকু তার পরিমাপ? আমরা জানি যে, আলো প্রতি মুহূর্তে ১,৮৬,০০০ মাইল (৩,০০,০০০ কিঃ মিঃ) বেগে চলে। এক মিনিটে অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব হ'ল তার ৬০ গুণ, ঘন্টায় তারও ৬০ গুণ, দিনে তারও ২৪ গুণ, বৎসরে তারও ৩৬৫.২৫ গুণ, যার দূরত্বদৈর্ঘ্য হ'ল কমবেশী ৫,৮৬৯,৭১৩,৬০০,০০০ মাইল, আর সে হিসাবে আমাদের গ্যালাক্সির ব্যাস হ'ল তার ১০০,০০০ গুণ বা ৫৮৬,৯৭১,৩৬০,০০০,০০০,০০০ মাইল – যা বর্ণনায় প্রকাশ কষ্টসাধ্য। আমাদের এই গ্যালাক্সি থেকে আয়তনে কমপক্ষে ১½ গুণ বড় ব্যাস সম্পন্ন অতিকায় গ্যালাক্সি তথাকথিত 'এণ্ড্রোমিডা নেবুলা' ১৯২৪ সালে ইডুইন হাবেল কর্তৃক সর্ব প্রথম উৎঘাটিত হওয়ার পর জানা যায় যে, গ্যালাক্সি সমূহ এক অতি মাত্রার দূরত্বে অবস্থান করে বলে তাদের আকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে মানুষ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহা সমুদ্রে এক একটা গ্যালাক্সি এক একটা দ্বীপ জগতের বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। মানুষের কাছে এই জ্ঞান কেবল হাবেলের আবিষ্কারের সূত্র ধরেই সম্ভব হয়েছিল। Ian Ridpath এর লেখায় বিষয়টির গুরুত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টভাবে – This discovery opened up the vision of a awesomely vast universe with galaxies scattered like islands in the sea of space[১৪]। বক্তব্যটি, ভীতিকারক ব্যাপ্তি ও প্রসারতার রাজ্যে মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে দ্বীপ সাদৃশ্য গ্যালাক্সি সমূহের অস্তিত্বের সাক্ষ্য তুলে ধরে। এমনিভাবে আপনি মহাজগত সম্পর্কিত যে কোন একটি মামুলী লেখা পড়তে গেলেই এমনি সব তথ্যের মুখোমুখী হবেন। দ্বীপ জগতের অস্তিত্ব মহাবিশ্বের ব্যাপকতার সাথে এমনিভাবে জড়িত যে, তাদের বাদ দিয়ে কোন বর্ণনা চলে না। এই দ্বীপ জগতের ধারণা এল মাত্র সেদিন – ১৯২৪ সালের কোন এক শুভ মুহূর্তে। ইডুইন হাবেল মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ থেকে যা প্রত্যক্ষ করলেন, পরবর্তীতে বিজ্ঞান জগৎ আনত মস্তক তা মেনে নিল। সারা বিশ্বময় যা এক বিশাল আলোড়নের ঝড় তুলল, সেই জ্ঞানটিই যে আবিষ্কারে ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল–কোরআনের পাতায় এসেছিল তার চেয়েও পরিষ্কারভাবে এক পরম সূক্ষ্মতায় , সেটি কিন্তু কেউ জানতে পেল না। আল–কোরআন এনেছে বহু প্রস্তাব , বহুভাবে মানুষের কাছে এই ধারণাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। মানুষ জেনেছে , মানুষ গ্রহণ করেনি – অথচ কত পরিস্কার ভাবেই দেখুন প্রস্তাবিত হয়েছে দ্বীপ জগতের জ্ঞানটি, – "তোমরা কি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করনা যে আল্লাহ্ কেমন করিয়া

www.pathagar.com

অসংখ্য আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? (৭১ঃ১৫) তিনি স্তর সমূহের অধিপতি"(৭০ঃ৩)।

মানুষ যাকে দ্বীপ জগত বলে জেনেছে, কোরআন তাকে স্তর হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। দ্বীপ ধারণাটি মূলতঃ সমুদ্র পৃষ্ঠের সাথে সম্পর্কিত। দ্বীপ হওয়ার প্রয়োজনীয় উচ্চতা প্রাপ্ত না হলে সমুদ্রের কোন তলকে ডুবো পাহাড় বা পর্বত হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি। অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপে সমুদ্র তলের সংগে জেগে উঠা ভূমি যে উচ্চতার পর্যায় রক্ষা করে – সেই মানটির উপর নির্ভর করে কোনটিকে দ্বীপ অথবা ডুবো পাহাড় বলা হবে। একজন অতি সাধারণ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট যে, নদী বা সমুদ্রের চরাঞ্চলই হ'ল দ্বীপ। কমবেশী সমস্ত দ্বীপ একই সমতলে বলা চলে। কিন্তু মহাবিশ্ব তথা মহাকাশে যে দ্বীপ জগত এর প্রস্তাব আমরা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে পাই, মূলতঃ তারা বিভিন্ন দূরত্ব-তল ও সময়-অবস্থানের পটভূমিতে অবস্থিত। একটিকে উপরে বললে অন্যটিকে নীচু অঞ্চলে রয়েছে বলতে হবে। যদিও মহাজগতের পরিমাপে উচু-নীচু ইত্যাদি জ্ঞান নেই, তথাপিও আপেক্ষিকতার জ্ঞানে আমরা মূলতঃ উঁচু-নীচুর প্রশ্নকে না এনে পারি না। উদাহরণ নিলে বলা যেতে পারে যে, আমাদের মাথার উপর আকাশ অথবা সূর্য। অতএব, আমাদের জানা ডাইমেনশন সমূহের মাত্রায় পরিচিত জ্ঞানের আলোকে আমরা বলতে পারি, একটি গ্যালাক্সি অবস্থানগত দিক দিয়ে অন্য একটির উর্ধে কিংবা নীচে রয়েছে। আর যখন আমরা এ ভাবে বিচার করতে বসি, -- তখন কিন্তু দ্বীপ জগতের ধারণার চেয়ে স্তর বা স্তর জগতই বলা অত্যন্ত সঙ্গত হয়ে পড়ে। আর সে জন্যই আল-কোরআন তার সঠিকতার মাত্রা যাচাইয়ের আরো একটা সুযোগে আমাদের জানিয়ে যায় – "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করিয়াছি"(২৩ঃ১৭)।

কি সে অসংখ্য স্তর? কেমন তার প্রকৃতি? আমরা তার ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর বিবেচনা সমূহ বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্যকে আরো নিখুঁতভাবে দেখতে পারি। সূর্যের যে বিশালতা, শুধুমাত্র তাকেই আমরা একটা স্তর হিসাবে বিচার করতে পারি। দূরবর্তী আকাশের দ্বীপ জগতের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি আমাদের সৌর মণ্ডলে ফিরে আসি, আমরা স্তরের সত্যতা রক্ষিত হতে দেখি। বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্বের সংগঠন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা হ'ল – The hierarchical structure of universe is a planet, a star, a galaxy and a cluster of galaxy.[১৫]

অর্থাৎ মানের উচ্চতর ক্রমানুসারে সাজাতে গেলে নিম্ন থেকে উপরের দিকে এখন পর্যন্ত জানা স্তর বিন্যাস হ'ল একটি গ্রহ, একটি নক্ষত্র, একটি গ্যালাক্সি এবং একটি গুচ্ছ গ্যালাক্সি। সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতেই আপনি বিচার করে দেখতে পারেন যে,

www.pathagar.com

এর প্রত্যেকটাই এক একটা স্তর। বিজ্ঞানের কথা আর কোরআনের তথ্যে তখন কোন পার্থক্য থাকে না। আমরা অনুভব করতে বসি, প্রকৃতই 'তিনি স্তর সমূহের অধিপতি'(৭০ঃ৩)।

এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি — আমাদের ছায়াপথের সবচাইতে নিকটতম প্রতিবেশী। এর ব্যাস প্রায় ১৫০,০০০ আলোক বর্ষের অধিক। স্তর হিসাবে সে এক সুবিশাল স্তরই বটে। প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র এই গ্যালাক্সির অধিবাসী।

স্তর সমূহের অধিপতি মহান আল্লাহের রীতিতে মানের যে ক্রম রয়েছে – তার ধারণা পাওয়া যায় ৮৪ঃ১৯ আয়াতে, –"তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করিবে"। যদিও আয়াতটি মূলতঃ একটি আধ্যাত্মিক প্রস্তাবের বিষয় এবং ৭৩ঃ৩ বা অনুরূপ আয়াত সমূহের সাথে সরাসরি কোন যোগসূত্র রক্ষা করে না – তথাপিও আমরা মানের উচ্চতর ক্রমের একটি ধারাবাহিক বিন্যাস পদ্ধতির সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হতে পারি এবং বিষয়টিকে ৭৩ঃ৩,২১ঃ৩,৭১ঃ১৫ –এই আয়াত সমূহের সাথে মিলিয়ে পড়লে একটা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হয়তো বা ৮৪ঃ১৯ এর সংগে এদের সমন্বয়ে একটি ক্রমবর্ধমান ধারার ইংগিত রয়েছে। আমি যা বলতে চাই , তা হ'ল যে, আল্লাহর বিধানে উন্নতি এবং প্রসারতার ধারা যেহেতু ধাপে ধাপে , সেহেতু তাঁর সৃষ্টিতে আমরা যে ধাপ বা স্তর সমূহ প্রত্যক্ষ করি – হয়ত বা তারা তাদের অবস্থানজনিত মানে এই ধারা ও ধাপের শাসন মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে সত্য ও বাস্তব তা-ই। বস্তুগতভাবে আমরা যা দেখি, পৃথিবী ৭৯১৫ মাইল ব্যাস যেখানে সূর্য ৮,৮৫,৪৬০ মাইল ও আমাদের গ্যালাক্সি হ'ল ৫৮৬,৯৭১,৩৬০,০০০,০০০,০০০ মাইল

www.pathagar.com

এবং স্থানীয় গ্যালাক্সি গুচ্ছের ব্যাস তার চাইতে বহু কোটি গুণ বেশী। ধারাটি যে এখানেই শুধু তা নয় – যত দূরবর্তী অঞ্চলের মহাজাগতিক বস্তুর সন্ধান জানা গেছে, তাদের প্রত্যেকটি তত অধিকতর দ্রুতি নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে; অর্থাৎ দূরত্বের সংগে আনুপাতিক সম্পর্কটি এমন যে, দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুতিও বেড়ে যায়। আল্লাহর কোরআনে ধাপে ধাপে প্রসারের যে ধারণা মিলে বস্তুজগতে আমরা সে প্রসারের চিহ্নগুলো সকল দিক হতে বিজ্ঞানের মহাপ্রাপ্তি হিসাবে প্রত্যক্ষ করি।

আমরা আবার আমাদের মৌলিক আলোচনায় ফিরে আসছি। স্তরের প্রস্তাবটি কি এবং কতদূর কার্যকর তা আমরা দেখতে চাই। পূর্বেই বলেছি, কোরআনের ভাষায় আকাশ শব্দটি যে কয়টি অর্থ প্রকাশ করে তার বিশেষ একটি হ'ল আঞ্চলিক ধারণা। আমাদের ছায়াপথের ব্যাস ইতিপূর্বেই আমরা অবগত হয়েছি। একই সাথে তাও জেনেছি যে, এটি একটি অতি সাধারণ গ্যালাক্সি মাত্র। অথচ তারই যে বিশাল অঞ্চল ১০০০০০ আলোক বৎসর বা ৫৮,৬৯৭,১৩৬,০০০,০০০,০০০ মাইল, বৈজ্ঞানিকগণ যাকে দ্বীপ জগৎ বলে আখ্যা দেন – তাকে একটি আসমানী স্তর বলা যায় কি? এই ছায়াপথের অন্যতম প্রতিবেশী এ্যান্ড্রোমিডার ধারণ ক্ষমতা তার চেয়ে ৩ গুণ। হতে পারে কি সেটি আর একটি স্তর? এমনিভাবে প্রতিটি দ্বীপ জগৎ এক একটি আলাদা আলাদা স্তর এবং এই অসংখ্য স্তরদের কথাই কোরআনে উল্লেখ রয়েছে অতিশয় সহজ সরল ভাবে – 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করিয়াছি অসংখ্য স্তর' বিশিষ্ট আসমান (৭৮ঃ১২)। তাহলে কি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আকাশের এ সমস্ত দ্বীপ জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এক মহাপ্রজ্ঞাশীল মনীষাই আল-কোরআনে আজ থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানুষের জ্ঞানে ধৃত হবার অনেক আগেই তথ্যটিকে অত্যন্ত নিখুঁত বিশুদ্ধতায় প্রকাশ করে তাঁর সত্তার সত্যতার স্বাক্ষরটুকুই রেখে গেলেন? কি করে তা সম্ভব হ'ল? এ জন্যই যে, "তিনিই আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (৬ঃ১)। আকাশ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা হইতে ক্ষুদ্রতর এবং তদাপেক্ষা বৃহত্তর কিছু নাই যাহা সুস্পষ্ট ও জ্ঞানময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই "(১০ঃ৬১)।

আমার সংগ্রহে মোট ৫০০ গ্যালাক্সির সাধারণ তথ্য রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরছি জ্ঞানী পাঠকের অনুধাবন সীমায়। আপনারা অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, আল-কোরআন যে স্তর বিন্যাসের কথা প্রস্তাব করছে, তা কিভাবে সত্য হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পরিসরে অগনিত গ্যালাক্সি একসাথে একই সমতলে অবস্থান করে এবং এ অবস্থানের বিন্যাসটি এমনি যে, যে কোন দিক থেকে বিবেচনা করে পৃথিবীকে যদি সর্বনিম্ন তল হিসাবে গণ্য করা যায়[১৬], সেই নির্দিষ্ট দিকের বিভিন্ন

www.pathagar.com

উচ্চতায় বিভিন্ন দ্বীপ জগৎকে শত সহস্রাধিক সংখ্যায় পাওয়া যেতে পারে যা স্তম্ভ বিহীন অগণিত ছাদ নিয়ে যদি অগণিত ইমারত নির্মাণ সম্ভব হত, তাদের তুল্য। নিম্নে ডাটা গুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে[১৭] ঃ-

গ্যালাক্সির সাংকেতিক নাম	দূরত্ব
NGC 205 NGC 221 (M32) NGC 221 (M32) IC 1613 And (NGC224;M31) And - 1 And - 2 And - 3 NGC 589 (M33)	2.2MLY
4363 Vir (M61) 4321 Com (M100) 4254 Com (M99) 4382 Com (M85) 4394 Com 4395 Com 4406 Vir (M86)	70 MLY
3031 UMa (M81) 55 Sce 3034 UMa (M82) 5236 (M83)	7- 8 MLY
3351 Leo (M95) 3368 Leo (M96) 3556 UMa (M108) 3992 UMa(M109) 4258 CVx(M46)	25MLY

www.pathagar.com

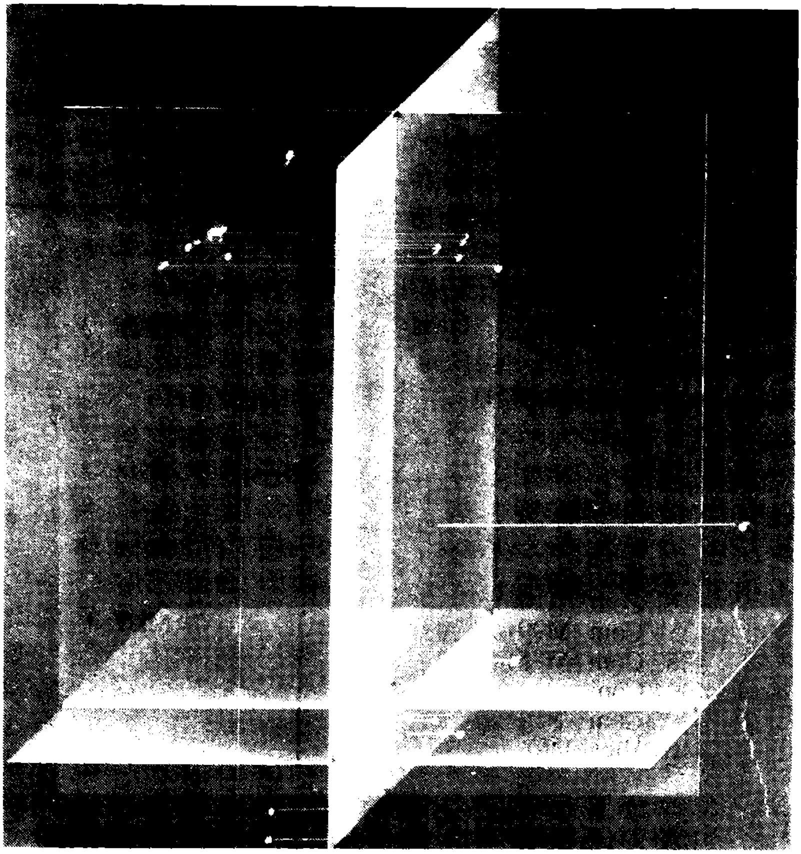

কল্পিত মহাশূন্যে লোকাল গ্রুপ। গ্যালাটিক প্লেইনটি খাড়াভাবে প্রলম্বিত। ইন্টারসেকশন বিন্দুতে ছায়াপথ, নিকটবর্তী ছোট দুইটি বিন্দু ম্যাজিলানিক ক্লাউড, গ্যালাটিক প্লেইনের বামে দূরবর্তী অঞ্চলে এন্ড্রোমিডা ও অন্যান্য গ্যালাক্সিদের গুচ্ছ। ৩০,০০০ আলোকবর্ষ হতে ১৫০,০০০ আলোকবর্ষের প্রতিটি উপ গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি আলাদাভাবে এক একটি স্তর কিংবা গুচ্ছাকৃতিতেও তারা এক একটি মহাস্তর।

4472 Vir (M49)	
4486 Vir (M87)	
4476 Vir	
4478 Vir	70MLY

www.pathagar.com

4569 Vir (M90) 4579 Vir (M58) 4552 Vir (M89) 4621 Vir (M59) 4321 Com (M1000)	70MLY

প্রদর্শিত ছকটি কিন্তু অতিশয় কাছাকাছি আকাশ পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যতগুলো গ্যালাক্সির ডাটা এখানে দেয়া হল, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ যে গতিবেগ নিয়ে গ্যালাক্সিগুলো উড়ে চলেছে , তা মাত্র ২৪০০ মাইল/সেকেণ্ড এর মধ্যে সীমিত। দূরত্বের সংগে এই গতিবেগ বেড়ে চলে। সবচেয়ে দূরের জ্যোতিষ্ক কোয়াসার OQ-172 ১০,০০০ মিলিয়ান আলোকবর্ষ (১০,০০০,০০০০০০ আলোকবর্ষ) দূরের অঞ্চলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় আলোর বেগে ধাবমান।[৯৮] সেই অনুপাতে আমরা যে সকল গ্যালাক্সিদের হিসাব এখানে জানতে পেরেছি , তা আমাদের একেবারেই হাতের মুঠোয়। যাই হউক, পূর্বেই বলেছি, প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় ব্যাস ১০০,০০০ আলোক বর্ষ ; বিভিন্ন ছোট ছোট গ্যালাক্সি, বিশেষতঃ উপগ্রহ্ গ্যালাক্সিগুলোর ব্যাস অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এর গড় মান নীচে নেমে আসে। মূলতঃ এমন গ্যালাক্সি রয়েছে , যাদের ব্যাস এই পরিমাপের চাইতে অনেক বেশী। এমনি বিভিন্ন পরিমাপের গ্যালাক্সিদের বিভিন্ন দূরত্ব তথা উচ্চতার মানে একই সমতলে থেকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা, তা সমষ্টিগতভাবে দেখলেও এক এক দূরত্ব তলে এক একটি স্তর/মহাস্তর বলে বিবেচিত হবে। আর ১৬০,০০০ আলোকবর্ষ হতে ১০,০০০,০০০,০০০ আলোকবর্ষের যে ভয়াবহ দূরত্ব[৯৯], তার মধ্যে রয়েছে এমন অসংখ্য তল বা ধাপ – যারা একক ও সমষ্টিগতভাবে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য স্তর, বিরাজ করছে মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতীক ও বাণীর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে। সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে – "যিনি স্তর সমূহের অধিপতি" (৭০ঃ৩) – তাঁর মহাবাণীর ; "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি অগণিত স্তর সমূহ" (২৩ঃ১৭)। এর প্রমাণ হিসাবে তথ্য সরবরাহ ও সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এই বইয়ের স্বল্পজ্ঞান লেখক, কোন আবেগতাড়িত মুসলমান কিংবা কোরআনের প্রতি ভক্তি আপ্লুত কোন ইসলামিক ব্যক্তিত্ব নয় – একটি অত্যন্ত নিরপেক্ষ, ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী জ্ঞানসাধক গোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশই কখনও কোরআন বিশ্বাস করেনা, এঁর প্রতি যাদের কোন শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নেই , তেমনি বিজ্ঞানীগণ। তথ্যের উৎসও তাদের গতিধারা আবারও একটিবার কোরআনের সত্যতাকেই তুলে ধরে – "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁহার জ্ঞানের আলোকে পূর্ণতা বিধান করিবেন" (৬১ঃ৮); এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সত্য যে, কোরআনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যারা ভ্রুকুটি করে থাকেন – তাদের দ্বারাই আল্লাহ কোরআনের সত্যাসত্য তুলে ধরেছেন। হতভাগ্য সম্প্রদায়

www.pathagar.com

জানতেও পারে নাই যে, কোরআনের প্রতি যাদের সমস্ত ঘৃণা, তারাই সেই কোরআনের সবচাইতে বড় দাস, সেই কোরআনকে সত্য প্রমাণে তারাই আল্লাহর সবচাইতে বড় হাতিয়ার। যাঁর অস্তিত্বের প্রতি তাদের চরম অসহনশীল মনোভাব আমরা লক্ষ্য করি, সেই মানুষগুলোই কিনা কোরআনের সত্যকে একের পর এক প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছে অদৃশ্য এক প্রেষণায়। হায় ! তারা জানেও না, তাদের আবিষ্কার কোরআনকে কত বৃহৎ ভাবে তুলে ধরে। সত্যিই "তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের বোধ শক্তি নাই" (৮ঃ৬৫)।

গ্যালাক্সিদের যে ধারণা আমরা ইতিমধ্যে পেলাম, আমরা ইচ্ছা করলে তার চাইতেও বড় কোন উদাহরণ আনয়ন করতে পারি। ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন যে, আকাশের বিন্যাস শাসনে গ্যালাক্সিরা গুচ্ছায়িত অবস্থায় থাকে। একটি গুচ্ছের আইন, কানুন, শৃংখলা অন্য একটি গুচ্ছের অনুরূপ নয়, কিন্তু একই গুচ্ছের অন্যান্য গ্যালাক্সিদের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র ও শাসনের সাদৃশ্যপূর্ণ বন্ধন। এ জন্যই এই সব গ্যালাক্সি একই সাথে গুচ্ছকৃত অবস্থায় থাকে। এমন সব গুচ্ছের সংখ্যা রয়েছে অযুত। শুধুমাত্র আমাদের ছায়াপথ যার শাসনাধীন, সেই 'লোকাল গ্রুপ' এর বিন্যাস চিত্রটি দেখুন ঃ[১০০]

THE LOCAL GROUP OF GALAXIES

GALAXY	DIAM KLY	DISTANCE KLY(LY × 1000)
Milky Way (M.W)	100	–
LMG	30	160
SMG	25	180
UMi system	3	220
Sculptor system	7	270
Drco System	4.5	330
Carina System	4.8	550
Fornax System	15	800
Leo II system	5.2	750
Leo I System	5	900
NGC 6822	9	1500
NGC 147	10	1900

www.pathagar.com

NGC 185	8	1900
NGC 205	16	2200
NGC 221 (M32)	8	2200
IC1613	16	2200
And (NGC224;M31)	130	2200
And I	1.6	2200
And II	2.3	2200
And III	0.9	2200
NGC598 (M33)	60	2300

এই লোকাল গ্রুপের গ্যালাক্সি গুচ্ছকে যদি শুধুমাত্র একটি স্তর বলে বিবেচনা করা হয়, তবে দৃশ্যমহাবিশ্বের অযুত সংখ্যক গুচ্ছকে আমরা অযুত সংখ্যক স্তর সৃষ্টি করে থাকতে দেখি। যে কারণে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র কোন গ্যালাক্সিতে গুচ্ছায়িত অবস্থায় আছে – সম্ভবতঃ অনুরূপ কিংবা তার চাইতে বড় কোন কারণে একটি গ্যালাক্সি–দল গুচ্ছায়িত অবস্থায় থাকতে পারে। একটি গ্যালাক্সিকে তাই আমরা যখন দ্বীপ জগৎ বলতে দ্বিধাবোধ করি না – বিশেষতঃ তার বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বীকৃতির কারণে, অনুরূপভাবেই কোন একটি গুচ্ছ-গ্যালাক্সিকে আমরা দ্বীপ মহাজগৎ বলতে পারি। বলতে পারি গুচ্ছ–গ্যালাক্সি, দ্বীপ জগতের সমষ্টি এক মহাস্তর। আমাদের লোকাল গ্রুপে ছায়াপথের সংগে রয়েছে আরো ২০টি বিভিন্ন মাপের স্তর। সবচাইতে বৃহত্তর হারকিউলাস ক্লাস্টারে রয়ছে এমন ১০,০০০ গ্যালাক্সির তালিকা। লোকাল গ্রুপ ও হারকিউলাস ক্লাস্টারের অন্তবর্তী সকল পরিমাপের গুচ্ছগুলো কি পেতে পারে না মহাস্তরের বিবেচনা? আপনি কি পারেন এ যুক্তিতে খণ্ডন করে দিতে, কিংবা ভুল প্রমাণিত করতে?

আমাদের অতি স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি এবং অত্যন্ত সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও কোরআনের তথ্যের একটা হুবহু মিল দেখতে পাই। বিজ্ঞান যাকে দ্বীপ জগৎ নাম দিয়েছে, কোরআন তাকে আকাশীয় স্তর বিবেচনা করেছে। আলোচনার কলেবরে ইতিমধ্যেই সংবেদিত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কোরআনের নামকরণ পদ্ধতিই গুণাগুণ ও মাত্রাগত অবস্থানের পরিমাপের সঠিক ; অর্থাৎ গ্যালাক্সিদের নামকরণে বিজ্ঞান যেখানে দ্বীপ জগৎ ধারণাকেই সব চাইতে বেশী প্রসারিত মনে করেছে, কোরআন সেটিকে শুদ্ধতার পরমতায় বিশ্লেষণ করে দিয়ে বলেছে যে, মহাকাশের মহাগর্ভে দূরত্বের স্থানাংকের অনুপাতে দ্বীপ জগতের উদাহরণ, প্রকাশের একটি দুর্বলতা ও চিন্তার অপ্রসারতা মাত্র ; স্তরের ধারণাটিই টিকে যায় বিশুদ্ধতার পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে অত্যন্ত সংগত কারণে ; সময় ও দূরত্বের পরিমাপে গ্যালাক্সিদের বিস্তার ও বিন্যাস একই তলে দ্বীপ হওয়ার চেয়ে

www.pathagar.com

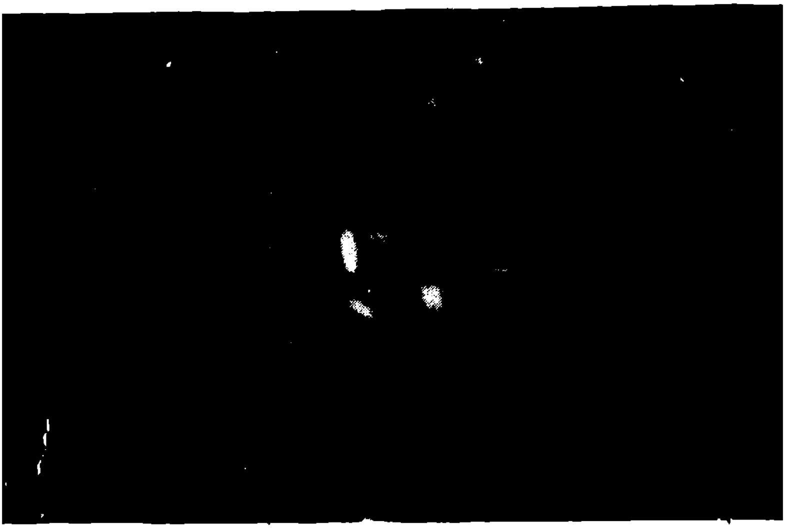

Surpens Constellation এর ৫টি গ্যালাক্সির একটি গুচ্ছ।
গুচ্ছায়িতভাবে এগুলি একটি মহাস্তর।

অসংখ্য তলের স্তর হওয়ার ধারণাটিকেই অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক বলে তুলে ধরে। আকাশের এই সকল দ্বীপ জগতের সংগঠন ও বিন্যাস, যেন মহাবিশ্বের সময় ও দূরত্বের অদৃশ্য তাকগুলোতে একের উপরে আর এক এবং তার উপর সহস্র – এমনি রীতিতে সাজিয়ে রাখা স্তর সমূহ। এমনি তাদের বিন্যাস যে, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আয়ুষ্কাল কোনটির পরিমাপে সময় ও দূরত্বের অতি আদিম ও অলংঘ্য ব্যবধানকে আমরা অতিক্রম করার শক্তি রাখি না।

প্রিয় পাঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানিয়ে দেব কি? শতাব্দীর বিশ–দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে, মহাবিশ্ব বলতে আমরা দৃশ্য জগতের যেটুকু খালি চোখে দেখতে পাই , তার পরিসীমা ততটুকুই। কিন্তু হাবেলের আবিষ্কারের পর পরই মানুষ জানতে পেল অত্যন্ত দুঃখ মিশ্রিত বিস্ময়ের সাথে যে, তাদের এতদিনের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত ভিত্তিহীন এবং অপ্রতুল। খালি চোখে দেখা যায়, এমনি মহাকাশের যে বিশালতাকে তারা এতদিন মহাবিশ্ব বলে জেনেছে , মূলতঃ তা ছিল শুধুমাত্র একটি অতি সাধারণ দীনহীন গ্যালাক্সি বা আকাশী স্তর, আমাদের ছায়াপথের রাজ্যে মাত্র। বিংশ শতাব্দীর উন্নততর প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মানুষকে সর্ব প্রথম

www.pathagar.com

হাবেলের আবিষ্কারের দ্বারা জানিয়ে দিল যে, এতদিন মানুষ যাকে বিশ্ব- জগৎ ভেবেছে , তার সমান ও তার চেয়ে বড় এমন সব জগতের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে ১০০ কোটি। ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর সীমার ওপাড়ে বর্তমান মানুষের পক্ষে কোন

Coma Berenices এর গ্যালাক্সির সংখ্যা ৮০০, এটি ৩৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একটি সুপার-গ্যালাক্সি। এককভাবে এটি একটি মহাস্তর।

প্রকার প্রযুক্তি দিয়ে শুধু দেখতে পাওয়ার বিষয়টিই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষ যেহেতু ১০,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরে OQ -172 কোয়াসারকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে , সেহেতু দৃশ্য জগৎ সীমা ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসরের ওপাড়ে অবশ্যই আমাদের দৃশ্য জগতের মতই থাকতে পারে গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সিগুচ্ছ। আজকের বিজ্ঞানে সুপার স্পেসের ধারণা এসেছে অনেক বড় প্রস্তাব ও অস্তিত্বের দাবী নিয়ে ; মানুষ এখন মনে করে স্বস্তি পাচ্ছে যে, আমাদের দৃশ্য জগৎ মূলতঃ একটি সুপার স্পেসের অংশ বিশেষ। আমার আলোচনাকে দীর্ঘায়িত না করে শুধু আপনাদের মনোযোগকে একটি মাত্র বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই যা হ'ল,

www.pathagar.com

বহু জগতের ধারণা। মানুষ এখন সুদৃঢ় চিত্তে বহু জগতের কথা বিশ্বাস করে, কারণ তাদের বাহ্যিক বস্তুগত অবস্থান প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধ। এই ধারণার জনক হাবেল সর্ব প্রথম বিষয়টিকে বিজ্ঞান লব্ধ তথ্যাকারে পরিবেশন করলেন মাত্র ১৯২৪ সালে। অথচ তার ১৪০০ বৎসর আগে আল-কোরআন দিয়েছিল এর অতি নির্ভরযোগ্য তথ্য। আল-কোরআনের পাতা খুললেই সর্বপ্রথম যে পঙতিটি, সে-ই বহন করে নিয়ে এসেছে এই মহামূল্য ধারণাটি, - "সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর যিনি জগৎ সমূহের প্রভু "(১ঃ১)। অনুভব করুন, আল-কোরআনের মত একটি মহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ-গাঁথুনির সর্বপ্রথম প্রস্তাব হল বহুজগতের ধারণা - " মহান আল্লাহই জগৎ সমূহের প্রতি পালক (৪০ঃ৬৪)। তিনি আরো সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তোমরা অবগত নও" (১৬ঃ৮)।

এভাবে খ্রীষ্টীয় সাত শতকে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে কি করে কোরআন বহুজগতের ধারণাকে প্রস্তাব করেছিল? কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে বহুজগতের প্রস্তাব কোরআন অবতীর্ণের প্রায় ১৪০০ বৎসর পরে এসে যখন বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ তথ্যের সাথে এক হয়ে পড়ে, তখন আমরা উপায়হীন ভাবে বলতে বাধ্য হই, - "আল-কোরআন বহুজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতেই অবতীর্ণ (২৬ঃ১৯২)। এই কোরআন আল্লাহ ব্যতিত অপর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার সমর্থন ও ইহা বিধান সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। সন্দেহ নাই যে, উহা জগৎ সমূহের প্রভু আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ"(১০ঃ৩৭)। অতএব, আমরা বলতে পারি, আল-কোরআনের সুপ্রসারিত অবদানের কাছে বিশ্ব সভ্যতার অন্যান্য অসংখ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মত এই বহু জগতের ধারণার বিষয়টিতেও জ্যোতির্বিজ্ঞান এই মহাগ্রন্থের জ্ঞানের ঋণে বাঁধা পড়ে আছে।

আমরা আরো একটা ক্ষেত্র-মাত্রা বিচার করে দেখতে পারি। সেটি হ'ল আধিপত্যের দাবী ; পৃথিবীর আর কোন ধর্ম গ্রন্থে আধিপত্যের এত ব্যাপকতার কথা দাবী করা হয়নি। এই দাবী সমূহে মহাবিশ্বের গর্ভে অগনিত আকাশ ও পৃথিবীর উপর মহান আল্লাহর কর্তৃত্বের বিষয়টি ফুটে উঠে। আমরা বারংবার আকাশ সমূহের তথা বিশ্বসমূহের দাবীর প্রতি আল্লাহর সুদৃঢ়তা ও পুনরাবৃত্তি খুঁজে পাই - "যাহা কিছু আকাশ সমূহে এবং ভূ-মণ্ডলে রহিয়াছে, সমস্তই আল্লাহর (২ঃ১১৬) আকাশ সমূহ ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই" (৫৭ঃ২) এমন অনেক সংখ্যক আয়াত রয়েছে, আধিপত্য যার মূল বক্তব্য। এই আয়াতগুলো মূলতঃ দুটি তথ্য বড় করে তুলে ধরে, এর একটি বহু জগতের ধারণা, অন্যটি বহুজগতের কর্তৃত্ব। আর এই দুই ধরনের তথ্য সমূহকে জ্ঞান ও যুক্তির পরিমাপে বিচার করলে পাওয়া যায়, "তোমাদের উপাস্য হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ - তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই

www.pathagar.com

(২ঃ১৬৩), তিনিই আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (৬ঃ১) যিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রহস্য অবগত আছেন (২৫ঃ৬)। তাঁহারই সকাশে পুণরুত্থান" (৬৭ঃ১৫)।

---

৮৭ । The Bible The Quran and Science - Dr. Maurice Bucaille.
৮৮ । The Expanding Universe - John Gribbin.
৮৯ । Galaxies and Quasars - Kaufmann.
৯০ । Stars & Planets - Ian Ridpath.
৯১ । ১ পারসেক = ৩.২৬ আলোক বৎসর।
৯২ । Galaxies and Quasars - Kaufmann.
৯৩ । The Edge of Eternity - John Gribbin.
৯৪ । Stars & Planets-Ian Ridpath.
৯৫ । The Cambridge Atlas of Astronomy - Introduced by; sir Barnard Lovell.
৯৬ । মহাবিশ্বের পরিমাপে উচু নীচু নেই – এটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র।
৯৭ । MLY মিলিয়ন আলোক বৎসর। প্রদর্শিত সংখ্যা গ্যালাক্সির ক্যাটালগ নম্বর । And. UMa, NGC ইত্যাদি Constellation সংকেত।
৯৮ । National Geographic Vol 145 No 5 May 1974 & The Stars by Roger Hall.
৯৯ । যথাক্রমে লোকাল গ্রুপের সবচাইতে কাছের গ্যালাক্সির দূরত্ব ও সর্বদূরবর্তী কোয়াসারের দূরত্ব।
১০০ । LY আলোক বৎসর, KLY হাজার আলোক বৎসর, DIAM ব্যাস।

www.pathagar.com

৪

মহাবিশ্বের অপরূপ রূপ

ডিসেম্বরের ছুটির দিনের উপভোগ্য সন্ধ্যাটি আজ রং –এ আমার মন চেয়ে নিয়েছে। আমি প্রাণভরে দেখছিলাম আকাশের অপূর্ব রূপ মাখা দৃশ্যগুলো। সাদা সাদা মেঘগুলো সুনীল আকাশের চির পরিচিত সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্থিরভাবে। যখন সূর্য ডুবতে শুরু করল, শুরু হল এক অপূর্ব রঙের খেলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা মেঘগুলো হলুদ ও কমলা রঙের মিশ্রণে বিরাজ করতে দেখলাম। তার একটু পরই সেগুলো ধারণ করল গাঢ় লাল কমলা রং। তার একটু পর ধূসরের উপর লালচে কাল লেপন পড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। এখন সাদা মেঘগুলো কোথা থেকে পেয়ে গেল ছাই রং , তাদের কান্তি জুড়ে লেপে রইল লাল কমলার একটা মিশ্র ছোঁয়া। অস্তাচলে সোনালী ও কমলা রঙের আভার উপরে আর একটা গাঢ় লাল পরশ দেখা যাচ্ছিল – তারপর লাল, ধূসর, কাল, কমলা ও অন্ধকার মিলে এমন এক রঙের সৃষ্টি হতে দেখলাম যে, প্রকৃতিতে আমাদের জানা রঙের নাম দিয়ে তাদের প্রকাশ সম্ভব নয়। আমাদের চেনা সূর্যাস্তের মাঝে এ অচেনা রূপটি কি করে জীবনের এতগুলো বছর পর্যন্ত দেখতে পাইনি, তা ভাবতে নিজের দীনতা চোখের সামনে অসংখ্য পরিহাস ও লজ্জার কালিমা ছড়িয়ে গেল।

আকাশের সাথে রঙের সম্পর্ক কতটুকু তা কিন্তু আমরা একটুও অনুভব করি না। বিশেষত অনুভব তো দূরের কথা, বাস্তবটি যতদূর সত্যের বিস্তৃতি নিয়ে বিরাজ করে – তাকে আমরা কোনদিনও কল্পনায় আনতে সক্ষম নই। শুধু তাই নয়, সত্য ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক উপাত্ত–প্রসূত জ্ঞান যদি আমাদের সামনে অত্যন্ত সঠিকতার মাত্রায় এনে হাজির করা যায় – তথাপি আমরা তা গ্রহণ করতে অসংখ্য দ্বিধার মুখোমুখি হব।

যা হোক, রং বলতে যা বুঝায়, তার সাথে আকাশের সঠিক সম্পর্ক কতটুকু তা অত্যন্ত ক্ষুদ্রসংখ্যক মানুষ অবগত আছেন। আকাশের অপরূপ রূপ বহু কাব্যিক ও সাহিত্যিক মনকে আকৃষ্ট করে, একে নিয়ে সভ্যতার গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে হাজারো সাহিত্যকর্ম, অথচ তাদের কেউ জানে না, তারা সম্মিলিত মনের শত লক্ষ কোটি কল্পনার তুলিতে জ্ঞাত–অজ্ঞাত সকল রং মাখিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্ট করতে সক্ষম – তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সৌন্দর্যের লীলাভূমি হয়ে আমাদের উপরে অদ্ভুত আকাশ বিরাজ করছে। আকাশের মহাশূন্যতার রাজত্বে শুধু রং আর রং ; হাজারো

www.pathagar.com

রঙের মিশ্রণে এক অসুর সৌন্দর্যের রাজত্ব এই আকাশ তার সৌন্দর্যের বিস্তৃতি চিরদিনের জন্য রেখে দিয়েছে আমাদের দর্শন সাধ্যের বাইরের সীমানায়। তার প্রাচুর্য, বিশালতা, রূপের মাত্রা, বৈচিত্রের ধারা এই সবের দিকে আলোকপাত করেই J.B.S. Haldane বলেছিলেন, The universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose.[১০১] মহাবিশ্ব শুধু আমরা যতদূর ভেবে থাকি, তার চাইতেও বৈচিত্রতর নয় – আমরা আসলেই যা ভাবতে সক্ষম তার চেয়েও অনেক বেশী বৈচিত্রপূর্ণ। আর এমনি সব বৈচিত্রের একটি – 'মহাবিশ্বের অপরূপ রূপ' হল আমাদের এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। আলোচনা আমরা সৌরজগৎ থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বের দিকে প্রসারিত করতে চাই।

সূর্য পরিবারের সবচাইতে নিকটতম গ্রহ বুধ এর রং , উজ্জ্বলতা হুবহু চাঁদের মত মনোমুগ্ধকর । ইউ এস মেরিনার-10, ১৯৭৪ সনে এই গ্রহটির ব্যাপক প্রসার ছবি তুলে পাঠিয়েছে। সেগুলোতে প্রতীয়মান হয় যে, বুধ গ্রহটি রং , চেহারা ও উজ্জ্বলতায় একেবারেই চাঁদের মত [১০২]। চাঁদ কার কাছে আরাধ্য নয়? পৃথিবীর মানে চাঁদ কিন্তু আসলেই একটি রূপের উদাহরণ।

স্বর্গের রূপসী, সূর্য পরিবারের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র রূপের আর একটি প্রতীক যে জন্যে প্রাচীন ব্যবিলীয়নরা তাকে Mistress of Heaven নামে অভিহিত করেছিল। এষ্ট্রোনোমারগণ তার রূপের বর্ণনা দিতে অল্প কথায় তুলে ধরেছেন, We saw a moon like panorama......[১০৩] অর্থাৎ প্রকৃতিতে শুক্রের অবস্থান আর একটা সুন্দর মনোহর চাঁদের মত আকাশচারীদের চোখে ধরা পড়েছে।

তারপর আসে পৃথিবী। পৃথিবীর সীমারেখা না ছেড়ে গিয়ে পৃথিবীকে দেখা সম্ভব নয়। অসংখ্য আকাশ অভিযানের নভোচারিগণ তাদের পরিচিত পৃথিবীর অজানা রূপটি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। এ্যাপোলো- ৮ এর দলপতি ফ্রেঙ্ক বোরম্যান পৃথিবীর এমনি অপরিচিত রূপটি দেখে যে অনুভূতি পেয়েছিলেন, তাকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেছেন – We were just saying that there is beautiful earth out there.[১০৪] এত অপরূপ পৃথিবী আমাদের ! কিন্তু কি তার রং? বলেছেন – Archebald Mac Leish- To see the earth as it truely is, small and blue and beautiful in that eternal silence where it floats.[১০৫] অনন্ত ও শাশ্বত নীরবতার রাজ্যে ভাসমান আমাদের পৃথিবীটি একটি ছোট, নীল ও অপূর্ব সৌন্দর্য। Ian Ridpath – এর ভাষায় পৃথিবী একটি নীল ও হাল্কা–সাদা সংমিশ্রণের রূপসী গ্রহ[১০৬]। Dr Thomas O Paine তার 'Next Step in Space –

www.pathagar.com

প্রতিবেদনটিতে পৃথিবী সম্পর্কে একজন নভোচারীর আবেগঘন যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার ক্ষুদ্রাংশ আপনাদের সামনে পেশ করা হল, – To summarise the whole, it appears an unthinkably beautiful object of a mixture of blue, white, red, violet, dark and light green with slight yellowish appearance.[১০৭] আমাদের পৃথিবীর রং ও রূপের সার চিত্রটি হল, একটি অচিন্তনীয় সুন্দর জগৎ – নীল, সাদা, লাল, বেগুনি, কাল ও হাল্কা সবুজের উপর সামান্য হলদে ছোঁয়ায় যা সম্ভব তেমনি একটি মায়াময়ী রূপ। অপরূপ এই পৃথিবীর অধিবাসী হয়েও আমরা কত হতভাগ্য যে আমাদেরই আবাসস্থল পৃথিবীর রূপটি অবলোকন করবার অধিকার আমাদের নেই।

পৃথিবীর পরবর্তীতে আসে Red-Planet নামে অতি পরিচিত মংগল। তার রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে Rick Gore তার 'Sifting for life in the Sands of Mars[১০৮] প্রবন্ধে লিখেছেন – To every ones surprise, the dust in the air hung like a hozy smog, scattering sunligth and thereby making the sky a creamy-orange-pink and a hundred time brighter than the faint blue that was expected. আমরা জানতে পেরেছি , আমাদের অতি পরিচিত লাল গ্রহ মঙ্গলের আকাশ ও তার গ্যাসীয় বলয় হাল্কা পীত, কমলা ও মলিন লাল বর্ণের এবং বিজ্ঞানিগণ যে ভাবে দেখতে পাবে আশা করেছিলেন – তার চাইতে শতগুণ বেশী উজ্জ্বল সৌন্দর্যমণ্ডিত অবয়ব নিয়ে মঙ্গল তাদের চোখে ধরা দিয়েছে।

তারপরে আসে বৃহস্পতি। সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। টেলিস্কোপে বৃহস্পতিকে বিভিন্ন রং – এ দেখায়। হরেক রকম রঙের মিশ্রণে মিশ্র-সৌন্দর্যের বলয় (belts) গ্রহটিকে ঘিরে নয়নানন্দ দৃশ্যের সৃষ্টি করে। মিথেন ও এ্যামোনিয়ার জন্য মূলত একে হলুদ কিংবা সবুজাভ–হলুদ দেখায়। এ ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে লাল বাদামী, বেগুনি ও নীল ইত্যাদি বিভিন্ন রং–এর প্রাধান্যে সৃষ্ট অপরূপ দৃশ্যমণ্ডল [১০৯]। আমাদের তিনটি পৃথিবীর আকৃতির সমান বৃহস্পতির রহস্যঘেরা Red-Spot আবিস্কারের পর হতে আজো অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে [১১০]। আবিষ্কৃত মোট ১৪টি চাঁদের মধ্যে চোখে পড়ার মত চারটিকে আপনি একটি বাইনিকিউলারেই দেখতে পাবেন। স্নেহ প্রতীম নাবিল আহমেদ ও তার বাবা শ্রদ্ধেয় ডঃ আবু আহমেদ তাদের ব্যক্তিগত ৮" রিফ্লেক্টর টেলিস্কোপে আমাকে বৃহস্পতি, অন্যান্য গ্রহ , আমাদের গ্যালাক্সি ছায়াপথের বিভিন্ন গ্লোবুলা, ষ্টার ক্লাষ্টার ও ২২ লক্ষ আলোক বৎসর দূরবর্তী এণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির প্রতি দৃষ্টি ফেলার সুযোগ করে দেন। ভাষা ও বর্ণনার অসাধ্য এক অদৃষ্ট পূর্ব সৌন্দর্যে মুহূর্তে আমার মন ছেয়ে গেল। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আকাশের অসীম সৌন্দর্য সম্পর্কে তথ্য দান করে। এখানে আমরা অতিশয় সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সৌন্দর্যের সৃষ্টির সংগে রয়েছে রং –এর সম্পর্ক। রূপ মূলতঃ রং এরই সৃষ্টি। অর্থাৎ আকাশের রং ও রূপের সীমাহীন বিশালতাই কোরআনের ১৫ ঃ ১৪,১৫ আয়াত দু'টির মৌলিক প্রস্তাব।

ইতিমধ্যেই আমরা সৌর দুনিয়া সম্পর্কে যতদূর জানতে পেরেছি , তা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, আমরা যদি এমন কোন পরিবেশ পেতাম বা তা সৃষ্টি করা সম্ভব হত, যেন সবগুলো গ্রহকে পাশাপাশি এনে এক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হচ্ছে , তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে আমাদের সৌরজগৎ এক অকল্পনীয় রূপ–সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে চাঁদের মত রজত শুভ্র গ্রহ রয়েছে ; নীল, সাদা, লাল, বেগুনি, কাল ও হাল্কা সবুজের উপর হলদে ছোঁয়া পাওয়া পৃথিবী রয়েছে , লাল গ্রহ রয়েছে , হলদে–সবুজ বা হলদে–পীত বর্ণের বৃহস্পতি এবং আই ও, ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিষ্টোসহ অন্যান্য চাঁদগুলোর সোনালী–রূপালী সৌন্দর্য রয়েছে , শনির মত লাল কমলা গ্রহ ও তার অপূর্ব দর্শন বলয়মণ্ডল রয়েছে, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোর মত হাল্কা সবুজ, সবুজ, নীল–সবুজ ইত্যাদি রঙের গ্রহদের বসবাস রয়েছে। সবচেয়ে ব্যর্থতার দিকটি হল যে, এই সব রং ও রূপ সৌন্দর্যকে বর্ণনার জন্য কোন ভাষাই স্বার্থকভাবে সমর্থ নয়। এর কারণ, রং সমূহের মিশ্র–সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি। আমরা মানুষ এই সব মিশ্র রং –এর সাথে পরিচিত নই , এদেরকে বর্ণনা দেয়ার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট উপযুক্ত শব্দ কিংবা ভাষা নেই। আরো অত্যন্ত আশ্চর্যরকম পরিবেশটি হল, প্রতিমুহূর্তে এই রঙের পরিবর্তন এবং নতুন নতুন রঙের আবির্ভার। আলোকের প্রতিফলন, বিক্ষেপন, আপতনের তীর্যকতা, অন্যান্য পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছুর উৎকর্ষতম সম্মেলনে সৃষ্ট একটি রং–কে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে দেখা যায় না – আবির্ভাব হয় নতুন নতুন রং ও ছটার। মানুষ এগুলো দেখলে কেবল বিস্ময়ে বিমূঢ়ই হবে না, হতবুদ্ধিকর এই রূপ ও সৌন্দর্য তাকে নেশাগ্রস্ত করে দেবে। এ সবই ১৯ শতকের শেষ হতে শুরু করে তার পরের কথাবার্তা। এর পূর্বে মানুষ টেলিস্কোপের অনুন্নত প্রযুক্তিতে যতদূর জানতে পেরেছে তা কখনোই নিখুঁত কোন ফলাফলের দাবীদার ছিল না। স্পেক্ট্রোস্কোপি বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দিল ১৯ শতকের শেষাংশে এবং মানুষের জানার সীমা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে লাগল একে একে। ৬০ দশকের পর মহাকাশযান প্রযুক্তি মানুষকে তার নোংরো বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ পেরিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহায্য করল, আর আমরা সেই নিখুঁত রং রূপ সৌন্দর্যের সাথে একে একে পরিচিত হতে শুরু করলাম। যারা এসব নিয়ে সবচাইতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ লাভ করল, তাদের কেউ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে মন্তব্য করল – The universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose - J.B.S. Haldane এর'এই মন্তব্যটি ৭০ দশকের একটি ঘটনা।

www.pathagar.com

তিনি কোরআন পাঠ করেননি। করলে দেখতেন, মহাবিশ্ব সম্পর্কিত তার এই আশ্চর্য হবার ঘটনাটি আজ থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহান আল্লাহ্ একজন নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখনিসৃত কোরআনের বাণীতে অত্যন্ত নিখুঁত বিশুদ্ধতায় প্রকাশ করে রেখেছেন।

উদ্ধৃত আয়াতে (১৫ঃ১৪) ব্যবহৃত 'লাও' অব্যয়টির দিকে আপনার দৃষ্টিকে আকর্ষিত করতে চাই। আরবী ব্যাকরণে 'ইন' 'ইজ' 'লাও' (ان - اذ - لو) এই তিনটি 'যদি' অর্থ প্রকাশক। এর মধ্যে শুধু লাও (لو) এর ব্যবহার অতীত বাচন পদ্ধতিতে (যেমন 'যদি' আকাশের দরজা খুলিয়া ধরিতাম) এমন যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবধারায় প্রায়োগিক উপযোগিতাকে পূর্ণ করতঃ কর্তা কর্তৃক প্রতিবেদিত ক্রিয়াটি সম্পাদনের বিষয়ে সর্বকালীন অসম্ভাব্যতা ও সাধ্যহীনতাকে নির্দেশ করে। অন্যভাবে বলা যায় – 'লাও' এর দ্বারা প্রস্তাবিত 'যদি' টি যে শর্ত সৃষ্টি করে , সেটি কখনো কার্যত ঘটবে না কিংবা কখনো উহা সম্ভব হবে না – এমনি অর্থ প্রকাশ করে থাকে। ১৫ঃ১৪ আয়াতেও এই শব্দাংশটির এমনি অর্থ আমাদেরকে জানায় যে, আকাশের এমন কোন সম্ভাবনা মানুষের জন্য খুলে ধরা হবে না এবং মানুষ মহাসৃষ্টির এমন কোন মাত্রা-গভীরতায় পৌছতে সক্ষম হবে না যে, চোখ বিভ্রান্তিকর সেই মহাজাগতিক সৌন্দর্যকে মানুষ দৃষ্টির সামনে এনে দৃশ্য দেখার মত করে অবলোকন করবে। আপনি বলবেন, তাহলে এই তথ্য পরিবেশনের কারণ কি? মূলত আমরা এর উত্তর খোঁজার মধ্যে আমাদের বহু প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাই। আপনারা অবগত রয়েছেন যে, আল-কোরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বাণী – "পড় (জ্ঞানার্জনার্থে) তোমার প্রভুর নামে (৯৬ঃ১) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (৯৬ঃ৪) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সে যাহা জানিত না" (৯৬ঃ৫)। ইত্যাদি ও অনুরূপ আরো অনেক আয়াতে জ্ঞানার্জন মানুষের জন্য আল্লাহের পক্ষ থেকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে। আবার আল-কোরআনই মানুষের অগ্রযাত্রার একটি সম্ভাবনাকে অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয়ে প্রকাশ করেছে , "তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করিবে" (৮৪ঃ১৯)। অর্থাৎ কোরআন জ্ঞানার্জন ও তজ্জনিত কারণে মানুষের উন্নতিকে শুধু স্বীকারই করে না, একই সাথে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে অত্যন্ত প্রসারিত উদারতায় গ্রহণও করে এবং বিষয়টিকে আপনি অধিকতর সত্যতায় যাচাই করবার সুযোগ পাবেন খোদ কোরআনের পাতাতেই। সবখানে দেখবেন, আপনার জানার প্রেষণাতে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য রয়েছে সরাসরি নির্দেশ – "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর" (১০ঃ১০১)। এই সব আয়াতের আলোকে অতি সুদৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, কোরআন মনীষা মানুষের জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করা এবং মানুষের জ্ঞানকে সাহায্য করার বিষয়টি বিবেচনা করে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি জানেন, একদিন মানুষ তার জ্ঞানে মহাকাশ সম্পর্কে প্রসারিতভাবে

www.pathagar.com

অবগত হবে, সে সাথে জানতে সক্ষম হবে মহাজাগতিক অসীম সৌন্দর্যকেও যদিও কিনা সীমিতসংখ্যক জ্ঞানসাধক বিজ্ঞানী ছাড়া সমস্ত পৃথিবীবাসীর কাছে তা থেকে যাবে চির অদৃশ্য ও অজ্ঞাত।*আর সে জন্য তিনি রেখে গেলেন চিহ্ন হিসাবে এই 'লাও' অব্যয়টির সংযোজন। আল-কোরআনের পাতায় প্রদত্ত তথ্যে বহুযুগ পূর্বে চরম বর্বরতার অন্ধকারে একজন নিরক্ষর মানুষের দ্বারা অত্যন্ত বৈরী পরিবেশে হাজার চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তিনি যে কোরআনের বিকাশকে সুদৃঢ় ভাবে সুনিশ্চিত করলেন, বহুযুগ পর যখন মানুষ এই সব তথ্যকে সত্য জ্ঞানের মাত্রায় জানতে সক্ষম হবে, তখন যেন সে সত্যকে গ্রহণ করে ও তার পথ নির্বাচন করতে সমর্থ হয়। মানুষ যেন অনুভব করে কৃতজ্ঞতার সাথে, "আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র তিনিই আল্লাহ (৬ঃ৩), যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন" (২৫ঃ৬)।

আল-কোরআনে যে অবাক করা সৌন্দর্যের ইংগিত দেয়া আছে , তার আলোকে আমরা এতক্ষণ সৌরজগতের সৌন্দর্যকে দেখার চেষ্টা করেছি। আমরা জানলাম হলদে সূর্য, চাঁদ সদৃশ বুধ ও শুক্র, প্রায় সকল রঙের মিশ্রণে অপরূপ পৃথিবী, লাল মংগল, হলদে-সবুজ বৃহস্পতি, সোনালী-রূপালী আভাকান্তিতে মিশ্র বর্ণ-ছোপ মাখানো আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড, ক্যালিষ্টো, লালচে-কমলা শনি ও অপূর্ব বলয়, টিটান ও অন্যান্য ৯টি চাঁদ, হাল্কা সবুজ গ্রহ ইউরেনাস, অপেক্ষাকৃত সবুজ নেপচুন ও নীল-সবুজ পুটো ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। প্রকৃত সৌন্দর্যের আরো একটি বিশাল ক্ষেত্র হ'ল গ্রহদের অরোরা। গ্রহের যে অংশে সন্ধ্যা বা উষার লগ্ন ঘটাতে শুরু করে, সেই অংশে আলোর প্রতিফলনজনিত দৃশ্যটি এমনি অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে যে আমাদের জানা ভাষা ও শব্দে তাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা সকাল বা সন্ধ্যায় যে ছটা ও আভামণ্ডল দেখে থাকি, মূলতঃ তা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে দেখি বলে প্রকৃত রূপটির তুলনায় অত্যন্ত অনুল্লেখযোগ্য একটি মাত্রাকে দেখতে পাই। পৃথিবী পৃষ্ঠে বসে পৃথিবীর অরোরা সামান্যই দেখা সম্ভব হয়। আমাদের পৃথিবীর একটি সকাল বা সন্ধ্যা হবার ঘটনাটি পৃথিবী থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে গিয়ে যদি আপনি অবলোকন করতে সক্ষম হন - তাহলে অনুভব করতে পারবেন যে, কোরআনের ১৫ ঃ ১৪,১৫ আয়াত দুটি কোন মহাসত্যের দাবী রাখে। আলোচনা সীমিত রাখার প্রয়োজনে একটি সহজ ধারণা পাওয়ার মধ্যে আমরা বিষয়টি এখানেই ইতি টানতে চাই।

সৌর পরিবার ছাড়িয়ে এবার চলুন মহাবিশ্বের সন্ধানে। সৌরজগৎ সীমার পরবর্তী দুনিয়া কি? বিজ্ঞানীদের ধারণা, Beyond Pluto, there is probably nothing, more than a belt of millions upon millions comets, the ghostly wanderers of the solar system.[১১৭] - জ্ঞাত সৌরজগৎ সীমা পুটোর

www.pathagar.com

পরের মহাব্যাপ্তিতে রয়েছে হাজার লক্ষ কোটি ধূমকেতু ; এরা সৌর দুনিয়ার প্রেত, বিস্ময়কর এদের ব্যবহার, বিস্ময়কর এদের শাসন না মানা চরিত্র এবং তেমনি ভাবে বিস্ময়কর এদের রূপ ও সৌন্দর্য। মূলত তাদেরকে নীলাভ বেগুনী রং –এ দেখায়, তার উপর সূর্যের রশ্মির বিভিন্ন কৌণিক আপাতন বিভিন্ন রং ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। মস্তিষ্ক থেকে পুচ্ছের দিকে ক্রমাগত গ্যাস–মেঘ–ধূলির ঘনত্ব হ্রাস পেতে থাকে। প্রসারিত পুচ্ছে সৃষ্টি হয় উজ্জ্বল রংধনুর। মিশ্র রং ও আভার সৌন্দর্য মনকে হরণ করে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

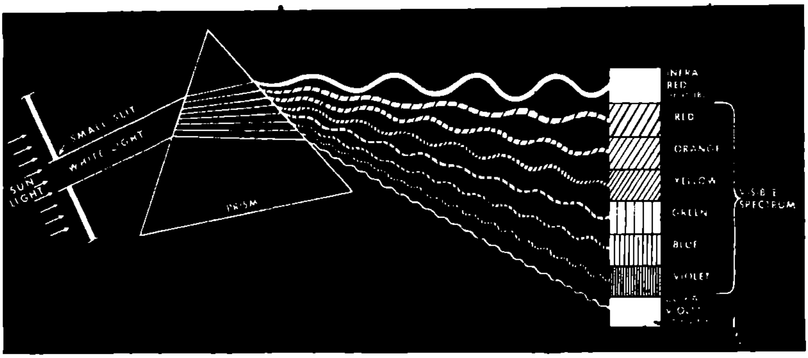

স্পেক্ট্রস্কোপি দ্বারা বিজ্ঞানীগণ দূর দূরান্তের আপাতঃ দৃশ্যে রংহীন নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিদের প্রকৃত রং নির্ণয় করে থাকেন।

ধূমকেতু অধ্যুষিত সহস্র সহস্র কোটি মাইল সীমানা পেরিয়ে শুরু হয় মহাবিশ্বের পরিবেশ, যার পরে আর সূর্যের কোনই আধিপত্য নেই। আমরা যে মহাকাশকে চোখের এক দৃষ্টিতে দেখতে পাই – মূলত তা সবটুকুই আমাদের মাতৃ গ্যালাক্সি ছায়াপথের রাজ্য। দৃশ্যমান সকল নক্ষত্রই সূর্য–সহোদর। অন্যান্য গ্যালাক্সিতে আমাদের গ্যালাক্সির মতই ব্যবস্থা রয়েছে , সে সকল নক্ষত্রদের মান ও গুণাগুণ একই রকমের। বিজ্ঞাণীগণ আমাদের গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রসমূহকে তাদের দৃশ্য রং ও উজ্জ্বলতার মানভেদে বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলেছেন। ১৯০০ সালে E. Pickering (১৮৪৬–১৯১৯) Harvard Spectral classes[১১৮] নামে যে বিশ্ববিখ্যাত বর্ণালী শ্রেণী বিভাগ চালু করেছেন, আজো তা আকাশবিজ্ঞানে সমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আকাশে রং–এর অস্তিত্ব কি এবং তা কত প্রসারিত, তা এই বর্ণালী শ্রেণী বিভাগ থেকে জানতে পারি। উক্ত শ্রেণী বিভাগে মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রকে O,B,A,F,G,K,M ইত্যাদি কয়টি ভাবে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটির রং ও তাপমাত্রার একটি ক্ষুদ্র তালিকা এখানে দেয়া

www.pathagar.com

হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে নক্ষত্রসমূহের রং প্রকৃতপক্ষে এর তাপমাত্রার উপরই নির্ভর করে।[১১৯]

স্পেক্ট্রাল ক্লাস	রং	নূন্যতম তাপমাত্রা	উদাহরণ	সূর্যের তুলনায় উজ্জ্বলতা
O	নীলাভসাদা	৪৫,০০০° কেলভিন ও তদূর্ধ্ব	b-ori Rigel	৫২০০০ গুণ
B	নীল	৩৫,০০০° ”	HD15570	২৫.১লক্ষ গুণ
A	সাদা	১১,০০০° ”	a -CHa sirius	২৩ গুণ
F	হলদে সাদা	৭৫,০০° ”	a-car,Carpus	১৪৩০ গুণ
G	হলদে (সৌরজগতীয় হলুদ)	৬০০০° ”	সূর্য	-
K	কমলা–হলুদ	৪৫০০° ”	a-Ari, Hamal	৮০ গুণ
M	লাল	৩৫০০° ”	a-Ori Betelgeuse	১৩,৮০০গুণ

শুধু মৌলিক রং গুলোতে দৃশ্যমান নক্ষত্রদের শ্রেণী বিভাগটিই এখানে তুলে ধরা হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নক্ষত্র রাজ্যে বিশেষ কোন রং এককভাবে প্রধান থাকার বিষয়টি বিশেষ ভাবে অনুল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রের রং দৃশ্যত মিশ্র বর্ণের। এই রং নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় বলয়মণ্ডল হতে তাপমাত্রার হ্রাস–বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফলত একটি নক্ষত্রকে মিশ্র বর্ণে দেখায়। নক্ষত্রে বিভিন্ন ধাতু, এদের যৌগসমূহ রং সৃষ্টির জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। আমরা এখানে যে শ্রেণী বিভাগ অবগত হলাম, তা প্রকৃতপক্ষে একটি স্থুল–বিভাজন। এদের মধ্যে আবার রয়েছে পুনঃ বিভাজন – যেমন, W, Oa Ob Od Oc N,R ইত্যাদি। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আয়তন, ভর ইত্যাদির সঙ্গে তাপমাত্রার একটি নিখুঁত যোগসূত্র রয়েছে। ছকে সূর্যের তুলনায় উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে ভর ও আয়তন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বিজড়িত। এখানে তাপমাত্রার যে নূন্যতম পরিমিতি দেখানো হয়েছে , তা সকল নক্ষত্রের জন্য প্রযোজ্য, অন্যপক্ষে এদের উজ্জ্বলতা ব্যক্তি নক্ষত্রগুলোর জন্যই প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

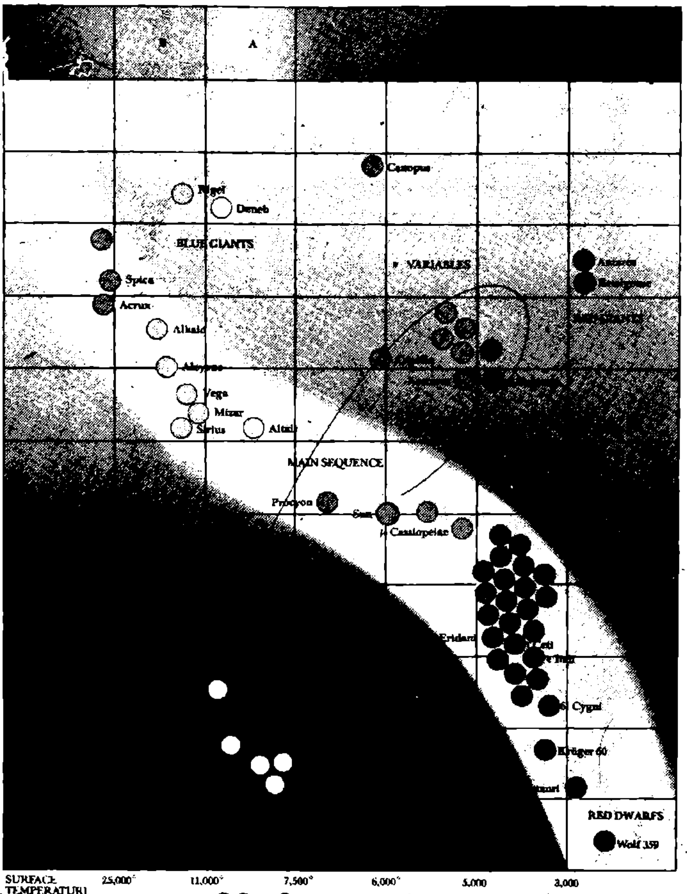

হার্টজস্প্রাং-রুসেল ডায়াগ্রাম। প্রতিটি ব্যক্তি নক্ষত্রর দৃশ্য উজ্জ্বলতা, প্রকৃত উজ্জ্বলতা এবং তাদের রং এর ব্যাখ্যায় এই ডায়াগ্রাম ব্যবহৃত হয়। অতি উজ্জ্বল তারাদের অবস্থান হলো সকলের উপরে, অনুজ্জ্বল তারাদের অবস্থান নীচের দিকে, অতিউজ্জ্বল ও নীল তারাদের অবস্থান সর্ব বামে, কম তাপমাত্রা ও লাল তারাদের অবস্থান ডানে। আমাদের সূর্য হলো মেইন সিকুয়েন্স ষ্টার যার অবস্থান মাঝামাঝিতে নির্দিষ্ট।

নক্ষত্রের রং ও উজ্জ্বলতা পরিমাপক বিখ্যাত Hertzsprung-Russel diagram - এ লক্ষ্য করলে আপনারা দেখবেন যে সুপার-জায়ান্ট (অতিদানব) নক্ষত্রের ব্যাপ্তি *O* হতে শুরু করে R-N পর্যন্তসর্বত্র।[120] আকাশের এই সকল নক্ষত্রর

www.pathagar.com

সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আকাশের রাজ্যে অতিশয় উজ্জ্বল সাদা-নীল কিংবা হাল্কা সবুজাভ-নীল (যেমন। w - ৫২০০০ কেলভিন, W D- 93129 সূর্য অপেক্ষা ৩৯.৮ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল), নীল, নীলাভ-সাদা,সাদা,হলদে-সাদা, সৌর নক্ষত্র (হলুদ), কমলা-হলুদ, লাল, গাঢ় কমলা-লাল (N), কমলা-লাল (R) ইত্যাদি সকল প্রকার রঙের মহাবিশাল বিস্তার নিয়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র অতিকায় নক্ষত্রগুলো আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে। আমাদের সূর্য বা গোত্রীয় মূলধারার (main sequence) নক্ষত্রদের তুলনায়, দেহে ও পদার্থে বহুগুণ বড় হওয়ার সত্বেও এবং উজ্জ্বলতায় বহু লক্ষ গুণ, কোটি গুণ বা সহস্র সহস্র কোটি গুণ (OQ-172 কোয়াসার সূর্যের তুলনায় ১০ হাজার মহাপদ্ম গুণ উজ্জ্বল) দীপ্তিময় হওয়া সত্বেও বিশাল বিশাল এই সকল নক্ষত্র বা নক্ষত্র-জগৎ চিরদিন আমাদের চোখের বাইরে পড়ে থাকছে ; সময় ও দূরত্বের মহাবাধার যে বাস্তবতাটি আমাদের চোখ হতে এই সব নক্ষত্রদের আড়াল করে রেখেছে , যেন তার তথ্যটিই আমাদের অনুধাবনের সামনে তুলে ধরছে ছোট একটি কোরানিক অব্যয় 'লাও' যেন বলে দিচ্ছে, মানুষের প্রযুক্তির সাধ্য নেই এই সময় ও দূরত্বের মহাবাধাকে অতিক্রম করে আকাশের বিশাল গর্ভে রক্ষিত সৌন্দর্যকে অবলোকন করার, মানুষের সাধ্য হবে না সভ্যতার শুরু হতে শেষ লগ্নটা পর্যন্ত যদি আলোর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে – তার পরেও। কত বিস্ময়কর এই ক্ষুদ্র 'লাও' অব্যয়টির ব্যবহার।। কত বিস্ময়করই না তার তথ্য প্রকাশের সামর্থ্য।।।

এতদ আলোচনার পর আমরা দেখতে পাই আকাশের রং রূপ ও সৌন্দর্য আমাদের চিন্তা-ভাবনার মাত্রা থেকে বহুগুণ ব্যাপক। আমরা বলতে পারি – আকাশে রঙের এক বিপুল ছড়াছড়ি। আপনি কি জানেন এ কিসের রং? কোথায় এ রঙের উৎস? এ হলো – "আল্লাহর রং এবং আল্লাহর রং অপেক্ষা কাহার রং উত্তম হইবে"? (২ঃ১৩৮)। তা কি করে তা জানেন? তা এ জন্যে যে – "আল্লাহ আকাশসমূহ এবং ভূমণ্ডলসমূহের আলো" (২৪ঃ৩৫)।

আকাশের সঙ্গে রং -এর সম্পর্কের বাস্তব উদাহরণ আজ মানুষের হাতে মজুদ রয়েছে। আকাশে রঙের কি বিপুলতা, সৌন্দর্যের কি অসীমতা তা বিজ্ঞানীগণ আরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এতক্ষণ আমরা শুধু ব্যক্তি-নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম। আপনি বিশ্বাস করবেন কি যে এক একটা গ্যালাক্সি বা নীহারিকাও হতে পারে রঙের বিস্তীর্ণ এক ক্ষেত্র যার প্রতি চাইলে আপনি বিমুগ্ধ নয়নে বলে উঠবেন ১৫ঃ১৫ আয়াতেরই সুরে সুরে – "আমাদের চক্ষু বিভ্রান্ত হইয়াছে মোহাচ্ছন্নতায় – বরং আমরা সকলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি"। এমনি একটি উদাহরণ হল অরিয়ন বা কালাপুরুষ নীহারিকাটি (Orion Nebula)। Sky & Telescope Nov 81 সংখ্যার ৪১৫ পৃষ্ঠায় ছেপেছে এমনি একটি অতি-জাগতিক ছবি। অদ্ভুত দর্শন এই

www.pathagar.com

ছবির অবিকল গুণাগুণের দাবীটিকে তুলে ধরে Davil F. Malin লেখেছেন, The yellowish-red coloration of the nebula in the picture here is not some artifact of photograpic process. Great care has been taken to ensure that colour reproduced is what you see if you could some how imagine the low -light color sensitibity of your eyes.

অরিয়ন নীহারিকার এ বিখ্যাত ছবিটিতে যেন কোন প্রকার রং চাতুর্য না ঢুকে পড়ে সে জন্য অত্যন্ত কড়া সর্তকতা অবলম্বনের দাবী রেখে ডেভিড ম্যালিন জানিয়েছেন, চক্ষুর আলোক - সংবেদনশীলতাকে যদি অত্যন্ত নিম্ন মাত্রায় নেয়া সম্ভব হত, তবে মানুষ এই অদ্ভুত দর্শন নেবুলাটিকে দেখতে পেত অবিকল এই ছবিটির ন্যায় ; যার বিপুল এলাকা জুড়ে ঘন লাল, কেন্দ্র ভাগটি লাল ও সবুজের মিশ্রণে হলুদ আভায় উজ্জ্বল। কারো কারো টেলিস্কোপে নীহারিকার মধ্যভাবে সবুজের ভাগটি বেশী ধরা পড়েছে। অনুরূপভাবে Eso 255, IG07 System এর চারটি গ্যালাক্সির রং ঈষৎ ঘন নীল রঙের। ডিম্বাকৃতির গ্যালাক্সিসমূহ সাধারণত লাল হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা গ্যালাক্সির অর্থ অনুধাবন করেছি। সেই জ্ঞানের অনুভূতি নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন - পুরো একটি দ্বীপ-জগৎ , বা আকাশের একটি অসীম বিশাল স্তরের বিপুল অংশ লাল-সবুজ-হলদে-কমলা রঙে রঞ্জিত, রঙের এই বিশালতার তুলনা হয় না, এর বর্ণনা সম্ভব নয় আমাদের জানা ভাষাসমূহে , এতদসত্ত্বেও আমরা তাকে দেখতে পাই না, আমরা তাকে দেখতে পাব না - কারণ আমাদের চোখে সে Low light color sensitivity নেই। তাহলে এসে যায় কি কোরআনের ১৫ঃ১৪ আয়াতের শীর্ষতম বিজ্ঞানভিত্তিক বিশুদ্ধতা? প্রমাণিত হয়ে যায় না কি যে, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত কোন জ্ঞান এই আয়াতের শর্ত সৃষ্টিতে 'লাও' অব্যয়টি এঁটে দিয়েছেন চরম নিখুঁতভাবে, আর তাতে অর্থটি দাঁড়িয়ে গেছে এমনি যা বিজ্ঞানের তথ্যে, Low light sensitivity না থাকার আনুপাতিক কোন অর্থের সমান। আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি , এই 'লাও' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে যে অর্থ প্রকাশ করছে - তাতে একটি ব্যকরণ বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মানুষ কখনো এই মহাবিশ্বের অপরূপ রূপ দর্শন করার সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হবে না। কোরআন যে অপরূপ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছে , সেটি চিরদিনই মানুষের দৃষ্টি সাধ্যের বাইরে পড়ে থাকবে।

রঙের এই অপূর্ব ছড়াছড়ির দাবী পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থে আপনি খুঁজে পাবেন না। আল-কোরআনই দিতে পারে তার নিখুঁত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য। সৃষ্টির সাথে রয়েছে রঙের সম্পর্ক -এই তথ্যটি মিলে এখানে আর একটি আয়াতে, - "আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন যে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীসমূহ। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন বিভিন্ন ভাষা ও রং ; নিশ্চয়ই উহাতে নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (৩০ঃ২২)। আল-কোরআনের আয়াতসমূহের বহুমুখিতার দাবীকে

www.pathagar.com

জিম্মি রেখে হয়ত কোন ছিদ্রান্বেষী প্রশ্ন তুলে বসবেন, জগৎ সৃষ্টির সাথে রং –এর সৃষ্টি না হয় মেনে নেয়া হল, কিন্তু আকাশ সৃষ্টির সাথে ভাষার সৃষ্টি কেন? বর্ণনায় দুর্বলতা দেখিয়ে তারা বলবেন, আকাশ সৃষ্টির সঙ্গে ভাষা সৃষ্টির বিষয়টি বড়ই বেমানান, ইত্যাদি। আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি , তারা যেন রেডিও এষ্ট্রোনমির উপর একটু লেখাপড়া করে নেন। তারা দেখবেন প্রকৃত ভাষা মূলত আকাশেরই। আল-কোরআনের বাণী কখনো ভুল হয় না। কোরআন মনীষা ভুলের উর্ধ্বে। "ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে , আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতি হন না" (২০:৫২)।

" হে লোক সকল ! তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক সনদ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি (৪:১৭৪)। বল, তোমরা যাহাদিগকে অংশীদার স্থির কর, তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল, আল্লাহ্ সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনিই আনুগত্যের দাবীদার, না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না সেই সকল মূর্তি ও প্রতিমা?" (১০:৩৫)। পাঠক ! এই প্রশ্নের জবাব আপনার অনুভবকে দিতে বলুন।

---

১০১ । National Geographic vol 145 No 5 May 74.
১০২ । National Geographic vol 147 No 6 June 75.
১০৩ । টীকা ১০২–এর অনুরূপ।
১০৪ । National Geographic vol 135 No. 5 May 69.
১০৫ । National Geographic vol 135 No. 5 May 69.
১০৬ । Stars and Planets - Ian Ridpath.
১০৭ । National Geographic vol 136 No. 6 Dee 69.
১০৮ । National Geographic vol 151 No. 1 May 77.
১০৯ । Stars & Planets - Ian Ridpath.
১১০ । The Solar Family - Peter Francis.
১১১ । The cambridge Atlas of Astronomy -Introduced by sir Barnard Lovell.
১১২ । Stars & Planets : Ian Ridpath.
১১৩ । National Geographic vol 160 No. 1 May 1981.
১১৪ । টীকা ১১১ এর অনুরূপ।
১১৫ । টীকা ১১২ এর অনুরূপ।
১১৬ । টীকা ১১১ এর অনুরূপ।
১১৭ । Stars and Planets - Ian Ridpath.
১১৮ । New Caxton Encyclopedia Vol-2.
১১৯ । The Henry Dramper (HD) Spectral sequence, New Caxton Encyclopedia হতে গৃহীত। অন্যান্য তথ্যসমূহ Guinness Book of Astronomy 1979, Realm of Universe - 1980 ইত্যাদি থেকে গৃহীত।
১২০ । উৎসাহী পাঠকগণ নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতা বিষয়ক H-R Diagram টি দেখে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

৫

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

জনৈক গ্রাট্রুর্ডস্টাইন তার জন্মভূমি সম্পর্কে খেদোক্তি করেছিলেন There is no there there সেখানে সেখানটি নেই। মাতৃভূমি ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড গ্রাট্রুর্ডস্টাইনের জানা ওকল্যান্ডের মত থাকেনি, পরিবর্তনের শত চিহ্ন তার মনে এমনি একটি উক্তির যোগান দিয়েছিল। গ্রাট্রুর্ডস্টাইন যদি জানতেন, তা হলে কখনো দুঃখ করতেন না। সৃষ্টির শুরু থেকে বিধান এই যে, সেখানে সেখানটি থাকে না – যেমন করে গ্রাট্রুর্ডস্টাইন নিজেও শিশুটি থাকেননি। তার জানা ছিল না – ওকল্যান্ড কেন, সমস্ত মহাবিশ্বেরই নিয়ম এই যে মহাকালের নিষ্ঠুর দুর্বোধ্য শাসনে ' সেখান হতে সেখানটি ' চলে যায়, Space time continuum এর দুর্নিবার স্রোতে গ্রাট্রুডস্টাইনের উক্তিটির মত এতবড় সত্য দুর্লভ। এ প্রবন্ধ আমাদেরকে দুর্লভ সে সত্যটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

মধ্যযুগীয় চার্চ অধ্যুষিত বিজ্ঞানের সযত্নে লালিত বিশ্বাস পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে খুঁজে পেয়েছিল। আজ পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এসেছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, – মহাবিশ্বের কোন কেন্দ্র নেই। এইটুকু বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বিজ্ঞানের লেগেছে দু'হাজার বছরের চেয়েও বেশী। সুধী পাঠক, এই তথ্যটিকে ধরে রাখবেন।

ধারণার উৎপত্তি প্রাচীনকালে, খ্রীষ্টের জন্মের বেশ আগে। মধ্যযুগে এসেও তা অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তি পেয়ে যায়। ধারণা করা হত, – চন্দ্র, সূর্য, জানা পাঁচটি গ্রহ ব্যতীত মহাবিশ্বের বাদবাকী দৃশ্যমন্ডল পশ্চাৎপটে কতিপয় স্থির অনড় স্বর্গীয় প্রদীপ দিয়ে তৈরী। মহাবিশ্ব হল রাতের দৃশ্য আকাশের সীমাহীন রাজত্ব। প্রতিবছর ঘুরে ফিরে একই আকাশ দেখা যায়, তাই সমসাময়িক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ একটি স্থির মহাবিশ্বকে খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষের এই বিশ্বাস কতদিন পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল জানেন কি ? Astronomers were still happy with a static universe in 1920s[১২১] –মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ শতাব্দীর বিশ দশক পর্যন্ত একটা স্থির মহাবিশ্বকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রকৃত সত্য তখনো মানুষের কাছে এসে পৌঁছেনি।

সর্বপ্রথম যিনি স্বার্থক সত্য জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন, মহাজগৎ বিদ্যায় বড় কোন নাম হয়ে সেই ডি-চ্যাস্যাক্স (De-Chesaux - 1744) বেঁচে থাকেনি। তৎকালীন মানুষও মহাবিশ্বকে অন্তহীন অসীম বলেই জানত, – কিন্তু এই অসীমতার

www.pathagar.com

অর্থ ছিল অত্যন্ত সীমিত, একটি গ্যালাক্সি - ছায়াপথকেই ধরা হত এই অসীমতার কল্পিত মহাব্যাপ্তি। বিভিন্ন অবলোকন (Observation) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশ তথা মহাবিশ্বে যে কোন বিন্দুতে তাকানো হউক, একটি করে নক্ষত্র সেখানে দৃষ্টিগোচর হয়। ডি-চ্যাস্যাক্স -এর প্রশ্ন ছিল, - তাহলে কল্পিত অসীম বিশ্ব (Supposedly infinite universe) রাতের বেলা অতিশয় উজ্জ্বল না হয়ে অন্ধকার কেন ? মহাবিশ্বের একটি অসীম উজ্জ্বল আকাশ থাকার কথা - রাতের আকাশের উজ্জ্বলতা এত বেশী হওয়া দরকার যা ন্যূনপক্ষে একটি নক্ষত্রের উপর কোন তলের উজ্জ্বলতার সমান , - We can say, the night sky should be only as bright as the surface of an average star in total, Just 40,000 times the brightness of the sun at noon.[১২২]

রাতের আকাশটি দুপুরের সূর্যের চাইতে কমপক্ষে ৪০,০০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিপত্তিকর সমস্যাটি হল - রাতের বেলায় আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন তা নয়, দিনের বেলাতেও কেন দৃশ্য আকাশ, তথা এই মহাবিশ্ব এত অন্ধকারে পরিপূর্ণ — সেই প্রশ্নটি। ডি-চ্যাস্যক্সের এই অতি গুরত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার দিকে সেদিন কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি।

১৮২৬ সনে উইলহেম অলবার্স (Wilhelm Olbers) এই বিপত্তির পুনঃ উত্থাপন করেন। অনেক কষ্টের সাথে সমসাময়িক বিজ্ঞান তার প্রশ্নটিকে মেনে নেয় এবং তার এই বিপত্তির নাম হয় অলবার্সের বিপত্তি (Olbers paradox)। তথ্য, উপাত্ত, যুক্তি, তর্ক ও সমস্যায় অলবার্সের বিপত্তিটি বিজ্ঞান জগতে স্থান গেড়ে বসে। সিদ্ধান্ত আসে, তিনটি সম্ভাব্য প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর হতে বেরিয়ে আসবে এর জবাব ঃ -

১। মহাবিশ্ব কি আসলেই অসীম ? এর কি এমন কোন সীমা আছে যার পরে কোন নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি থাকতে পারে ?
২। মহাবিশ্ব কি সুসম ঘনত্বে বিরাজমান ? নক্ষত্রদের ঘনত্ব কি ক্রমাগত দূরত্বের সাথে হ্রাস পেয়ে থাকে ?
৩। মহাবিশ্ব কি সৃষ্টিগতভাবেই অনড় ? এর কি কোন অবস্থানিক পরিবর্তন হচ্ছে না ?

প্রথম প্রশ্নের জবাব আসে - মহাবিশ্ব আসলেই অতিশয় অসীম। তা না হলে আমাদের দৃশ্য আকাশ সূর্যের দীপ্তির চাইতে বহুগুণ তীব্র উজ্জ্বলতায় বিরাজ করত। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার জবাবে এসে যায় ১৯ শতকের ধারণা, যা বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিতে

www.pathagar.com

সত্য প্রমাণিত হয়েছে ; তা হল, মহাবিশ্বের সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট আয়তন শূন্যতায় একটি নির্দিষ্ট এবং সম-সংখ্যক গ্যালাক্সি সকল সময় বিরাজ করে। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অসীম ব্যপ্তি ও সমঘনত্বের চরিত্রের সঙ্গে মহাজাগতিক বস্তুদের গতিশীলতার বিষয়টি জুড়ে দিয়ে একটি সমস্যা পাওয়া যায় - মহাকাশ সকল সময় অপরিবর্তিত এবং অনুরূপ কেন দেখায় ? এই প্রশ্নও অন্যান্য তথ্যের সাথে অলবার্স-বিপত্তি এক করে দেখলে একটি মাত্র জবাব আসে - মহাবিশ্ব অবশ্যই সম্প্রসারণশীল।

অলবার্সের তাত্ত্বিক ধারণা পরবর্তীতে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনও তার আপেক্ষিক বাদে আঁচ করতে পেরে বিপত্তিটিকে পাড়ি দেয়ার জন্য cosmological constant এর অবতারণা করেন। ডি-সিতার (de - Sitter) আইনস্টাইনের সমীকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি তাত্ত্বিক সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা প্রকাশ করেন। এই সব ধারণা কোনটিই তৎকালীন বিজ্ঞানের কাছে সামান্য আদর পায়নি।

১৯ শতকের শেষদিকে বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscopy) আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। টেলিস্কোপের দূরপাল্লার দৃষ্টিতে এই যন্ত্র এনে দিল অদ্ভুত দর্শন-সামর্থ্য। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ লক্ষ যোজন আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তের নক্ষত্র ও নীহারিকাদের উপর পরীক্ষা করবার সামর্থ্য অর্জন করলেন। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের মহাযাত্রার প্রথম সোপান।

১৯২০ সালে ইডুইন হাবেল এতদিনের নীহারিকা নামে জানা এন্ড্রোমিডার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। ৩০০ মহাপদ্ম সংখ্যক নক্ষত্রের আবাসস্থল এই এন্ড্রোমিডা আমাদের দৃশ্য ছায়াপথ জগৎ থেকে প্রায় দেড়গুণ ব্যাস সম্পন্ন বিরাট এক দ্বীপজগৎ বা গ্যালাক্সি, আর তার অনুরূপ কিংবা তার চাইতেও অতিকায় এমন গ্যালাক্সির সংখ্যা শত কোটি। এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ দুটি গুরুতর প্রশ্নের মুখোমুখি হল। ছায়াপথের সীমানা পেরিয়ে অবস্থানরত গ্যালাক্সিসমূহের প্রকৃতি কি এবং তারা কত দূরে অবস্থিত ? দূরত্বের প্রশ্নটি সকল মহলে তুলল ভাবনার ঝড়। এর উত্তর এল মনীষী হাবেলের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ফসল হিসাবে।

১৯২৩ হতে ২৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাপ্ত সমুদয় গ্যালাক্সিসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করলেন। স্পেক্ট্রোস্কোপির সাহায্যে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্যালাক্সির "রেড ও ব্লু শিফট" [১২৩] নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তিনি দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেক দূরবর্তী গ্যালাক্সি অপ্রত্যাশিতভাবে রেড শিফট প্রদর্শন করে যাচ্ছে , যার অর্থ হল দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে গ্যালাক্সিদের সরে যাওয়া । তিনি আরো দেখতে

www.pathagar.com

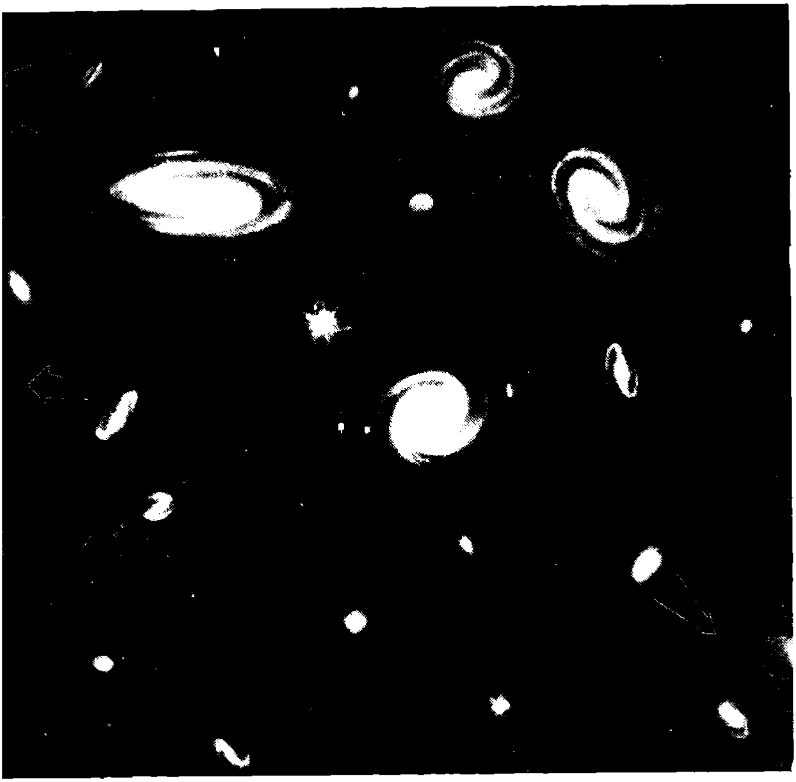

কালের দ্রুততম ঘোড়ায় চড়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে এই মহাবিশ্ব। যে কোন অবস্থান হতে দেখলে মনে হবে বাকী সব কিছু পিছিয়ে যাচ্ছে। এই সম্প্রসারণ দূরবর্তী 3C-295 এর জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৯০,০০০ মাইল।

পেলেন,- এই দূরে সরে যাওয়ার প্রকৃতি সকল দিকে সামঞ্জস্যের সাথে সুসমভাবে সংগঠিত হচ্ছে। অধিকতর দূরবর্তী গ্যালাক্সি অধিকতর দ্রুতগতির সাথে উড়ে যাচ্ছে অসীমের সীমাহীন গহ্বরের দিকে। তাদের দ্রুতি ও গতির উপর হাবেল একটি তত্ত্ব পেশ করলেন, বিজ্ঞান জগতে যা হাবেলের আইন (Habble's law) নামে সমধিখ্যাত। হাবেলের আইনটি হল, যতই দূরে সরে যাচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো ততই বেড়ে যাচ্ছে তাদের দূরে সরে যাওয়ার গতিমাত্রা। একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির পর থেকে তা একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে চলে। বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম হল হাবেল ধ্রুবক (Habble's

www.pathagar.com

constant) । হাবেলের সূত্র অনুসারে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর এর গতিমাত্রা দূরত্বের সমানুপাতিক ও সময়ের ব্যস্তানুপাতিক ; অর্থাৎ $V = \frac{D}{T}$ (D = দূরত্ব, T = সময়, V = গতিবেগ)। এই সমীকরণে হাবেল 1/T কে ধ্রুবক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন । (T এর মান ১০,০০০,০০০,০০০ থেকে ২০,০০০,০০০,০০০ বৎসর)[১২৪]। হাবেল দেখান , ১ মেগাপারসেক দূরত্বের (৩.২৬ মিলিয়ন আলোক বর্ষ) পর প্রতি সেকেন্ডে গ্যালাক্সিসমূহের গতিবেগ ৫০ মাইল (৭৫ কিঃ কিঃ) হারে বেড়ে যায়। [১২৫] সেই সূত্র ধরে ২৭০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরের কোন গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে ৪৫,০০০ মাইল গতিতে ছুটে চলে। 3C - 295 গ্যালাক্সিটি প্রতি মুহূর্তে ৯০,০০০ মাইল গতিতে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।[১২৬] কালের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এই ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে মহাবিশ্ব, শূন্যতার প্রসারতায় মহাগহ্বরের অতল তলে। কোথায় যাচ্ছে , আমরা তার ঠিকানা জানি না – যেথায় যাচ্ছে , কি তার নাম, আমরা তার কিছুই জানতে সক্ষম নই।

আলোচনার পটপরিবর্তন করে চলুন আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও কিছু বেশী আগের কোন ইতিহাসে। " আরবগণ, বিশেষতঃ মক্কাবাসীগণ গভীরভাবে মদ্যপান, জুয়া ও সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত ছিল, নৃত্য ও গীত এক শ্রেণীর দাসী রমনীগণ অনুশীলন করত, বহু বিবাহের অবাধ প্রচলন ছিল যার স্বরূপ ছিল এমনি যে, মাতা ছাড়া অন্য বিধবারা হত পুত্রের উত্তরাধিকারের সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, নারী ও শিশু বিক্রয়ের মত নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবসা ছিল সার্বজনীন "।[১২৭] তখনকার শিক্ষা-দীক্ষার মান পরিচায়ক পাথর, হাড়, গাছের ছাল তালপত্র ইত্যাদি ছিল লিখবার জন্য আজকের কাগজ স্থানীয় উপায়, সেই যুগের একজন নিরক্ষর নবী, যাঁর কোন শিক্ষক ছিল না, যিনি কোনদিন কোন পাঠশালায়ও যাননি ; তেমনি একটি সময়ে তেমনি একজন মানুষের মুখ হতে নিঃসৃত হল এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তথ্যটি, – " আমি আকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিবলে – নিশ্চয়ই আমি উহাকে সম্প্রসারণ করিতেছি " (৫১ঃ৪৭)।

এমন একটা অজ্ঞতার যুগে কোথা থেকে বেরিয়ে এল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত তথ্যটি ? একজন নিরক্ষর মানুষ, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে আজ থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মাত্র অল্প কয়েকটি শব্দে পেশ করেছিলেন এমন এক মহাতত্ত্ব যা নিয়ে বিজ্ঞান খাবি খাচ্ছিল শত শত বৎসর ; আর সেখানেও এঁটে দেয়া হল জ্ঞানশুদ্ধতার সূক্ষ্মতা, যা আজকের বিজ্ঞানের সকল শক্তি দিয়েও সামান্য ভুল প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। মানুষ যা বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কৃপায় জানতে পেরেছে , খ্রীষ্টীয় সাত শতকে যদি অবিকল সেই তথ্যটিই কোন ধর্মগ্রন্থ মানুষের কাছে প্রকাশ করে

www.pathagar.com

থাকে, তাহলে কি প্রমাণিত হয় না,- "তাঁহার মহাবাণীই সত্য (৬:৭৩) নিশ্চয়ই তোমাকে আল কোরআন দেওয়া হইয়াছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের পক্ষ হইতে" (২৭:৬) ?

ব্যবহৃত শব্দ 'মুসিঁওনা (موسعون) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বাচক এই শব্দটির মূল (root) হল 'আওসাআ ' (اوسع)[১২৮] যার অর্থ – আরো সম্প্রসারিত করা, বিস্তৃত করা ইত্যাদি (to widen, to make more spacious ; to cause to expand)[১২৯]। ব্যাকরণের দিক থেকে শব্দটিকে বিচার করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সম্প্রসারিত হতে থাকবে। আর এমন একটি বর্ণনা সত্যিই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত রায়ের সঙ্গে মিলে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এর কারণ, – "আল কোরআন মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ (৩৬:২) , ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হইতে" (৩৯:১)।

এতক্ষণ আমরা যে সম্প্রসারণের তথ্য জানলাম – তার প্রকৃত কি ? বিজ্ঞানিগণ একসাথে অনেকগুলো গ্যালাাক্সির রেড শিফট ও ব্লু শিফট নিয়ে তৈরী সেটের ওপর গবেষণা করে দেখতে পেলেন এই সম্প্রসারণের প্রকৃতি কখনো একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, একটি গ্যালাক্সি অন্য আর একটি গ্যালাক্সি কিংবা অন্য একাধিক গ্যালাক্সি হতে দূরত্ব রচনা করে চলছে ক্রমাগত। আরো সহজতর উদাহরণ দেয়ার জন্য বিজ্ঞানিগণ সমস্ত মহাবিশ্ব ব্যবস্থাকে একটি ক্রমাগত ফুলতে থাকা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করেন। একই রীতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে একটি ব্যক্তি গ্যালাক্সির নিজস্ব ব্যবস্থা। অর্থাৎ অন্তঃস্থিত নক্ষত্রসমূহও কোন গ্যালাক্সি ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সম্প্রসারিত হচ্ছে একই রীতিতে যে প্রক্রিয়ায় নিখিল মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলছে পলে পলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের গ্যালাক্সি ছায়পথের দু'টি বাহুর কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবী এবং গ্যালাক্সি কেন্দ্র –এর মাঝখানের অবস্থিত বাহুটি প্রতিমুহূর্তে ৫৩ কি ঃ মিঃ বেগে এবং বিপরীত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিঃ মিঃ বেগে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে।[১৩০] এই সম্প্রসারণ বাহুদ্বয় এবং তাদের বেষ্টনীস্থিত প্রত্যেকটি নক্ষত্র কিংবা বস্তুভরের উপর প্রযোজ্য। একই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে ২০০০ আলোকবর্ষ ব্যাসের গ্যালাক্সি কেন্দ্রটিও প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিঃ মিঃ গতি নিয়ে। অর্থাৎ সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভিতরে, বাইরে ও গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। ঠিক একই উপমা দেয়া চলে যেন বেলুনকে বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে তোলা, ফলতঃ সম্প্রসারণ নীতির কোন নির্দিষ্ট দিক নেই ; নেই কোন কেন্দ্র। এই রীতিতে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে বলেই প্রত্যেক বছর ঘুরে ফিরে আমরা একই আকাশ দেখতে পাই। তবে সন্দেহ নেই যে, একটি বিশাল সময়ের কাল ধরে যদি কেউ দৃশ্যমান আকাশকে দেখতে থাকত, তবে অবশ্যই তার চোখে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

চিহ্নগুলো পড়ত। মূলত মহাবিশ্বে মহাকালের অনুপাতে কয়েকশত কিংবা কয়েক সহস্র বৎসর অত্যন্ত নগণ্য পরিমাপ। নক্ষত্রসমূহ এত বিশাল দূরত্বে অবস্থান করে যে প্রতিমুহূর্তে অত্যন্ত বেগে ধাবমান কোন বস্তুকেও কয়েক যুগ বা কয়েকশ বছর ধরে একই স্থানে স্থির বলে মনে হবে।

আমরা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রকৃতির কথা আলোচনা করছিলাম। ফুলে উঠা একটা বেলুনের কোন একটি বিন্দুতে যদি একটি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্র কোন একটি কীটকে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে সেই ক্ষুদ্র কীটটি তার চারিদিকের যে কোন বিন্দুকে দেখবে যেন সেই বিন্দুটি তার নিকট হতে পিছনে সরে যাচ্ছে – যা মূলত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের মুল প্রক্রিয়া। আর ঠিক এই তথ্যটিই কোরআনে দেয়া আছে এক সহজবোধ্য প্রস্তাবে। লক্ষ্য করুন, – " নক্ষত্রসমূহের/নক্ষত্র সমষ্টির শপথ, যাহারা পশ্চাৎ গমনে রত " (৮১ঃ১৫), এমনি একটি তথ্য বিজ্ঞানের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা অনুভব করি বা না করি, জ্ঞানীমাত্র এই সঠিকতার মাত্রায় স্তম্ভিত বিমূঢ়তায় দু'দন্ড থমকে দাঁড়াবেন। "অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য " (১৬ঃ৬৭)।

পূর্বে গ্যালাক্সিদের গতিমাত্রার কথা উল্লেখ করেছি। ২৭০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরবর্তী কোন গ্যালাক্সির প্রতি সেকেন্ডে গতিমাত্রা ৪৫,০০০ মাইল। হাবেল ধ্রুবককে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানিগণ দেখেছেন যে, দূরত্ব যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে – গতিমাত্রা তত বেড়ে চলবে। পূর্বেই বলেছি , 3C - 295 গ্যালাক্সিটি প্রতি সেকেন্ডে ৯০,০০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে সম্প্রসারণের তাড়নায়। যাচ্ছে কোথায় ? বিজ্ঞানীগণ 'প্যারালাল স্পেস, 'সুপার স্পেস' ইত্যাদি বিভিন্ন ধারণা এ প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন যা কিছুই আসুক না কেন, গণিত শাস্ত্র জানায়, ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরত্বে কোন গ্যালাক্সির অবস্থান হলে সেই গ্যালাক্সির গতিবেগ হবে আলোর গতির সমান ; আর এমন একটা গতিবেগ প্রাপ্ত হবার অর্থ হল সেই বস্তুটি চিরদিনের জন্য আমাদের দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে পড়া, এমন একটি গতিবেগের জন্য আমরা কখনো আর তাকে দেখতে পাব না। বিজ্ঞানিগণ আজ ১০,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর পর্যন্ত সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দূরত্বে ~~বস্তু~~ প্রাপ্তির অর্থ হল, হয়ত বা তার আগেও কিছু কিছু গ্যালাক্সি ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসরের সীমা পেরিয়ে আমাদের চির অজ্ঞাত কোন আবাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের সীমাকে যে মুহূর্তে কোন গ্যালাক্সি অতিক্রম করে যাবে, সেই মুহূর্ত হতে তা হয়ে যাবে অদৃশ্য।[১৩১] ভাসমান দ্বীপজগৎসমূহ ১১ মহাপদ্ম (বিলিয়ন) আলোকবর্ষ পরে যেভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা –ঠিক সেই প্রক্রিয়াটিও দেখুন কত নিখুঁত মাত্রায় এসেছে কোরআনের পাতায়, " এবং (তাহাদের শপথ) যাহারা ভাসিয়া বেড়ায় ও অদৃশ্য হইয়া যায় "

www.pathagar.com

(৮১ঃ১৬)। মহাবিশ্বের মহাসমুদ্রে ভাসমান গ্যালাক্সিগুলোই যে ৮১ঃ১৬ আয়াতের প্রস্তাব তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর হল এর পূর্ববর্তী আয়াত ৮১ঃ১৫, যেখানে প্রস্তাব এসেছে – নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সি) শপথ। যাহারা পশ্চাদগমনে নিরত। "এই প্রস্তাব যে এমন একটা পরিবেশের ধারণা দেয়, যা ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের পাল্লায় পৌছে যাওয়ার আনুপাতিক, অর্থাৎ যে দূরত্বমাত্রায় পৌছুলে ভেসে চলার প্রক্রিয়াটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে পারে – এই বিষয়টি কোন সন্দেহ ও তর্ক ব্যতীতই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। তাহলে দেখতে পাই ৫১ ঃ ৪৭ আয়াতটি যেখানে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণজনিত মূল প্রস্তাব বা সূত্র প্রমাণ করে, সেখানে ৮১ ঃ ১৫ আয়াতটি এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ার কথা বলে আর ৮১ ঃ ১৬ আয়াতে এই সম্প্রসারণের সম্ভাব্য একটি পরিণতির ধারণা চিত্রায়িত হয়। আয়াত তিনটিকে পাশাপাশি সাজালে যে ধারাবাহিক চিত্রটি আমরা দেখি – তা বিজ্ঞান শুধু অনুমোদনই করে না, এই ধারাবাহিকতা কিংবা প্রদত্ত আয়াতগুলো দ্বারা দেয়া তথ্যের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে কখনো অন্যকোন প্রস্তাব রাখবার সামান্যতম সুযোগ বিজ্ঞানের নেই ; আল কোরআন যা প্রস্তাব করেছে – তাই হয়ে গেল বিজ্ঞান ! বিস্ময়কর নয় কি ?

বিস্ময়কর নয় কি যে এর পরেও মানুষ তার পথ নির্বাচনে চরম ভ্রান্ত আর অমনোযোগ প্রদর্শন করে। তাইতো অনুরণন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পাতায়, – (ওহে মানুষ) "তোমাদের কি হইল, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করিতেছ না ? (৭১ ঃ ১৩) । তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আসমান – জমিনে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই আল্লাহ্ জানেন ? (৫৮ঃ৭) ; (মনে রাখিও) তোমরা যে যেখানে অবস্থান কর, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকেই টানিয়া আনিবেন (২ ঃ ১৪৮), (অতএব) হে মানুষ। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের , যখন পিতা সন্তানের উপকারে আসিবে না এবং সন্তানও আসিবে না তাহার পিতার কল্যাণে (৩১ঃ৩৩)। দুর্ভাগ্য তোমাদের তোমরা যাহা বলিতেছ , তাহার জন্য (২১ঃ১৮)। মূলতঃ দাসগণের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে (৩৫ঃ২৮)। এই সব হইতেছে উপদেশ, অতএব, যাহার ইচ্ছা সে তাহার পালন কর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক "(৭৬ঃ২৯)।

---

১২১ । The Expanding Universe - John Gribbin.

১২২ । The Expanding Universe - John Gribbin.

১২৩ । একটি স্থির আলোক উৎস হতে আগত বিচ্ছুরণ, স্পেক্ট্রামে (বর্ণালী) সম – মসৃণভাবে বিক্ষেপণের সৃষ্টি করে। চলমান উৎস লাল ও নীলের দিকে বিক্ষেপণ দেখায়। দূরে সরে

www.pathagar.com

যাওয়া উৎসের তরঙ্গ লালের দিকে ও দর্শকের প্রতি এগিয়ে আসতে থাকা উৎসের তরঙ্গ নীলের দিকে বিস্তৃত হয়। যথাক্রমে এদেরকে রেড ও ব্লুশিফ্‌ট বলে।

১২৪ । Encylopedia Britannica - Macropaedia Vol - 18.

১২৫ । The Expanding Universe - John Gribbin.

১২৬ । The Stars - Roger Hall.

১২৭ । The Sprit of Islam - Sir syed Amir Ali.

১২৮ । Arabic English Dictionary - Steingass.

১২৯ । বাজারে প্রাপ্ত সমস্ত অনুবাদই প্রস্তাবের মৌলিকতাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। জ্ঞানী ইউসুফ আলীও We, who creat the vastness of space - এই অর্থ করেছেন। বিজ্ঞানের সাথে অনুবাদকারীগণের দূরত্বই এর কারণ। তাছাড়া বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বে কৃত অনুবাদের সহিত সঙ্গতি রাখার অদৃশ্য প্রেরণাও এজন্য সমভাবে দায়ী।

১৩০ । Galaxy and Qusars - Kaufmann.

১৩১ । The Stars - Roger Hall.

www.pathagar.com

৬

সঞ্চালনশীল সূর্য

আপনার ও আমার পরিচয় কি ?

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি সূর্য। সূর্য পৃথিবীবাসীর পরম পরিচয় ও পরম গৌরব। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করেন – 'জীবনের জন্য বস্তুজগতে আমরা কার কাছে সবচাইতে বেশী ঋণী' ? – সকল অর্থে তার সঠিক উত্তর হবে, সূর্য। সূর্যের এই প্রাধান্য মানুষ বুঝতে শুরু করে তার অস্তিত্বলগ্ন থেকে। তাই সূর্যের বিবেচনা মানুষের অনুভবে জন্মলগ্ন থেকে সুদৃঢ় ভিত গেড়ে বসে আছে। জন্মগতভাবে অসহায় মানুষ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে নির্ভরশীলতা ও অবলম্বন আশ্রয়ী হওয়ায় সৃষ্টিতে তার অবস্থানকে ন্যায্যতা ও যুক্তিযুক্ততায় সমর্থিত করার জন্য তার স্রষ্টা, পালনকারী ও রক্ষাকর্তার সন্ধান করার প্রয়াস রেখেছে । স্রষ্টার প্রতি মানুষের এই কৃতজ্ঞতাবোধ, বাস্তব ও অতিবাস্তব (abstract) স্রষ্টা কল্পনায় মানুষকে সহজাতভাবে প্রেরণা যোগিয়েছি। স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বাস্তবে স্রষ্টার সন্ধান কখনোই লাভ করেনি, এক অতিবাস্তব স্রষ্টার অস্তিত্ব সে মেনে নিয়ে তার শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন উপায় ও ধারাগুলোকে সনাক্ত করে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশের তৎপরতায় যে বিশেষ বিশেষ বিবেচনাসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে দেখেছে – তার মধ্যমনি হয়ে এসেছে সূর্য। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ হতে আজকের দিন পর্যন্ত সূর্য হল মহাশক্তিশালী স্রষ্টার একজন বিশিষ্ট "দেবতা" । বিশেষ বিশেষ কার্যভার নিয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন এ সূর্যদেব মানুষের কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে তার ইচ্ছায় – অতএব মানুষ তার সুবুদ্ধিতে সূর্যের পূজাকে অতি উত্তম ও সঙ্গত কর্তব্য বিবেচনা করে একটি পূজা – অর্চনার ধারা সৃষ্টি করল। সূর্যের সন্তুষ্টি অর্জনে মানুষ উৎসর্গ করল ধন, মান, সম্পদ, পশু ও সন্তান। সূর্যের বেদী হল রক্তরঞ্জিত টক টকে লাল। প্রতিটি সকালে লক্ষ কোটি মানুষের – বিনীত নমস্কার নিয়ে ওঠা সূর্য একই রীতিতে ডুবে গিয়ে হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে ভক্তদের প্রতি তার অনুকম্পা প্রদর্শনের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ নিয়মের যৎকিঞ্চিত ব্যতিক্রম না করে স্বীয় শৃংখলাম্বিত দাসত্বের যে প্রোজ্জ্বল উদাহরণ রাখল, মানুষ তা কখনোই অনুভূতি দিয়ে বিচার করলো না।

খ্রীষ্টানদের ধর্মযাজকদের' 'জিয়োসেন্ট্রিক' বাদ বা পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বকে ষোল শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত টিকে থাকতে সাহায্য করে। টলেমির তত্ত্বকে উল্টিয়ে দিয়ে

www.pathagar.com

কোপার্নিকাস হেলিও সেন্ট্রিক ধারণার প্রবর্তন করে চার্চের রোষ দৃষ্টিতে পড়লেন। মৃত্যুর কাছে নিজকে সমর্পণ করে এই জ্ঞানবৃদ্ধ যদিও রক্ষা পেয়েছিলেন – কিন্তু হতভাগ্য গ্যালিলিওর শেষ রক্ষা হল না। নিজের আবিষ্কার হল তার কাল। হলি ইনকুইজিশনের[১৩২] রায় অনুসারে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার নেমে এল। জীবনের ভয়ে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সত্যের বিপরীতে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য হলেন তিনি। সতের শতকের শেষভাগে মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন এর Principia প্রকাশিত হওয়ায় পূর্বলগ্ন পর্যন্ত হয় পৃথিবী স্থির, হয় সূর্য স্থির, না এই দুই ধারণার বিরাজ করছিল। কোপার্নিকাসের রেনেসাঁধর্মী – তত্ত্ব "হেলিও সেন্ট্রিক থিওরী" নিউটন সতের শতকের শেষভাগে বিশুদ্ধ করে দিয়ে দেখালেন, সূর্যও ঘুরছে, ওটা স্থির নয়। সূর্য ঘুরছে অথবা সূর্য ঘুরছে না – এই দ্বন্দ্বটি কাটিয়ে উঠতে মানব জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল একজন নিউটনের জন্ম পর্যন্ত, তিনি এসে সঠিক ধারণার মুক্তিদান করলেন।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আসার হাজার বছরের চাইতেও বেশী সময় আগে কোরআনের তথ্য প্রদানের নির্ভুলতার বিষয়টি প্রথম অধ্যায় হতে আমরা অবগত রয়েছি। একটি অত্যন্ত সুস্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতায় কোরআন জানিয়েছে যে, সৃষ্টিতে এমন কোন অস্তিত্ব নেই যা স্থির এবং সৃষ্টিতে একটি বস্তুও নেই যা তার আবর্তনচক্র, কক্ষপথ বা জীবনবৃত্তের উপর গতিশীল নয়। তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় হতে এ সঞ্চালনশীলতার স্বরূপটি অনুধাবন করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। এক একটা দ্বীপজগৎ বা আকাশের এক একটা স্তর উড়ে যাচ্ছে কয়েক শ' থেকে বহু হাজার মাইল গতি নিয়ে, আবার এই আশ্চর্যরকম গতিটিও মাত্র একটি চোখের পাতা ফেলার জন্য যতটুকু সময় দরকার, ততটুকু সময়ে। সঞ্চালনশীলতার এই নজিরহীন মহিমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে কোরআনের জ্ঞান। পৃথিবীর জীবনের জন্য সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সূর্যের দ্বারাই মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন এমনি একটি তথ্য, দুর্লভ একটি জ্ঞান, একটি বিশষ নির্দেশনা যা কেবল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মানুষ জ্ঞানের সীমায় আনতে পেরেছে তার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। কেন এই সব জ্ঞান কোরআন অবতীর্ণ হবার সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রকাশিত হয় নি ? কি হতে পারে এর কারণ ?

যে যুগে আল – কোরআনের উদয়, যে যুগের মানুষের সামনে বিজ্ঞানের এতসব জটিল বিষয়গুলি শুধু অবিশ্বাস্যই হত না, হতে পারত এক বড় রকমের বিসম্বাদ। যুগের চাহিদা আর বিজ্ঞানের প্রাপ্তি – দুই এর মাঝ হতে বেরিয়ে আসা তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞানে কোরআনের মহিমা উন্মোচিত হোক, মানুষ এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভব করুক ; হয়ত এমনি কোন সুযোগ ফেলে যাওয়া , একটি

www.pathagar.com

চিহ্ন রেখে যাওয়া ; মহাকালের কলেবরে একটি সাক্ষ্য খোদাই করে রাখা যে, "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে এক মাত্র তিনিই আল্লাহ (৬ঃ৩) তিনি এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত " (৬৪ঃ৪)।

সূর্য বিজ্ঞানের গোড়ার দিকের ইতিহাসকে একটু ডেকে আনতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) আমাদের ছায়াপথের সাধারণ আকৃতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করলেন। তিনি সূর্যের কক্ষপথ চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে ১৯২০ শতাব্দীতে হারলো শেপ্‌লে (Harlo Shapley) ছায়াপথ ও সূর্য বিষয়ক বিশুদ্ধ হিসাব - নিকাশের দাবী করেন। পরবর্তী বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ হতে আমরা জানতে পারি যে, শেপলে প্রদত্ত ডাটা সত্য এবং সে অনুযায়ী গ্যালাক্সি কেন্দ্র হতে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সূর্য ছায়াপথের নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিঃ মিঃ (১৫৬ মাইল) বেগে ধাবিত হচ্ছে। ১৪০০ বছরের পূর্বের অবতীর্ণ কোরআনের বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে পড়েছে, "তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিলেন নিয়মাধীন - প্রত্যেকেই একটি ব্যাপ্তিকাল পর্যন্ত সঞ্চালনশীল " (১৩ঃ২)।

শুধু কি এই টুকু ?

চলুন আমরা আমাদের মৌলিক আলোচনায় প্রবেশ করি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, প্রতিমুহূর্তে ২৫০ কিঃ মিঃ বেগের এই গতি ক্রমাগতই সূর্যকে নিয়ে যাচ্ছে তার অন্তিম পরিণতির দিকে। এই দ্রুতি নিয়ে চলমান সূর্য প্রায় ২২ কোটি বছরে তার একটি পূর্ণ ঘূর্ণি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সূর্যের কক্ষজাত সঞ্চালন তাকে ক্রমাগতই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা হল, সোলার এ্যাপেক্স' (Solar Apex) যার অবস্থান 'ভেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বরাবরে।[১৩৫] কনসটেলেশন অব হারকিউলাস (আলফা লাইরী) নামক কেন্দ্রটির দিকে একটি নির্দিষ্ট বিচ্যুতি (deviation) নিয়ে ক্রমশ ঃ এগিয়ে যাচ্ছে সূর্য। সূর্যের এই বিচ্যুতির প্রতিমুহূর্ত - গতিবেগ ২০ কিঃ মিঃ[১৩৬]। তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য তার বয়স পরিক্রমার মাঝামাঝি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। মহাকালের গহব্‌রে আলফা - লাইরীর বিন্দুর দিকে বিচ্যুত হওয়ার এক পর্যায়ে চলে আসবে সূর্যের অন্তিমকাল। প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিঃ মিঃ গতি নিয়ে চলতে চলতে আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর পরে এমন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছবে সে, যখন আর তার গতি নেই , তেজ নেই , জীবন নেই, তখন সে ধ্বংস হয়ে পড়েছে। এই সেই লক্ষ্যবিন্দু, মহাকালের গহীন গর্ভে এক অজ্ঞাত অঞ্চল যার উদ্দেশ্যে চলছে সূর্য প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। বিশুদ্ধ পদার্থ বিদ্যা ও গণিতের রায় অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ করে

www.pathagar.com

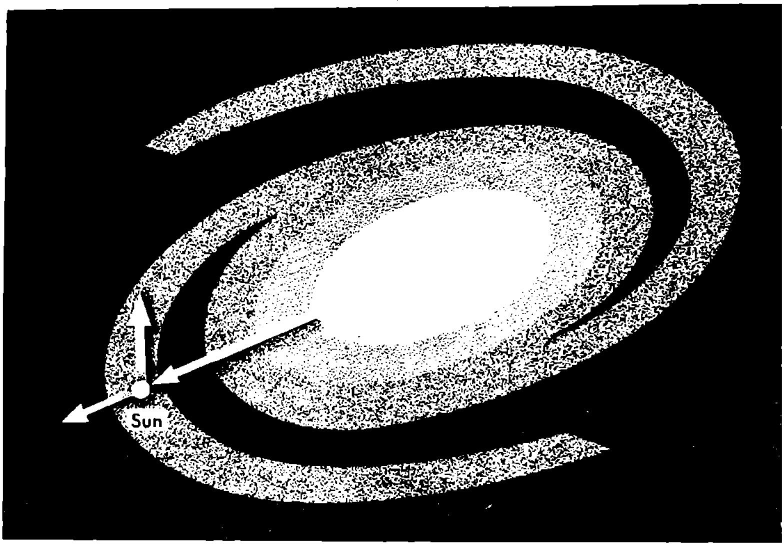

আমাদের ছায়াপথে সূর্যের অবস্থান। সূর্য তার কক্ষ পথে সেকেণ্ডে ২৫০ কিঃ মিঃ বেগে পথ চলে। এই গতিতে চলার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ২০ কিঃ মিঃ গতিতে আলফা লাইরীর দিকে বিচ্যুৎ হয়। এই বিচ্যুতি একদিন তাকে কালের গর্ভে অদৃশ্য করে ফেলবে।

ফেলবে । তখন তার সমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে (red giant) পরিণত হয়ে। নক্ষত্রের বিলয় প্রক্রিয়ায় এই লাল – দানবের অভ্যন্তের পড়বে জ্বালানি সংকট, অভিকর্ষ বলের প্রভাব তখন কার্যকর হবে ধ্বংস পতন (Coollapse) ঘটিয়ে। এ ধ্বংস পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে চাপজনিত কারণে পরিণামে সৃষ্টি হবে একটি সাদা বামন (white dwarf) শীতল, অনুজ্জ্বল, নির্জীব ও অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন এই নক্ষত্র কেন্দ্রটি যখন সাদা বামনাকৃতি লাভ করবে – তখন তা মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে আর চিরতরে চলে যাবে আমাদের দৃষ্টির বইরে[১৩৭]। আপনি জানেন কি, এই সব তথ্য এসেছে আল – কোরআনে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে? শুনতে বিস্ময় লাগে কি ? সূর্য পরিণতির বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অতি সংক্ষিপ্ত সার উপরে তুলে ধরা হল, ঠিক অনুরূপ একটি তথ্য যদি কোন ধর্মগ্রন্থ তুলে ধরে থাকে আজ থেকে বহু আগে, বিষয়টি মানুষ জানবার হাজার বছরের বেশী পূর্বে, সে কি আপনার অনুভারের দাবী করতে পারে ? সে কি দাবী করবে না আপনার তীক্ষ্ম বিচার শক্তির ? আপনার অনুভব আপনার কাছেই থাকুক, লক্ষ্য করুন, সূর্যের পরিণতি নিয়ে আল – কোরআনের

www.pathagar.com

প্রস্তাব, "সূর্য তার নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে গমণ পরিক্রমার নিরত, ইহা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর সুনির্ধারিত ব্যবস্থা " (৩৬ঃ৩৮)। আপনি অবগত রয়েছে কি যে, উল্লিখিত, আয়াতে ব্যবহৃত 'মুসতাকার' (مستقر) শব্দটির অর্থ গন্তব্য ও আবাসস্থ হাওয়ার সাথে সাথে পরিণতির অর্থকেও প্রতিভাত করে ? বিজ্ঞানীকুল সূর্যের গন্তব্যস্থলকে পেয়েছেন সেই "সোলার এ্যাপেক্স" বরাবরে কোন অজ্ঞাত স্থানে যেখানে তার অন্তিম পরিণতি নির্ধারিত রয়েছে । ১৮ শতাব্দীতে স্যার উইলিয়াম হারশেলের আবিষ্কারের ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্ববাসী যা অবগত হল, কি করে তা খ্রীষ্টীয় ৭ শতকের মুহাম্মদ (সঃ) অজ্ঞ আরব মরুবাসীদের মাঝে বসে বিজ্ঞানের এতবড় তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন যেখানে খ্রীস্টীয় ১৭ শতকে নিউটনের তত্ত্ব পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত মানুষ কোপার্নিকাসের স্থির সূর্য নিয়ে বেশ সুখেই কাটাচ্ছিল ?

সূর্য যখন লাল-দানবে পরিণত হবে, তখন এর আয়তন এত বড় হতে যে তা মঙ্গলকে গ্রাস করে ফেলবে।

সূর্য যখন সোলার এ্যাপেক্স বরাবরে সে নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে যাবে , কি হবে তার ? আপনি হয়ত বিস্ময়ে হতবাক হবেন যে, এ তথ্যটিও আল-কোরাআনে এসেছে অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সাথে। ১৩ঃ২ ; ৩১ঃ২৯ ; ৩৫ঃ১৩ এবং অনুরূপ আরো

www.pathagar.com

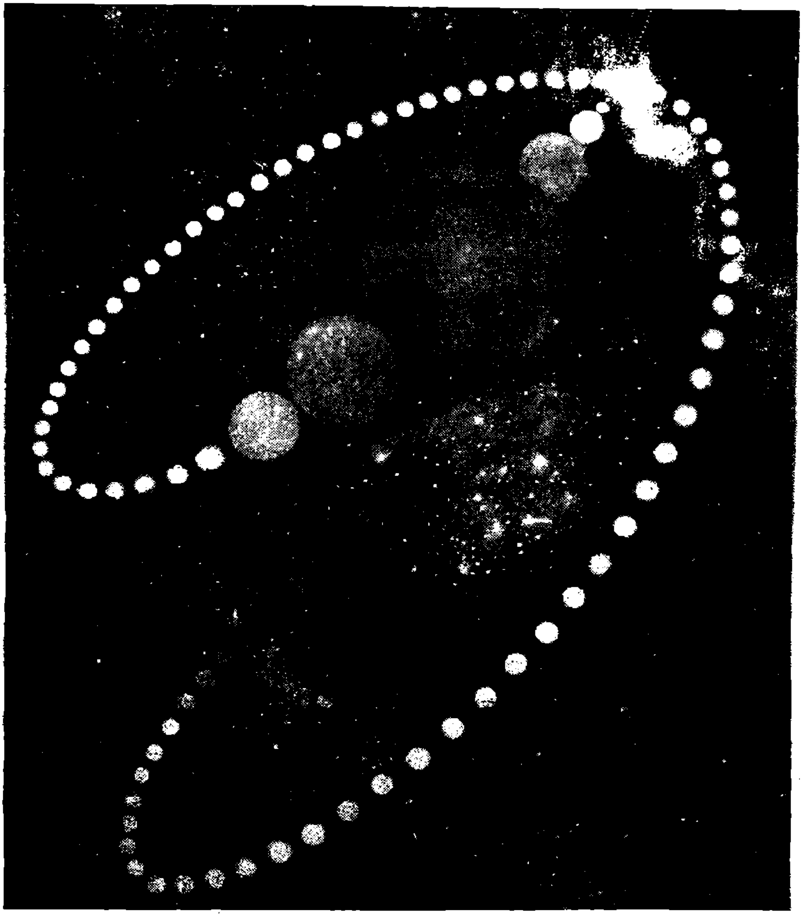

সূর্য ও অন্যান্য মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্রের জীবন পরিক্রমা। গ্যালাক্সি হতে সৃষ্টির পর ক্রান্তিকালীন ভর ও অভিকর্ষের বিপরীতমুখী শাসনে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর লাল দানবে পরিণত হয় এই সব নক্ষত্র। তারপর নোভা বিস্ফোরণের দ্বারা অতিঘন সাদা বামনে রূপান্তরিত হয়ে তারা মহাজগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হয় (চিত্রে সর্ব ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি)।

আয়াত রয়েছে যেখানে একটি প্রস্তাব এসেছে, "তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের অধীন — সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে প্রত্যেকেই পরিভ্রমনশীল একটি

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত"। আয়াতাংশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিস্তীর্ণ। আজলিন (اجل) শব্দটির অর্থকে অনুবাদগণ শুধু নির্দিষ্টকাল অর্থে গ্রহণ করেছেন; এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আরো ব্যাপক, যাদের সংগে কোরআনের প্রস্তাবের আবেগ আতি সংগত কারণ সুদৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। শব্দটির আরো যে অর্থ রয়েছে তা হল, একটি সুনির্ধারিত সময়, কালান্তর, পরিণতি, ভাগ্য, গন্তব্য মৃত্যু ইত্যাদি (appointed time, term, fate, destiny, death hour of death etc.) । এই অর্থগুলোর প্রতি চোখে চোখ রেখে অনুবাদ করলে আমরা যে বক্তব্যটি পাই, তাতে নির্দিষ্ট কালের সংগে নির্দিষ্ট পরিণতির (fate, destiny , death) বিবেচনা আসে এবং সেই পরিণতির প্রকৃতি যে ধ্বংস বা বিলয়, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থগুলোর আলোকে আমরা এই আয়াতাংশের সম্ভাব্য অনুবাদ দিতে পারি - "সকলেই চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক পরিণতির তাগিদে কাল - দূরত্ব পরিক্রমায় নিরত"। সুধী পাঠক, নিশ্চয়ই এই অনুবাদকে চাপিয়ে দেয়া বা জোর করে অর্থ করার অপবাদ দিতে পারবেন না। উল্লিখিত আয়াত তিনটির আলোকে আমরা বলতে পারি, কোরআনের সূর্য বিষয়ক পরিণতি প্রস্তাবের সংগে সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানের সামান্যও বিরোধ নেই। ৩৬ঃ৩৮ আয়াতে সূর্য সঞ্চালনের যে ধারণা প্রকাশিত হয়, একই আয়াতসহ ১৩ঃ২, ৩১ঃ২২, ৩৫ঃ১৩ এবং অনুরূপ আরো আয়াতে এর পরিণতি সম্পর্কে যে চিত্র প্রত্যক্ষ করি, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, এক মহা বিজ্ঞান দ্রষ্টাই আল-কোরআনের প্রস্তাবক যিনি বিজ্ঞানের এই সব দুর্লভ তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

যে কোন বুদ্ধিমান পাঠকের সন্ধানী চোখে পড়বে একটি শব্দে 'কুল' যার অর্থ হল সমস্তই। পরিণতির দিক দিয়ে আমরা শুধু সূর্যের তথ্যই এতক্ষণ জেনেছি। বিজ্ঞানিগণ আঞ্চলিক নক্ষত্রসমূহের এই মহাযাত্রার একটি সাধারণ দিক নির্ণয় করতে পেরেছেন যা হ্যানবের্স্টের ভাষায় - All the local stars, including sun are heading in the direction of the constellation cygnus.[১৩৯]

সূর্যের বেলায় বিজ্ঞানীগণ সুনির্দিষ্ট গন্তব্য খুঁজে পেয়েছেন, আঞ্চলিক নক্ষত্রদের বেলায় তাদের সাধারণ দিকটি জানতে পারার বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, প্রতিটি নক্ষত্রই নিজ নিজ গন্তব্য, পরিণতি ও ধ্বংসের প্রতি এগিয়ে যাচ্ছে এক মহা দুর্নিবার গতিবেগে। সময়ের বিশাল বিপুল কালের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একদিন তারা উপনীত হবে বিলয়-কাল-দূরত্বে। কোরআনের বাণী প্রস্তাব, 'সকলেই চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক পরিণতির তাগিদে কাল-দূরত্ব অতিক্রম কার্যে নিরত'- এই তথ্যের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে গ্যালাক্সিকে আমরা দৃশ্যপটে আনতে পারি। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, হাবেলের বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কার ও তত্ত্বানুযায়ী দূরত্বের

www.pathagar.com

হারে গ্যালাক্সিসমূহের গতি বৃদ্ধির এক পর্যায়ে দেখা যায়, আমাদের অবস্থান থেকে ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বছরের দূরবর্তী অঞ্চলের কোন গ্যালাক্সির গতি প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতির সমান। এমনি অবস্থানের কোন গ্যালাক্সির ভাগ্যে কি আছে, তা জানার শক্তি আর মানুষের নেই। এমনি একটি গ্যালাক্সি চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে মানুষের দৃষ্টির আওতা থেকে। এর কারণ, নির্গত আলোক রশ্মি কোন দিনই আর আমাদের চোখে পৌছবে না। গ্যালাক্সি সমূহ যে দুর্দান্ত গতিবেগ নিয়ে উড়ে চলছে, তাদের ভ্রমণ পরিক্রমায় এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ১১,০০০ মিলিয়ন বছরের সীমা পেরিয়ে গ্যালাক্সিরা কি হয় ? কোথাও কোন এক পর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অথবা হবে না । কিন্তু সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি আমাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছে , তার আলোকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, এক সময় গ্যালাক্সিগুলোও লয় প্রাপ্ত হবে – তবে কোথায় কি করে , আমরা তার তথ্য সম্পর্কে অবগত নই। ক্বোরআন আমাদেরকে যেভাবে জানায় – "আল্লার সত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল' (২৮ঃ৮৮), সম্ভবতঃ আজকের দুনিয়ায় এ বিষয়টি সন্দেহ কাটিয়ে উঠেছে। যারা আল্লাহে বিশ্বাস করেন না, তাদেরও বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টিতে যাবতীয় কিছুই ধ্বংসশীল। তাহলে আমরা আলোচনার রেশ টেনেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কথিত ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বছর সীমানা পেরিয়ে যে জগৎ , হয়তবা সেখানে কোথাও সৃষ্টি হয়ে রয়েছে গ্যালাক্সিদের সর্বশেষ পরিণতি বা মৃত্যুফাঁদ। [১৪০] ততটুকু সময়ে হয়ত তারাও তাদের নিজেকে গুটিয়ে নেবে যেমন সূর্যের বেলায় সাদা বামন হয়ে যাবার বিষয়টি। গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রে সর্বভুক ধ্বংসশীল ব্ল্যাকহোলগুলোর মত অতি বৃহৎ গহবর এমনি কোন একটি শর্ত পূরণের তাগিদে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে কি না কে জানে ? এ সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের কাছে এখনো সুদূর পরাহত। এগুলো এতই জটিল যে, বর্তমান প্রযুক্তির মানে এ সব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা একেবারে অসম্ভব। মানুষের হাতে তেমন উৎকর্ষ প্রযুক্তি কিংবা তেমনি সাফল্য আসবে কিনা তাও এখনো আমরা নিশ্চিত নই।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমি বলতে চাই , ১৩ঃ২, ৩১ঃ২৯ কিংবা ৩৫ঃ১৩ ইত্যাদি আয়াতে 'কুল' (كل) শব্দ সংযোগে যে শর্ত সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু তথা সমস্ত কিছুই যে ধ্বংসোত্মক পরিণতির দিকে ক্রমধাবমান, তা আমরা সৌরজগৎ থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুতে সমভাবে দেখতে পাই। আমরা কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে অতিশয় সংগতি ও বৈষম্যহীনতা লক্ষ্য করি।

বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের কতিপয় ক্ষেত্রে নিখুঁত মিলের দিকটি মানুষকে উৎসাহিত করে এবং কতিপয় আবেগতাড়িত জ্ঞানীগুণী মুসলমানকেও বলতে দেখা যায় – কোরআন আর বিজ্ঞান যমজ ভাই। তারা অবশ্যই ভুল করেন। মানুষের কষ্টলব্ধ জ্ঞানের সীমা গন্ডী অত্যন্ত ক্ষুদ্রই নয়, তার পাশাপাশি ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সময়ের

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে তা বিজ্ঞানের পরিচয় নিয়েই বাঁচে। জগৎ সমূহের স্রষ্টা মহাজ্ঞানী আল্লাহর কোরআন কখনোই মানুষকৃত বিজ্ঞানের তুল্যে পরিমেয় নয়।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা দাবী করে, - "তোমাদের উপাস্য হইতেছে এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই (২ঃ১৬৩)। যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকিত মহাবিশ্বে কিংবা পৃথিবীতে, তবে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইত (ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়)। অতএব, উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি অতিশয় পবিত্র" (২১ঃ২২)।

---

১৩২ । মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক সর্বোচ্চ রায় প্রদানকারী ধর্মীয় সংস্থা যার কঠোর নিয়ন্ত্রণে তদানীন্তন বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত হতে হত।

১৩৩ । 'সামাওয়াত' শব্দের অর্থ মহাবিশ্ব নেয়া হয়েছে (ব্যাখ্যা মহাকাশ পর্ব-২ দ্রষ্টব্য।

১৩৪ । National geographic Vol - 145 No. 5 May 74.

১৩৫ । The Frame work of the Stars : Nigel Henbest.

১৩৬ । The Bible the Quran and Science - Dr. Maurice Bucaille.

১৩৭ । The Life and Death of Stars-Geoffrey Bath.

১৩৮ । Arabic-English dictionary : F. Steingass

১৩৯ । The Frame work of the Stars - Nigel Henbest.

১৪০ । লেখকের নিজস্ব মতামত – এ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য আজো প্রস্তাবিত হয়নি।

www.pathagar.com

৭

গ্যালাক্সির ধারণা ও মহাবিস্ফোরণ–তত্ত্বের সাথে সম্পর্ক বিচার

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় দ্বীপজগৎ , আকাশের স্তর কিংবা গ্যালাক্সির প্রস্তাব শাব্দিক অর্থে আল–কোরআনে আছে কি?

এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় যদি পড়ে থাকেন, তাহলে আপনি অবশ্যই বলবেন, শাব্দিক অর্থে নয়, প্রস্তাব ও ধারণার বিচারে গ্যালাক্সির সংবাদ আল–কোরআনে অত্যন্ত প্রকটভাবেই রয়েছে। আমি কিন্তু আপনাদেরকে তার চেয়েও সুনিশ্চিত অর্থে গ্যালাক্সির ধারণা দিতে চাই যা মৌলিক সৃষ্টি–তত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; চুল থেকে চুল পরিমাণ সূক্ষ্মতায় যাকে বিচার করা চলে, বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত দিয়ে পরীক্ষা করেও আপনি যার কোন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ভুল–বিচ্যুতি দেখবেন না। অথচ শব্দ নির্বাচন ও ব্যাকরণের প্রয়োগ–রীতিতে সামান্য অসঙ্গতি থাকলেই বিজ্ঞানের দ্বারা এ পর্যন্ত লব্ধ ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের আলোকে তা হয়ে পড়ত এক দুর্বলতা ও বৈপরীত্যের স্বাক্ষর, ভেঙ্গে যেত আল–কোরানের অনন্য ও অসাধারণত্বের গৌরব। বিস্ময়কর নৈপুণ্য ও বিশুদ্ধতায় আল–কোরআনে যে অকল্পনীয় বিজ্ঞানময়তার ছাপ রয়েছে , তাতে প্রমাণিত হয়ে যায় – "নিশ্চয়ই উহা মহা সম্মানজনক কোরআন (৫৬ঃ৭৭) সর্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ" (৬৯ঃ৪৩)।

কোরআনের পাতায় ১৫ঃ১৬, ২৫ঃ৬১, ৮৫ঃ১ অনুরূপ আরো অনেকগুলো আয়াতের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আয়াতসমূহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি শব্দ ব্যবহার পেয়েছে যাদের একটি বুরুজ (برج) এর বহু বচন 'বুরোওজ'(بروج) ও অন্যটি 'জায়ালা' (جعل) । আজ পর্যন্ত প্রচলিত সকল অনুবাদেই বুরোওজ শব্দটির বেশী ভাগ অর্থ রাশিচক্র করা হয়েছে এবং কতিপয় অনুবাদক একে গ্রহ, নক্ষত্র কিংবা কক্ষপথ হিসাবে স্থির করেছেন। ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক "আল–কুরআনুল করীম" অনুবাদটি বিশেষভাবে বঙ্গানুবাদে উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। উক্ত গ্রন্থে নির্দেশিত অনুবাদের কথা ধরুন যা ১৫ঃ১৬ আয়াতখানির অর্থ করেছে ,– "আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য।" বুরুজ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গুণাগুণ ও আবেগ প্রকাশকারী যে সকল শব্দ হাতের কাছে মজুদ ছিল, তা দিয়ে সে শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে। আর এভাবেই ভাষা-প্রবাহে বুরূজ শব্দটি Castle, Fortress ইত্যাদি অতি সীমিত অর্থ প্রকাশ করার দায়ে আটকা পড়ে গেছে। কয়েক শ' বছর আগে যখন কোরআন বাংলায় কিংবা ইংরেজীতে অথবা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে, তখনকার মানুষের পক্ষে গ্যালাক্সি কি, তা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। আকাশের সর্ব বৃহৎ অস্তিত্ব হিসাবে মানুষ যাকে জানত, সে ছিল রাশিচক্র। মানুষ তার জানার সাধ্যের সবচাইতে বৃহত্তর অস্তিত্বকেই বুরুজ বলে ধরে নিয়েছিল। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি , বুরুজের অর্থ গ্রহ-নক্ষত্র, নক্ষত্র বা রাশিচক্রের কোনটিতেই প্রশস্ত নয়। সর্ব বৃহৎ অস্তিত্ব হিসাবে আমাদের জ্ঞানে শুধুমাত্র গ্যালাক্সিরই সংযোজন হয়েছে যা মূলতঃ রূপক অর্থে Fotress বা castle এর গুণাগুণেরই আনুপাতিক। মহাবিশ্ব এত বিশাল যে অতিশয় দূর-দূরান্তের মানুষ, পৃথিবী নামক কোথাকার কোন এক গ্রহ থেকে বিংশ শতাব্দীতে এসে মহাকাশের দিকে টেলিস্কোপ তাক করবে আর সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচের ফলকে লক্ষ কোটি যোজন দূরের গ্যালাক্সিকে যখন দেখবে, তাকে দেখাবে যেন ছোট এক গুচ্ছ নক্ষত্র আর ধূয়ার আবাসিক অঞ্চল ; আশেপাশের অনেক বিস্তীর্ণ এলাকায় আর কোন বস্তুর অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও নেই। অসীম শূন্যতার মহাসমুদ্রে অত্যন্ত কঠোর প্রতিরক্ষায় সেই ধূয়াগুচ্ছ তার অধিবাসী নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্যাসকে রক্ষা করে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষায়। মানুষের চোখে যেভাবে এর আবির্ভাব হওয়া সম্ভব কিংবা গুণাগুণের মাত্রায় যে ভাবে তা নক্ষত্র ও গ্যাসপুঞ্জকে নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করে – তার উপমা হতে পারে দুর্গ বা শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য অঞ্চলের। হয়ত টেলিস্কোপে দেখে এমনি কিছু মনে হওয়ার সাথে এই শব্দটির প্রয়োগের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, আর হয়ত তাই এমনি কোন জ্ঞানী মনীষা যাঁর কাছে এই সব বিবেচনাগুলো রয়েছে , তাঁর পক্ষ হতেই এসেছে এই বুরূজ শব্দটি, অন্যথায় কোরআনে এর প্রয়োগে এর বড় স্বাতন্ত্র্য এবং চোখে পড়ার মত পার্থক্য (জায়লার প্রয়োগ) কখনোই আমরা দেখতে পেতাম না। অতএব, কোরআনে বুরুজের প্রস্তাবনায় রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির পরিবর্তে গ্যালাক্সি শব্দটি ব্যবহার করবার একটি অতিশয় যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা পেয়ে যাই। জেনে রাখা দরকার যে 'মাওকিব' কিংবা 'মাজাররাত' (موكب - المجرة) শব্দসমূহ[১৪৭] গ্যালাক্সি অর্থ প্রকাশক হলেও এরা আধুনিক শব্দ যা বিংশ শতাব্দীতেই সৃষ্টি হয়েছে।

এবার ফিরে চলুন আল-কোরআনের পাতায় ২৫ঃ৬১ আয়াতে , মহান আল্লাহর বাণী গাম্ভীর্যে সুবিশাল জ্ঞান বিস্তৃতির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে যা আজকের বিজ্ঞানের বিস্ময় গ্যালাক্সির অস্তিত্ব সম্পর্কে অতি সুদৃঢ় সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের বংগানুবাদে বলা যায় – "অতিশয় উচ্চ মর্যাদাময় তিনিই সেই মহান আল্লাহ , যিনি

www.pathagar.com

মহাকাশে সংস্থাপন করিয়াছেন 'বুরুজ' বা গ্যালাক্সিসমূহ , সূর্য এবং চন্দ্র।" এই আয়াত প্রকারান্তরে বলে দিতে চায় যে, মহাবিশ্বে এই বুরুজ বা গ্যালাক্সির অবস্থান সূর্য এবং চন্দ্র যতদুর সত্য ও বাস্তব হয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় বিরাজ করে, তার সাথে তুল্য বরং এর সত্যতা সূর্য কিংবা চন্দ্রের অবস্থানের বাস্তবতার চাইতেও অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে। এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি আয়াতটিতে শব্দের বুননে 'বুরুজ,' 'সেরাজ 'ও 'কামার' 'শব্দগুলোর অবস্থানিক মান নির্ণয়ের দ্বারা। এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সনদ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ প্রথমে টেনে আনলেন বুরুজকে, তার পরে তিনি গণ্য করলেন সূর্যকে এবং তার পরের গণ্যতা পেল চন্দ্র। আমরা আমাদের বাস্তবজীবনে সূর্যকে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে দেখতে পাই এবং তারপরে পাই চন্দ্রকে। প্রশ্ন আসে, যদি এ যুক্তি সত্য হয়, তবে বুরুজ শব্দটির অবস্থানিক মান কিভাবে সূর্য ও চন্দ্রের প্রেক্ষাপট হতে যুক্তিযুক্ত করা যায়? উত্তরটি সহজ, প্রায়োগিক ও অবস্থানিক সকল দিক হতে বিচার করলে গ্যালাক্সি সূর্যের আগে চলে আসে। মহাকাশ সংগঠনের বিন্যাসটি ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, মানের ক্রমানুসারে তা হল গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ , উপগ্রহ ইত্যাদি। প্রকৃত-পক্ষে একটি গ্যালাক্সির শাসন একটি নক্ষত্রের জন্য অপরিহার্য যার অপিরিহার্যতা পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহবাসী জীবনের জন্যও। ঔজ্জ্বল্যের বিবেচনা আসতে পারে বিচারের আরেকটা প্রধান দিক হয়ে। সূর্যের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দুরের এই সূর্য একটি মুহূর্তে যে পরিমাণ ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়, সৃষ্টির শুরু হতে এই পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীবাসী যত জ্বালানি ব্যবহার করেছে , সেই ঔজ্জ্বল্যের বিচ্ছুরণ তার চাইতে অনেক অনেক বেশী। আর বুরুজ হল গড়ে কমপক্ষে এমনি ১০ হাজার কোটি সূর্যের আবাসস্থল যাদের কেন্দ্র ভাগের (galatic center) উজ্জ্বলতা কোটি সূর্যের সমান। উদাহরণ দেয়া চলে কর্কট নীহারিকা (crab nebula), কালাপুরুষ (Orion) nebula), লেগুন নেবুলা (Lagoon nebula) ইত্যাদির। উদাহরণ হয়ে আসে দুর্বোধ্য ক্ষুদে গ্যালাক্সি কোয়াসার OQ-172 এর, যার উজ্জ্বলতা সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের ১০ ট্রিলিয়ন গুণ। আমরা দেখতে পাই , কোরআনের ২৫ঃ৬১ আয়াতে শব্দ ব্যবহারের ধারাবাহিকতার যে যুক্তি আসতে পারে, তা যুক্তির সাথে প্রমাণের সকল তথ্য ও উপাত্তের সংগে মিলে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

আপনি জানেন কি যে শব্দ নির্বাচনের এ বিষয়টি সৃষ্টিতত্ত্ব বা Big Bang theory অথবা অনুরূপ কোন সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করে এবং শুধু তা-ই নয়, আল-কোরআনের বর্ণনা শৈলীকে সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যার প্রচলিত নিয়ম কানুনের মাত্রায় ব্যাখ্যা করা যায়? সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে সবিস্তার জ্ঞান লাভ করব, তবে এই আলোচনার প্রয়োজনে জানাচ্ছি যে, তত্ত্ব অনুযায়ী অনুমান করা হয় যে,

www.pathagar.com

আজ থেকে ১৫ মহাপদ্ম বছর পূর্বে [১৪৪] এক অকল্পনীয় ভর-ঘনত্বে এক অসীম তাপমাত্রার পরিবেশে অতিশয় মারাত্মক সংকোচনজনিত অতি ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তুপিণ্ডে অত্যন্ত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সময়ে এক মহা বিস্ফোরণ ঘটে যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দেয়। এই বিস্ফোরণের প্রমাণ হিসাবে সমস্ত মহাবিশ্বে প্রাপ্ত পশ্চাদ-পটি বিকিরণ (Background radiation) ও পশ্চাদপটি কোলাহল (Background hiss) মহাসম্প্রসারণ এবং আরো অনেক শক্তিশালী যুক্তি ও তথ্যে বিষয়টি আজ কল্পনার দোষারোপকে অতিক্রম করে সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। বিশ্ব সংসার একটি মহাবিস্ফোরণের ফসল হিসাবে সৃষ্টি হয়ে জন্মলগ্ন থেকে সকল দিকে উড়ে চলছে এক অসীম দুর্নিবার গতিতে মহাসম্প্রসারণের নেশায়। বিজ্ঞানীগণের এইসব ধারণার পিছনে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণের পাশে সূক্ষ্ম গণিতের হিসাব-নিকাশ। সৃষ্টির ক্ষণ থেকে চতুর্মুখী সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বিস্ফোরণ কেন্দ্রটি আজ আমরা কত দূরে ফেলে এসেছি তা জানা ও অনুমান করা সম্ভব নয়। হয়ত বিশ মহাপদ্ম অথবা তার চাইতেও বেশী আলোক বর্ষ দূরের কোন স্থানে জন্ম নেয়া আমাদের চেনা বিশ্ব সংসার মহাকালের মহাবেগবান বিমানে করে আজকের স্থানে এসে পথ নিয়েছি। অতএব আমাদের জ্ঞাত Space-time continuum বা আপেক্ষিক সময়-দূরত্ব-ধারাবাহিকতার যে কোন পর্যায়ে গ্যালাক্সিদের সৃষ্টি হওয়ার যে কোন ধারণা অসত্য ও অযৌক্তিক। আল কোরআন যদি ১৫ঃ১৬ ২৫ঃ৬১, ৮৫ঃ১ এবং অনুরূপ প্রস্তাবে আয়াতসমূহে খালাক শব্দটি ব্যবহার করত, তবে তার অর্থ দাঁড়াত, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় অথবা তার পরবর্তীতে কোন পাঠক কর্তৃক কোরআন আবৃতি করার সময় গ্যালাক্সিরা যে যে অবস্থানে অবস্থিত ছিল বা রয়েছে – সেই সেই অবস্থানে তাদের সৃষ্টি হওয়া। পূর্বেই বলেছি 'খালাক' শব্দটি নতুন অস্তিত্বে সৃষ্টি করা বা হওয়ার অর্থকে তুলে ধরে। আর 'জায়লার স্থলে এমনি একটি শব্দের প্রয়োগ, কোরআনের সকল দম্ভ ও মাহাত্ম্যের ভিতকে করে দিত একেবারে নড়বড়ে। জ্যোতি-পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ও সময়-দূরত্ব ধারার আপেক্ষিকতায় খালাক এর প্রয়োগে যে অর্থ হতে পারত তা প্রমাণ করে দিত যে, এই শব্দের ব্যবহারটি বাস্তবে এক চরম ভ্রান্তি। অন্যপক্ষে 'জায়লা' এর ব্যবহার প্রতিটি মুহূর্তে মুহূর্তে গ্যালাক্সিদের অবস্থানের পরিবর্তন, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে শুধু অনুমোদনই করে যায় তা নয়, বিজ্ঞানীগণ যে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের ধারণা পোষণ করেন, তা কিংবা অনুরূপ কোন ঘটনাকেও ইঙ্গিত করে যায়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'জায়লা' এর ব্যবহার আমাদেরকে অত্যন্ত নির্ভেজালভাবে জানিয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ বুরুজ বা গ্যালাক্সিদেরকে সময় ও দূরত্বের বিস্তারে সংস্থাপন করেছেন, যারা মেনে চলছে গতির শাসন। আর নিয়ম মানার এই নিশ্চিত ব্যবস্থায় অতি তীব্রবেগে স্ফীত হয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। সম্প্রসারণশীল ও গতিময় মহাবিশ্বের গোড়ায় কেবল একটি মহাবিস্ফোরণকে আনলেই বিষয়টির সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা চলে। অন্যপক্ষে বুরুজ শব্দের একই প্রয়োগে জায়লা -এর স্থলে

www.pathagar.com

খালাক্ব -এর ব্যবহার করা হলে আমাদের জানা সময় দূরত্ব-ক্রমের কোন পর্যায়ে Big Bang এর পরিবেশ হতে ভিন্ন কোন এক পরিবেশে গ্যালাক্সিদের শূন্য বা সম্প্রসারিত বিশ্বের ফাঁকা স্থান হতে এমনিভাবে এমনি থেকে সৃষ্টি হবার ধারণা এসে যেত এবং

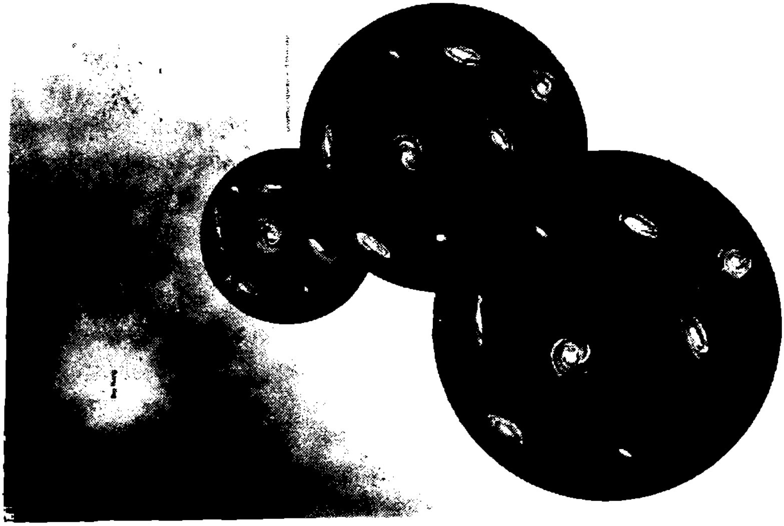

Space-Time-Continuum এর শাসনে প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তন নীতিকে কোরআন অনুমোদন করে। গোটা মানব জাতি ১৪০০ বৎসর ধরে সকল শ্রদ্ধা বিমিশ্রিত জ্ঞানের বিচারে মাত্র একটি শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে যে ভুল করে আসছে, তা যদি কোরআন অনুমোদন করতো তার শব্দ বিন্যাসে, তবে Spece-time-Scale এর অতি সূক্ষ্ম বিচারে কোরআন পরিণত হতো ক্রটিপূর্ণ রচনায়। বুকজ শব্দের সাথে জায়লা শব্দের ব্যবহার কোরানিক বিজ্ঞান-বিশুদ্ধতার এক বিস্ময়কর পরিচয়।

ফলশ্রুতি হত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের চরম বিরোধিতা। আমরা দেখতে পাই Space time continuum এর শাসনে প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তন নীতিকে কোরআন অনুমোদন করে। গোটা মানুষ জাতি তার সকল শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত জ্ঞানের বিচারে মাত্র একটি শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিগত ১৪০০ বছর ধরে যে ভুলটি করে যাচ্ছে , সেই ভুলটি যদি আল-কোরআনের শাব্দিক ব্যবহারে করা হত, তাহলে কোরআন পরিণত হয়ে যেত একটি ক্রটিপূর্ণ রচনায়[১৪১] । এইসব সূক্ষ্মতাগুলোই মহান

www.pathagar.com

আল্লার একটি বাণীকে তুলে ধরে চোখের সামনে - "তাহারা কি সতর্কতার সংগে কোরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো নিকট হইতে প্রকাশ পাইত, তবে তাহারা অবশ্যই উহাতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি প্রত্যক্ষ করিত (৪ঃ৮২)। তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও সম্পূর্ণ সংগত। তাঁহার বাণী কেহই পরিবর্তন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না (৬ঃ১১৫)।" এতবড় একটি বিশাল গ্রন্থে একটি শব্দের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ ও তার কৈশিক নির্ভুলতা প্রদত্ত আয়াত দু'টির একটি বাস্তব প্রমাণ পেশ করে। আমাদেরকে ডাক দিয়ে যায়, - "বলিয়া দাও, ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাজেলকৃত জ্ঞানের কথা ও বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ এবং দয়া (৭ঃ২০৩)। ইহা কোন জ্যোতিষীর উক্তি নহে যদি কদাচিৎ ও তোমরা বুঝিয়া থাক (৬৯ঃ৪২)। যদি মোহাম্মদ আমার সম্পর্কে কোন কথা বানাইয়া বলিত, (৬৯ঃ৪৪) তবে আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কব্জা করিতাম (৬৯ঃ৪৫)। তারপর তাঁহার জীবনশিরা কাটিয়া দিতাম (৬৯ঃ৪৬)। ইহা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ গ্রন্থ (৪০ঃ২)। যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই" (২ঃ২)।

আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সমাপ্ত করার পূর্বে আবার সেই ১৫ঃ১৬ আয়াতটিকে একটু দৃশ্যে আনতে চাই। দেখুন, "আমরা আকাশে সৃষ্টি করিয়াছি সুরক্ষিত দুর্গ সাদৃশ্য গ্যালাক্সিসমূহ ; উহাকে আমরা সজ্জিত করিয়াছি তাহাদের জন্য যাহারা প্রকৃত দর্শক"। এই আয়াতটি আকাশ তথা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার ইঙ্গিত বহন করে। মহাবিশ্বের অবারিত সৌন্দর্যের সন্ধানও আমরা এ আয়াতের বিষয়বস্তু হিসাবে পেয়ে থাকি। সুধী পাঠকের নিশ্চয়ই চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরা মহাবিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপ্তির কথা মনে আছে? কিন্তু প্রশ্ন হল, আল্লাহর বিচারে প্রকৃত দর্শক কে? আল-কোরআনে রয়েছে তাদের পরিচয়, - "যাহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করিয়া থাকে এবং মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর (আসমান ও জমিন) সৃজন বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে আর (উপলব্ধি হইতে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি বৃথা কিছুই সৃষ্টি কর নাই - তুমিই পবিত্র" (৩ঃ১৯১) তারা -ই।

"হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য গ্রহণ কর এবং যখন তোমরা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছ , তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইও না (৮ঃ২০)। পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে , তাহাদিগের কি পরিণাম হইতেছে (১৬ঃ৩৬)। যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই , উহার অনুসরণ করিওনা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় উহাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হইবে (১৭ঃ৩৬)। মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করিয়া থাকে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের (২২ঃ৩)। বস্তুর চক্ষুতো

www.pathagar.com

অন্ধ নয়, অন্ধ হইল বক্ষস্থিত হৃদয় (২২ঃ৪৬)। নিশ্চই বিচারের দিন নির্ধারিত রহিয়াছে (৭৮ঃ১৭)। এইত সঠিক সত্য দিন ; অতএব, যাহার ইচ্ছা , নিজ পালনকর্তার স্মরণ লউক" (৭৮ঃ৩৯)।

---

১৪১ । Arabic English-Dictionary - F. Steingass.
১৪২ । ২৬ঃ৮৪,৮৫ আয়াতে এই শব্দের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করুন।
১৪৩ । Elias Modern Dictionary - Elias A. Elias & E.D.E. Elias.
১৪৪ । Chambers Twentieth Century Dictionary - AM Macdonald.
১৪৫ । The Framework of the Star - Nigel Henbest.
১৪৬ । To the Edge of Eternity - John Gribbin.
১৪৭ । Wortabet's Dictionary English -Arabic - John Wortabet & Harvey Porter.
১৪৮ । ১ মহাপদ্ম সমান ১ বিলিয়ন বা ১,০০০,০০০,০০০ (আমেরিকান একক)।
১৪৯ । ভুলটি হল জায়লা (جعل) কে খালক (خلق) এর অর্থে অনুবাদ করা।

www.pathagar.com

৮

ভিন জগতের জীবন

সৃষ্টিতে সুবিস্তার নিয়ম, ব্যবস্থা, আইন ও শৃংখলার ছবি এঁকেছেন এক কবি – বিজ্ঞানী ঃ-

নিয়ম দেখো আর নিয়মের করছে কেমন নিয়ন্ত্রণ,
অজানা সূর্যের বৃত্তে ঘুরিছে অজানা গ্রহরা সারাক্ষণ।[১৫০]

কবির কল্পনা অজানা অজ্ঞাত সৌর ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করেছে। কিন্তু কবি তো বিজ্ঞানী নন। কে শুনবে তার কল্পনার বাণী? এ্যালেন আইজ্যাক বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের প্রসংগকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শুধু নাকচই করে যাননি, – মহাবিশ্বে সৌর ব্যবস্থার অনুরূপ আর কোন ব্যবস্থা থাকা সম্ভব এমন ধারণাকেও উড়িয়ে দিয়েছেন তার লেখায়।[১৫১] তিনি পরিচিত ছিলেন ৯২টি মৌলের সাথে। তার দৃঢ়তার প্রতি বিদ্রুপস্বরূপ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা দাঁড়াল ১০৫টি। ১৯৮৪ সালে 'বিটা পিকটরিস' নামক নক্ষত্রের রাজ্যে অনুরূপ সৌর ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়ে যায় ও এ্যালেন আইজ্যাকের দৃঢ়তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। চিলির লাস ক্যাম্পানাস মানমন্দির থেকে ৫০ আলোক বছর দূরের এই সূর্যের গ্রহ ব্যবস্থাকে অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ধারণ করা হয়েছে।[১৫২] অনুরূপভাবে চলে আসে ১৯৮০ সনে আবিষ্কৃত বার্নাড ষ্টারের কথা, যার রয়েছে গ্রহ পরিবার। বিজ্ঞান আজ বিরুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করেছে। কবির কল্পনা সত্য হয়ে পড়েছে।

অনুরূপ ধারণার প্রস্তাব করেছিলেন ফরাসী দার্শনিক ফন্টেনেলী এখন থেকে দুই শতাব্দী আগে ঃ-

Why should nature be partial as to accept only the earth ? I can't help thinking it would be strange that the earth should be well peopled, and other planets not inhabited at all. I think they were made but to little purpose. I must believe the planets are peopled as well as the Earth.[১৫৩] অতিশয় যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন ; শুধু পৃথিবীই কেন এককভাবে জীবনময় হবে, অন্যান্য গ্রহরা কি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি? যুক্তি আর আবেগের আতিশয্যে তিনি সকল গ্রহেই জীবনের সন্ধান খুঁজে ফিরেছেন। ফন্টেনেলীর ধারণাও কালের বিচারে মিথ্যা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আমরা আজ জানতে পেরেছি অন্ততঃ আমাদের সৌর ব্যবস্থায় পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহেই জীবন থাকা সম্ভব নয়। জীবন সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য চাই কোন গ্রহের 'সবুজ তলের জীবন এলাকায়' (Green belt of life zone) অবস্থান, যেখানে পানি তরল অবস্থায় অবস্থান করে[১৫৪]। এর উভয় দিকে রয়েছে মৃত্যু – অতিশয় উত্তাপ যা পানিকে চিরবাষ্পায়িত অবস্থায় রাখে এবং অতিশয় ঠাণ্ডা, যা হিমায়িত বরফের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে থাকে। তার পরেও রয়েছে সহস্র সমন্বয়ের শর্ত যা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ফন্টেনেলী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকলে অবশ্যই এমন দাবী করতেন না। ফন্টেনেলীর বহু আগে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে থেলাস দৃঢ়ভাবে মত পোষণ করতেন – দৃশ্যমান গ্রহ ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য কোন জীবন বহুল জগৎ রয়েছে। তার ছাত্র একজিমেণ্ডারের (Anzximander) মতে এমন জগতের সংখ্যা হল অসংখ্য। পুটার্চ (Plutarch) তার ধারণায় চাঁদে স্বর্গের অসুরদের আবাস ভূমিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদগণও পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহে জীবনের কল্পনাই শুধু করতেন না, তারা কল্পিত জগৎগুলোর সংগে যোগাযোগ স্থাপনেরও নিরন্তর প্রয়াস ও ধ্যান-ধারণার চিহ্ন রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়। বিখ্যাত গণিতবিদ সি এফ গাউস (C F Gauss 1777-1855) সাইবেরীয় জংগলের বৃক্ষরাজিতে একটি অতিকায় ত্রিকোণ তৈরীর প্রস্তাব করেছিলেন যা অন্যান্য গ্রহের অধিবাসিগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। জে জে ভন লিট্রো (JJ Von Littrow 1781-1840) সাহারা মরুভূমিতে জ্যামিতির পদ্ধতি অনুসারে সুবৃহৎ আকৃতির নালা তৈরী করে তাতে কেরোসিন ঢেলে রাতের বেলায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব রাখেন। সি গ্রস (C Gros) দিনের সূর্যালোকে অতিকায় আয়না স্থাপন করে আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ভিন গ্রহের মানুষের সংগে যোগাযোগের উপায় করার পরামর্শ পর্যন্ত দান করেছিলেন।[১৫৫]

এতক্ষণের আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে উন্নততর মধ্যযুগীয় দার্শনিক ও আকাশ বিজ্ঞানীদের বল্গাহীন কল্পনার ছড়াছড়িকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের অনেকেই বিজ্ঞানের বিচারে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাদের এই বল্গাহীন কল্পনা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হল একটি 'কারণ' যা মানুষকে পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র কোন গ্রহ-জগতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবিত করে তুলেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষ ভিন জগতের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে যাচ্ছে কেন? এই ভাবনাটি আটকে ধরে রাখার পেছনে যুক্তি কি? আজকের দিন পর্যন্তও যেখানে মানুষ এমন কোন প্রমাণ হস্তগত করতে সক্ষম হয়নি, সেখানে এমন একটি ধারণাকে লালন করে যাওয়ার পেছনে কারণের উৎসটি কোথায়?

www.pathagar.com

কে'ন মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে অজ্ঞাত, অদৃশ্য কোন কিছুর কল্পনা করে, তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা মানুষের জানা নেই। অথচ এই "কল্পনা" কিন্তু একেবারেই ফেলনা নয়। বিজ্ঞানের যদি মুখফুটে কথা বলবার ক্ষমতা থাকত, তবে এ কথাটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই জানত যে, মানুষের কল্পনার গর্ভেই তার জীবনের সঞ্চার, সেখানেই সে গঠিত হয়েছে, বড় হয়েছে, রূপ পেয়েছে – তারপর জন্মগ্রহণ করেছে যেমন মানব শিশু জন্মায়। যুগে যুগে কল্পনাই মানুষকে পথ দেখিয়েছে বাস্তবের দিকে – বিশেষভাবে জগৎ বিজ্ঞানে এর চেয়ে বড় কোন সত্য নেই। আর এই বিষয়টিকেই বিজ্ঞানীগণ তুলে ধরে জানান যে, The foreground of human intelligence is being won by imagination, the ability to think in unconventional ways, to orient one self and discover which is now of greatest value.[১৫৬] আজকের দুনিয়ায় হেঁয়ালি কল্পনার মূল্য অনেক। কল্পনা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির মাত্রাকে শুধু অতিক্রমই করে যায়নি, বল্গাহীন কল্পনাশক্তিই মানুষকে জানতে ও আবিষ্কার করতে সাহায্য করছে। কল্পনাই হয়েছে যুগে যুগে জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। আজকের বিজ্ঞান কল্পনাকে কখনোই খাটো করে দেখে না।

তাহলে সিদ্ধান্ত কি আসে? ভিন জগতে জীবনের ধারণা কি তাহলে সত্য? হাতে পাওয়া উদাহরণ না থাকলেও তার প্রমাণ রয়েছে অসংখ্য। With our rapidly growing understanding of the universe has dawned the profound belief that we are not alone.[১৫৭] বিশ্বজগতকে যতই জানা যাচ্ছে, ততই সুদৃঢ় ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, সৃষ্টিতে আমরা একা নই। বিষয়টির উপর প্রফেসর জর্জ ওয়াল্ড (Geogre wald) হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জীববিজ্ঞানী, একটি সিম্পোজিয়ামে ঘোষণা করেন – I think there is no question that we live in an inhabited universe that has life all over it.[১৫৮] কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই মহাবিশ্বের সর্বত্র জীবনের পরিপূর্ণ বিস্তারের এই ধারণাকে সমর্থ করলেন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড বেরিজেন (Richard Berendzen) - The question has become not so much one of "if" as of "where" and many of these forms of life are probably far more technically advanced than ourselves.[১৫৯]।

এখন আর যদির প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল ঠিকানার ; সম্ভবতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহান্তরের জীবন বা সভ্যতার মান প্রযুক্তির পরিমাপে আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী। আর বিজ্ঞানীগণের এই সব দাবী যেন হুবহু মিলে যায় কোরআনের ভাষ্যের সাথে – "তোমরাতো সামান্য মানুষ মাত্র, তাহাদেরই মত যাহাদের আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন" (৫ঃ১৮)।[১৬০] এ আয়াতাংশ কি আমাদের বলতে চাইছে যে আমাদের মতই উন্নততর সৃষ্টি মহাবিশ্বের কোন অজ্ঞাত ঠিকানায় পড়ে আছে আমাদের অজ্ঞাতে?

www.pathagar.com

আর সেই সৃষ্টির তুলনায় আমরা পৃথিবীবাসী অতি সামান্য মানুষরূপ প্রাণী মাত্র ; অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান, যোগ্যতা ও উৎকর্ষতায় আমরা পিছিয়ে পড়ে রয়েছি। ঠিক একই ধারণা আজ বিজ্ঞানীগণের মনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে প্রশ্নটি এনেছে - Is there intelligent life on earth ? প্রশ্নটি এত বড় হয়ে এসেছে যে, London planetarium -এর সম্মুখের দেয়ালে খোদাই করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ যাদের সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদেরই অনুরূপ সৃষ্টি আমরা মানুষ ; তবে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের ভাষ্যে মানুষের অবস্থানটি অন্যটির বর্ণনার পাশাপাশি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য জগতের জীবনের যে অস্তিত্ব ধারণা করা হয়, তার তুলনায় পৃথিবীবাসী মানুষ জাতির অতিশয় অনুল্লেখযোগ্যতার বিষয়টি প্রসংগে কোরআন ও বিজ্ঞানের কথা এক হয়ে যায়।

আধুনিক ধারণায় আজ এসেছে অত্যন্ত দৃঢ়তার বিষয়টি। আমরা এর কারণাত্মক প্রমাণ বিশ্লেষণ করতে পারি। নতুন নতুন আবিষ্কার ও হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, মহাশূন্যে জীবন উৎপন্নকারী অণুর প্রাচুর্য অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বেশী। তাদের মধ্যে এ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, সায়ানাইড, ফরমাল ডি হাইড এবং পানি প্রধান। এরা বহন করে জীবনের প্রাথমিক জরুরী বস্তুকণা - কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এ পর্যন্ত জানা জীবনের জন্য ৯১ ভাগ বস্তু কণাই এদের দ্বারা গঠিত। মহাকাশের তীব্র তেজস্ক্রিয়তার পরিবেশে (environment of intense radiation) কিংবা বৈদ্যুতিক নির্গমন (electric discharge) দ্বারা আমাদের জানা গঠনের চেয়ে অধিকতর জটিল এমাইনো এসিডের উৎপত্তি এবং পরিণামে অধিকতর দক্ষ জীবন-দল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।[১৬১] তাই অত্যন্ত সংগত কারণেই বিজ্ঞানীরা আমাদের চাইতে উন্নততর জীবনের কল্পনায় আজ বিভোর।

অতিশয় দৃঢ়তার সাথে আজ বিশ্বাস করা হয় যে, In our own galaxy, the Milky Way, there are thousands of millions of stars on which life MUST exist.[১৬২] Many scientists conclude that on countless warm planets not too far from the billions of suns like ours, life much as we know it MUST exist.[১৬৩]

উদ্ধৃতি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন উৎস হতে গৃহীত তথ্যের 'must' শব্দটি বিজ্ঞানীদের দৃঢ়তার বিষয়টি তুলে ধরে। ভিন জগতের জীবন যে সত্য, বিজ্ঞানীগণ এই ধারণার উপর কোন আড়ালই রাখতে চান না। আমরা কি তাহলে কোরআনের উদ্ধৃতিকেই ডেকে আনব, - "তিনি এমন আরো সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমরা অবগত নও

www.pathagar.com

(১৬ঃ৮) যাহারা আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে আছে উহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভাল করিয়াই জানেন" (১৭ঃ৫৫)।

কারা এই "যাহারা"? আকাশসমূহে এই "যাহারা" কি করে অবস্থান করছে? এই "যাহাদের" বর্ণনা দেয়ার বিষয়টিকে পৃথিবীর বুকে যারা আছে, তাদের আপেক্ষিকতায় কেন প্রকাশ করা হল? এর অর্থ সুস্পষ্ট যে কোরআন ভিন জগতের জীবন সম্পর্কে প্রস্তাব করছে। আর বিজ্ঞানের ধারণাও এই প্রশ্নে এসে অবারিত হয়ে পড়েছে - One strong reason for believing in the wide spread existence of life in the abundance of organic chemicals both on earth and more surprisingly in the space.[১৬৪]

১৯৯৩ সালে মেক্সিকোতে পতিত একটি মিটিওরাইট; এর মাঝে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক চরিত্র বিজ্ঞানীদেরকে বিস্মিত করেছে।

মহাবিশ্বের সর্বত্র জৈব রাসায়নিক বস্তুকণার অবাধ বিস্তৃতি বিজ্ঞানকে মহাবিশ্বের সর্বত্রই জীবন রয়েছে - এই ধারণায় প্রভূত উৎসাহিত করেছে। ১৯৫৩ সালে স্টেনলে মিলার (Stanley Miller) মহাকাশের পরিবেশে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ যে সকল অবস্থায় রয়েছে, তাদের নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ফলাফল এসে যায়। তিনি দেখলেন, জীবনের মূল শর্ত এ্যামাইনো এসিড অণু তথা

www.pathagar.com

অতি জটিল জৈব অণুসৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তিনি কৃত্রিমভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে মহাকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। সৌরজগতের উল্কাপিণ্ডসমূহে এ্যামাইনো এসিডের অণুর প্রাপ্তি মানুষকে আরো উৎসাহিত করল। মানুষের মনে তখন হতে বদ্ধমূল ধারণার জন্ম হয় যে, পৃথিবী ছাড়িয়ে যে মহাজগৎ , তার কোথাও না কোথাও জীবনের অস্তিত্ব থাকতেই হবে। এ ধারণাটি অত্যন্ত প্রকট ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণে প্রোজ্জ্বল। বিজ্ঞানীগণ আমাদের ছায়াপথে সৌর জগতের মত কত সংখ্যক জগৎ রয়েছে , সেখানে উন্নত, অনুন্নত যে সকল সভ্যতা বসবাস করে, তার নির্ণেয়ক একটি ফর্মূলা পর্যন্ত বের করে ফেলেছেন। এই ফর্মূলা গড়পড়তা সবগুলো গ্যালাক্সির জীবনধারক গ্রহদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য তারা সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

N	=	$\underline{N^* \text{ fp ne fv fi fc t}}$
N	=	জীবনময় গ্রহ/সৌর সংখ্যা।
N*	=	নূতন জন্মগ্রহণকারী সৌর-নক্ষত্রের সংখ্যা = ২০
fp	=	5; ne =1; fv = .2; fi =1; fc = .5; t = time

এই ফর্মূলা অনুযায়ী ধরা হয়, আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতিবছর সূর্যের অনুরূপ ২০টি নক্ষত্র নতুনভাবে জন্ম নেয়, এদের মধ্যে ১০টি নক্ষত্রের গ্রহ ব্যবস্থা রয়েছে , যাদের একটি গ্রহ হলেও "গ্রীন লাইফ বেল্টে" অবস্থান করে, এমন ৫টি উপযুক্তভাবে স্থাপিত গ্রহের একটিতে জীবনের উন্মেষ ঘটে, এমন অর্ধেক সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাহলে কি কোরআনই সত্য? সত্য তাঁর বাণী – "মহান আল্লাহই জগৎসমূহের প্রতিপালক (৪০ঃ৬৪)। আল্লাহ হইতেছেন তিনি , যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অসংখ্য আকাশ আর অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী। উহাদের উপরেও আল্লাহের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় ; (এ তথ্যটি) এই জন্য যে তোমরা যেন অবগত হও, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ (৬৫ঃ১২)। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা" (৪০ঃ৬৫)। পাঠক। আপনার বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি মুক্তাংগনে দাঁড়িয়ে একবার অনুভব করুন, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত রায়ের এ তথ্যটি আজ থেকে ১৪০০ বছরের পূর্বে যে কোরআন অনুরূপ মাত্রায় প্রকাশ করেছে , সেই মহাগ্রন্থ আমাদের শ্রদ্ধার দাবী রাখে কি? এ শ্রদ্ধা সত্য এবং সত্যের প্রতি। সত্য প্রাপ্তির পরও " যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে"? (১৮ঃ১৫)।

সুবিজ্ঞ পাঠকের কাছে প্রশ্ন এসে যাবে "অসংখ্য আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী" এই প্রসংগে আকাশের সঠিক অর্থ কি? আল-কোরআনে 'আকাশ' ধারণা

www.pathagar.com

অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আপনারা 'মহাকাশ পর্ব–২' এ পাঠ করবার সুযোগ পাবেন ; তবে আপনাদের জ্ঞাতার্থে শুধু জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই আয়াতের প্রস্তাব হতে পারে এক একটি সৌর ব্যবস্থা। আমরা জানি না বিজ্ঞান যে সৌর ব্যবস্থার হিসাব দেখায় অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি সঠিকভাবে অবস্থিত গ্রহের একটিতে জীবনের উন্মেষ হবার ধারণা, তা সত্য অথবা সত্য যে, সকল সৌর ব্যবস্থাতেই সময়ের অবারিত বিস্তৃতির কোন পর্যায়কালে জীবনের উন্মেষ ঘটে থাকে। সর্ব নিকটবর্তী এমন সৌর ব্যবস্থার দূরত্ব আমাদের অবস্থান হতে ৫০ আলোকবর্ষ ; সময় ও দূরত্বের এই বিশাল বাঁধকে আমরা অতিক্রম করার কৌশল আজো জানি না। সকল সৌর ব্যবস্থাতেই জীবন রয়েছে অথবা নেই – দু'টিই আমাদের সমান সমর্থনের দাবীদার।

কোরআনের সর্বত্রই এই ভিন দুনিয়ার জীবনের কথা বার বার প্রস্তাবিত হয়েছে। কোরআনের পাতা খুললে সর্ব প্রথম যে আয়াতটি আপনার চোখে পড়বে, সেটি হল বহু জগতের প্রস্তাব। আমি অনেক বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিতের সাথে বহুজগৎ সম্পর্কিত ধারণাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সকলেই 'আঠারো হাজার আলম' এর উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের এক একটি প্রজাতি এক একটি জগৎ বা আলম নামের দাবীদার। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই, সেহেতু, আমাদের পৃথিবীর মত অনুরূপ জীবনময় জগৎ অন্যত্র থাকতেও পারে। কতিপয় মনে করেন, যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সবচাইতে সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করছেন, যেহেতু জীবনের ব্যাপারে পৃথিবীই অনন্য ; আল্লাহর সৃষ্টির সবচাইতে সেরা বস্তু মানুষ পৃথিবীর উপরই জন্ম নিয়েছে ও পরিণত হয়েছে – অতএব, বহির্বিশ্বে অন্তত মানুষের অনুরূপ আর কোন জীব অসম্ভব এবং সে সূত্রে পৃথিবীর মত জীবন পালনকারী কোন গ্রহও থাকতে পারে না যেখানে মানুষের মত কোন উন্নত জীব বসবাস করতে পারে। জনাব ইউসুফ আলী তার বিখ্যাত The Holy Quran তফসীরে এই আয়াতের "সাতটি আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবীর" ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, আমাদের সৌর আকাশে বিভিন্ন উচ্চতার (দূরত্ব) ক্রমভেদে যে গ্রহসমূহ রয়েছে এবং পৃথিবীর স্তরগত যে ভৌগলিক বিন্যাস রয়েছে – এসবের সঙ্গে 'সাতটি আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক যমীনের' ধারণার যোগসূত্র থাকতে পারে। অনুরূপভাবে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর Translation of the Holy Quran গ্রন্থে পৃথিবী ভিন্ন অন্য সাতটি প্রধান গ্রহের অবস্থানকে এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে। তারা সমভাবে সেগুলির মধ্যে জীবনের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) এর মতামত হতে জানা যায় যে, এই আয়াতে যে "নির্দেশ নাযেল হওয়ার "ধারণা প্রস্তাবিত রয়েছে , তার জন্য প্রাণ বা জীবনের শর্ত

www.pathagar.com

জরুরী নয় – আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও নিয়মের শাসনের প্রতি তিনি ইংগিত প্রদান করেছেন। আমরা দেখতে পাই, এই ৬৫ঃ১২ আয়াতটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের জিজ্ঞাসা নিয়ে অমীমাংসিত ধারণার বেড়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছেন।

কোরআনের সর্বত্র "সামাওয়াতে ওয়াল আরদ" (السموات والارض) এই সমাসবদ্ধ পদটি ঘুরেফিরে এসেছে বহুবার। কতিপয় ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "সাবাআ"(سبع) যার অর্থ সাত কিংবা অসংখ্য – উভয়ই। এই শব্দ গুচ্ছের প্রচলিত অর্থ আমরা যা পাই , তা হল – সাত আসমান ও যমীন ; অর্থাৎ সাত কিংবা অসংখ্য সংখ্যক আকাশ ও পৃথিবী। পৃথিবীর সংখ্যা কত? সকল আয়াতের আলোকেই তা বলা যায় – একটি। কিন্তু সমস্যা হল এই ৬৫ঃ১২ আয়াতের প্রস্তাব – এখানে এসে যখন মুখোমুখি হই , "সাত সংখ্যক আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী" ধারণার, তখন আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই যে আল-কোরআনে "আল আরদ" (الارض) শব্দটি একটি বহুবচন ও বটে, যা প্রচলিত ব্যাকারণের লংঘন। আপনারা হয়ত জেনে থাকবেন যে, আরবী রীতিতে বচন বিষয়ক ধারণা প্রস্তাবিত সংখ্যা, বিশেষ্য , সর্বনাম ও ক্রিয়া – ইত্যাদি সকলের উপর বর্তায় ; অর্থাৎ কোন একটি সংখ্যা এক বচন, দ্বিবচন কিংবা বহুবচন কি–না, তার ধারণা উল্লিখিত সবগুলোতেই বর্তমান থাকে। কোরআনের অন্যান্য সকল স্থানে "সাবআ সামাওয়াতে ওয়াল আরদ" শব্দ কটির সাত সংখ্যক আসমান ও একটি পৃথিবীর ধারণা বৈধ হতে পারে। কিন্তু ৬৫ঃ১২ আয়াতে এই ধারণা বৈধ নয় ; এখানে আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে যে, অন্ততঃ এ আয়াতে সাতটি আসমানের সংগে সাতটি পৃথিবীর (অথবা অসংখ্য আকাশ অসংখ্য পৃথিবী) প্রস্তাবই করা হয়েছে। যেহেতু এ ধারণার বাইরে অন্য কোন অর্থ করবার অবকাশ নেই সেহেতু আমাদের সামনে বিপত্তিকর একটি সমস্যা এসে দাঁড়ায় যা হল, 'আল আরদ' শব্দটি এবং তার বাচনিক মান। আমরা জানি যে আরদ বা পৃথিবীর বহু বচন হল "আরদুন, আরাদুন, আরাদাত, আরাদ, আরাদি" ইত্যাদি। আরবীতে বহুবচন থাকা সত্বেও কোরআনে কোন কারণে কোথাও "আরদ" শব্দটির স্থলে ভাষাগত বহুবচনের ব্যবহার হয়নি? এ সমস্যাটি প্রসংগে আমি জনৈক বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদের সংগে আলাপ করলে তিনি আমাকে জানান যে ৬৫ঃ১২ আয়াতে শব্দটির ন্যায্যতা সম্পর্কিত কোন যুক্তি তার জানা নেই , যদিও কিনা কোরআন একটি কম্পিউটর বিশুদ্ধ গ্রন্থ। তবে, কোরআন যখন অবতীর্ণ হয় – তখন আরবী ভাষায় ব্যাকরণের শৃংখলা আজকের দিনের মত ছিল না। কোরআনই মূলতঃ তাকে শৃংখলা পেতে সাহায্য করেছে। তিনি জানান, 'আলআরদ' শব্দটি ৭ শতকের ব্যাকরণের একক ও একাধিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হত কি না তিনি তা নিশ্চিত নন। তবে ৬৫ঃ১২ আয়াতে অত্যন্ত ব্যাকরণ সিদ্ধভাবেই বহুবচন হিসাবে শব্দটি ব্যবহার পেয়েছে – এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতে 'আল-আরদ' শব্দটি যে বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা সুধী পাঠক নিজেও হৃদয়ংগম হতে পারবেন। তাহলে প্রশ্ন এসে যায়, কোরআনে ব্যবহৃত 'সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' এই সমাসবদ্ধ পদটি কি একচেটিয়াভাবে বহু আকাশ ও একটি পৃথিবী অর্থেই সীমিত? আমরা ৬৫ঃ১২ আয়াতের আলোকে বলতে পারি এই শব্দ গুচ্ছে পৃথিবীর একক অর্থও হতে পারে এবং একাধিক অসংখ্যক অর্থও হতে পারে ; আমরা বলতে পারি 'সামাওয়াত' বা আকাশসমূহের মত 'আল-আরদ' শব্দটি 'পৃথিবীসমূহের' অর্থ প্রকাশ করার জন্যও প্রসারিত রয়েছে। তা হলে দেখতে পাই কোরআনে সর্বত্রই পৃথিবীর অনুরূপ অসংখ্য ব্যবস্থার কথা প্রস্তাবিত হয়েছে আর বিষয়টিতে যেন আমাদের সন্দেহ না থাকে তার জন্য এসেছে ৬৫ঃ১২ আয়াত - "আল্লাহ্ হইতেছেন তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অসংখ্য আকাশ ও অসংখ্য (অনুরূপ সংখ্যক) পৃথিবী ; উহাদের উপরও আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়"। আমরা দেখতে পাই - কোরআনের প্রস্তাব আর বিজ্ঞানের বক্তব্য সংঘাতহীনভাবে এক হয়ে পড়েছে ; মহাবিশ্বে আমরা পৃথিবী-মানুষই শুধু একা নই - আমাদের মত আরো অগণিত গ্রহবাসী উন্নততর জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করছে, এই ধারণাটি যে কোরআন ও বিজ্ঞান সম্মত - তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

১৯৬০ সালে ডাঃ ফ্রেঙ্ক ড্রেইক - এর বিশ্ববিখ্যাত Project Ozma দুনিয়াজোড়া তল্লাশি চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রকল্পে ভিন জগৎ হতে পাঠানো বেতার তরঙ্গ রেকর্ড করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই ব্যর্থতার পর গ্রীন ব্যাংক, গোর্কী, ইউরেশিয়ান অমনি ডাইরেকশনাল নেটওয়ার্ক, ওহিও ষ্টেট, এ্যালগোকুইন ইত্যাদি ছাড়াও আরো বিভিন্ন মানমন্দির হতে কিছু বিশেষ নক্ষত্রের এবং সামগ্রিকভাবে দৃশ্যমান আকাশের সর্বত্র তল্লাশি চালানো হয়, কিন্তু কোন আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়নি। ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সনে দুটি ভুল প্রচারণায় ভিন জগৎ হতে পাঠানো শব্দ তরঙ্গ রেকর্ড করার দাবীর পর আজ পর্যন্তও এ বিষয়ে বিশেষ কোন অগ্রগতি সাধিত হতে দেখা যায় না। অথচ তার পরেও বিজ্ঞানের আশা ও আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর কারণ কি?

আজকের দুনিয়ার 'ইউ এফ ও' বা ফ্লাইং সসারের নাম জানে না এমন লোক খুবই অল্প। এদের প্রসংগে এত বেশী তথ্য রয়েছে এবং সেগুলো এত চমকপ্রদ যে একটিকে রেখে অন্যটিকে উদ্ধৃতি দেয়া কষ্টকর। এস্ট্রো ফিজিসিষ্ট এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডঃ জ্যাক ভেলী (Jacques Vallee) এবং তার সহযোগী এ্যালেন হাইনেক (Allen Hynek) সুদীর্ঘ চার বছর যাবৎ ইউ এফ ও -দের অনেক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ

www.pathagar.com

করেছেন এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। জগৎ বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর মতে – UFOs have been seen through out history, and have consistently received (or provided) their own explanation within the frame work of each culture. In antiquty their occupants were regarded as Gods, in medieval time, as magicians; in nineteenth century, as scientific geniuses and finally in our time as interplanetary travellers. [১৬৫]

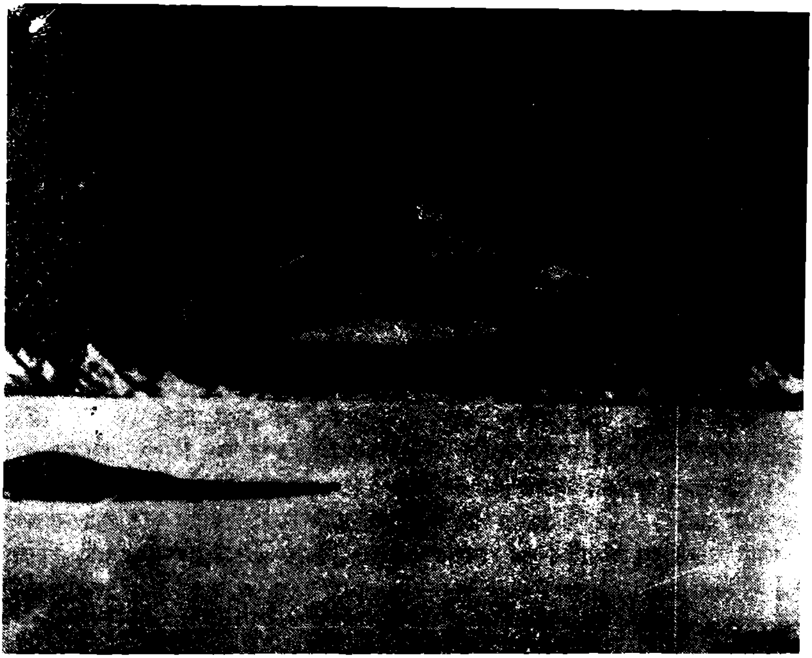

UFO – আজকের দুনিয়ার বিস্ময় ও ভীন জগতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক গুরুতর জিজ্ঞাসা।

ইউ এফ ও সমস্যাটি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, জার্মান এবং আমেরিকা প্রভৃত গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছে , আমেরিকার প্রায় সকল বিশিষ্ট প্রেসিডেন্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন এবং কেউ কেউ উড়ন্ত সসারকে দেখার দাবীও করেছেন। আমাদের অতি পরিচিতজনদের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার, জন এফ কেনেডী, জিমি কার্টার, ডঃ কোর্ট ওয়েল্ডহেম, উথান্ট তারা প্রত্যেকেই UFO সমস্যার সংগে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন।

বিজ্ঞানীরা আজ বিহঃবিশ্বের অধিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে চায়। এনগ্রেইভড মেটালিক প্ল্যাকে বিজ্ঞানের সার্বজনীন ভাষায় ভিন জগৎবাসীদের জন্য এই পৃথিবীর জীবন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত গুরুত্ব তথ্য। Pioneer 10 ও 11 দ্বারা এই তথ্য লিপি অজানা জগতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমাদের আলোচনার পরিধিতে নয় বলে এ বিষয়ে বেশী আর আলোচনা করতে চাই না। তবে পাঠকদের জানা দরকার যে, 'ইউএফও' গণ হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরবর্তী নক্ষত্র এমনকি গ্যালাক্সি হতে অভ্যাগত যারা সময় ও দূরত্বের মহা বাধাকে আমাদের অজ্ঞাত কোন পদ্ধতিতে অতিক্রম করে থাকে যা হয়ত 'প্রতি মাধ্যাকর্ষণ' 'বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি' 'প্রতি বস্তু ফোটন সঞ্চালন' (antimatter

www.pathagar.com

photon drive) 'সময়ের প্রলম্বন' (time dilatation),'সুপার স্পেস টানেল' ইত্যাদির কোন একটি অথবা অনুরূপ কিছু যা আমরা অনুমান করতেও সক্ষম নই। ভিনজগতের জীবন সম্পর্কে আজকের বিজ্ঞানবিশ্বের কোন সন্দেহ নেই , এখানেই বক্তব্যটি শেষ হয়ে যায় না, বিজ্ঞানীদের দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাসের কারণ ও প্রমাণসহ অনেক তথ্য বহুল বই[১৬৬] আপনি হাতের কাছেই পাবেন। এই সকল বই কোন কাল্পনিক সাহিত্য কর্ম নয় ; দিন , ক্ষণ , স্থান ও বিশিষ্ট জগৎ বিখ্যাত পাত্রদের উদ্ধৃতি সহযোগে আপনি জানতে সক্ষম হবেন, বহু জগতের ধারণা এবং সেগুলোতে জীবনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞান কত সুবিশাল প্রত্যয়ের সংগে দেখে আসছে। বিগত ৩০০০ বছরের জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বিজ্ঞান শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রেই তার পূর্ব ও প্রাচীন বিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। তথ্য প্রমাণ তাকে অগ্রাহ্য করার পরিবর্তে অধিক হারে গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেশী সুদৃঢ়তায় তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করে তুলেছে। আর এই বিশ্বাসটি হল পৃথিবী ভিন্ন অন্য জগতের অস্তিত্ব, সেখানে মানুষের মতই জীবন রয়েছে। এদের কেউ আমাদের চাইতে উন্নত আবার কেউ আমাদের তুলনায় অনুন্নত। পত্র-পত্রিকায় আর টেলিভিশনের পর্দায় এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আসে অনেক মজার মজার তথ্য।

একইভাবে আমরা দেখতে পাই কোরআনের পাতায় বহু জগতের ধারণা, আমাদের মত জীবনের অস্তিত্ব ও আমাদের পৃথিবী জগতের মত অনুরূপ জগৎ বিপুলভাবে স্থান নিয়েছে যেমনটি বিজ্ঞানের কাছেও। বিজ্ঞান আর কোরআনের প্রস্তাব এখানে আর কোন বৈষম্যের সৃষ্টি করে না ; শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে এক হয়ে যায়। বিজ্ঞানের জন্মের বহু আগেই মহান আল্লাহ , "জগৎসমূহের প্রতিপালকের" পক্ষ হতে অবতীর্ণ কোরআন যে সুদৃঢ় তথ্যাদি পেশ করেছে , বিজ্ঞান কতিপয় ক্ষেত্রে তা সত্য প্রমাণিত করেছে , কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণের অপেক্ষায়। হাতের মুঠোয় এনে যে প্রমাণ সম্ভব, বিজ্ঞানের কাছে তা হয়ত আসবে, তবে কখন, তা আমরা জানি না।

"জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কি" ? (২৬ঃ২৩)।

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহ এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও (২৬ঃ২৪)। তিনিই আল্লাহ , তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই , দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশংসা তাঁহারই , বিধান তাঁহারই, তোমরা তাঁহারই সকাশে প্রত্যাবর্তন করিবে (২৮ঃ৭০) । আল্লাহ! তিনি তো অতিশয় সুউচ্চ ও সুমহান" (৩১ঃ৩০)।

www.pathagar.com

১৫০ । Observe how system into system runs
What other planets circle other suns" - Alexander Pope.

১৫১ । Introducing Science - Alen Isaacs.

১৫২ । National Geographic Vol 167 No 1 Jan 1985.

১৫৩ । The Living Void - Ian Ridpath.

১৫৪ । Planet Earth - Peter Owen.

১৫৫ । The UFO phenomenon - Johannes Von Buttlar.

১৫৬ । Yuri Uvarov-Sputnik Oct 87.

১৫৭ । National Geographic Vol 145 No 5 1974.

১৫৮ । Natioanl geographic Vol 145 No 5 1974.

১৫৯ । Natioanl geographic Vol 145 No 5 1974.

১৬০ । প্রবন্ধে ৫ঃ১৮ আয়াতের উত্থাপিত অংশটি কোরআনে বর্ণনার প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিকতা হতে ভিন্নতর একটি প্রেক্ষিতে ব্যবহার করার পিছনে মূল যুক্তিটি আসে ব্যবহৃত শব্দ 'মিম্মান খাল্কা (ممن خلق), আয়াতাংশটির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং একই আয়াতে আকাশ, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে প্রসারিত সৃষ্টির উপর আল্লাহর আধিপত্যের দাবীর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সর্বোপরি কোরআনের আয়াত/আয়াতাংশের অসাধারণ বহুমুখী গুণাগুণ-এর দাবী হতে। বর্ণনার প্রেক্ষাপট যা হোক ; 'বাল আনতুম বাশারা মিম্মান খালাক' এর সরাসরি অর্থটিই হল বরং তোমরা তাঁহার সৃষ্টির অংশবিশেষ সামান্য মানুষ মাত্র - যাহাদের আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন'। এই 'যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন' - তা শুধুমাত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের মানব প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরী নয় ; হতে পারে শুধুমাত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের মানুষকেই বুঝিয়েছে , হতে পারে তা পৃথিবীর বাইরের অপরাপর পৃথিবীতে সৃষ্ট মানুষের কথা বলেছে। বস্তুতঃ জীবন বসবাসকারী আর কোন পৃথিবী নেই - এমন আয়াত কোরআনের কোথাও নেই , তবে জীবনের সম্ভাব্যতার নির্দেশক কিংবা পৃথিবীর অনুরূপ জীবনপালক দুনিয়ার সুসংবাদ কোরআনের সর্বত্র বিরাজমান। কোরআনের আয়াতের উৎকর্ষতম সফলতা হল এই যে - বর্ণনার প্রেক্ষাপট বিচারে যেমন তার মূল্যায়ন রয়েছে , প্রেক্ষাপটের বাইরেও তার কোন না কোন মূল্যমান থাকে। আয়াতের অর্থের এই অপ্রচলিত ব্যবহারটি পরবর্তীতে ১৬ঃ৮; ১৭ঃ৫৫; ৬৫ঃ১২; ১ঃ১; ৩ঃ১৯১; ৪০ঃ৬৫; ২৬ঃ২৪ ইত্যাদি আয়াতের অনুকূলে রায় দেয় বলেই তা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর ন্যায় অনুরূপ একাধিক ও অসংখ্য দুনিয়ায় মানুষ জাতির মত অনুরূপ সৃষ্টি বর্তমান থাকলে 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর ধারণাটি কোনভাবেই ক্ষুন্ন হয় না। প্রণিধানযোগ্য যে গ্রহান্তরের অধিবাসীদের সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা - তা সম্পূর্ণভাবে অনুরূপ এক মানুষ প্রজাতিরই নির্দেশ করে। হতে পারে, আল্লাহ মহাবিশ্বের হাজার হাজার কোটি গ্রহ ব্যবস্থায় আমাদের মত অনুরূপ মানুষ প্রজাতি সৃষ্টি করে রেখেছেন। অন্যথায় এই মহাবিশ্বের এত বিশাল অস্তিত্বও উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে যা কোরআন কোন কারণেই অনুমোদন করে না। আমি এ ব্যাখ্যার বিষয়ে আল্লাহর অনুকম্পা ও জ্ঞানের নিরন্তর আশ্রয় কামনা করি এবং অপব্যাখ্যা করার মত গুরুতর অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা করি।

১৬১ । National Geographic Vol 145 No 5 May -74.

১৬২ । National Geographic Vof 150 No 3 Sep 1976.

www.pathagar.com

১৬৩ । The Living Void-Ian Ridpath.
১৬৪ । The Cambridge Atlas of Astronomy - Introduced by Sir Barnard Lovell.
১৬৫ । The UFO phenomenon-Johannes Von Buttlar.
১৬৬ । " Life in the Universe"; "The search for life in the universe" "Are we alone" ? "Intelligent life in the Universe" etc.

www.pathagar.com

৯
অভিকর্ষ বল

দৃশ্যমান মহাবিশ্বের তিনটি সাধারণ চরিত্রের অন্যতম একটি হল অভিকর্ষ বলের প্রাধান্য। মহাবিশ্বের যে কোন অংশ - সে যত ক্ষুদ্রই হোক, সরাসরিভাবে মহাবিশ্বের অন্যান্য সকল অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিপরীতভাবে মহাবিশ্বের বাদ বাকী অংশসমূহ কর্তৃক প্রভাবিত হয়। [১৬৭] এই দৃশ্যমান মহাবিশ্বে মূলতঃ চারটি প্রধান বল প্রধানভাবে বিরাজ করছে। মানের ক্রমানুসারে এরা হল - অভিকর্ষ বল (gravitational force), দুর্বল মিথস্ক্রিয়া (weak interaction), বিদ্যু-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া (clectromagnatic interaction) এবং সর্বশেষে সবল মিথস্ক্রিয়া (strong interction)। উল্লিখিত চারটি বলের মধ্যে অভিকর্ষ বল অতিশয় মৃদু এবং দুর্বল। এতদসত্বেও এর শাসন মহাবিশ্ব জুড়ে সর্বত্র। [১৬৮] প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব এক সুবিশাল অনন্ত বিস্তার যুদ্ধ ক্ষেত্র। এর এক পক্ষে অভিকর্ষ বল এবং বিপরীতে পারমাণবিক বল (nuclear reaction)।[১৬৯] এই দুই বলের শাসনে শাসিত হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল অস্তিত্ব। তারা একে অন্যের প্রভাব কাটিয়ে সৃষ্টি করে চরম ভারসাম্যহীনতা, তারপর সেই ভারসাম্যহীনতা হতে সৃষ্টি হয় ভারসাম্য । এই ভারসাম্য ভংগ হতে ভারসাম্য সৃষ্টির অভিনব জটিলতার উৎস মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। এই সব ক্ষেত্রে Valid physical questions face us for which our physics is utterly inadequate. [১৭০] আমরা অনেক অকাট্য ও জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হই - যাদের যথাযোগ্যে সমাধান দিতে আমাদের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান অতিশয় অসহায়ভাবে অনুপযুক্ত। তবুও এ ভারসাম্য ভঙ্গ ও সৃষ্টির মূলে বিজ্ঞান যে কারণ খুঁজে পেয়েছে - সে হল অভিকর্ষ বল। আমরা তারই আলোচনা কোরআন ও বিজ্ঞানে মিলিয়ে দেখব।

বৃন্তচ্যুৎ আপেল মাটিতে পড়ছে - এমনি এক অতি স্বাভাবিক দৃশ্যে এক অস্বাভাবিক চিন্তার সঞ্চার হল মহাবিজ্ঞানী নিউটনের মনে। ফলটি মাটিতে পড়বে কেন ? - এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তার বিখ্যাত Philosohiae Naturalis Principia Mathematica গ্রন্থে। নিউটন গাছ হতে ফল মাটিতে পড়ার বিষয়টিকে অভিকর্ষ তত্বে প্রকাশ করলেন এবং দাবী করলেন, মহাজগৎ জুড়ে এক অতিশয় প্রভাবশালী বল কাজ করছে যার জটিল শাসনে শাসিত হচ্ছে এই দৃশ্যমান জগৎ। এই শক্তির পরিমাপ মান হল দু'টি ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ বস্তু দুটির ভরকে গুণ করে তাদের দূরত্বের বর্গ

www.pathagar.com

দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার সমান $(m_1 \times m_2 / d^2)$। অতি তাড়াতারি সূত্রটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল বিজ্ঞান বিশ্বে। নিউটন তত্ত্বটির আরো ব্যাপক গাণিতিক প্রসার ঘটিয়ে কেপলারের গ্রহদের কক্ষপথের অস্পষ্ট ধারণাকে সম্প্রসার ও সুস্পষ্ট করে তুললেন। [১৭১] এই নব উদ্‌ঘাটিত অভিকর্ষের সাথে গতিতত্ত্বের সংযোগ ঘটিয়ে নিউটন ব্যাখ্যা দিলেন মহাবিশ্বের প্রতিটি সঞ্চালিত বস্তুর সঞ্চালন প্রক্রিয়ার' দেখা গেল অভিকর্ষ বলই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রাধান্য বিস্তারকারী বল, যা সমস্ত দৃশ্যমান মহাবিশ্বের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে।

কি এই বিশ্বজোড়া অভিকর্ষ বলের প্রকৃতি ?

১৯ শতকের শেষ ভাগে আবিষ্কৃত বর্ণালী বীক্ষণ (Spectroscopy) জ্ঞানের নবদিগন্ত খুলে দিল। টেলিস্কোপের সংগে এই যন্ত্রের ব্যবহার করে দূর-দূরান্তের নক্ষত্র-নীহারিকার অনেক অজ্ঞাত গোপনীয়তা জানা গেল। এ ক্ষেত্রে সফলতার বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ দাবী করেন যে, সূর্য বা কোন নক্ষত্রের এক টুকরো অংশ যদি ল্যাবরেটরীতে এনে পরীক্ষা করা সম্ভব হত, তবে যে মানের ফলাফল আশা করা যেত – পৃথিবীর বুকে বসে আজ তারা তেমনি ফলাফল লাভের প্রযুক্তি ও উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন। [১৭২] বিজ্ঞানের এই নিশ্চিতি অতিশয় প্রমাণসিদ্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো। আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে যে সকল মূল্যবান তথ্যাদি সরবরাহ করছে , তাদের আলোকে আমি এখানে অভিকর্ষ বল সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র তুলে ধরব। আপনারা অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, সমস্ত সৃষ্টিজুড়ে অভিকর্ষ বলই মূল চালিকাশক্তি হয়ে কাজ করে যাচ্ছে , সৃষ্টি করে চলছে ভারসাম্যহীনতা , তারপর সেই ভারসাম্যহীনতা হতে সৃষ্টি হচ্ছে ভারসাম্যের , আর সেই ভারসাম্যে রক্ষিত হচ্ছে নিখিল বিশ্বব্রহ্মান্ড, পৃথিবী ও আমাদের জীবন।

আপনারা পূর্বেই জেনেছেন , মহাবিশ্ব অভিকর্ষ বল ও পারমাণবিক বলের এক সুবিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র। অতিকায় মহাজাগতিক বস্তুপিন্ডসমূহ তাদের বিবর্তনের কাল পর্যায়ে ভারসাম্যে অসাম্যতা সৃষ্টি করে চলছে আর এই প্রক্রিয়াকেই করে নিয়েছে প্রতিক্ষণের জীবনী শক্তির সঞ্চার ও দীর্ঘসূত্রী জীবন রক্ষার উপায়। ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির পূর্বশর্ত হল অভিকর্ষ বল। অন্যভাবে বলা যায়, অভিকর্ষ বলই হল মহাবিশ্বের বস্তুনিচয়ের মধ্যে জীবনের স্পন্দন রক্ষিত হবার পূর্বশর্ত। তা কেমন করে ? – প্রশ্নটা এসে যাওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা জানি, আন্তনাক্ষত্রিক মেঘ (Inter stellar clouds) এলাকা নিরপেক্ষ ও আয়নিত হাইড্রোজেন (HI,HII) সমৃদ্ধ। অতিশয় বৃহৎ ও বিপুল ঘনশীতল

www.pathagar.com

গ্যাসধূলির (Supergiant gas dust complex) সমন্বয়ে এই আন্তনাক্ষত্রিক পদার্থ তৈরি হয়। আমাদের কাছাকাছি এমন একখানি ঘন অতিকায় ও শীতল মেঘ খন্ডের নাম অরিয়ন নীহারিকা (Orion nebula) বা কালাপুরুষ। নক্ষত্রসমূহ এই শীতল এবং ঘন কুজ্ঝটিকা জটের মধ্য হতে জটিল প্রক্রিয়ায় জন্মলাভ করে। এই কুজ্ঝটিকা-জট এলাকার তাপমাত্রা সাধারণ হাইড্রোজেন আয়ন (HII) সমৃদ্ধ বিশাল এলাকার গড় তাপমাত্রা হতে অনেক কম থাকে। জটের বাইরের এলাকার ঘন গ্যাস, আন্তনাক্ষত্রিক অতি বেগুনী রশ্মি এবং রন্জন রশ্মি (Far ultraviolet ray and x-ray) শোষণ করে নেয় - ফলশ্রুতিতে আভ্যন্তরীণ গ্যাসের আয়নিত হবার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্যাস-মেঘ এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাপমাত্রা যখন ৫-১০ কেলভিনে উপনীত হয়, তখন হাইড্রোজেন অণুর গঠণ নিয়ে বিরাজ করে।[১৭৩] গ্যালাক্সির এই সকল পদার্থ কখনো সুসমভাবে সর্বত্র বিরাজ করে না, এরা সুসমতার নিয়ম লংঘন করে, বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও অতিশয় বিশাল আকৃতির মেঘপিন্ডের সৃষ্টি করে। ইহা গ্যাস-মেঘের সুসম বন্টনের ব্যতিক্রম ব্যবস্থা, যা মূলতঃ নক্ষত্র জন্মের মূল শর্ত।[১৭৪] তারপর একদিন এই মেঘপিন্ডের উপর অভিকর্ষ বলের প্রভাব সৃষ্টি হয়, - শুরু হয় অভিকর্ষের মহাটানে মেঘমালার বাইরের দিকের অংশের কেন্দ্র অভিমুখী পতন পাত (collapse) । কোথা হতে এই ধ্বংস পতন সৃষ্টি হয়, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাছে জানা নেই।[১৭৫] তবে তা যে অভিকর্ষের সংকোচনে ঘটে, তা ব্যাখ্যা করা যায়। অভিকর্ষ বলের এই ধ্বংস পতন শুরু হওয়ার জন্য যে অবস্থার প্রয়োজন তা হল ১ টি সৌর ভরের গ্যাস, ১/৮ আলোক বছরের কম ব্যাস গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান। কিন্তু জ্ঞাতব্য যে শুধুমাত্র একটি নক্ষত্র কখনোই একাকী তৈরী হয় না, নক্ষত্রদের জন্ম হয় সমষ্টিগতভাবে গুচ্ছাকৃতিতে। প্রক্রিয়াটি সংগঠিত হবার জন্য একটি গ্যালাক্সির কমপক্ষে কয়েক সহস্র ভর পরিমাণ পদার্থ কণা যখন একসাথে জড়ো হতে পারে - তখনই অভিকর্ষ বলের হস্তক্ষেপ কার্যকরী হয়। অভিকর্ষ বলের এই প্রভাব কার্যকর হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ভরের প্রয়োজন (কয়েক সহস্র সৌর ভর) , তাকে জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় জেন-মাস (Jeans critical mass) বলে।[১৭৬] এই 'জেন মাসে' সংকোচন প্রক্রিয়াটি স্তরে স্তরে এবং ধাপে ধাপে ঘটতে থাকে, ফলত ; স্থানে স্থানে পূর্বোল্লিখিত শর্তে এক একটি ব্যক্তি-নক্ষত্র একটি বিশাল গুচ্ছের মধ্যে তৈরি হতে থাকে। ১/৮ আলোক বছর ব্যাপ্তির কম অঞ্চলে যখন একটি সৌর-ভরসম্পন্ন পদার্থ একসাথ অবস্থান করে, তখন কেন্দ্রাভিমুখী যে ধ্বংস পতন শুরু হয়, এই ধ্বংস-পাত-সংকোচনের ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রভাগে সৃষ্টি হয় অকল্পনীয় মাত্রার উত্তাপ। একদিকে অভিকর্ষ বলের সংকোচন এবং অন্যদিকে সংকোচনজনিত কারণে আভ্যন্তরীন উত্তাপ, এই দুই -এর মধ্যে শুরু হয় তুমুল লড়াই। আভ্যন্তরীণ তাপ, অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে নক্ষত্রের কেন্দ্র ভাগ হতে বহির্মুখী প্রসার ঘটিয়ে এক পর্যায়ে আনয়ন করে ভারসাম্য। অভিকর্ষ বলের মহাসংকোচনের ফলে নক্ষত্রে যে কল্পনাতীত তাপমাত্রার সৃষ্টি হয় -

www.pathagar.com

তার ফলশ্রুতিতে নক্ষত্র শিখিতে (core) কোন এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয় হয় এক পারমাণবিক বিক্রিয়া। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে নক্ষত্রের ভারসাম্য আনয়নের জন্য এই পারমাণবিক বিক্রিয়া একটি অপরিহার্য শর্ত। যখনই এই শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তৈরী হয় এক নব–নক্ষত্র বা ' প্রটোষ্টার'। গ্যাস–ধূলি–মেঘ হতে প্রটোষ্টারে পৌঁছুতে সময় লেগে যায় কয়েক নিযুত (মিলিয়ন) বছর। প্রটোষ্টারে পরিণত হওয়ার পূর্বে নক্ষত্রটিতে অগণিতসংখ্যক সংকোচন ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যার জন্য মূলশক্তি জোগায় অভিকর্ষ এবং এই অভিকর্ষজাত সংকোচনই নক্ষত্র শিখিতে পারমাণবিক শক্তি সঞ্চার করে যা প্রোটোষ্টারকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে ভারসাম্যের সাথে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অর্থাৎ একটি প্রটোষ্টার হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হল অভিকর্ষ বল। প্রটোষ্টার একদিন হাজার লক্ষ বছরের বিবর্তনের পর গুচ্ছ–বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আসে, মহাকাশের অসীম কন্দরে স্থান করে নেয় একটি জীবন্ত নক্ষত্র হিসাবে।

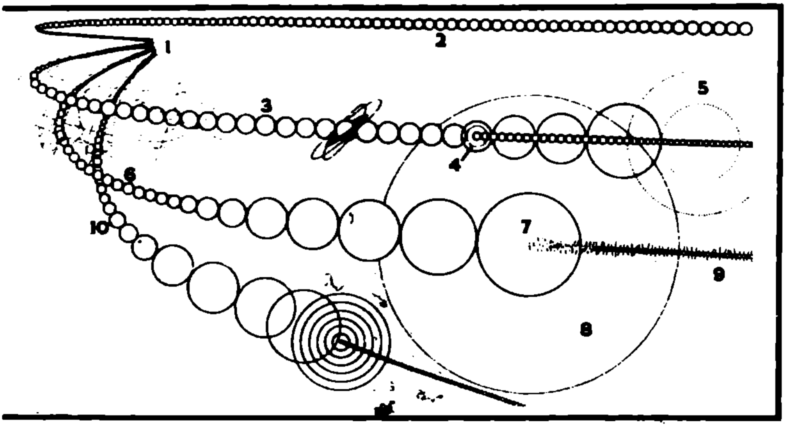

বস্তু–বিস্তৃতি ও অভিকর্ষ বলের সম্পর্ক। 1. নূতন প্রজন্ম নক্ষত্রের জন্ম স্থান। 2. বৃহস্পতি ও সমগোত্রীয় গ্রহ (সূর্য ভরের ১/১০) পরিণামে Brown dwarf সৃষ্টি করে। 3. সূর্য ও সমগোত্রীয় নক্ষত্ররা Red giant এ পরিণত হওয়ার পর নোভা বিস্ফোরণের দ্বারা While dwarf সৃষ্টি করে। 6. সূর্যের চেয়ে ১০ গুণ ভরের নক্ষত্ররা সুপার নোভা বিস্ফোরণের পর পাল্সার বা নিউট্রন ষ্টার তৈরী করে। 10. সূর্য ভরের ৩০–৫০ গুণ নক্ষত্ররা সুপার নোভা বিস্ফোরণের দ্বারা Black hole তৈরী করে। প্রতিটি প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি অভিকর্ষ বল যা বস্তু বিস্তারকে অতিশয় শক্তিতে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

www.pathagar.com

নক্ষত্রের জীবন ইহিাস ও বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, কেন্দ্রস্থিত হাইড্রোজেন জ্বলে জ্বলে হিলিয়ামে পরিণত হয়। বহু বছরকাল এ ভাবে জ্বলবার পর অধিক জ্বালানীর চাহিদায় কেন্দ্রটি বাইরের দিকে প্রসার লাভ করে। ফলতঃ এক পর্যায়ে নক্ষত্র কেন্দ্র হতে বহির্মুখী চাপ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু অভিকর্ষ বল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। তখন নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে বাইরের অংশসমূহ চুরমার হয়ে ধ্বংস-পাত সৃষ্টি করে। এই পতন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে, ফলত কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় এক অবিশ্বাস্য মাত্রার তাপ। এই তাপমাত্রায় হিলিয়াম বিগলিত হয়ে জন্ম নেয় কার্বন। সূর্যের ভরের দশগুণ কিংবা তার চাইতে বড় নক্ষত্রদের কার্বন শিখি যখন পূর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ধ্বংস পতনের কেন্দ্রভাগে পতিত হয়, তখন অতিকায় বস্তুভরজনিত কারণে অভিকর্ষী সংকোচন উত্তরোত্তর এমনিভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, এক পর্যায়ে সেই শিখিতে উত্তাপের মাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ৬০,০০০০০০০° সেঃ (ষাট কোটি) ; তখন কার্বন বিগলন (Fusion) প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় ম্যাগনেশিয়াম। এইভাবে নক্ষত্র কেন্দ্র যখন ক্রমশঃ আরো উত্তাপ অর্জন করে – তখন ম্যাগনেশিয়াম বিক্রিয়া ঘটিয়ে অন্যান্য মৌল তৈরী করে এবং অন্যান্য মৌল হতে আরো বিবিধ মৌলের সৃষ্টি হয়। এভাবে নক্ষত্র শিখিতে একের সংগে অন্য মৌলের একীকরণ অতিশয় উর্দ্ধগতিতে চলতে থাকে এবং বাইরে এ অতিকায় দানব নক্ষত্র (Super giant) উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতরভাবে জ্বলতে থাকে। অতঃপর একদিন আসে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের, যখন কেন্দ্র ভাগের তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৩৫০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় সৃষ্টি হয় লৌহের মৌল। লৌহের পারমাণবিক গঠন এমন যে, পারমাণবিক বিগলনে উত্তাপ বিকরিত হওয়ার পরিবর্তে তা উত্তাপ শোষণ করে নেয়। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ সরবরাহে একসময় প্রচন্ড ভাটা পড়ে। সাথে সাথে নক্ষত্রের বাইরের অংশমন্ডল অতিকায় বস্তুভরজনিত অভিকর্ষ বলের তাড়নায় অতিশয় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে লৌহ-শিখিতে আছড়ে পড়ে। নক্ষত্রের শিখি শেষবারের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে হঠাৎ। অত্যন্ত আসুরিক (Violent) শক্তি ও তীব্রতায় ঘটে এক অনন্য ধর্মী বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের নাম সুপারনোভা বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে এক দীর্ঘ বিস্তার (Widerange) মৌল, যৌগ এবং বস্তু স্তুপ সৃষ্টি হয় এবং বিস্ফোরণের বিশাল শক্তিতে সেগুলো লাখ যোজন দূর-দূরান্ত ছুটে যায়। এই বিস্ফোরণ বিস্তৃতির প্রান্তিকভাগে বিক্ষিপ্ত বস্তুমালা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রভাব মন্ডলে প্রবেশ করলে নক্ষত্রের অভিকর্ষ যদি তাদেরকে বেঁধে ফেলেতে সক্ষম হয়, তবে তারা সেই নক্ষত্রের পরিবারভুক্ত গ্রহ হিসেবে নতুন জীবন চক্রে কালপাত শুরু করে। আমাদের পৃথিবীর যাবতীয় ভারী মৌলসমূহ যা জীবনের অপরিহার্য শর্ত, এমনি কোন বিস্ফোরণের ফসল।

এত দীর্ঘ ও জটিল আলোচনাটি করা হল শুধু কয়েকটি তথ্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে যে, অভিকর্ষ বল নক্ষত্র সৃষ্টি, বিবিধ মৌল সৃষ্টি, সকল রকম পদার্থ সৃষ্টি, পরিশেষে

www.pathagar.com

জীবন-ক্ষেত্র, গ্রহ এবং তাদের সহযোগী উপগ্রহ , সবশেষে জীবন সৃষ্টির জন্য অতিশয় অলঙ্ঘ্য শর্ত । তাহলে আমরা দেখি, দৃশ্যমান মহাবিশ্বে অভিকর্ষ বলের স্থানই শীর্ষে।

আমরা এ মুহূর্তে কোরআনের পাতায় দৃষ্টি ফেরাতে চাই । ৭৯ঃ১ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন। ছোট দু'টি শব্দ আল্লাহ্ তালার এক কঠোর শপথের বাণী - 'আন্নাযিআতি গারাক্বান' (والنزعات غرق)। এই দুটি শব্দেই রয়েছে অভিকর্ষ বলের সন্ধান। আপনি বাজারের প্রাপ্ত বংগানুবাদ বা ইংরেজী অনুবাদগুলো খুলে তাকালে বিবিধ অর্থ ও ব্যাখ্যায় এই ক্ষুদ্র আয়াতের এমন ধারণা পাবেন যা আপনাকে নিতান্ত সমস্যায় ফেলবে। আল-কোরআনের সমস্ত অনুবাদকারীগণ ও জ্ঞানী তফসীরকারীগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দেয়ার প্রয়াস করেছেন। বেশীরভাগ ব্যাখ্যাকারীগণ একে স্বর্গীয় আজ্ঞাবাহী কর্তৃক সজোরে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের প্রাণ উৎপাটনের অর্থে অনুবাদ করেছেন। জ্ঞানী ইউসুফ আলী তার অনুবাদে লিখেছেন, By the (angels) who tear out (soules of wicked) with violence অর্থাৎ স্বর্গীয় আজ্ঞাবাহীর শপথ , যে সজোরে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের প্রাণ হরণ করে নেয়। মারমাডিউক পিকথাল (Marmaduke Pickthal) তার অনুবাদে লিখেছেন By those, who drag forth to destruction - 'যারা ধ্বংসের দিকে টেনে নেয় - তাদের শপথ'। জনাব মোহাম্মদ আলী একে Consider these that draw forth to the full - এই অনুবাদ করেছেন। তাজ কোম্পানীর অনুবাদে লেখা হয়েছে , - ' সজোরে আকর্ষণকারীর শপথ' আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত কুরআনুল করিম' -এ বংগানুবাদ দেয়া হয়েছে - ' শপথ তাহাদিগের, যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে' ইত্যাদি। সবচাইতে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল যে, আয়াতে কোথাও ফেরেস্তা (angel) বা প্রাণ সংহারকারী এমন কোন অর্থজ্ঞাপক আরবী শব্দ ব্যবহার হয় নাই। আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এগুলো নিতান্ত রূপক অর্থে অনুবাদকগণ প্রচলিত জ্ঞানে যাকে উপযোগী মনে করেছেন, তার ধারণা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আল-কোরআনের প্রকাশ ভঙ্গিমায় অপূর্ব এক বৈশিষ্ট্য হল যে, তার বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট নামকরণে না এনে সে সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদি এমনভাবে তুলে ধরে, যেন স্থান ও কালভেদে কোন নির্দিষ্ট একটি ধারণা, প্রস্তাব বা জ্ঞানের নামকরণ ভিন্ন হলেও সকল স্থানে সকল কালে যেন সেই ধারণা বা প্রস্তাবটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। প্রশ্ন এসে যেতে পারে - সরাসরি নামকরণের দ্বারা মহাকর্ষ বলের প্রস্তাব করা হল না কেন? খৃষ্টীয় সাত শতকের মানুষ অভিকর্ষ বলের নামের সংগে

www.pathagar.com

পরিচিত ছিল না, – কিন্তু এই বলের প্রকৃতিতে যা ঘটে, যেমন, উপর হতে বস্তুর নিম্নমুখী পতন, গাছ হতে ফলের ভূমিপাত হওয়া ইত্যাদির সংগে তাদের পরিচয় ততটুকু, যতটুকু আমরাও জানি । আজ থেকে আগামী কয়েক হাজার বছর পর বিজ্ঞান হয়ত অভিকর্ষ বলের এমন নতুন কোন দিক খুঁজে পাবে যে তার নামকরণের নবায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কিন্তু তখনও একটি বস্তুকে উপর হতে ছেড়ে দিলে নীচের দিকেই পড়বে এবং আতাফল বৃন্তচ্যুত হলে মাটিতেই পতিত হবে। আল-কোরআন বিজ্ঞান বিষয়ক স্বতঃসিদ্ধগুলোকে ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের আঙ্গিকে প্রকাশ করে থাকে, নামকরণে নয়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পর একজন মানুষ গাছ হতে ফল পতিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যত সহজে সনাক্ত করবে, হয়তবা অভিকর্ষ বলকে নয়। সময়ের শাসনে ও ব্যবহারের বৈষম্যে সুনির্দিষ্ট কোন শব্দ বা নামকরণ অতি সহজে তার ভাব বিনিময়ের মৌলিক বিষয়বস্তু হতে বিচ্যুত হতে পারে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার প্রকৃতি নয়। আল-কোরআন কোন জটিল তথ্য প্রস্তাবরীতিতে ব্যবহার করছে এমনি পদ্ধতি যা তার সর্বকালীন উপযোগিতা রক্ষার একটি বিশেষ উপায়। এর মধ্যে অবশ্য একটি সুযোগও রয়েছে যে, কোন একটি কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অন্য কোন ধারণাকে পুরে দেয়া যায় যা একটি সুনির্দিষ্ট কাল এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের মাত্রা পর্যন্ত সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। ৭৯ঃ১ আয়াতের বেলায় এমনি একটি যুক্তি খাটে। আলোচনার এই ভাবধারাটির পুনরাবৃত্তি ঘটবে আমাদের পরবর্তী বর্ণনায়। কিন্তু তার আগে আমরা আয়াতটির বিশ্লেষণ অন্বেষণ করব।

'আন্নাযিরিত' (النزعات) শব্দটির ধাতু নাযউন (نزع) যার অর্থ হল – প্রবলভাবে টানা, বিপুলভাবে টানা, কোন স্থান হতে সজোরে টেনে আনা, ছিনিয়ে নেয়া, ছিড়ে ফেঁড়ে টেনে আনা, অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করা ইত্যাদি। (Pull out, draw, wide, draw off, take away, snatch from the place, teat off, death struggle)। অন্যদিকে ;গারাক্বান (غرقا) শব্দের ধাতু 'গারকুন' (غرق) এর অর্থ হল – সবেগে ধাবিত হওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, সীমার বাঁধন অতিক্রম করা , সর্ব সমেত ধাবিত হওয়া ইত্যাদি (To plunge into ; destroy ; rush precipitately into ; exceed all bounds)।[১৭৮] গারাক্বান একটি কর্মবাচক বিশেষ্য যার উপর আয়াতের প্রথমাংশ অর্থাৎ আন্নাযিয়াত –এর ক্রিয়ার ভাবটি প্রতিফলিত হয়। আয়াতের শুরুতে 'ওয়া' (و) –এর ব্যবহার শপথ প্রস্তাবকে

www.pathagar.com

প্রতিভাত করে। অতএব চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে আমরা আয়াতিটর জন্য যে সকল সম্ভাব্য অর্থ পাই – তা নিম্নরূপ ঃ

ওয়া (و) আন্‌নাযিয়াত (النزعات) (ফলশ্রুতিতে) গারাকান (غرقا)

ক	খ	গ
শপথ	১। যা প্রবলভাবে টানে	১। নিমজ্জিত করে।
	২। যা কোনস্থান হতে সজোরে টেনে আনে	২। সীমার বাধন অতিক্রম করে যায়।
		৩। সবেগে (কেন্দ্রভিমুখ) ধাবিত করে।
	৩। যা সজোরে ছিঁড়েফেঁড়ে টানতে থাকে।	৪। ধ্বংস করে।
	৪। যা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন মরণ সংগ্রাম করে।	৫। সর্ব সমেত আকর্ষণ করে।

আপনি 'খ' কলামের চারটি প্রস্তাব, 'গ' কলামের যে কোন একটির অর্থের সাথে মিলিয়ে পাঠ করুন। প্রদর্শিত খ এবং গ কলামের বিভিন্ন বিন্যাস ও প্রয়োগে এখানে মোট ২০ টি প্রস্তাব তৈরী হতে পারে। [১৭৯] অত্যন্ত আশ্চর্য হবার বিষয় যে, প্রত্যেকটি প্রস্তাব আলাদা আলাদা ভাবে যে সকল তথ্যাদি সরবরাহ করে , তা কেবল অভিকর্ষ বল (gravitational force) ছাড়া পৃথিবীর অপর কোন জানা অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমান নেই। আমি ইতিপূর্বে নক্ষত্র তৈরি হওয়া হতে 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণ পর্যন্ত যে যৎসামান্য আলোচনা করেছি , তাতে অন্ততঃ এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় যে, অভিকর্ষ বলের ফলশ্রুতিতে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ–ধূলি–গ্যাসে এক ঘনায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়, এক পর্যায়ে অভিকর্ষের বিপুল টানে শুরু হয় ধ্বংস পতন, এই ধ্বংস–পতনে বস্তুনিচয় ক্রমাগত নিমজ্জিত হতে থাকে চতুর্দিক হতে একটি বিশেষ বিন্দু বা স্থানে একের উপরে আরেক পতিত হয়ে। এই ধ্বংস–পাত যখন শুরু হয় , তখন নক্ষত্রের বাইরের দেহ ভেংগে , ছিঁড়ে, ফেঁড়ে কেন্দ্রের দিকে সৃষ্টি করে নিমজ্জন প্রবাহ। শুধু তা – ই নয়, যে মুহূর্তে নক্ষত্রটি প্রটোষ্টারে পরিণত হয়, সেই মুহূর্ত হতে পরবর্তীতে এবং তার পূর্বে – সকল সময়েই নক্ষত্রটির জীবন বলতে যা বুঝায়, তা নির্ভর করে একটি ভারসাম্য ব্যবস্থার উপর। এই ভারসাম্যটি মূলতঃ একটি অস্তিত্ব বজায়ের 'জীবন–মৃত্যু–সংগ্রাম ' ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিকর্ষ বল তার প্রচন্ড ও বিশাল চাপে নক্ষত্রের কেন্দ্রে যে পারমাণবিক বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেই পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় বহির্মুখী সম্প্রসারণ চাপ ; এই বহির্মুখী চাপ যখন অভিকর্ষ সংকোচনের সমান হয়, তখন নক্ষত্রটি স্থিরত্ব লাভ করে। কোন কারণে এই আভ্যন্তরীণ চাপ কমে গেলে অভিকর্ষ সংকোচন বৃদ্ধি পায়, – তখনই নক্ষত্র অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়

www.pathagar.com

সংকোচন চাপজনিত উত্তাপ ; পুনরায় তা বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি করে এবং ভারসাম্য আনয়ন করে। আমরা দেখতে পাই – ভারসাম্যটি মূলত একটি অস্তিত্ব বজায় রাখার 'জীবনমরণ যুদ্ধ' বা death struggle ছাড়া কিছুই নয়। আন্নাযিয়াতি –এর প্রদর্শিত সকল ক্রিয়া বাচক অর্থের পাশাপাশি একটি বিশেষ্য বাচক অর্থ এখানে প্রদান করা হয়েছে যা হল death struggle, যা শব্দটির মৌলিক ভাবাবেগ ব্যক্ত করে।

যারা ব্ল্যাক–হোল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, যে ব্ল্যাকহোল হল একপ্রকার অভিকর্ষ–কূপ (gravity well), [১৮০] সীমার বাঁধন অতিক্রম করে এই সর্বভূক কূপ তার আশেপাশের নক্ষত্র, অন্যান্য বস্তুকে বিপুলভাবে, ছিঁড়ে–ফেঁড়ে টেনে আনে ; বস্তু সম্ভার সজোরে ধাবিত হয় এই অভিবর্ষ কূপে, নিমজ্জিত হতে থাকে একে একে এবং প্রচন্ড ঘনায়ন প্রক্রিয়ায় বস্তু সম্ভার তাদের আদি ঘনত্বে থিতিয়ে পড়ে।

আমরা অভিকর্ষের যে পরিচয় পেলাম, তা হল তার চরম রূপ। চরমতার মাত্রা ব্যক্ত করণের মাধ্যমে তথ্যটি আর অনির্দিষ্ট থাকে না , – অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইতিপুর্বে যে পুনরাবৃত্তির কথা বলেছিলাম, তার সূত্র ধরে এখানে পেশ করতে চাই যে, আল–কোরআন ৭৯ঃ১ আয়াতের শপথ বাক্যে যে ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের চিত্রায়ন করেছে তা সর্বোতভাবে অভিকর্ষ বলের সর্বাধুনিক ধারণাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে। আর এই সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ্য ব্যবহার করার চেয়ে তার প্রক্রিয়া ও মূল চিত্রটি ব্যক্ত করাই অধিকতর নিরাপদ যা আমরা কোরআনের পদ্ধতিতে দেখতে পাই। মহাকালের মহাগর্ভে বহু স্থান, ব্যক্তি বা ঘটনার নামগুলো সময়ের নিষ্ঠুর শাসনে মুছে গিয়ে নতুন নাম পেয়েছে – এমন অজস্র প্রমাণ ইতিহাসের সমস্ত কলেবর জুড়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। [১৮১] যেহেতু ৭৯ঃ১ আয়াতে কোন ফেরেস্তার (angel) উল্লেখ নেই , সেহেতু এই আয়াতের প্রস্তাবে ফেরেস্তা ভিন্ন অন্য কিছু ভাববার সুযোগ আমাদের অবশ্যই রয়েছে। আমরা যখন আয়াতটির শাব্দিক বিশ্লেষণ বিবেচনা করি, তখন আয়াতের মাত্র দু'টি শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানের এক বিশাল তত্ত্বের প্রকাশ দেখতে পাই। অর্থাৎ স্বীকার করে নিতে হয় যে, আল–কোরআন অভিকর্ষ বলের সন্ধান দিয়েছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে এবং মানুষের জ্ঞানে তা ধৃত হবার হাজার বছর আগে, – মানুষকে বুঝিয়ে দিতে যে, –"এইগুলি প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদের আহ্বান করে, তাহা মিথ্যা" (৩১ঃ৩০)। কারণ "মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, উহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন জ্ঞান দীপ্ত গ্রন্থ" (২২ঃ৮)। অভিকর্ষ জ্ঞান সচেতন যে স্রষ্টাকে আমরা ৭৯ঃ১ আয়াতে খুঁজে পাই – কিংবা ৭৯ নম্বর সূরাটির নামকরণেই যিনি

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের এই বিশাল জ্ঞানটি মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন, সেই প্রভুই ৩১ঃ৩০ আয়াতে এসে তাঁর আপনত্বের সত্যতার বিষয়টিকে যাচাই করেছেন যুক্তির চূড়ান্ততায় ; দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, – "বল আল্লাহর যুক্তি চূড়ান্ত ও অবিনশ্বর" (৬ঃ১৪৯)। পাশাপাশি এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একটি জিজ্ঞাসা – "উহারা কি অজ্ঞ যুগের অনুরূপ নিদর্শন খুঁজিতেছে ? আল্লাহ অপেক্ষা নির্দেশ দানে কে শ্রেষ্ঠ ' ? (৫ঃ৫০) । তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন নির্দশনকে অস্বীকার করিবে " ? (৪০ঃ৮১)।

আল্লাহর নিদর্শন কি ?

"বিশ্ববাসীগণের জন্য পৃথিবীতে যাবতীয় কিছুই আল্লাহর নিদর্শন" (৫১ঃ২০)।

সৃষ্টির সর্বোচ্চ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অনুভবকে জাগ্রত করার জন্য সমস্ত কোরআন জুড়ে এসেছে হাজারো আহ্বান। মানুষের মনে জিজ্ঞাসার ঝড় তুলে তাতে প্রস্তাব আসে, – তাহারা কি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর ব্যবস্থার দিকে তাকায় না ; এবং তাদের প্রতি , যাহা আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন" ? (৭ঃ১৮৫)। তারপরও যখন মানুষের অনুভবের নিদ্রা কাটে না , তখন কোরআন আরো সহজতরভাবে ও দৃঢ়তার সাথে মানবকুলকে জানায়, – 'ওহে (মুহাম্মদ সঃ) "বল আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে , তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর (১০ঃ১০১) অবশ্যই তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য " (১৫ঃ৭৫)।

(ওহে মানুষ ;)"জানিয়া রাখ, আকাশ মন্ডলীতে যাহা আছে এবং পৃথিবীতে যাহা রহিয়াছে তাহা সকলই আল্লাহর । যাহারা আল্লাহর সহিত অংশীরূপে অপরকে আহ্বান করে, তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারাতো শুধু অনুমানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে (১০ঃ৬৬)। এ সম্পর্কে তাহাদের আদৌ কোন জ্ঞান নাই – তাহারা কল্পনার অনুসরণ করে এবং নিশ্চিত যে, সত্যের সন্মুখীন হইয়া কল্পনা আদৌ ফলপ্রসূ হইবে না (৫৩ঃ২৮)। উহারা মৃত্তিকা তৈরি যে সকল উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে , সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম ?(২১ঃ২১)। বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে 'ইলাহ' মনে কর, তাহাদিগকে আহ্বান কর ; দেখিবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার শক্তি উহাদিগের নাই (১৭ঃ৫৬)। উহারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং উহাদিগকেই সৃষ্টি করা হয় (১৬ঃ২০)। এবং তাহারা তাহাদের (যাহারা উপাসনা করে) সাহায্য করিতে পারে না এমনকি নিজেদেরকেও (৭ঃ১৯২)। তোমরা তাহাদের আহ্বান কর অথবা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে সবই সমান (৭ঃ১৯৩)। সে আহ্বান করে

www.pathagar.com

এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক আর কত নিকৃষ্ট এই সহচর" । (২২ঃ১৩)।

" ইহারা কি বলে যে, সে (মুহাম্মদ সাঃ) ইহা (কোরআন) নিজে রচনা করিয়াছেন ? বল ! তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত নিদর্শন আনয়ন কর আর আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে চাহ্ আহ্বান কর (১১ঃ১৩)। যদি তাহারা তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জানিয়া রাখ, ইহা আল্লাহরই জ্ঞান হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত আর কোন উপাসনাযোগ্য প্রভূ নাই। এইসব জানিয়াও কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে না ? " (১১ঃ১৪)।

১৬৭। The Cambridge Atlas of Astronomy.
১৬৮ । The Encyclopaedia Britannica VI-13.
১৬৯ । The Encyclopaedia Britannica - Propaedia.
১৭০ । Sky & Telescope Mar 1983.
১৭১ । National Geographic Vol - 145 No. 5 May 1974.
১৭২ । National Gegraphic Vol-128 No. 5 Nov 65.
১৭৩ । Galaxies and Quasars - Kaufmann.
১৭৪ । Life and Death of Stars - Geoffrey Bath.
১৭৫ । National Geographic vol - 167 No 1 Jan 1985.
১৭৬ । ইংরেজী পদার্থবিদ স্যার জেমস্ জেইন -এর নামানুসারে।
১৭৭ । The Stars and Planets - Ian Ridpath
১৭৮ । F. Steingass.
১৭৯ । অনুরূপ আরো অনেক অর্থ হতে পারে।
১৮০ । The UFO Pheneomenon - Buttlar.
১৮১ । ইতিহাস বিখ্যাত হুদাইবিয়া 'হুদাইবিয়া-সন্ধির' কারণে জগৎ বিখ্যাত এবং সর্বজনবিদিত। এতদসত্ত্বেও মাত্র ১৪০০ বছরে প্রান্তে এসে স্থানটি "সুমাইসিয়া" নামে বিশ্বের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। হযরত ইউসুফের নাম যোশেফ, ঈশা যেসাস, ইব্রাহীম আব্রাহম ইত্যাদি নামকরণের অপভ্রংশতাও ইতিহাস বিদিত।

www.pathagar.com

১০

আইনষ্টাইনের সমীকরণ

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে" (২১ঃ৩৫)।

কোরআনের উল্লিখিত আয়াতটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যার সম্পর্কে তর্ক সৃষ্টি হবার কোন সুযোগ নেই। সকল জীবই লয়শীল – এটাই শাশ্বতিক। কিন্তু যারা জীবনহীন জড় জগতের অন্তর্ভূক্ত – তাদের লয়, মৃত্যু বা বিনাশ আছে কি? এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পদার্থের বিনাশ নেই। বিশ্বে যত পদার্থ আছে , তাদের মোট ভরের কোন পরিবর্তন হয় না। একে বলা হয় পদার্থের ভরের নিত্যতার সূত্র।

অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য নিয়ে অবতীর্ণ হয় আল-কোরআন আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে। "ইহার (সৃষ্টির)[১৮২] উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তু লয়শীল (৫৫ঃ২৬), আল্লাহর সত্বা ব্যতীত সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ধ্বংসের অধীন" (২৮ঃ৮৮)। আল-কোরআন পদার্থের লয় বা ধ্বংসকে অবশ্যম্ভাবী দাবী করেছে। ব্যবহৃত ফানা (فان) শব্দটি অস্তিত্বহীন হওয়া অর্থেই ধ্বংস প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করে যায়।[১৮৩] আমরা কোনটি গ্রহণ করব – বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ দিনের বিশ্বাস না আল-কোরআন?

পদার্থের ভরের নিত্যতার সূত্র যে ত্রুটিমুক্ত নয় – মানুষ সে সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। এই বোমার মধ্যে যে ইউরেনিয়াম –২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম –২৩৯ নামক পদার্থ থাকে, তাদের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের যখন বিভাজন হয়, তখন সেই বিক্রিয়ায় মোট ভরের সামান্য কিছুটা কমে যায়। সেই হারিয়ে যাওয়া সামান্য ভরই বিস্ফোরণের বিপুল শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পদার্থ শক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়ে একদিকে পদার্থের নিজস্ব ধ্বংস ও অন্যদিকে পদার্থের শক্তিতে পরিণত হবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করে।

পদার্থ শক্তিরূপে রূপান্তরিত হতে পারে, তা তাত্বিকভাবে বহুপূর্বে প্রকাশ করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে তার বিখ্যাত আপেক্ষিক বাদে। এই তত্বে পদার্থ ও শক্তির সমতুল্যতা বিষয়ক বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ প্রস্তাবিত হয়। এই সমীকরণ আপেক্ষিক বাদের এক বিস্ময়কর অবদান। একটি পদার্থে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত রয়েছে , তার পরিমাণ, পদার্থটির নিরেট ভর ও আলোর

www.pathagar.com

গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান। এই সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, অতি সামান্য পদার্থকে ধ্বংস করতে পারলে প্রাপ্ত শক্তিরপরিমাণ $E = mc^2$ বা $1 \times (3 \times 10^8)^2$ বা ৯০ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন জুল। অর্থাৎ অতি অল্প পদার্থ হতেও বিস্ময়কর পরিমাপের শক্তি পাবার সম্ভাবনার কথাটি এই সমীকরণ দাবী করছে। এ প্রসংগে সূর্যের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। প্রতি মুহূর্তে সূর্যের অভ্যন্তরে ৬০ কোটি টন হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় ; আর তার মধ্য হতে মাত্র ৪০ লাখ টন হাইড্রোজেন সরাসরি বস্তুগত অবস্থার বিলয় ঘটিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সূর্যের দেহ ভরের কাছে এই ৪০ লাখ টন হাইড্রোজেন অতিশয় নগণ্য একটি পরিমাণ। এই নগণ্য পরিমাণ হাইড্রোজেন, যা সূর্যের শক্তি উৎপাদনে এক সেকেণ্ডের কাঁচা মাল মাত্র – সে পরিমাণ হতে প্রাপ্ত শক্তিটি কত জানেন কি? তার পরিমাণ এই যে, সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সমুদয় মানুষ যতটুকু শক্তি ব্যবহার করেছে – তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।[১৮৪] আর পৃথিবী যা পেয়ে থাকে তা উৎপাদিত সমগ্র শক্তির ২ বিলিয়ন ভাগের ১ ভাগ মাত্র।[১৮৫] অর্থাৎ অতিশয় অল্প পদার্থ হতে বিপুল পরিমাণ শক্তি সৃষ্টির কথা আমরা জানতে পারি, যা অন্য কথায় আইনস্টাইনের সমীকরণ বা $E = mc^2$ এর রীতি অনুসরণ করে।

কোরআনে সন্নিবেশিত আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ হতে উল্লিখিত সমীকরণে পৌছা যায়। তার পূর্বে আমরা বস্তু সম্পর্কিত যৎসামান্য আলোচনা করে নেব।

আমরা অনেকেই নিউক্লিয়াসের বল (Nuclear Force), বন্ধন শক্তি (binding energy) ইত্যাদি সম্পর্কে কম বেশী শুনেছি। "পরমাণুর নিউক্লিয়াস দুই প্রকার কণিকা – প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটন হল পজেটিভ তড়িৎ মণ্ডিত এবং নিউট্রন নিরপেক্ষ। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে কোন প্রকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণ থাকেতে পারে না। অধিকন্তু স্বধর্মী চার্জ বিশিষ্ট প্রোটনগুলোর মধ্যে সমজাতীয় বৈদ্যুতিক বল বর্তমান থাকার জন্যে বিকর্ষণ বলের প্রভাবে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কথা। অথচ তারা নিউক্লিয়াসের মধ্যে খুবই কাছাকাছি ও অতিশয় নিবিড়ভাবে অবস্থান করে এবং এমনকি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে বিপুল পরিমাণ শক্তির আবশ্যক হয়। আবার নিউক্লিয়াসের দু'টি ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ-বল এতই দুর্বল যে নিউক্লিয়াসের বিরাট বন্ধন-শক্তির (binding energy) তুলনায় তাকে অতিশয় নগণ্য বলা চলে। অতএব, আমরা বলতে পারি যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি অজ্ঞাত বল রয়েছে যা বস্তুর গঠন, গুণাগুণ, আকৃতি ইত্যাদির জন্য একান্তভাবে দায়ী এবং তা অবশ্যই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ কিংবা মাধ্যাকর্ষণ বল হতে ভিন্ন। সেই অজ্ঞাত বলটি যদি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান নিশ্চিত না করত – আমরা

www.pathagar.com

আমাদের চারপাশের জগৎকে যেভাবে দেখতে পাই তা সম্ভব হত না এবং এমনকি যে, আমরা নিজেরাও অস্তিত্বহীন হতাম। নিউক্লিয়াসের এই বলই মূলতঃ পদার্থের প্রকরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পরমাণু কেন্দ্রে এই বলের অনুপস্থিতিতে কোন পদার্থের আকৃতি গঠন সম্ভব হত না, মৌলিক কণিকাগুলো শর্তহীনভাবে পাশাপাশি অবস্থান করত শুধু।

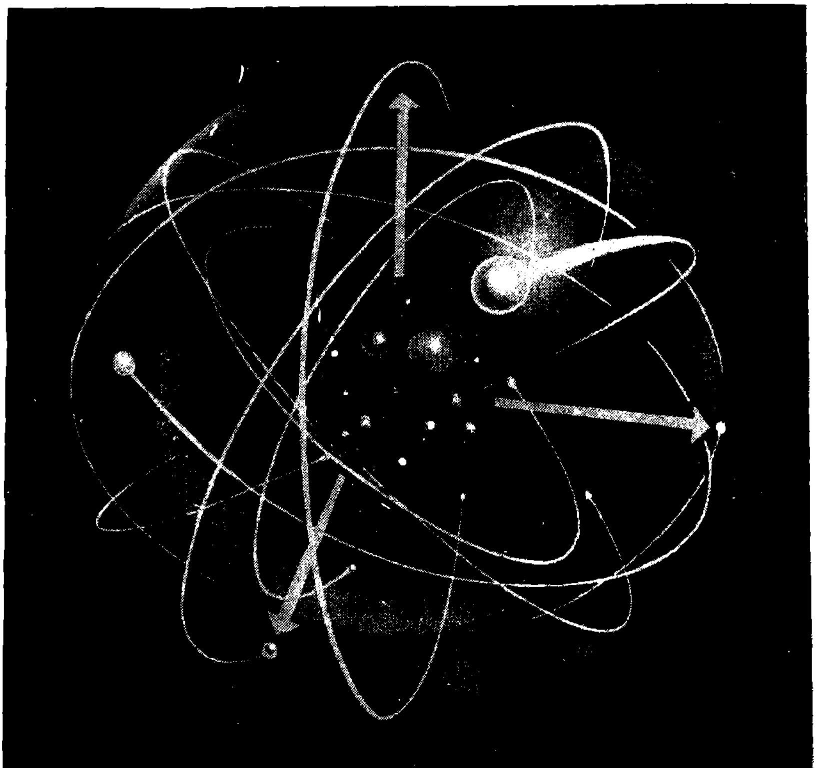

Binding energy-র বিপুল শক্তি এবং তার উৎস আজো দুর্বোধ্য। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন বিপুল বন্ধন শক্তিতে আবদ্ধ থাকে। রহস্যময় এ বলে প্রকৃতি হলো প্রবল আকর্ষণ বলয়ের চূড়ান্ততায় একটি অব্যাখ্যাত বিকর্ষী বলের দ্বারা নিউক্লিয়াসে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, যার অন্যথায় সমস্ত সৃষ্টি একটি একক ও নিরেট বস্তুপিন্ডে পরিণত হতো। বস্তুময় জগতে এই বল এক অসীম বিস্ময়!

www.pathagar.com

নিউক্লিয়াসের এই অদ্ভুত বলের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীগণ অনেক প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তারা দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন দ্বারা প্রোটনকে আঘাত করে প্রোটনের সাহায্যে নিউট্রনের বিক্ষেপণের বিষয় নিয়ে বহু গবেষণা করলেন। প্রোটনের দ্বারা বিভিন্ন গতিসম্পন্ন নিউট্রনের বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপণের পরিমাণ হতে নিউক্লিয়াসের বলের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হল।

অল্প পরিসরবিশিষ্ট এই বল যেহেতু প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাগুলোকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, অতএব সমষ্টিগতভাবে তা আকর্ষীধর্মী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই বল সম্পূর্ণরূপে আকর্ষীধর্মী হতে পারে না। কেননা এরূপ হলে ভারী নিউক্লিয়াসগুলো অবশ্যই জমাটবদ্ধ নিষ্ক্রিয় কণিকায় পরিণত হত। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সমস্ত কণিকাগুলোর মধ্যে একমাত্র আকর্ষী বল বিদ্যমান থাকলে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হবে, যাতে নিউক্লিয়াসের সমস্ত কণিকা একে অপরের আকর্ষী বলের কার্যকরী দূরত্বের মধ্যে আসবে। এর ফলে সমস্ত কণিকার উপরে কার্যরত আকর্ষী শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং কণিকার সংখ্যা যা-ই হোকনা কেন, সমস্ত নিউক্লিয়াসের আয়তন সমান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা কখনো পরিলক্ষিত হয় না। দেখা যায় যে, নিউক্লিয়াসের আয়তন, এর ভর-সংখ্যার সাথে বেড়ে যায় এবং হালকা ও ভারী প্রায় সকল নিউক্লিয়াসের প্রতি-কণিকার জন্য বন্ধন শক্তিও প্রায় কাছাকাছি। এতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে আকর্ষী বলের পরিমাণ সীমিত। নিউক্লিয়াসের এইরূপ আচরণ, যার দ্বারা একটি সীমিত পরিমাণ আকর্ষণ নির্দেশ করে থাকে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়াসের বলের সম্পৃক্তি (saturation of nuclear forces) নিউক্লিয়াসের এই রূপ সম্পৃক্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ বলেন যে, নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন কণিকাগুলোর মধ্যে এক প্রকার আদান বল (exchange force) সংঘটিত হয় এবং এই বলই নিউক্লিয়াসকে বেঁধে রাখে।

দেখা যায় নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে কার্যরত বল ৫০% ক্ষেত্রে সাধারণ প্রকৃতির এবং ৫০% ক্ষেত্রে আদান প্রদান ধর্মী হলেও এ দ্বারা নিউক্লিয়াসের বলের প্রয়োজনীয় সম্পৃক্তি উৎপাদিত হয় না। সুতরাং প্রয়োজনীয় সমপৃক্তির জন্য নিউক্লিয়াসের বলের অপর কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য হল, নিউক্লিয়াসের প্রোটন কণিকাগুলো খুব কাছাকাছি আসলে (10^{-13} সেঃ মিঃ এর অর্ধেকের চাইতেও কম) এরা আকর্ষণ রূপ পরিবর্তন করে বিকর্ষণ রূপ পরিগ্রহণ করে। অর্থাৎ কণিকাগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে থাকে। কি করে বিশাল এক আকর্ষণ মণ্ডলের অভ্যন্তরে আকর্ষী বলের চূড়ান্ত প্রভাব পর্যায়ে একটি বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় এবং যা বস্তু ধর্মের বিধিরীতি বহির্ভূত এক ব্যাখ্যার অতীত গুণাগুণের দ্বারা বস্তু সৃষ্টির গোড়াপত্তন করে, তা বিজ্ঞান মস্তিষ্কে এক দুর্লঙ্ঘ্য জটিলতা সৃষ্টি করে। যাই হোক, হাইসেন বার্গের এই মতামতে উদ্ভূত

www.pathagar.com

সমস্যা পাড়ি দেয়ার জন্য ১৯৩৫ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া (Yukawa) 'মেশন তত্ত্বের' অবতারণা করে এই জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে প্রস্তাব করেন যে, নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি কণিকাগুলোর মধ্যে এক প্রকার কণিকার অবিরাম শোষণ ও নির্গমণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং তাদের আদান প্রদানের জন্যই নিউক্লিয়াসে সেই কথিত অল্প পরিসর বিশিষ্ট শক্তিশালী বলের উদ্ভুত হয়। ইলেক্ট্রন অপেক্ষা ভারী ও প্রোটন অপেক্ষা হালকা এই কণিকারা নেগেটিভ কিংবা পজেটিভ চার্জযুক্ত কিংবা তড়িৎ নিরপেক্ষও হতে পারে। এই কণিকাগুলোর নাম দেয়া হয় মেশন ; মেশনের অনুমানকৃত ভর ইলেক্ট্রনের ২০০ ভাগের ১ ভাগ।[১৮৬]

এতক্ষণ নিউক্লিয়াসের বল সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হল, বিজ্ঞানীগণ পরবর্তীতে তার প্রসার ঘটিয়েছেন। নিউক্লিয়াসের লিকুইড-ড্রপ মডেল, শেল মডেল, যৌথ মডেল ইত্যাদিতে পরমাণু কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা হলেও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও মানুষের বিবিধ প্রকল্পের (হাইপোথিসিস) মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রন জড়াজড়ি করে থাকে এক অজ্ঞাত শক্তির কারণে যাকে মানুষ এখনো পূর্ণমাত্রায় বুঝতে সক্ষম হয়নি।

অনুরূপ ব্যাখ্যা আসে পদার্থের অণুসমূহের বন্ধন ও পদার্থ গঠনের বিষয়কে বিশ্লেষণ করার সময়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পদার্থসমূহের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যার ফলশ্রুতিতে অণুগুলো একে অপরের সাথে পরস্পর নিবিড়ভাবে সংঘবদ্ধ থাকে। তারা আরো মনে করেন যে, অণুগুলো তাদের বিন্যাসে মধ্যস্থিত শূন্যস্থানের মধ্যে দ্রুত কম্পনশীল। ফলে অণুসমূহের পরস্পর বিযুক্ত হবার একটি স্বাভাবিক বিকর্ষণ প্রবণতা রয়েছে। আর বিকর্ষণ শক্তি, যার ফলে এরা পরস্পর বিযুক্ত হতে চায় বা হওয়ার প্রবণতা দেখায়, এই দুয়ের মিলিত শক্তি বা রেজালটেন্ট ফোর্সকেই আন্তরাণবিক শক্তি বলে। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর দৃঢ় আকর্ষণে পরস্পর ঘন সন্নিবিশিষ্ট থাকে এবং এর জন্যই কঠিন পদার্থের আকার সম্ভব হয়। আমাদের চারপাশের যাবতীয় পদার্থ বিভিন্ন জটিল যৌগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যৌগিক পদার্থগুলোর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীগণ রাসায়নিক ক্রিয়ার মূলে এক প্রকার রাসায়নিক আসক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে থাকেন। বিজ্ঞানীদের কাছে এই রাসায়নিক শক্তি, এর ধরণ বা প্রকৃতি আজো রহস্যাবৃত। 'নিউটন' মনে করতেন, এটি মহাকর্ষ বলেরই একটি রূপ। আধুনিক বিজ্ঞীনগণ মনে করেন এটি সম্ভবতঃ একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি হতে পারে।

এতক্ষণের আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাই যে, এক অজ্ঞাত শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে পদার্থের মৌলিক কণিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করছে যার উপর পদার্থের সকল গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ নির্ভর করে। এদের মধ্যে পদার্থের গঠন,

www.pathagar.com

পদার্থের অবস্থা, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, রাসায়নিক আসক্তি ও পদার্থের প্রকার ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুরূপ আরেকটি অজ্ঞাত শক্তি পদার্থের আকৃতি দান করছে , পদার্থকে পদার্থের পরিচয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় পেশ করছে। এই আন্তরাণবিক শক্তি পদার্থে বর্তমান না থাকলে পদার্থের অণুগুলো পাশপাশি আলগাভাবে অবস্থান করত এবং জীবন থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় কিছু অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ত। এক অজ্ঞাত শক্তি বস্তুতে রাসায়নিক আসক্তির যোগান দিচ্ছে বলেই জীবন সৃষ্টি ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য হাজার লক্ষ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আমরা দেখতে পাই , বস্তুর নিরেট উপযোগহীন পদার্থ ভরে বর্ণিত অজানা অজ্ঞাত শক্তি যখন প্রবিষ্ট হয়, কেবল তখনই তা পরিণত হয় উপযোগী পদার্থে। আমরা তাকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে, বস্তুর উপযোগহীন ভরকে যখন সেই অজ্ঞাত শক্তি গুণান্বিত করে, তখনই বস্তুটি উপযোগী পদার্থে পরিণত হবার গৌরব অর্জন করে থাকে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি,

বস্তুর উপযোগীহীন অস্তিত্ব × অজ্ঞাত শক্তি = উপযোগী পদার্থ কণা।

এই বই এর এই পৃষ্ঠাটি, পাঠকের চক্ষু এবং ডাষ্টবিনের সর্বনিকৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেকটি উপযোগী পদার্থের উদাহরণ। এদের প্রত্যেকটি অগণিত অণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটি নির্দিষ্ট শক্তি এই অণুগুলোকে পাশাপাশি সুবিন্যস্তভাবে একটি শৃংখলায়িত বিধানে আবদ্ধ করে রাখছে বলে এক কোণে হাত বুলিয়ে এই পাতাটিকে উল্টানো সম্ভব হচ্ছে এবং অণুগুলো ঝর ঝর করে পড়ে যাচ্ছে না। তাহলে আমাদের সেবায় নিয়োজিত সকল পদার্থ গঠনের পেছনে সেই অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবটি অবশ্যই অনস্বীকার্য।

এই আলোচনায় পদার্থের গুণাগুণ বিষয়ক সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠা করার পর আমরা আল-কোরআনের আয়াতসমূহের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই। বস্তুবিষয়ক যে সকল আয়াত কোরআনে রয়েছে , তা হতে কয়েকটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল ঃ-

ক । "তিনি (আল্লাহ) সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা (৬ঃ১০২)।

খ । যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর ইহাদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা, ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করিয়াছেন (২০ঃ৫০)।

গ । প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত (৫৫ঃ২৯)।

www.pathagar.com

ঘ । পালনকর্তা নিজ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন – তাহা কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? (৬ঃ৮০)।

ঙ । সতর্ক হও, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন (৪১ঃ৫৪)।

চ । প্রভু তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বস্তু ঘিরিয়া রহিয়াছেন (৭ঃ৮৯)।

ছ । তোমার প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন (১১ঃ৫৭)।

জ । আকাশ মণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যাবতীয় বস্তুই আল্লাহর – আল্লাহ সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করিয়া আছেন" (৪ঃ১২৬)।

উপরের প্রত্যেকটি আয়াতই বস্তুর উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ শক্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। ৬ঃ৮০ আয়াতের জিজ্ঞাসায় একটি রহস্য গভীর তথ্যের সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। পালন কর্তা যে প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তা যেন একটি দৃশ্যমান সত্য ও স্বতঃসিদ্ধতার বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি যেন এমন যে, বস্তুদের দিকে তাকালেই "পালন কর্তার ঘিরে থাকার" ঘটনাটি দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ আমরা বস্তুর দিকে তাকিয়ে কখনো পালন কর্তার ঘিরে থাকাকে দেখতে পাই না। তাহলে কি বুঝাতে চেয়েছে এই আয়াতটি? তা কি সে অজ্ঞাত শক্তি, যা বস্তুর পরমাণুর গঠনকে অস্তিত্বে আনে, গঠিত পরমাণুকে ব্যাখ্যার অতীত অথচ একটি সুনির্দিষ্ট শৃংখলায় সংঘবদ্ধ করে অণুর আকৃতি ও অণু হতে পদার্থের আকৃতি দান করে এবং এভাবে একটি মূল উপযোগহীন ভরকে উপযোগপূর্ণ বস্তু ভরে পরিণত করে যা কখনো – আন্তরাণবিক বল, কখনো রাসায়নিক আসক্তি কখনো বা নিউক্লিয়াসের বলের অব্যাখ্যিত রহস্য হয়ে আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয়? আল্লাহ আসলে বস্তুধর্মের উল্লিখিত নাজুক গুণাগুণসমূহ ও ব্যাখ্যার অতীত শূন্যতা সংক্রান্ত জ্ঞানটির বিষয়ে মানুষকে এই আয়াত দ্বারা জানাতে চান যে, মানুষের প্রত্যক্ষ করা উচিত – তাঁর নিয়ন্ত্রণ শক্তিই পদার্থের অণুতে বাঁধন সৃষ্টি করে আর রাসায়নিক আসক্তির বল হয়ে বস্তুর মিলন ঘটায় এবং উপযোগী পদার্থ সৃষ্টি করে, যা বর্তমান না থাকলে পদার্থের কণারা শর্তহীনভাবে পাশাপাশি অবস্থান করত, কোন উপযোগী পদার্থের কাঠামো রচনা কখনোই সম্ভব হত না। আরো বিস্তারিতভাবে বললে বলতে হয়, – বস্তুদের 'উপযোগ' গুণাগুণই আল্লাহর বস্তুকে পরিবেষ্টন করে থাকার স্বাক্ষর, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তিই এদের মাঝে উপযোগিতা সৃষ্টি করেছে , অতএব বস্তুদের উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করে আমরা যেন এই বস্তুময় জগতে পালনকর্তার মহাবিস্তৃত অবস্থান (সমস্ত বস্তুকে ঘিরে থাকা) সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারি। এই ধারণাকে প্রভূতভাবে প্রসারিত করে তুলে ২০ঃ৫০ আয়াতটি। এতে দাবী করা হয়েছে যে, পদার্থের গঠন বা আকৃতি আল্লাহর দান এবং তিনি তাদের গুণাগুণ ও রীতি নীতি নির্দেশিত করে দিয়েছেন। ৫৫ঃ২৯ আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ সার্বক্ষণিক সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত। শুধু তাই নয়, ১১ঃ৫৭ আয়াত

www.pathagar.com

আনুযায়ী আল্লাহ্ বস্তুর গুণাগুণ সংরক্ষণকারী, অর্থাৎ বস্তুর মাঝে ধর্ম ও গুণাগুণের স্থায়ীত্ব বিধায়ক মহান আল্লাহ্ তায়া'লা ৪ঃ১২৬ আয়াত আনুযায়ী আকাশ ও ভূমগুলের সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

তাহলে আমরা দেখতে পাই , আল্লাহ্ প্রথমে বস্তুর স্রষ্টা। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা উপযোগপূর্ণ বস্তুর সৃষ্টি করেন। রহস্যঘেরা সেই নিউক্লিয়াসের বল কিংবা আন্তরাণবিক বলের অব্যাখ্যিত শূন্যতায় আল্লাহকে টেনে আনলে সমস্ত সমস্যাটির একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিজ্ঞান যে সমস্যাটিকে লংঘন করতে পারে না, সে বিষয়টি যখন কোরআনের বাণীর আলোকে দেখা হয়, আমরা দেখি – বস্তুকে কার্যোপযোগী করার পেছনে প্রকৃত যুক্তিই আসলে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি।

অর্থাৎ ,

উপযোগ বিবর্জিত বস্তুর নিরেট ভর × আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি = উপযোগী বস্তু।[১৮৭]

ইতিপূর্বের আলোচনায় বিজ্ঞান যাকে "অজ্ঞাতশক্তি" হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে , কোরআনের আয়াতের বিশ্লেষণ আনুযায়ী তাকেই আল্লাহর শক্তি হিসাবে দেখতে পাই অর্থাৎ বিজ্ঞান যে অজ্ঞাত শক্তির কথা বলে তা মূলতঃ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। প্রিয় পাঠক, আমরা এই সম্বন্ধ হতে আইনষ্টাইনের সমীকরনে পৌঁছতে পারি।

তার পূর্বে আইনষ্টাইনের সমীকরণের বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত সহজ ও নিম্নরূপ ঃ-

$E = mc^2$
E = চলমান বস্তুর সমগ্র শক্তি (বস্তুর গতি শক্তি যখন আলোর সমান)।
m = পদার্থ-ভর।
c = আলোর প্রতি সেকেণ্ডে গতি।

আমরা যদি একটি একক ভরের বস্তুকে বিবেচনা করি, তবে এই তুচ্ছ বস্তু হতে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ অতিশয় বিশাল দেখতে পাই।

$$E = mc^2$$
$$= 1 \times (299792458)^2$$
$$= 1 \times (3 \times 10^8)^2$$
$$= 9 \times 10^{16} \text{ Joules}$$

m = 1kg.
C = 299792458 m/sec or 3×10^8 m/sec

www.pathagar.com

$$= 90{,}000{,}000{,}000{,}000{,}000 \text{ Joules} = \infty$$ (অসীম) ।

অর্থাৎ বস্তুতে এক মহাবিস্তার শক্তি (আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে) বর্তমান রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা প্রাপ্ত সম্বন্ধ হতে দেখতে পাই যে, বস্তুতে সকল প্রকার উপযোগিতা, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। বস্তুর শক্তি একটি উপযোগিতা, সুতরাং প্রাপ্ত বিশাল শক্তিটি আল্লাহর শক্তিকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ আইনষ্টাইনের তত্ত্ব বলে যে, আল্লাহর শক্তি মহাবিশ্বের অগণিত সংখ্যক ও অপরিমেয় পরিমাণের বস্তুর প্রেক্ষিতে অচিন্তনীয়ভাবে অসীম। ঠিক অনুরূপ তথ্য ও উপাত্ত আমরা আল-কোরআনের আয়াত হতে পেয়ে থাকি। এর আগে আমরা জেনেছি যে, –

উপযোগ বিবর্জিত বস্তুর নিরেট ভর × আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি = উপযোগী বস্তু।

যদি আমরা উপযোগ বিবর্জিত বস্তুকে m° এবং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে E^{A} এবং উপযোগী বস্তুকে m ধরি তবে পাই, –

$m^{\circ} \times E^{A} = m$, (আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি বস্তুকে গুণান্বিত করে বলে)।

$$E^{A} = \frac{m}{m^{\circ}}$$

কিন্তু সত্যিকারের কোন উপযোগহীন বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই বলে

$m^{\circ} = o$;

তহলে সমীকরণটিতে অবস্থা দাঁড়ায় –

$E^{A} = \frac{m}{o}$ অর্থাৎ $E^{A} = \infty$ (অসীম)[১৮৮]।

এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থে কার্যরত আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি অসীম যা আইনষ্টাইনের তত্ত্ব আমাদেরকে জানিয়ে যায়। ফলাফলের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই , আল-কোরআন আইনষ্টাইনের সমীকরণকে যথার্থভাবে অনুমোদন করে। শুধু তাই নয়, আপনারা পরবর্তী অধ্যায়ে জানবেন যে, 'হকিং রেডিয়েশন' বা গামা-রে এর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে কিভাবে ব্ল্যাক-হোলের মহা-বিপুল বস্তু ভর নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয়। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব আমাদের জানায় যে, বস্তুর চূড়ান্ত ধ্বংস সম্ভব – তবে তা বিপুল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে মাত্র। পদার্থ অবিনাশী, এই ধারণা এই শতাব্দীর গোড়ায়ও মানুষ আকড়ে ধরে রেখেছিল। পদার্থের বিনাশ সম্ভব, তা আইনষ্টাইন হতেই আমরা প্রথম অবগত হই। অথচ তারও ১৪০০ বছর আগের কোরআন অতি সুদৃঢ়তায় অবিনাশ বাদকে নাকচ করে দিয়ে প্রস্তাব করেছিল, "যাবতীয় বস্তুই লয়শীল (৫৫ঃ২৬)। আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুই

www.pathagar.com

ধ্বংসের অধীন" (২৮ঃ৮৮)। এখানে এসে কোরআনের প্রস্তাব ও আইনষ্টাইনের প্রাপ্তি এক হয়ে যেতে দেখি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, আল-কোরআন আইনষ্টাইনের তত্ত্বে বস্তুর লয় পাবার বিষয়টি এবং একই সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু হতে বিপুল শক্তির সম্ভাবনা ও সমীকরণের ফলাফল উভয়কেই অনুমোদন করে। এই অনুমোদন এক বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

"তবে কি তাহারা এই বাণী অনুধাবন করে না? (২৩ঃ৬৮) এইগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন (১০ঃ১) ইহা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ (৪০ঃ২)। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী" (৮ঃ৪৯)।

কে আল্লাহ?

"তিনিই আল্লাহ। তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি আছে? অতঃপর তোমরা কোথায় ছুটিয়া যাইতেছ? (১০ঃ৩২)। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারাতো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে সমর্থ নয়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে সম্মিলিত হইলেও; বরং মাছি যদি কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে – তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল (২২ঃ৭৩)। যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে বহু উপাস্য থাকিত, তবে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইত (ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়)। অতএব উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আরশের অধিপতি অতিশয় পবিত্র" (২১ঃ২২)।

---

১৮২ । আলাইহা (عليها) – এর অর্থ প্রায় সকলেই 'পৃথিবীর উপর' করেছেন। এই আয়াতে, তার পূর্ব ও পরে কোথাও পৃথিবীর উল্লেখ নেই। অতএব তা 'সৃষ্টি অর্থেও প্রশস্ত।

১৮৩ । Elias Modern Dictionary - Arabic to English

১৮৪ । National Geographic Vol 128 No. 5 May 1974.

১৮৫ । ১ বিলিয়ন = ১০০০,০০০,০০০ (আমেরিকা)।

১৮৬ । পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান – আহমদ হোসেন ও সিরাজুল ইসলাম।

১৮৭ । উপযোগহীন পদার্থ কি, তা আমরা জানি না। সকল পদার্থের উপযোগিতা আছে। এ হল পদার্থের অনুমানকৃত একটি অবস্থা যখন পদার্থের পরমাণুর গঠন, আকৃতি ইত্যাদি সম্ভব নয়, অর্থাৎ পদার্থের সূক্ষ্মতম ইউনিট নিউক্লিয়াসের শক্তি কিংবা অণুর মধ্যস্থ আন্তরাণবিক বল শূন্য বস্তুর অনুমানকৃত অবস্থা। এমন একটি অবস্থার কথা আমরা ভাবতে পারি না। কোরআনের আয়াত অনুসারে ধরে নেয়া যায় যে, যখন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি উক্ত

www.pathagar.com

অবস্থা জাত পদার্থে গুণিত হয়, তখন বস্তুটি হয় সেবাদানে উপযোগী। ততক্ষণে বস্তুটি একটি স্বাভাবিক পরমাণু বা অণুর গঠন প্রাপ্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে যাকে আমরা উপযোগী পদার্থ বলতে পারি। এটি একটি প্রকল্পিত অনুমান। (Hypothesis)।

১৮৮ । আল্লাহর শক্তি অসীম ও অপরিমেয়। প্রদত্ত সমীকরণে শুধু একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নেয়া হল যে, মাত্র এক কেজি বস্তু-ভরকে তার বস্তুরূপ অবস্থায় রাখার জন্য দরকার হয় ৯০০ কোটি কোটি জুল শক্তির। অন্য কথায় ৯০০ কোটি কোটি জুল পরিমাণ শক্তিকে ঘনায়ন করলে মাত্র এক কেজি বস্তু তৈরী হবে। এইভাবে মহাবিশ্বের বস্তু মজুত মহাপদ্মের উপর মহাপদ্ম শক্তি পরিমাপের জাত বস্তুর ভাণ্ডার সৃষ্টিতে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ঘনায়ন করার প্রয়োজন হয়েছিল, তার কোন প্রকাশ সম্ভব হবে না। $E^A = \propto$ (অসীম) - এর অর্থ এখানে এমনি একটি প্রস্তাব তুলে ধরে যা, $E = mc^2$ এরই সমানুপাতিক।

www.pathagar.com

১১
ব্ল্যাক-হোল

একটি উটকে সূঁই -এর ছিদ্রপথে প্রবেশ করানো সম্ভব কি?

বোকা হতে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী, জ্ঞানহীন সকলের জন্য এর একটি মাত্র জবাব থাকা উচিত - তা হল, উটকে সূই এর ছিদ্রপথে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। এমনি একটি জিজ্ঞাসা যে আমাদের দৃষ্টিতে সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধি বিবর্জিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ এমন একটি সম্ভাবনার কথা সরাসরি প্রস্তাব হয়ে এসেছে আল-কোরআনে। কোরআন কি তাহলে রূপকথার আজগুবি গল্প বলেছে? অথবা অলৌকিক এমন কিছু যা পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে ব্যাখ্যা করা যায় না? জ্ঞানী পাঠক সমাজের নিকট এই প্রশ্নটি রাখলাম ; প্রবন্ধের শেষে এর উত্তর আপনার নিকট হতে আশা করব।

জগৎবাসীর জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার কাছে আজ হতে ১৪০০ বছর আগে আরবের নিরক্ষর নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর উপর অবতীর্ণ কোরআনে ঘুরে ফিরে বার বার এসেছে কয়েকটি অনবদ্য চ্যালেঞ্জ। দাবী করা হয়েছে ,- "তাহারা কি সূক্ষ্ম সর্তকতার সঙ্গে কোরআনকে অনুধাবন করে না? যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন উৎস হইতে অবতীর্ণ হইত, তবে অবশ্যই উহারা উহাতে পাইত বহু অসংগতি ও সামঞ্জস্যহীনতা (৪ঃ৮২)। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না (৬৭ঃ৩)। মহাবিজ্ঞানময় এই কোরআন (৩৬ঃ২), জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ এই গ্রন্থে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই" (৩২ঃ২)। এই চ্যালেঞ্জগুলোর একটিকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার কেউ আছেন কি? যারা ছিদ্র অন্বেষণ করে থাকেন, তাদের জন্য কোরআনের সেই একটি প্রস্তাব, সূঁই -এর ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ করবার ধারণাটি কোরআনের চ্যালেঞ্জকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লোভনীয় হাতিয়ার হতে পারে। আপনিও তা চেষ্টা করে দেখবেন কি?

অতীব দুঃখের সাথে জানাতে হয় যে, এই সুযোগটিও আর কোন মানুষের জন্য ফেলে রাখা নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ আজ প্রমাণ করে ফেলেছেন এর সম্ভাব্যতার বিষয়টি। একটি উট কেন, সূঁই -এর ছিদ্র পথে শত-সহস্র উটকেও এক সংগে প্রবেশ করানো সম্ভব। বিস্ময়করভাবে অবিশ্বাস্য সত্যতার দাবী রেখে বিজ্ঞান আনত মস্তকে এমনি সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েছে। আবারো আরেক দফা প্রমাণিত হয়ে পড়ল - "ইহা এমন গ্রন্থ যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই" (২ঃ২)। আমাদের

www.pathagar.com

এই প্রবন্ধ সেই অবিশ্বাস্য ব্যবস্থার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে। তার নাম ব্ল্যাক-হোল (Black hole), বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পিলে চমকানো এক মহাজাগতিক ব্যবস্থা – যা হাতেকলমে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিষয়ে সামান্যও আগ্রহী অথচ ব্ল্যাক-হোলের নাম শুনেননি এমন লোকের সংখ্যা আজকের পৃথিবীতে নিতান্ত হাতেগোনা। প্রকৃতির অদৃশ্যগর্ভে কত বিস্ময়, কত অভিনবতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে , তার সন্ধান আমরা জানি না। কিন্তু মজার বিষয় হল যে, এদের মধ্য হতে যদিও দু' একটা বিষয় বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা অবগত হই , আমাদের পরিচিত জ্ঞানের তুলনায় তারা এত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে, এগুলো প্রমাণিত তথ্য হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কারণ, এগুলো আমাদের বিশ্বাস জন্মাবার পূর্বশর্ত চিন্তা শক্তির সাধ্য-সীমার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের জ্ঞান। 'One can not believe impossible things' কথাটি বলেছেন Lewis Carroll তার Alice in Wonder Land পুস্তকে ; And impossible indeed they seem to be. In those far reaches of universe, in those bewildering worlds are places......where matter and light are continually sucked up by devouring black-holes, never to be seen again.[১৮৯] অসম্ভব ধারণাকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না ; এবং দূর-দূরবর্তী মহাবিশ্বের যাদুময় জগতে সর্বভুক ব্ল্যাক-হোল, যা বস্তু, এমনকি আলোক রশ্মি পর্যন্ত একের পর এক গলাধঃকরণ করে চলে ও চিরতরে অস্তিত্বহীন করে দেয় – তাদেরকে প্রকৃত পক্ষেই অসম্ভব মনে হয়।

গোড়া থেকে আলোচনাটি শুরু হোক। সর্বপ্রথম ব্ল্যাক-হোলের প্রস্তাব করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জন মিচেল (John Mitchell) ও ফরাসী বিজ্ঞানী লা প্লাস (Laplace) ১৮ শতকের শেষভাগে।[১৯০] তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে, আকাশের অচেনা গহ্বরে এমন এক অস্তিত্ব থাকা সম্ভব যেখানে অভিকর্ষ বল বস্তু সমূহের চেনা আকৃতি ও আয়তনকে অতিশয় চাপ ও তাপজনিত শক্তিতে অকল্পনীয় ক্ষুদ্রাকৃতি কিংবা অদৃশ্য করে দিতে পারে। তাদের এই ধারণা সেদিন অসংখ্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল এবং সম্ভাব্য ধারণা হিসাবে তদানীন্তন বিজ্ঞানে কোন স্থানই পেল না। তারপর হতে শুরু হল নানা জল্পনা-কল্পনা। অতঃপর সময় গড়িয়ে এল আইনষ্টাইনের যুগ। মাত্র ২৬ বছর বয়সে এই বিজ্ঞান হিতৈষী জার্মান সন্তান ১৯০৫ সালে তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special Theory of Relativity) প্রকাশ করলেন এবং পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে আবার দ্বিতীয় বা General Theory of Relativity প্রকাশিত হল। আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বগুলো ব্ল্যাক-হোলের ধারণাকে সুদৃঢ় করে তুলল। তিনি এসে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে Curved space এর

www.pathagar.com

ধারণার জন্ম দিলেন এবং গাণিতিকভাবে ব্ল্যাক-হোল থাকতে পারে – এই প্রস্তাবকে সুদৃঢ় করে তুললেন[১৯১]।

১৯৩৫ সালে আজকের পৃথিবীর প্রথম সারির একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক সুব্রহ্মনীয়ম চন্দ্রশেখর লণ্ডনের এক বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতাকালে ব্ল্যাকহোলের জোর ধারণা পোষণ করে এর অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবে সেদিন প্রতিপক্ষ বিজ্ঞানীগণ তাকে পাগল বলে আখ্যা দেন। সেদিনের অন্যান্য হাস্যরসকারী বিজ্ঞানীদের সাথে স্যার আর্থার এডিংটন –এর মত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীও কিন্তু যোগদান করেছিলেন। অথচ তার মাত্র ৩৫ বছর পর পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়ে ব্ল্যাক-হোলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি এস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট উহুরু (Uhuru) কে বায়ুমণ্ডলের দূষণ এড়িয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই উহুরু সারিতে SAS -1, SAS - 2 এবং SAS-3 এই তিনটির প্রথম ও তৃতীয়টি রঞ্জনরশ্মি (X-ray) উৎস এবং অন্যটি গামা রশ্মি (gama-ray) এর উৎস নিয়ে অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধান প্রকল্পে ১৬০টি 'এক্স-রে' উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। এই 'এক্স-রে' উৎসগুলোই মূলতঃ ব্ল্যাক-হোল। সর্বপ্রথম প্রাপ্ত ব্ল্যাক-হোলের নামকরণ করা হয় সাইগনাস এক্স – ১ (Cygnus X-1)[১৯২]।

তারপর হতে বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধানে আরো বিপুলভাবে উৎসাহিত হলেন। সমস্ত পৃথিবীময় হৈ চৈ পড়ে গেল। আবিষ্কার হতে লাগল আরো অনেক নতুন ব্ল্যাক-হোল। Cygnus X-1, V 861 Scocpii, Circinus X1, GX 339-4 এর নাম ব্ল্যাক-হোল এর তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিনের স্বপ্ন-বিলাসিতা বলে উড়িয়ে দেয়া অতিশয় অবাস্তব একটি ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্য ও সঠিক বলে বিজ্ঞান প্রমাণ হাজির করল।

কি এই ব্ল্যাক-হোল ?

ব্ল্যাক-হোলের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। এ হল মহাজাগতিক বিবর্তনের একটি বিশেষ ধাপ[১৯৩]। কোন নক্ষত্রের ভর যদি কমপক্ষে সূর্যের ১০ গুণ হয় তবে সেই নক্ষত্রটি তার বিবর্তনের এক পর্যায়ে একটি ব্ল্যাক-হোল সৃষ্টি করতে পারে।[১৯৪] এই রকম একটি নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এরা সূর্যের চেয়ে অধিকতর দ্রুত হারে তাদের জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলে। এরূপ একটি নক্ষত্রের জ্বালানি সরবরাহের কাজে প্রথমে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে, পরে হিলিয়াম কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হওয়ার পর নক্ষত্রটির অভ্যন্তরে দারুন জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয় এবং আভ্যন্তরীণ ভাগ হতে বহির্মুখী চাপ অত্যন্ত নীচে নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে অভিকর্ষ

www.pathagar.com

বলের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। আভ্যন্তরীণ বহির্মুখী চাপ যতই হ্রাস পেয়ে চলে, অভিকর্ষ বল ততই মারাত্মক হতে শুরু করে। কার্যতঃ সৃষ্টি হয় মহাসংকোচনের প্রক্রিয়া। এই সংকোচন নক্ষত্রের কেন্দ্রের উপর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে সংকোচন মাত্রা এত বিশাল ও অসীম হয়ে পড়ে যে, এই সংকোচনের কেন্দ্র বিন্দুতে সৃষ্টি হয় এক মহা-বিস্তার তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রায় নক্ষত্র শিখিতে (Core) অবস্থানরত কার্বন পরিণত হয় ম্যাগনেসিয়ামে। ম্যাগনেসিয়াম-কোর আকস্মিক প্রজ্বলন প্রক্রিয়ায় তাপ ও বর্হিমুখী চাপ সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্বন শিখির স্থলাভিষিক্ত হয় এবং হিলিয়াম বা কার্বন প্রজ্জ্বলনের ন্যায় অনুরূপ 'নিউক্লিয়ার রি-এ্যাকশন' এর দ্বারা নক্ষত্রটির জন্য অভিকর্ষ বলের বিপরীতমুখী চাপ সৃষ্টি ও সমতা আনয়নের মাধ্যমে পুনরায় তার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নতুন মৌলের সৃষ্টি এবং পারমাণবিক বিক্রিয়ার পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হাজার লক্ষ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সর্বশেষ পর্যায়ে নক্ষত্র শিখিতে একদিন লৌহের মৌল সৃষ্টি হয়। লৌহ মৌল-সমৃদ্ধ শিখি তৈরী হওয়ার মধ্যদিয়ে নক্ষত্রটি তার বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। যে মুহূর্তে নক্ষত্র শিখি লৌহ মৌলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার পরে আর পূর্ব-রীতির সংকোচন, সম্প্রসারণ, নব মৌলের সৃজন ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলোর পুনরাবৃত্তির কোন সুযোগ থাকে না। এর কারণ এই যে, নক্ষত্রের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্য যে কোন মৌল শক্তি নির্গত করে ; কিন্তু লৌহ বিপরীতভাবে শক্তি নির্গত করার পরিবর্তে শক্তি শোষণ করে নেয়। নক্ষত্র শিখিতে যখন লৌহ মৌলে পূর্ণ হয়, তখন তার ভারসাম্য উত্তাপ অতিক্রত কমতে থাকে। লৌহ অবশিষ্ট তাপকে শোষণ করে নেয় এবং কোন প্রকার তাপ শক্তিকে নির্গত হতে দেয় না। এক পর্যায়ে অভিকর্ষ বলের মহা-সংকোচনের বিপরীতমুখী কোন কার্যক্ষম আভ্যন্তরীণ বলই থাকে না যা নক্ষত্রের দেহকে অভিকর্ষের ধ্বংসাত্মক চাপ হতে রক্ষা করতে সমর্থ। তখন শুরু হয় অভিকর্ষ-সংকোচনের ফলে এক অচিন্তনীয় ধ্বংস লীলা। সমস্ত নক্ষত্রটির বাইরের অংশসমূহ অতিশয় তীব্র ভর-বেগে নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই ধ্বংসে পতনকে প্রতিরোধ করার জন্য আর পূর্বের মত কোন বিক্রিয়া ঘটে না। শিখিতে লৌহ-মৌলের উপস্থিতির কারণে নক্ষত্রকেন্দ্রে এই চাপ হয় ইতিঃপূর্বে যে কোন পর্যায়ের তুলনায় অতিশয় বিপুল। সেখানে সৃষ্টি হয় এক পদার্থ-ভোজী কূপ। বাইরের স্তরসমূহ তীব্রবেগে ধাবিত হয় এই কূপের দিকে। পদার্থের এই ধ্বংসে পতনের মাত্রা এত তীব্র হয় যে, অভিকর্ষ বলের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয় এক মারাত্মক তাপমাত্রা যা পূর্বোক্ত নক্ষত্র শিখি গলন প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন ও অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই তাৎক্ষণিক তাপমাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হল মহাবিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ এত ভয়ঙ্কর যে নক্ষত্রের বাইরের অংশ টুকরো টুকরো হয়ে মহাশূন্যের অসীম গহ্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অতি দূর দূরান্তে হারিয়ে যায়। উৎপন্ন শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয় এক মহাবিপুল-বিস্তার (greatly wide range) মৌলিক ও যৌগিক বস্তুকণা। কিন্তু অবশিষ্ট থেকে যায়

www.pathagar.com

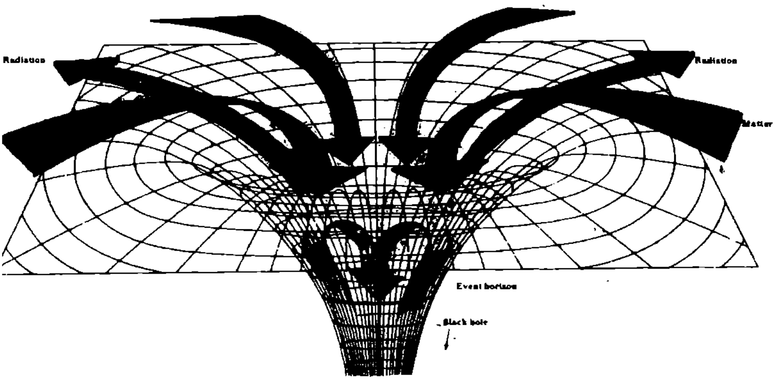

ব্ল্যাকহোল জিয়োমেট্রি

অতিশয় ঘনত্ব ও অস্বাভাবিক গুণাগুণ সম্পন্ন ছোট নক্ষত্র শিখিটি। উহা পরিণত হয় একটি নিউট্রন-ষ্টার বা পালসারে ; কিংবা কোন মহাজাগতিক দৃশ্য বস্তুতে পরিণত না হয়ে শিখির অবশিষ্টাংশ বিস্ফোরণের অতিশয় চাপজনিত মহাসংকোচনের ফলে অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। এই সংকোচন বিন্দুতেই সৃষ্টি হয় একটি ব্ল্যাক-হোল[১৯৫]। একটি ব্ল্যাক-হোল সৃষ্টি হবার জন্য জরুরী শর্ত হল যে এর মুক্তি-গতি (escape velocity) কমপক্ষে আলোর গতির সমান হওয়া চাই। অর্থাৎ কোন বস্তু যদি এর আওতায় পতিত হয় – তবে তাকে মুক্ত হবার জন্য কমপক্ষে আলোর গতির চাইতে বেশী গতিসম্পন্ন হতে হবে। অকল্পনীয় ঘনত্বের এই ব্ল্যাক-হোলে বস্তু পতনের সাথে সাথে তার দৃশ্য অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং শেষ পর্যায়ে তা চরম ঘনত্ব-সম্পন্ন আয়তন লাভ করবে। আমাদের এই বিশাল পৃথিবী কিংবা তার সমভর সম্পন্ন আয়তনের অপর একটি বস্তুকে যদি এই ব্ল্যাক-হোলে পতিত হতে দেয়া যায়, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে এক অসীম শক্তি সংকোচনের ফলশ্রুতিতে এমন একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডে পরিণত হবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র ১ সেন্টিমিটার। একটি দানবীয় ব্ল্যাক-হোলের আয়তন আমাদের সৌরজগতের আয়তনের সমান হতে পারে যার পদার্থ ধারণা ক্ষমতা শত লক্ষ কোটি সূর্যের ভরের সমান[১৯৬]।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হল কি এই ব্ল্যাক-হোলের প্রকৃতি এবং কি করে এর এই অতিকায় ভোজ্য ক্ষমতা জন্মায়, কেনইবা একে ব্ল্যাক-হোল বলা হয় আর কোন বিশেষত্ব নিয়েই বা এই প্রবন্ধে তার আলোচনা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রাপ্তির মাঝেই মূলতঃ এ আলোচনার সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

যুগ্ম-নক্ষত্র-ব্যবস্থা (binary system), কিংবা গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলে ব্ল্যাক-হোলের উৎপত্তি ঘটে থাকে। এর কল্পনাতীত অভিকর্ষের টানে আশেপাশের নক্ষত্রসমূহের গ্যাস কিংবা আন্তঃনাক্ষত্রিক পদার্থসমূহ ব্ল্যাক-হোলের মৃত্যু-চোঙ-এ পতিত হয়। প্রকৃত ব্ল্যাক-হোল কখনোই দেখা যায় না, এর চারপাশের ধারকে Schwarzschild horizon বা event horizon বলে। আকর্ষিত বস্তু কখনোই ব্ল্যাক-হোলে সরাসরি পতিত হয় না, বস্তুর পতন সকল সময়েই এই ধারে বা event horizon এ হয়ে থাকে। 'ইভেন্ট-হরাইজনে' পতিত হবার সাথে সাথেই কেন্দ্রাভিমুখী গতির দ্বারা তাড়িত ও চাপে নিষ্পেষিত হয়ে বস্তুকণা এত উত্তপ্ত হয় যে, তা রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) বিমুক্ত করে। এক সময় কৌণিক ঘূর্ণি বস্তুকে ব্ল্যাক-হোলে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য করে। কেবল ব্ল্যাক-হোলের চারপাশের ইভেন্ট হরাইজন থেকে মুক্ত এক্স-রে এর অস্তিত্ব হতেই ব্ল্যাক-হোলের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়।

ব্ল্যাক-হোল যে প্রক্রিয়ায় তার আশেপাশের নক্ষত্রসমূহকে নিঃশেষে জঠরস্থ করে, সে সম্পর্কে Ian Ridpath আমাদেরকে জানায়, The Black-hole would grow by the influx of material ..... at which stage, gravity would tear appart nearby stars and then suck in the gas. Such a massive black-hole swallowing matter (stars and other interstellar matters) at the heart of our galaxy[১৯৭] ..... বস্তুসমূহের পতনপাত হতে বৃদ্ধি পাওয়া এই ব্ল্যাক-হোল এক পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রদেরকে টেনে, ছিঁড়ে এনে গলাধঃকরণ করে ফেলে। প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রভাগে অনুরূপ নক্ষত্র ও আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু ভোজনকারী ব্ল্যাক-হোল রয়েছে। অনুরূপ ব্যাখ্যা রেখেছেন Geoffrey Bath ....'some are so massive that they collapse under the force of their own gravity into super dense black-holes, swallowing matters swept from any neighbouring stars[১৯৮] পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রদের ভোজন করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করবার চিত্রটির সংগে পরিচিত হবার সাথে সাথে আমরা তাও অবগত হই যে, ব্ল্যাক-হোল নক্ষত্রসমূহ ধ্বংস করে, শোষণকৃত নক্ষত্র বা আন্ত নাক্ষত্রিক বস্তুকে অস্তিত্বের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। নক্ষত্র জীবন বিবর্তন লব্ধ জ্ঞান হতে আরো অবগত হই যে, নক্ষত্রসমূহের সজীব অস্তিত্ব হতে তাদেরকে ধ্বংস করবার উপায়, এই ব্ল্যাক-হোল ভিন্ন আর একটিও নেই। উপরে এইটুকু বর্ণনার পর আমরা আল-কোরআনের পাতায় ফিরে আসতে চাই।

www.pathagar.com

সূরা নম্বর ৫৬ এর ৭৫, ৭৬ নম্বর আয়াতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্ তাঁর বাণীতে এক অতিশয় গুরুগম্ভীর শপথ উচ্চারণ করেছেন – "শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (৫৬ঃ৭৫)। যদি তোমরা জানিতে, উহা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ" (৫৬ঃ৭৬)।

বাজারে প্রাপ্ত অধিকাংশ তরজমা ও তফসিরে আপনি ৫৬ঃ৭৫ আয়াতের বিভিন্ন অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাবেন। ব্যবহৃত শব্দ 'মাওয়াকিয়ি' (موقع) –এর অর্থ অস্তাচল কিংবা অস্ত যাওয়ার সময় বলে ধরে নেয়া হয়েছে (যেমন ঃ যখন নক্ষত্রসমূহ অস্ত গমন করে কিংবা যেখানে নক্ষত্রসমূহ অস্ত যায়) কিন্তু এই অর্থগুলো মহাজাগতিক রীতিনীতি ও প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। মহাজাগতিক বস্তু ও তাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যিনি সামান্য জ্ঞানও রাখেন, তিনি নিশ্চিতই অনুভব করবেন যে, মহাবিশ্বের কোথাও নক্ষত্রসমূহের অস্তগমনের সম্ভাবনা নেই , কিংবা যে অর্থে অস্তাচলের ব্যবহার হয়ে থাকে সে অর্থের কোন অস্তাচল কোথাও নেই যার আড়ালে নক্ষত্র সমূহ অস্তগমন করবে। প্রণিধানযোগ্য যে, 'ওয়াকায়া' (وقع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ধ্বংস হওয়া, ধ্বংসের টানে পতিত হওয়া, বিস্ফোরিত হওয়া (Collapse to run into mishap, calamity, to blow, to fall)[১১১] । এটি একটি ক্রিয়াপদ এবং আরবী ব্যাকরণ রীতি অনুযায়ী কোন ক্রিয়া পদের পূর্বে জবরযুক্ত মীম (مَ) সংযুক্ত হলে তা ক্রিয়াপদের স্থান বা কালকে প্রতিভাত করে। 'ওয়াকায়া' (وقع) এর অর্থ অস্তগমন বা অস্তাচল অর্থে অভিধানের কোথাও নেই। শব্দটি মূলতঃ ধ্বংসের প্রস্তাব করে এবং একই নামকরণের অধীন এই সূরাটিকে আমরা আল-কোরআনে ধ্বংস বিষয়ক প্রস্তাব ও ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হতে দেখতে পাই। অতএব, অতিশয় যুক্তিযুক্ত কারণেই 'মাওয়াকিয়ি' এর অর্থ অস্তাচল, অস্তগমনের সময় ইত্যাদির স্থলে ধ্বংসের স্থান বা সময় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মহা জগতের বিশাল অংগনে নক্ষত্রদের ধ্বংসের স্থান ব্ল্যাক-হোলের সংগে আমরা পরিচিত – কিন্তু এর নির্দিষ্ট কোন সময়মিতি নেই। অতএব, 'মাওয়াকিয়ি' এর শুধু মাত্র একটি অর্থই গ্রহণযোগ্য যা হল, ধ্বংসের স্থান ; আর এভাবে ৫৬ঃ৭৫ আয়াতের অর্থ অবশ্যই এই হতে হবে যে, – শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়" কিংবা "শপথ সেই স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে"। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার জ্ঞানে শুধুমাত্র এই ব্ল্যাক-হোলকেই চিহ্নিত করতে পেরেছে যেখানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয় ও ধ্বংসলাভ করে। তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি কি যে, আমরা যাকে ব্ল্যাক-হোল বলে থাকি, সেই জ্ঞানটি সম্পর্কে কোরআন মনীষা অবগত রয়েছেন এবং তাই তিনি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর শপথ বাক্যে

www.pathagar.com

মানুষকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন এমনিভাবে, যেন মানুষ তা অবগত হয় এবং কোরআনের সত্যতা ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

ক্ষুদ্র একটি ব্ল্যাক–হোল একটি অতিকায় নক্ষত্রকে গলাধঃকরণ করে ফেলছে। আমাদের পৃথিবী এমন একটি ব্ল্যাক–হোলে পতিত হলে তা ১ সেঃ মিঃ ব্যসার্ধ সম্পন্ন একটি অতিঘন বস্তু–পিন্ডে পরিণত হবে। মূল ব্ল্যাক–হোল চিরদিনই অদৃশ্য।

www.pathagar.com

কোন বিরুদ্ধবাদী যদি প্রশ্ন করেন – প্রমাণ কি যে কোরআন মনীষা একেবারে ব্ল্যাক-হোলের কথাই বলেছেন? প্রকৃতপক্ষে ৫৬:৭৫ আয়াতই যথেষ্ট যা অতিশয় সার্থকভাবে ব্ল্যাক-হোলকে তুলে ধরে। কিন্তু মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্ তাঁর এই তথ্য প্রদানের বিষয়টিকে সুদৃঢ় করতঃ ব্ল্যাক-হোলের চিত্র প্রদান করতে আরো একটি বিশুদ্ধতার ব্যবস্থা এঁটে দিয়েছেন পরবর্তী আয়াতে যেন কোন ছিদ্রান্বেষী কর্তৃক আয়াতের ভাষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হয়। ৫৬:৭৫ আয়াতের ব্যবহৃত শব্দ 'লাওতায়লামুন' (لو تعلمون) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরবী রীতিতে 'যদি' অর্থ প্রকাশের জন্য যখন 'লাও' (لو) অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়, তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটির কর্তা/কর্তাগণের সাধ্যের সকল সম্ভাব্যতাকে নাচক করে দেয়। অর্থ্যাৎ লাও শব্দাংশটি একটি চির সম্ভাবনাহীনতার অর্থ প্রকাশ করে। "যদি তোমরা জানিতে – উহা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ"; এই বাণী প্রকারান্তরে বিষয়টি মানুষের জানার সাধ্য ও সামর্থের নাগালের বাইরে পড়ে থাকবে চিরদিন, – এমনি তথ্য আমাদের প্রদান করে যায়। আপনি হয়ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন যে, ব্ল্যাক-হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানও ঠিক অনুরূপ জ্ঞান আমাদেরকে প্রদান করে থাকে। ব্ল্যাক-হোলের নামকরণেই এর গুণাগুণ প্রকাশ পায়। এর অভিকর্ষ টানের তীব্রতা এতই বিশাল যে, ব্ল্যাক-হোল হতে কোন তথ্যই প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। অভিকর্ষ বল নির্গত আলোক অর্থাৎ ফোটন কণাগুলোকেও শোষণ করে ফেলে। ফলতঃ কোন আলোকরশ্মি পর্যন্ত এই মৃত্যুকূপ হতে বেরিয়ে আসতে পারে না। আর আলোক রশ্মি না আসতে পারার অর্থই হল যে, তা থেকে কোন তথ্যই পাবার সম্ভাবনা নেই। I. Novikov, USSR Academy of science এর Space Research Institute প্রধান এ সম্পর্কে বলেছেন, ... absolutely no information passes out of black-hole and that is why it is black.[২০০] " আমরা কখনো জানতে পারব না প্রকৃত ব্ল্যাক-হোলটি কেমন, কি ঘটে যখন ব্ল্যাক-হোলে বস্তু পতিত হয় এবং কি করে তা পরিশেষে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় ও নিঃশেষ হয়ে পড়ে" ।[২০১]

What is inside a black-hole ? It is impossible to tell. You will never be able to see inside a black-hole and you can never know -[২০২] তুমি কখনো তার অভ্যন্তরটি দেখতে পাবে না – এমনকি তুমি কখনো জানতেও পারবে না। ব্ল্যাক-হোলে কি হয় তা বলা একেবারে অসম্ভব। সুপ্রিয় পাঠক, আপনার অনুভব ও সত্য গ্রহণকে জাগ্রত করুন। বিজ্ঞানের ও কোরআনের তত্ত্ব প্রকাশের এই নিখুঁত মাত্রার মিলটি কিন্তু আমাদেরকে বলে যায় – "এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের আহ্বান করে তাহা মিথ্যা" (৩১:৩০)।

শুধু কি তাই?

www.pathagar.com

ব্ল্যাক-হোলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়ারও একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় আল-কোরআনে মহান আল্লাহর বাণীতে। আমরা জানি ব্ল্যাক-হোলে বস্তু পতিত হওয়া মাত্র তা অতিশয় চাপে সংকুচিত হতে হতে দৃশ্য অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। পূর্বেই বলেছি, আমাদের এত বড় পৃথিবীকে যদি এই মৃত্যুকূপে ফেলে দেয়া যায়, – তা পরিণত হয়ে যাবে একটি অতিশয় ছোট পিণ্ডে যার ব্যাসার্ধ মাত্র ১ সেঃ মিঃ। এমনি একটা আনুপাতিক ধারণার প্রস্তাব করেছে আল-কোরআন তার ৭ ঃ ৪০ আয়াতে, " তাহারা জান্নাতে (পুরস্কারস্বরূপ সুখময় আবাস) প্রবেশ করিতে পারিবেনা, যতক্ষণ না উট সূঁই -এর ছিদ্রপথে প্রবেশ করে।" এই রূপক ধারণা প্রস্তাবে পাপীদের স্বর্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি দু'টি ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে বিশ্বাস প্রত্যাবর্তনকারীদের স্বর্গ প্রাপ্তি ও মুক্তিলাভের বিষয়টি যা এক অতিশয় কষ্টকর পরিণতির নামান্তর, এবং একটি বিশাল উটের সূঁই এর ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হতে পারার সম্ভাবনার বিষয়টি। আপনারা অবগত রয়েছেন যে, এদেশের মানুষের অভিজ্ঞতায় হাতী যেমন সর্ববৃহৎ জীব, তেমনি আরববাসিগণের কাছে উট হল সর্ববৃহৎ প্রাণী, যার অপর নাম -মরুভূমির জাহাজ। অপরপক্ষে একটি সূঁই -এর ছিদ্রপথ একটি উটের দেহের আকৃতির লক্ষ/কোটি ভাগের এক ভাগ। এমনি একটা বিপুল দেহী উটের একটি অতিশয় ক্ষুদ্র সূঁইয়ের ছিদ্র পথে ঢুকতে পারার সম্ভাবনার কথা বর্তমান শতাব্দীর সত্তর দশকের পূর্বে বিজ্ঞান কোন দিনও কল্পনা করেনি। মূলতঃ এই ধারণাটি যে ব্ল্যাক-হোলের ধারণারই সমানুপাতিক – তা তর্কের উর্ধ্বে এবং সকলভাবেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল – এই সম্ভাবনার বাণী কি করে প্রস্তাবিত হয়েছিল আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে? ব্ল্যাক-হোল এর ভাবনা শুরুর পূর্বে বস্তুর সংকোচন জনিত কারণে আয়তনের এত বিপুল হ্রাস প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা ঘুণাক্ষরেও মানুষ জাতি ভেবেছে , তা ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই। আর এমনি একটা অতিশয় অস্বাভাবিক ভাবনাকে নিতান্ত স্বাভাবিকতায় বর্ণিত হতে দেখে আমরা বিস্মিত হই। আল-কোরআনের কোন বর্ণনায় কোথাও কোন অসংগতি নেই। অথচ ৭ঃ৪০ আয়াতের প্রস্তাবিত ধারণা সহসা আমাদের সকল মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়; ৫৬ নম্বর সুরায় বর্ণিত দু'টি আয়াতের সংগে মিলিয়ে যখন আমরা পাঠ করি – তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, কোরআন ব্ল্যাক-হোলের প্রস্তাবকেই উল্লিখিত ৩টি আয়াতে এমনভাবে তুলে ধরেছে যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্থক বর্ণনা আর এমনিভাবে কোরআন মাত্র অল্প কয়েকটি শব্দে ব্ল্যাক-হোলের প্রধান চরিত্র গুলো সঠিক ভাবে ব্যক্ত করে আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। তখন আরো একবার প্রমাণিত হয় যে, – "আল্লাহ্ গগন মণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ অবগত রহিয়াছেন" (৪৯ঃ১৮)। তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁহার বাক্য কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রহিয়াছেন" (৬ঃ১১৫)।

www.pathagar.com

সুপ্রিয় পাঠক, আপনার অবাক হবার বিষয়টি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ব্ল্যাক-হোলের সূত্র ধরে চলুন আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যাই ও কোরআনের আরো একটি অনন্য বাণীর সত্যতা হাতেনাতে পরীক্ষা করি। ব্ল্যাক-হোল সম্পর্কিত গবেষণায় বিজ্ঞান জগতে যাদের নাম সর্বাগ্রে গণ্য – তাদের পুরোধায় হলেন ইংল্যাণ্ডের স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking)। শুরু হতেই পঙ্গুত্বে ভুগছেন এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অথচ তার ধারণা এত নিখুঁত ও স্বচ্ছ যে তিনি আজ আকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। তিনি দেখিয়েছেন – যদিও ব্ল্যাক-হোল থেকে আলোক রশ্মি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না, তথাপি বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে এর মধ্য হতে মৌলিক কণিকাগুলো রূপান্তরের ফলে এক বিকিরণের সৃষ্টি করতে পারে যারা ব্ল্যাক-হোল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সমর্থ। বিজ্ঞানের ভাষায় এর পরিচয় 'হকিং বিকিরণ' (Hawking Radiation)। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে, – ব্ল্যাক-হোলের ধীরে ধীরে উবে যাওয়া। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে লক্ষ কোটি বছরের। সবশেষে এক একটা গামা রশ্মির বিকিরণের ঝলকের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে ব্ল্যাক-হোল ও তার অপরিমেয় বস্তুভর শূন্য বা সম্পূর্ণ বিলয় অর্থে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। বস্তু অবিনাশী – এই তত্ত্বটি আর গ্রহণযোগ্য থাকে না এই জ্ঞানটি আমাদের কাছে চলে আসার পর। বস্তুর বিনাশ, "শূন্য অস্তিত্বের মাত্রায়" প্রমাণিত হবার পর আরো একতরফা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, – "ইহার উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তুই লয়শীল (৫৫ঃ২৬)। আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত সমস্ত কিছুই নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে (২৮ঃ৮৮)। শুধু তোমার সম্মানিত প্রভুর সত্তা লয়হীন ও অনন্তস্থায়ী" (৫৫ঃ২৭)।

জ্ঞানী পাঠকের কাছে একটি ক্ষুদ্র যুক্তির বিষয়কে পেশ করতে চাই। একজন ইতিহাস স্বীকৃত নিরক্ষর আরব 'উম্মীর' প্রস্তাবে আল্লাহ নামক এক অদৃশ্য সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ বলে দাবীকৃত একটি গ্রন্থ – 'আল-কোরআন', আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এমন এক পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল যার অজ্ঞানতার মাত্রা আজকের সভ্যজনের অনুভবে ভয়ার্ত শিহরণ আনে। সে সময়ের অবতীর্ণ গ্রন্থ কোরআন সে যুগের উপযোগিতায় যেমন কার্যোপযোগী ছিল, তার ১৪০০ বছর পর তার চাইতে শত সহস্র গুণ উন্নততর পৃথিবীতে তেমনভাবে যুগ ও চাহিদার সংগে তাল মিলিয়ে তার উপযোগিতা রক্ষা করে চলেছে বিস্ময়করভাবে। শুধু তাই নয়, আজকের দুনিয়ায় সর্বশেষ হতবুদ্ধিকর আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে এমন অভাবিত তথ্য প্রদান করছে, যা বিজ্ঞানের কল্পনাতীত সূক্ষ্মতার কষ্টিপাথরে যাচিত হওয়ার পর যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তাতে মনে হয়, সূক্ষ্ম গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান যেন কোরআনের কাছে মাথা হেট করে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। যুগের জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা দিয়ে যাচাইকৃত এই গ্রন্থের প্রকাশমান এতই নিখুঁত যে, সামান্য পরিমাণ দ্বন্দ্ব বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। সেই গ্রন্থটি সমগ্র পৃথিবীর মানবকূলকে বিগত ১৪০০ বছর ধরে

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে – দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কখনও কোন অসংগতি দেখিতে পাইবে না। তোমরা সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেখ, তেমন কিছু (অসংগতি) দেখিতে পাইয়াছ কি? অতঃপর আবারও তোমার দৃষ্টিকে নিক্ষিপ্ত কর এবং আবারও। তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করিবে আহত, ব্যথিত, ক্লান্ত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়ে" (৬৭ঃ৩)। আজ পর্যন্ত যে মহাগ্রন্থের একটি অক্ষর বা শব্দের কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি – কি হতে পারে তার অর্থ? কত অপূর্ব যে বিগত ১৪০০ বছর ধরে এ সত্য রক্ষিত হয়ে চলছে, – "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই – ইহা এক মহা সাফল্য।" (১০ঃ৬৪)।

" ওহে মানুষ! তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে এক সনদ ; এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি (৪ঃ১৭৪)। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহা নির্দেশ ও করুণা (৭ঃ২০৩)। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই (২ঃ২৫৫), আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন উপাস্য নাই। যদি থাকিত, তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। এই সম্পর্কে উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ্ অতিশয় পবিত্র (২৩ঃ৯১)। সুতরাং আল্লাহর কোন সাদৃশ্য সৃষ্টি করিও না (১৬ঃ৭৪)। করিলে পরিণামে নিন্দিত ও অসহায় হইয়া পড়িবে (১৬ঃ২২)। নিশ্চয়ই আমি আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করিতেছি। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ সেদিন শুধু বলিবে, হায়! আমরা যদি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতাম" (৭৮ঃ৪০)।

---

১৮৯ । National Geographic VOL - 145 No 5 May '74.
১৯০ । The Cambridge Atlas of Astronomy.
১৯১ । The Edge of Eternity - John Gribbin.
১৯২ । Hamlyn Encyclopedia of Space - Ian Ridpath.
১৯৩ । Micropaedia, The Encyclopedia Britannica.
১৯৪ । The World Reference Encyclopedia-Foreworded by Professor J.K Galbraith.
১৯৫ । Hamlyn Encyclopedia of Space.
১৯৬ । The Cambridge Atlas of Astronomy.
১৯৭ । Stars and Planets.
১৯৮ । The Life and Death of Stars.
১৯৯ । Modern Dictionary Arabic English - Elias A Elias & ED.E.Elias.
২০০ । Science in USSR Vol - 3, 1988.
২০১ । জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দেশ, ২৩ জুলাই ১৯৮৮।
২০২ । National Geographic Vol - 145 No 5 May 1974.

www.pathagar.com

১২
'কসমিক স্ট্রীং বা মহাজাগতিক তার

'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানুষ তার প্রয়োজনে নিয়োজিত করেছে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা বা 'ইন্ট্রাএ্যাটমিক পারটিক্যাল যাকে দেখা যায় না, আল্ট্রা সাউন্ড যা শোনা যায় না, আল্ট্রাস্পীড যা অনুভব করা সম্ভব নয়, অস্তিত্বহীন এমন অনেক কিছুই এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে'।[২০৩] আজকের কোন বিজ্ঞান পুস্তিকার পাতা উল্টালেই আপনার চোখে পড়বে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক কিংবা বস্তুর কথা। অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তথ্য প্রমাণের সাথে আজ বিজ্ঞানীরা আমাদের জানায় যে, মহাজগতে মোট যত প্রকার রশ্মি রয়েছে তার ১% ভাগেরও কম আলোক রশ্মি আমরা দেখতে পাই , বাকী ৯৯% ভাগের বেশী আলোক সর্বদা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে।[২০৪] এদের মধ্য হতে অতি পরিচিত কয়েকটি উদাহরণ হতে পারে আল্ট্রা ভায়োলেট-রে , এক্স-রে , ইনফ্রারেড-রে লেসার-রে ইত্যাদি। শতাব্দীর শেষার্ধে জ্যোতির্বিদ্যার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে , তা বিস্ময়কর । নতুন আবিষ্কারের সাফল্য মানুষের জন্য বয়ে আনছে প্রসারিত জ্ঞান ও বিস্ময়কর তথ্যসমূহ। অনাদিকাল হতে মানুষ আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহের পরিচয় পেয়ে আসছে দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে। এই দৃশ্য আলোক বিস্তৃত তড়িৎ-চুম্বক বর্ণালী (Broad electromageatic spectrum) এর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে অবস্থান করে মাত্র। বাকী সুবিশাল ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলো অদৃশ্য আলোকের ছটায় গঠিত। দৃশ্য আলোকের বাইরের যে সুবিশাল আলোর অস্তিত্ব রয়েছে , তা জানার জন্য বিজ্ঞানকে অনেক কিছু আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানুষ কয়েক দশক আগে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার সুযোগ লাভ করে মাত্র। স্পেকট্রস্কোপি বা বর্ণালীবীক্ষণ বিদ্যার অগ্রগতির ফলে মানুষ জানতে পেরেছে যে, মহাকাশের অসংখ্য অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক রয়েছে যারা অবিরাম নানা রকম আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলছে প্রতিক্ষণ। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েক কিলোমিটার হতে শুরু করে এক সেন্টিমিটারের হাজার কোটি ভাগের চেয়েও কম হতে পারে। এই বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে যে সকল আলোর বিকিরণ দৈর্ঘ্য ০·৪ থেকে ০·৭ মাইক্রন[২০৫] এর মধ্যে, শুধু সেই টুকুই আমাদের চোখে দৃশ্য আলোকের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম।

আমরা সকলেই জানি , মহাজগৎ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। প্রায়

www.pathagar.com

সকল ধর্মই তাদের উপাস্যের প্রতিকৃতি তৈরি করে তার অর্চনা করত এবং এখনো তা করা হয়। যখন পৌত্তলিকতার চরম উৎকর্ষ যুগ, সে যুগে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয় আল-কোরআন। এই কোরআন সর্বপ্রথম জগৎবাসীর জ্ঞানের কাছে অদৃশ্যবাদের যে ধারণাকে প্রস্তাব করে তাতে মুত্তাকিনদের স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে বলা হয় – 'যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস' করে (২ঃ৩)। আকাশ শব্দটির সংগে অদৃশ্য জ্ঞানের সংযোগ এত বেশী প্রকটভাবে আল-কোরআনে স্থান পেয়েছে যে, তা অতি সহজভাবে চোখে পড়ে। আপনাদের অনুভবের সামনে আমি এ সম্পর্কে কোরআনের গুটিকয়েক আয়াত তুলে ধরছি ঃ –

ক। "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই (১৬ঃ৭৭)।

খ। বল আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না।(২৭ঃ৬৫)।

গ। অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু তাঁহারই , তাঁহার জ্ঞানের উপর অন্য কাহারো কোন প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নাই (৭২ঃ২৬)।

ঘ। বল তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাহ যাহা তিনি অবগত নহেন ? নিশ্চই তিনি (অজ্ঞানতা হইতে) অতি পবিত্র" (১০ঃ১৮)।

আকাশের সাথে অদৃশ্যের সম্পর্ক নির্ণেয়ক বহু আয়াত রয়েছে যাদেরকে কোরআনের পাতায় ঘুরেফিরে আসতে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কোরআন অবতীর্ন হবার সময়কালে এবং তার পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ অদৃশ্যের কোন অস্তিত্বকে বিশ্বাস করত না এবং সে সময়ে আকাশে অদৃশ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে – এমনি একটা ধারণাও ছিল হাস্যকর। ফলত 'যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে' – আল-কোরআনের এই জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব সেদিন পৌত্তলিকদের ও অবিশ্বাসীদের কাছে পরিণত হয়েছিল এক চরম ভ্রান্ত ও উদ্ভট কল্পনা হিসাবে। অথচ আজ বিজ্ঞান শুধু সগর্বে স্বীকারই করছে না – সনদও দিচ্ছে যে, The non existent has become a reality. অদৃশ্যের বিষয়বস্তু আজ বাস্তব হয়ে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞান যেমন জানতে পেরেছে যে ৯৯% ভাগের বেশী আলোক রশ্মিই অদৃশ্য, তেমনি রয়েছে এক বিপুল বিস্তার অদৃশ্য পদার্থ ভর। মানুষের স্বল্প পরিসরের দৃষ্টি ক্ষমতা সে সকল অদৃশ্য পদার্থকে কখনো খুঁজে পাবে না । অথচ তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সত্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা আর এ সম্পর্কে সামান্য

www.pathagar.com

সন্দেহের অবকাশ রাখেন না। শুধু দৃশ্য জগতের ব্যপকতাই এতটুকু যে তার সীমা পরিসীমা নেই। অথচ অদৃশ্য জগতের তুলনায় সেও সসীম। ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে এবং আবারও বলছি, যে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হতে আলোক রশ্মি আমাদের চোখে এসে পৌছাতে পারে – সে আলোক–উৎসসমূহকে আমরা দেখতে পাই এবং সর্বশেষ যে অঞ্চল হতে আলোক রশ্মি লাখো কোটি বছরের যাত্রাপথ অতিক্রম করে আমাদের চোখে এসে পৌছাতে পারে, সেই সীমারেখা পর্যন্ত হল দৃশ্যজগতের পরিব্যাপ্তি। হাবেলের আবিষ্কারের পর মানুষ যে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কথা অবগত হল, তাতে দেখা যায় – গ্যালাক্সিসমূহ হাজার মাইল/সেকেন্ড বেগে সরে যাচ্ছে সম্প্রসারণের নেশায়। 3c-295 এই জ্যোতিষ্ক প্রতিমুহূর্তে ৯০,০০০ মাইল বেগে হারিয়ে যাচ্ছে অজানার পথে। হাবেল–স্লিফেংকের হিসাবে দেখা যায়, যেহেতু সম্প্রসারণের নীতিতে দূরত্বের সাথে সাথে গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেহেতু কোন গ্যালাক্সি যে মুহূর্তে ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতি লাভ করবে, সেই মুহূর্ত হতে কোন আলোক আর সে গ্যালাক্সি হতে আমাদের উদ্দেশ্যে ছুটে আসবে না। বিজ্ঞানীগণ একে দৃশ্যজগতের সর্বশেষ সীমারেখা মনে করেন। এই সীমারেখা আমাদের অবস্থান হতে ১১শ কোটি আলোকবর্ষ (১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) দূরে। তারপর কি আছে ? হয়ত আমরা যত গ্যালাক্সির হিসাব জানি তার চাইতে অধিকসংখ্যক গ্যালাক্সি এবং তারও পরে আরো অধিক এবং আরো – কিন্তু আমরা তা কখনোই জানতে সক্ষম হব না।[২০৬] এ পর্যন্ত জানা মহাবিশ্বের সর্বশেষ দূরবর্তী জ্যোতিষ্কের একটি OQ-172, ১৯৭৩ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। আমাদের অবস্থান হতে এই কোয়াসারটি ১০ বিলিয়ন বা ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থান করে। প্রতি সেকেন্ডে কোন যন্ত্রযান যদি ১,৮৬,০০০ মাইল (৩,০০,০০০ কিঃ মিঃ) বেগে চলতে থাকে তবে সেই যানে চড়ে সেই জ্যোতিষ্ক হতে কেউ পৃথিবীতে আসতে চাইলে তার প্রয়োজন হবে হাজার কোটি বছর। এই রহস্যময় জ্যোতিষ্ক সৌরজগতের আয়তনের তুলনায় মাত্র কয়েক গুণ বড় আকারের হওয়া সত্ত্বেও এদের একটি যে পরিমাণ শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটায়, তার পরিমাণ একশত গড় গ্যালাক্সির সম্মিলিত শক্তির সমান। অন্যভাবে ১০ হাজার বিলিয়ন (লক্ষ কোটি) সূর্যকে একত্র করলে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তার সমান।[২০৭] জানা সর্বপ্রান্তিক কোয়াসারের ব্যাপ্তিসীমা পর্যন্ত রয়েছে 10^9 বা ১,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক দৃশ্য গ্যালাক্সি। প্রতিটি গড় গ্যালাক্সির ব্যাস ১০০,০০০ আলোক বৎসর। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড় নক্ষত্র সংখ্যা ১০০ বিলিয়ন বা দশ হাজার কোটি।[২০৮] সূর্য একটি গড় নক্ষত্র যা পৃথিবীর চাইতে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবীর ভরকে অঙ্কে প্রকাশ করলে এর মান দাঁড়ায় $6X10^{24}$ কেজি বা ছয় কোটি কোটি টন।[২০৯] এই তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করে আমরা মহাবিশ্বের দৃশ্য বস্তুদের একটা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ওজন পেতে পারি। এই পরিমাণ বস্তুভর যে কত অকল্পনীয়ভাবে বিশাল হতে পারে, তা আপনি চূড়ান্ত প্রচেষ্টায়ও অনুভব করতে ব্যর্থ হবেন। এমন একটি সংখ্যার মান ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব

www.pathagar.com

ব্যাপার। আর এমনি একটি অসীম বস্তুভর মহাবিশ্বের হিসাবের পরিমাণে কতদূর জানেন কি ? শতাব্দীর শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন তা দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুভরের মোট পরিমাণের মাত্র দশ ভাগের চেয়েও কম। অর্থাৎ ৯০ ভাগের চাইতে বেশী পরিমাণ বস্তুই অদৃশ্য ।[২১০] মানুষের চোখে এই পদার্থ কখনো দেখা সম্ভব নয়।

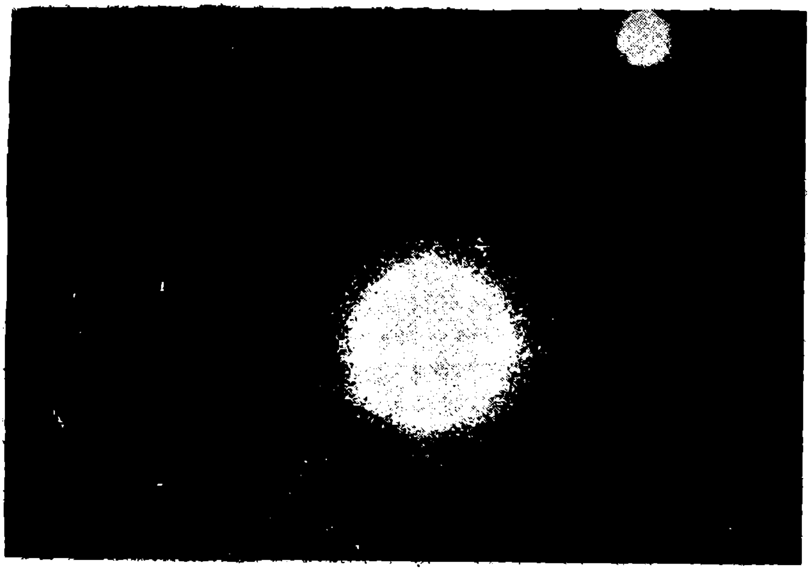

OQ-172 কোয়াসারটি হলো সর্ব দূরবর্তী অজানা জগতে আলোর বর্তীকা; এর ঔজ্জ্বল্য সূর্য হতে ১০,০০০ মহাপদ্ম গুণ বেশী। আমাদের অবস্থান হতে এই কোয়াসার প্রায় ১১ শত কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মহাচিহ্ন হয়ে কে জানে এই বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক কোন মহা আবিষ্কারের পথ সূচনা করবে?

দৃশ্য জগতের তুলনায় অদৃশ্যজগৎ যে কত সুবিশাল, বিজ্ঞানীরা তা এখনো পরিপূর্ণভাবে অনুমান করতে সক্ষম হয়নি, তবে এ বিষয়টি এখন অনুমান করা হয় যে, সমস্ত পৃথিবীকে যদি একটি একক মহাসমুদ্র কল্পনা করা হয়, আর এই একক মহাসমুদ্রটি যদি হয় সমস্ত সৃষ্টির (দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়) প্রতীক, আর সেই সুবিশাল মহাসমুদ্রে যদি একটি অতিশয় নগণ্য ক্ষুদ্রাকৃতির দ্বীপ থাকে, ঢেউয়ের নাগরদোলায় যে

www.pathagar.com

একবার ডুবে যায় অন্যবার ভেসে উঠে, সেই দ্বীপটি যদি হয় দৃশ্য জগতের প্রতিকৃতি – তাহলে বাদ বাকী সমস্ত মহাজলধিই বুঝি অদৃশ্য জগৎ । মহাসমুদ্রের কাছে গোষ্পদের তুলনা যতটুকু – তা । অদৃশ্য ও নিরাকার আল্লাহে যাদের বিশ্বাস নেই এবং যারা এ বিষয়টির উপর হাস্যরস করেন , বিজ্ঞানের এই সুদৃঢ় তথ্যগুলোকে কি তারা মোকাবেলা করবেন ?

সুধী পাঠক ! আপনার বিচার বিবেচনা কি বলে ? আল-কোরআন কি এসে যায় না এই প্রেক্ষাপটে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তথ্যদানকারী হিসাবে ? অনুভব করুন ! আজ থেকে ১৪০০ বছরের বেশী সময়। তখনকার মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার মান ইতিহাসের পাতাতেই লেখা রয়েছে। ঠিক এমনি একটা অজ্ঞতার যুগে কে এসে বিজ্ঞানের সুবিশাল ও অতিশয় নির্ভুল তথ্যসমূহকে মুদ্রণ করে দিলেন আল কোরআনের পাতায় ? তিনি কে যিনি জানালেন, – "তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এমন অনেক কিছুই যাহা তোমরা অবগত নহ (১৬:৮)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহ (৩২:৬)। তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যাহা ইহা হইতে উদগত হয় এবং আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহা কিছু আকাশে উত্থিত হয় (৩৪:২)। অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। আকশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচরে নহে সূক্ষাণু পরিমাণ কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছু ; প্রত্যেকটির তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে (৩৪:৩)[২১]। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বা অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন (২৭:২৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্টির অগম্য – সকলই আল্লাহর (১১:১২৩)। আর এই সমস্ত অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে (হযরত মুহাম্মদ) ওহী (প্রত্যাদিষ্ট বাণী) দ্বারা অবগত করিতেছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না কিংবা জানিত না তোমার সম্প্রদায়"(১১:৪৯)।

উল্লিখিত আয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে যে সকল তথ্য বেরিয়ে আসে, তা বিজ্ঞানের চোখে অতিশয় আদরণীয়। দৃশ্য আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে আর কোন অস্তিত্বের সম্ভাবনা সর্বপ্রথম কোরআনই মানুষকে জানায়। আকাশ ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত পদার্থ থাকতে পারে – এ সম্ভাবনা জানতে পাবার হাজার বছরের ও বেশী সময় আগে কোরআন অতিশয় দৃঢ়তায় তাকে প্রকাশ করেছে। দৃষ্টির অগম্য বস্তু সম্ভার রয়েছে –এ কথা কোরআনেব পূর্বে আর কোন উৎস হতে প্রস্তাবিত হয়নি। অদৃশ্য জগতের তথ্য ওহীযোগে নিরক্ষর নবীকে অবগত করার সময় কোরআন মনীষা সুচিহ্নিত করে গেছেন যে, এই সকল তথ্য তিনি যেমন অবগত ছিলেন না – তেমনি কেহ অবগত ছিল না তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ জাতি। ইতিহাসের সুকঠিন ফলকে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত চিহ্ন। আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও বিশেষত এ

www.pathagar.com

শতাব্দীর গোড়াতেও অবিশ্বাসীদের কাছে এ সকল আয়াতসমূহের প্রস্তাব ছিল উদ্ভট, মিথ্যাচার ও কল্পনার বিলাস। শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন তা প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন অবিশ্বাসীগণের কেউ কেউ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বললেন, The explanation of Quran stands as the most astonishing surprise to modern man .. The speculations of modern physics are drawing close to the same conclusion (as of Quran) ... This conclusion is no longer theory but is based on scientitic observation।[২১২] সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞান অভিজ্ঞ মানুষের কাছে অতিশয় বিস্ময়কর। . . . .. বিস্ময়কর যে কোরআনের প্রস্তাবের সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্যা খুঁজে পাচ্ছে এক অপূর্ব মিল। . . . কোরআনের এই সকল সিদ্ধান্ত আর কোন তত্ত্ব নয়, তারা আজ বিজ্ঞানের পরীক্ষণ নীতির অবলোকন পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আপনারা যদি কেউ Nature Spirituality and Science বইটি পড়ে থাকেন তবে দেখবেন, – তার লেখক বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনাশেষে স্ব-ধর্ম পুস্তক 'বেদ' –এর বাণীকে আর সকল ধর্মের চাইতে অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য করে দেখাবার এক অদম্য প্রয়াস নিয়েছেন। তার লেখার তিনটি পৃথক স্থান হতে উদ্ধৃত তিনটি আলাদা বাক্য এক অকাট্য প্রমাণ যে, ইতিপূর্বে কেরাআনে যাদের বিশ্বাস ছিল না – আজ তারাও এর সঠিকতা, নির্ভুলতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক সুদৃঢ়তায় অবাক না হয়ে পারছেন না।

আমরা আবার পূর্ব ধারায় ফিরে আসছি। আমরা জানতে পেরেছি যে মহান আল্লাহ্ এই সকল অদৃশ্য বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি দৃষ্টির অগম্য জগৎ ও বস্তু সম্ভারের স্রষ্টা এবং তাদের পূর্ণভাবে জানেন । তিনি সমস্ত লুক্কায়িত বস্তুদের প্রকাশ ঘটান এবং তিনিই ওহীযোগে তথা আল-কোরআনের মাধ্যমে এই সকল অদৃশ্য অজ্ঞাত বিষয়কে মানুষের জ্ঞানে পৌছে দিয়ে থাকেন। এই কথাগুলোর সত্যতা আমরা উপলদ্ধি করতে পারি যখন দেখি আল-কোরআনের পাতায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিস্ময়কর ব্ল্যাক হোলের তথ্য, গ্যালাক্সি তথ্য, বিগ ব্যাংগ এর তথ্য, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের তথ্য, গতির তথ্য , আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তুর তথ্য, নক্ষত্রের তথ্য , অভিকর্ষ বলের তথ্য, গ্রহ নক্ষত্রের তথ্য এবং ৮০ এর দশকের আলোড়ন, বিস্ময়কর কসমিক ষ্ট্রীং –এর তথ্য পর্যন্তও। রয়েছে এমন আরো অগণিত তথ্য যা আমরা অবগত নই। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এতদিন আমরা কতিপয় বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা পাইনি । আমরা আমাদের এই পাঠে কসমিক ষ্ট্রীং বা মহাজাগতিক তারের মত সূক্ষ্ম বিজ্ঞানকে কোরআনে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে জানার চেষ্টা করব । কিন্তু তার পূর্বে আমি পাঠককে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি করতে চাই।

www.pathagar.com

আমি আমার লেখার বিষয়ে অনেক জ্ঞানীগুণীর সাথে আলাপ করার সময় একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক প্রতিষ্ঠিত তথ্যসমূহকেও অনেকেই বিশ্বাস করেন না বা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না, কারণ, বিষয়গুলো অতিশয় অসম্ভব মনে হয়। কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন - এইগুলো বিজ্ঞানীদের খেয়ালীপনা মাত্র। এর কারণ অসম্ভব কিছুকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ সত্য যে পৃথিবীতে হাজার হাজার মানমন্দির রয়েছে যেগুলো হতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয়, হাজার হাজার ল্যাবরেটরী রয়েছে যেখানে এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কোন একটি উৎস হতে যদি সাড়া জাগানো কোন তথ্যের প্রকাশ ঘটে আর সেই তথ্যটিকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি প্রমাণ করার উপায় না থাকে, তবে পৃথিবীর বাদবাকী বিজ্ঞানীগণ যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবেন - তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অতএব, সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ যে রায় দিয়ে থাকেন, তার একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাকে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু আমার শুভানুধ্যায়ীগণের প্রশ্ন তার পরেও থেকে যায় - এই সকল বিষয়ে চিন্তা ও অসম্ভব কল্পনাগুলো মানুষের মনে আসে কেন ? আসেই যদি, তবে কোন প্রক্রিয়ায় ? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি তার জবাব দেয়ার সামান্য প্রয়াস নিচ্ছি।

ইতিপূর্বে মানুষের কাছে অনুরূপ কোন তথ্যাদি না থাকা সত্ত্বেও মানুষ প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা হতে ব্যতিক্রমের সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করে বহু যোজন দূর হতে কি করে নিজের মধ্যে চিন্তার খোরাক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় - বিজ্ঞান এ সম্পর্কে ভাল কোন বিশ্লেষণ দিতে পারে না। তবে আল-কোরআনের আলোকে আমরা এই চিন্তা উদ্রেকের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

মহাবিশ্বে তথা সৃষ্টির যে সমস্ত অদ্ভুত তথ্য অত্যন্ত অদ্ভুত অথচ মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে ছিল এবং পরবর্তীতে মানুষ তাকে আয়ত্ত করেছে, তাদের সম্পর্কে মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত হঠাৎ করে ও অতি বিস্ময়করভাবে ঘটেছে। কেন মানুষ চিন্তা করতে পারে কিংবা ভাবতে পারে, আর এই ভাবনাটা কি - তার কোন প্রকার সঠিক ব্যাখ্যা নেই। আত্মার সাথে এই চিন্তার সম্পর্ক কি, আত্মা কি ইত্যাদি আজো বিজ্ঞানের কাছে চরম অজ্ঞাত অস্তিত্ব। মানুষ হাজার কোটি আলোক বছর দূরত্বের বস্তুকে তার জ্ঞানে টেনে এনেছে - কিন্তু সে তার নিজের আত্মা সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি অবগত নয়। ডঃ ম্যারিট ষ্ট্যানলে কংডন তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, - 'আমি অনেকের কাছেই চিন্তার যথার্থ রাসায়নিক ফর্মূলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এর দৈর্ঘ্য কত সেঃ মিঃ, এর ওজন কত গ্রাম, এর রং দেখতে কেমন, কি তার গঠন ও আকার, একি চাপ না কি আভ্যন্তরীণ টান, কি তার কর্মক্ষেত্র, কোথা তার অবস্থান, কি তার শক্তি, কি তার দ্রুতি ? একটি মাত্র চিন্তাকে কেউ কোন প্রাকৃতিক নিয়ম,

www.pathagar.com

সংজ্ঞা, সমীকরণ বা ছকে ফেলে কোনভাবেই ব্যাখা করতে পারেনা।[১২৩] বলা হয়ে থাকে, চিন্তা জীব বা মানুষের মস্তিস্কের বিশেষ বিশেষ কোষসমূহের কার্যক্রমের ফলশ্রুতি। অথচ সদ্য কোন প্রাণীর প্রান-বিয়োগের সাথে সাথেই তার মস্তিষ্ক মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় না, কারণ কোষসমূহের মৃত্যু অবশ্যই প্রাণ বিয়োগের সংগে যুগপৎ নয়। এতদসত্বেও কোন মৃত প্রাণীর মস্তিষ্ক হতে কেন কোন চিন্তা আশা করা যায় না ? মৃতদেহের অভিব্যক্তিহীনতা প্রমাণ করে যে তার মস্তিস্কে কোন প্রকার চিন্তার কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে না। তাহলে আমরা দেখছি , চিন্তার পেছনে প্রাণ একটি অবিচ্ছেদ্য অথচ চিরঅজ্ঞাত ও অব্যক্ত কারণ যা মস্তিস্কের চিন্তাকোষকে কার্যক্ষম করে। প্রাণের সম্পর্কে বিজ্ঞান কোনরূপ মীমাংসায় আজো পৌছুতে সক্ষম হয়নি। আল-কোরআন প্রাণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব রেখেছে , তা আমাদেরকে প্রসারিত ভাবনার এক উদার দিগন্তের দিকে পথ চলতে ইশারা করে। "উহারা প্রাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে ? বল, প্রাণ (রুহ) আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত ব্যাপার এবং এ সম্পর্কে তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে" (১৭ঃ৮৫)। এই আয়াতের সত্যতার স্বাক্ষর এই যে, বিজ্ঞানের এত বিপুল অগ্রগতি হওয়া সত্বেও প্রাণের ব্যাখ্যা আমরা জানি না।

যা হোক , আমরা দেখতে পাই – প্রাণ হল জগৎ প্রতিপালক আল্লাহর আদেশ ঘটিত অস্তিত্ব। প্রাণের সাথে প্রতিপালকের আদেশের সম্পর্কটি আমাদেরকে আরো একটি তথ্য দেয় যে – যেহেতু প্রাণ বা আত্মাই চিন্তার উৎস, সেহেতু মানুষের মনে যে সকল অভাবিত সত্যের উন্মেষ হয়, তা প্রতিপালকের আদেশ কিংবা ইচ্ছাতেই হওয়া সম্ভব। অন্য এক স্থানে প্রাণ সম্পর্কে আল-কোরআন বক্তব্য রেখেছে – "আত্মা (প্রাণ) এর শপথ ও তার ত্রুটি বিহীনতার" (৯১ঃ৭) এবং উহার শুভ ও অশুভ চিন্তার করার সামর্থের (৯১ঃ৮)। আল্লাহ কোরআনে দাবী করেছেন যে, আত্মাকে তিনি ত্রুটিবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, অশুভ ও অশুভ চিন্তা করার। এখন ১৭ঃ৮৫ ; ৯১ঃ৮ আয়াত দুটিকে পাশাপাশি এনে আমরা দেখতে পাই যে, শুভ অশুভ চিন্তার মূলে রয়েছে ত্রুটিবিহীন আত্মার অস্তিত্ব এবং আত্মা বা প্রাণ মূলতঃ আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ । বিষয়টির এমনও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, মানুষের মনে উদিত অতিশয় অস্বাভাবিক চিন্তাগুলো যা সৃষ্টির বিষয়ে মানুষকে অবগত হতে পথ দেখায় , সেগুলো আল্লাহর আদেশেরই ফলশ্রুতি। ঠিক এই ধারণাটির অনুরণন বাজতে দেখি জার্মান বিজ্ঞানী Reinhard Breuer এর কণ্ঠে – "To my mind, either God must guide us in accordance with our laws so that we can understand Him or He must improve our knowledge and make us as wise as He is , so that we can understand Him. We must not think however, that God shares our views.[১২৪] আমার যতদূর মনে হয়, অবশ্যই স্রষ্টা আমাদিগকে

www.pathagar.com

পরিচিত আইন-কানুনের আলোকে পরিচালিত করেন কিংবা অবশ্যই তিনি আমাদের জ্ঞানকে উন্নতি দান করে থাকেন, যেন আমরা তাঁকে বুঝতে পারি। মানুষের উপলব্ধির এই দিকটাকে আমরা আল-কোরআনের বাণী গাম্ভীর্যে অতিশয় দৃঢ়তায় প্রকাশ পেতে দেখি - "তাহারা নিভাইয়া দিতে চাহে আল্লাহর নূরকে (জ্ঞানের আলো) মুখের ফুৎকারে! সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁহার নূরকে পূর্ণতা দান করিবেন" (৬১ঃ৮) । অর্থাৎ মহাজ্ঞানী আল্লাহ কোরআনে যে বিশাল জ্ঞানের সম্ভার রেখেছেন, স্বয়ং তিনিই তাঁর নিজ ব্যবস্থায় তাঁর প্রতিশ্রুত জ্ঞানকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে পূর্ণতা দান করবেন।

এতক্ষণের আলোচনা আমাদেরকে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহে উপনীত হতে নির্দেশ দেয় ঃ -

ক। আত্মা, প্রাণ বা রূহ আল্লাহর আদেশ ঘটিত একটি সত্ত্বা যার সম্পর্কে সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন এবং এ সম্পর্কে মানুষের অধিকতর জানার সম্ভাবনা নেই।

খ। এই আত্মা বা প্রাণ ত্রুটিবিহীন এবং সে ভাল ও মন্দ চিন্তা করতে সক্ষম। আত্মাই মূলতঃ চিন্তাশক্তির বাহন।

গ। মানুষের মনে বিশেষভাবে উদিত চিন্তা-ভাবনা আল্লাহর আদেশেই প্রকাশ লাভ করে। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের অনুভবে সে সব অভাবিত জ্ঞান ও তথ্য উদিত হয়।

ঘ। আল্লাহর জ্ঞান (কোরআন) কে পূর্ণতা প্রদান করতে আল্লাহ বদ্ধ পরিকর।

তাহলে কি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, অদৃশ্য অজ্ঞাত জগৎ আর তার মাঝে মহাবিস্তার জ্ঞান যার সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়, সেই সব আল্লাহই নির্দেশ দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাগরূক করেন, এই জন্য যে, তিনি যে জ্ঞানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে জ্ঞান কোরআনের বিশাল ভাণ্ডারে প্রকাশ পেয়েছে , তা যেন পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর কি করে তা মানুষের মনে জাগরিত হয়? কার্ল সেগান এ সম্পর্কে পেশ করেছেন একটি তথ্য,— In many areas, it (Science of astronomy) has moved from myth and vague guesswork to precise knowledge.[২১৫] কার্ল সেগানের তথ্যে দেখা যায়, জ্যোতির্বিদ্যার সুবিশাল বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান বা কল্পনা থেকে যাত্রা করে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। আর এইভাবেই The foreground of human intelligence is being won by imagination. It is imagination, the ability to think in an

www.pathagar.com

unconventional way to orient oneself and discover the novel in the ever expanding stream of knowledge which is now of greatest value.[২১৬] মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি ভূমি আজ কল্পনার দ্বারা বিজিত হয়ে পড়েছে। এই হল সেই কল্পনাশক্তির অপ্রচলিত ও অভাবিত ধারায় ভাববার ক্ষমতা যা কোন সন্ধানীকে জানতে, বুঝতে ও পরিচিত হতে সাহায্য করে। মহাজ্ঞানের মহাবিস্তৃত স্রোতধারায় নতুন কিছুকে উদঘাটন করতে অনুমান বা কল্পনার এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তার উদাহরণ দেখা যায় গাছ হতে আপেল মাটিতে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে সন্ধান মিলেছে অভিকর্ষ বলের। ১৯৬৭ সনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্টনি হিউইশ (Anthony Hewish) ও তার ছাত্রী জোসেলিন বেল (Jocelyn Bell) চূড়ান্তভাবে আবিষ্কার করলেন পালসার। অথচ এমনি গুণাগুণসম্পন্ন নক্ষত্রের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে কল্পনায় এনেছিলেন ফ্রিটজ্বইকী (Fritz Zwicky) তা আবিষ্কারের বহু বছর আগে। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন নিউট্রন ষ্টার। ৭০ দশকে ব্ল্যাক-হোল সম্পর্কে নিশ্চিত হল মানুষ। অথচ তার অস্তিত্বের কথা জোর গলায় প্রস্তাব করেছিলেন কয়েকজন কল্পনাবিলাসী বিজ্ঞানী তা আবিষ্কারের বহু আগে, ৩০ দশকের গোড়ার দিকে কিংবা তারও পূর্বে। প্রশ্ন এসে পড়ে, উল্লিখিত অস্তিত্বসমূহ মূলতঃ অদৃশ্য এবং তাদের অনুরূপ অস্তিত্বের কথা ইতিপূর্বে মানুষ জানত না। এতদসত্ত্বেও মানুষ কিভাবে কোন প্রয়োজনে উদ্ভট কল্প-কাহিনীকেও হার মানায় এমনি সব অতিজাগতিক বস্তুদের অস্তিত্বের খবর পেয়েছিল? কোন্ সে অদৃশ্য কারণ যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শত লাঞ্ছনা ও অপমান সইবার জন্য? শত কষ্ট ও অপমানের বিনিময়ে তারা তাদের বিশ্বাসবোধকে ধরে রেখেছিল প্রাণপণে। এই সব অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের ভাল কোন উত্তর আমাদের জানা নেই। তাহলে কি এই হল আল্লাহর জ্ঞানকে পূর্ণতা দেয়ার সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে, তারই একটি বিশেষ ব্যবস্থা? সম্ভাবনার যুক্তিটি কি কোন প্রতিযুক্তি দিয়ে আপনি উড়িয়ে দেবেন? আমরা যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা বলে থাকি, অথচ তার ব্যাখ্যা জানি না, হতে পারে সেই অনুভব বা কল্পনার অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থাই মহান আল্লাহর নির্দেশপত্র গ্রহণের উপায় হয়ে মানুষের মাঝে অবস্থান করে।

আজকের বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাজগতের সংগঠন মূলতঃ মহাজাগতিক তার নামক বিস্ময়কর বস্তুর প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। এই মহাজাগতিক তারগুলো এক অতিশয় সূক্ষ্মতার উদাহরণ, অথচ দৈর্ঘ্যে এই তার লক্ষ আলোক বছর। এদের কোনটি সর্পিল, কোনটি আংটি বা কটিবন্ধের মত অথবা কোনটি তার চাইতে জটিল। তারা অতীব শক্তিশালী এবং তাদের পদার্থ ভর অচিন্তনীয় ও অতিশয় সুবিশাল। এরা আলোর গতিতে চলে। চওড়ায় এত সূক্ষ্ম যে, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। চওড়ায় তার পরিমাপ হল 10^{-30} সেঃ মিঃ; অর্থাৎ ১ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যকে একের পর ৩০টি শূন্য যোগে যে বিশাল সংখ্যা হয় তা দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফল হতে পারে - তার সমান।

www.pathagar.com

তার অর্থ হল, ১ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যকে "একশত কোটি, কোটি কোটি কোটি" দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তা।[২১৭] অথচ এত সূক্ষ্ম তারটির মাত্র দেড় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ভর সুইজারল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমা পরিবেষ্টনকারী আলপস পর্বতের ভরের সমান। মাত্র কয়েক কিলোমিটার তারের ভর ওজন সমস্ত পৃথিবীর ভরের চাইতে বেশী।[২১৮] ফের্মিন্যাশনাল অ্যাকসেলেরেটার গবেষণাগারে মহাজাগতিক তার নিয়ে তরুণ একদল কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী গবেষণা চালিয়ে আসছেন কিছুকাল ধরে। অংকের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারে তুলে ধরেছেন তারা এই তারের গতি-প্রকৃতি। এর জন্য সুপার কম্পিউটার চক্র -২ কাজে লাগানো হচ্ছে। তারা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখতে পান, এই তারের ব্যাস এত সূক্ষ্ম যে, তা পরমাণুর প্রোটনের চেয়েও 10^{17} ভাগ (১/১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) ছোট। একটি পরমাণু এবং একটি কসমিক ষ্ট্রিংকে যদি একই অনুপাতে পাশাপাশি বিবর্তন করা হয় এবং বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে যদি পরমাণুটি সৌরজগতের আকার ধারণ করে, তখন বিবর্তিত মহাজাগতিক তারের চওড়াটাকে মনে হবে একটি ভাইরাসের সমান মাত্র !

আদিম মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাঙ) -এর সময় এই তারগুলোয় সঞ্চিত হয়েছিল অকল্পনীয় অভিকর্ষ বল। এই শক্তির টানে এই তারে পুঞ্জিভূত হয়েছিল মহাজাগতিক বস্তুকণা। এই বস্তুকণাদের মহাসম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল গ্যালাক্সি। প্রায় ১৫ বিলিয়ন (১৫০০ শত কোটি) বছর পূর্বে এই আদি বিস্ফোরণে যে অকল্পনীয় শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, মহাজাগতিক তার সেই শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো বহন করে চলছে। পদার্থ বিজ্ঞানী টম কিবল (TWB Kibble) পরম একত্রীকরণ ক্ষেত্রতত্ত্ব বা 'গ্রাণ্ড ইউনিফাইড থিওরী'র বিষয়ে ১৯৭৬ সালে তার ফের্মি গবেষকদের সহ এক জোরালো অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধরে নেয়া হয়, সময় যখন শূন্য (০) ছিল, তখন ভ্রূণ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করছিল এক অতিবিচিত্র দশা। এই অবস্থায় আদি অগ্নিগোলকের পদার্থ বা মৌল এবং শক্তিকে পৃথকভাবে চেনার কোন উপায় ছিল না। দ্রবণে ফিটকারি, লবণ, চিনি ও পানি যেমন এক ও অবিচ্ছিন্ন থাকে, তেমনি ছিল মহাবিশ্বের পরিবেশ। অতঃপর ঘটল মহাবিস্ফোরণ - বিগ ব্যাঙ। মহাবিস্ফোরণের পরপরই যখন সময়মান 10^{-35} সেকেণ্ডে (এক সেকেণ্ডকে ১ এর পর ৩৫টি শূন্য যোগে গঠিত সংখ্যায় ভাগ করলে যে সময় হয়), তখন তার তাপমাত্রা নেমে আসে ১০০০ ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন (1000 trillion, trillion) ডিগ্রী সেঃ গ্রেঃ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালীন বিশেষ এই মুহূর্তে পরম একত্রীকরণ ক্ষেত্রের অবসান হয়। দ্রবণের তাপমাত্রা কমলে দ্রবীভূত সামগ্রীগুলো - লবণ, চিনি, ফিটকারী ইত্যাদি যেমন পৃথক হয়ে কেলাসিত অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ত হয়, এ ক্ষেত্রে তেমনি ঘটনা ঘটল। মৌলিক বলগুলো নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ল। এই মৌলিক বলগুলো দুর্বল মিথস্ক্রিয়া (Weak interaction) সবল মিথস্ক্রিয়া (Strong interaction),

www.pathagar.com

বিদ্যুচ্চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া (Electromagnatic interaction) এবং অভিকর্ষ বল (Gravitational force)। টম কিবল বললেন, বিস্ফোরণের পরপরই ঘন 'শক্তি–পদার্থে' অধ্যুষিত আদি অগ্নিগোলক সম্প্রসারণ হতে শুরু করে। প্রবল শক্তি ও বহিঃমুখী চাপে মহাবিশ্ব ক্রমাগত ফুলতে থাকা বেলুনের মত সম্প্রসারিত হতে থাকে। ঠিক এই সময় ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সৃষ্টি হয় সূক্ষ্ম ফাটল। এই ফাটল ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথাও কুণ্ডলী পাকানো, কোথাও সর্পিল, কোথাও আংটি বা কটিবন্ধ আকৃতির। কম্পিউটারের পর্দাতে এদের প্রতিকৃতি দেখা যায় যেন জটিল জাল সদৃশ। মূল অগ্নিগোলক, যার বিস্ফোরণে সৃষ্টি হল ব্রহ্মাণ্ড, তার জমাট শক্তি ও ভর যে অবস্থায় বিরাজ করছিল ; তারগুলোর মধ্যে শক্তি ও ভর সেই অবস্থায়ই সঞ্চিত থেকে গেল। সমস্ত মহাবিশ্ব ও তার সকল শক্তি যে একই উৎস হতে উৎসরিত হয়েছে , এই ধারণাটি বহু পূর্ব হতেই মানুষের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। ৭০ দশকে স্যার গ্লাসো, এস ওয়েনবার্গ এবং আঃ সালাম এই তিনজন বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, সবল মিথষ্ক্রিয়া এবং বিদ্যুৎ–চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া এর একত্রিকরণের কাজ সম্পন্ন হবার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের আশাবাদ একত্রিত ত্রয়ীশক্তির সাথে অভিকর্ষ বলের একত্রিকরণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই বিষয়ের উপর গবেষণা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করলেন যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি একক উৎস হতে আর মহাবিশ্বের সৃষ্টি উত্তর জানা মহাবিশ্বের চেনা আকৃতি ও সংগঠনের জন্য কসমিক স্ট্রীং - এর অবস্থান অবশ্যই থাকতে হবে।

বিজ্ঞানীদের সুদৃঢ় আশাবাদ এই যে, মহাজাগতিক তার রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, কি তার উপযোগিতা এবং মহাজাগতিক তারগুলো না থাকলেই বা কি হত? এর উত্তর দেন বিজ্ঞানীগণ। সম্ভবত এই তার না হলে এই চেনা মহাবিশ্বের সংগঠন হত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। মহাজাগতিক তারগুলো না থাকলে মহাবিশ্ব কখনো আজকের জানা আকৃতিতে আসতে সক্ষম হত না। থাকত না এই দৃশ্য জগতের বিস্তার কিংবা আপনার ও আমার অস্তিত্ব। টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ভিলেনকীন এ তথ্য প্রকাশ করেন যে, প্রচণ্ড পরিমাণ অভিকর্ষ শক্তির অধিকারী হওয়ার দরুন মহাজাগতিক তারই হয়ত গ্যালাক্সিপুঞ্জের বীজ হিসাবে কাজ করেছে। আর ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম যে বিগ ব্যাঙ –এর পর ভ্রূণ থেকে জন্ম নিল ব্রহ্মাণ্ড। যখন তার শৈশব অবস্থা, তখন মহাজাগতিক তার সক্রিয় হয়ে উঠে। শত আলোকবর্ষ কিংবা তার চাইতে কম ও বেশী দৈর্ঘ্যের তারগুলো তাদের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণাকে আকর্ষণ করতে থাকে। এই আকর্ষণে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণা সমূহ প্রচণ্ড গতিতে তারের দিকে ছুটে আসে। জমতে থাকে তারের চারপাশে। এক সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ততক্ষণে ঐ গ্যাস সামগ্রী তৈরী করে ফেলেছে এক একটি গ্যালাক্সি। বিলুপ্তি পাবার আগে কোন কোন ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য তার নিকটতম দীর্ঘ তারের সান্নিধ্যে আসতে শুরু করে। এই ভাবে তারা ভিড় জমায়

www.pathagar.com

একের পর আরেক। সৃষ্টি করে একটি গ্যালাক্সিপুঞ্জ বা ক্লাস্টার। কম্পিউটার সিম্যুলেশনে প্রমাণিত ও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে, গুচ্ছ গ্যালাক্সি তৈরীর পেছনে কেবল এই মহাজাগতিক তারেরই অদৃশ্য হাত রয়েছে।

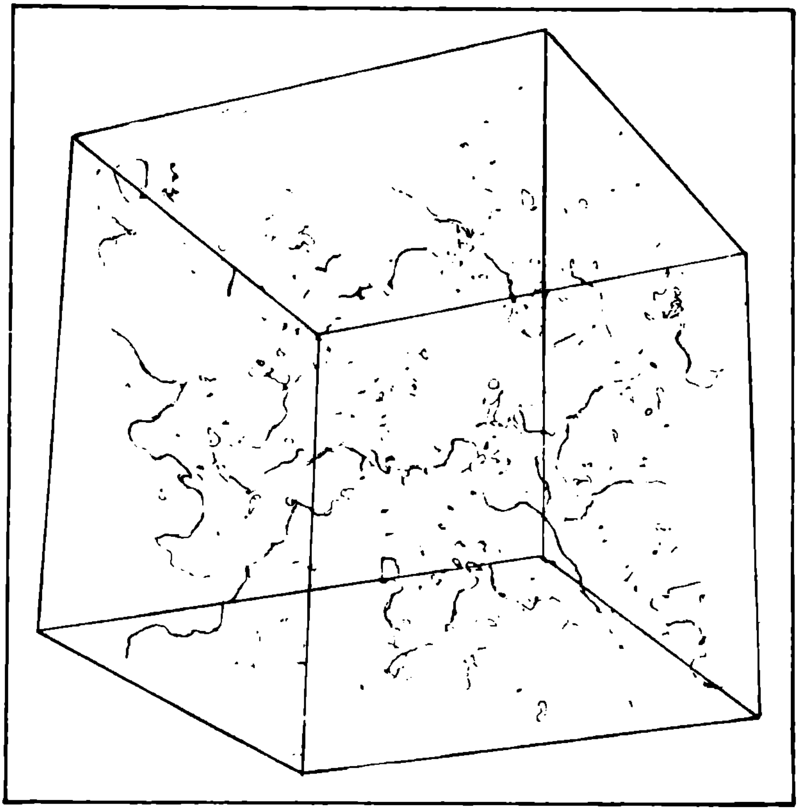

কম্পিউটার সীমুলেশনে কসমিক-স্ট্রীং। অনুমান করা হয়, সৃষ্টিতে এরাই গ্যালাক্সির বীজ বুনেছিল। চওড়ায় ১ সেঃ মিঃ-এর হাজার মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ আর তার মাত্র দেড় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তারের ভর সুইজারল্যেন্ডের ভৌগলিক সীমায় অবস্থিত আল্পস পর্বতমালার ভরের সমান।

গ্যালাক্সিসমূহের এই গুচ্ছায়িত হওয়ার কারণে মহাবিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল শূন্যতা (void)। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎবিজ্ঞানী এ্যাডোয়ার্ড ভিটেন মনে করেন

www.pathagar.com

– মহাজাগতিক তার অতি পরিবাহীরূপে কাজ করে। মহাবিস্ফোরণের পর তৈরী হয় এক অতি শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র। মহাজাগতিক তার এই চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে এক অকল্পনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ। এই সময় অতিশয় দ্রুততার সাথে কম্পনশীল মহাজাগতিক তার সৃষ্টি করে তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণের বন্যা। সেই বিকিরণে সংঘাতে শিশু মহাবিশ্বের গ্যাসীয় সামগ্রীর মধ্যে সৃষ্টি হয় আলোড়ন বা ঝড়। ফলে গ্যাসীয়মণ্ডলের মাঝে সৃষ্টি হয় শূন্যতার পরিবেশ বা শূন্যতার বুদ্‌বুদ। এমনি কয়েকটি সম্প্রসারণশীল বুদ্‌ বুদ্‌ যখন এক সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন এদের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় গুচ্ছ –গ্যালাক্সির। সৃষ্ট শূন্যতা যখন অতি বড় দানবীয় আকৃতির হয়, তখন সেই শূন্যতা (void) একটি গুচ্ছ হতে অন্যকোন গুচ্ছের দূরত্বের পরিমাপক হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। বর্তমান বিশ্বে এই ধারণাটি আরো অধিক প্রসার লাভ করেছে প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ইয়েকভ য্যালদোভিচ (Yakov Zeldovich) এর মৌচাক সদৃশ্য মহাবিশ্বের সংগঠনের ধারণা থেকে। তিনি দেখিয়েছেন – মহাবিশ্ব একটি মৌচাকের মত সংগঠন নিয়ে বর্তমান। গ্যালাক্সিগুলো এই মৌচাকের অসংখ্য শূন্য কোষের ধার অঞ্চলে অবস্থান করছে।[২১৯] গ্যালাক্সিসমূহের এইরূপ অবস্থান এবং তজ্জনিত কারণে তাদের বিন্যাসে সৃষ্ট নিয়ম কানুন ও তাদের সংগঠনের চরিত্র ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানীদেরকে কসমিক ষ্ট্রীং –এর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করেছে। মহাবিশ্বে মাইক্রো–ওয়েভ ব্যাকগ্রাউণ্ড –এর অবস্থান কসমিক ষ্ট্রীং এর যুক্তিকে আরো অধিকতর দৃঢ়তা প্রদান করে। কসমিক ষ্ট্রীং –এর প্রকৃতি হল যে তা অতিশয় দ্রুত তরঙ্গায়িত হয় এবং বিদ্যু–চৌম্বক তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে। আজকের বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত জোরালোভাবেই মত পোষণ করেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি এবং শক্তিশালী গামা রশ্মির ফোয়ারা ইত্যাদি মূলতঃ এই মহাজাগতিক তারের জন্যই হয়ে থাকে। কেউ কেউ সুদূরবর্তী অতি শক্তিশালী কোয়াসার অস্তিত্বের পিছনে কসমিক ষ্ট্রীং –এর অবস্থানকেই খুঁজে পাবার প্রয়াস করছেন আজ। কয়েক বছর পূর্বে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম তারের মত বেতার উৎসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাবছেন, হয়তবা একটি মহাজাগতিক তারের অবশেষ আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে আজো তার অস্তিত্বের খবর পাঠাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস,– পৃথিবী ও দূরবর্তী কোন গ্যালাক্সির মধ্যে কোথাও কোন মহাজাগতিক তার যদি অবস্থান করে এবং তারটি যদি কোন গ্যালাক্সিকে অবলোকন করার সময় সেই গ্যালাক্সির দর্শন রেখাকে (Line of sight) ছেদ করে তবে সেই গ্যালাক্সি হতে আগত আলোক পৃথিবীর দিকে আসার সময় তারের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। নলকার মুখে তীব্রবেগে পানি পতিত হবার সময় একটি লোহার সরু শলাকা ধরলে যেমন পানির প্রবাহ দু'দিকে ভাগ হয়ে পতিত হয়,

www.pathagar.com

অনুরূপ ঘটনা ঘটবে এই ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে একজন দর্শক কোন গ্যালাক্সিকে একটি না দেখে পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি গ্যালাক্সিকে দেখতে পাবে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী একটি কসমিক ষ্ট্রীং আশপাশের আলোককে বক্র করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বলেই এই দৃশ্য হওয়া সম্ভব। সম্প্রতি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জ্যোতির্বিদ এমনি কোন এক দৃশ্য দেখার দাবী রেখেছেন। তাদের এই অবলোকন, মহাজাগতিক তারের অস্তিত্বের ভিতকে অধিকতর মজবুত করেছে।

শুরুতে অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষার্ধে অনেকেই মহাজাগতিক তার সম্পর্কে অনেক ঠোঁটকাটা মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এটি হল একটি কষ্টকল্পিত তত্ত্ব, জ্যোতি-পদার্থ বিজ্ঞানীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। তার জবাবে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-পদার্থবিদ ডেভিড শক্রাম বক্তব্য রাখেন যে, ত্রিশ এর দশকে ব্ল্যাক-হোলও এমনি একটা তত্ত্ব ছিল। অনেকেই তাকে নিয়ে হাস্যরস করেছে। কিন্তু ষাট এর দশকে এই সকল হাস্যরসিকতা বন্ধ হয়ে যায় এবং সত্তরের দশকে তাদের গ্রহণহীনতা তাদেরই কাছে লজ্জা হয়ে ফিরে আসে। মহাজাগতিক তারের বেলায়ও এই কথাটি খাটে। মাত্র পাঁচ বছর আগেও মহাজাগতিক তার নিয়ে যাদের অসংখ্য সন্দেহবাদ ছিল, তারাও এখন বিষয়টি বিবেচনা করছেন। তারাও ভাবছেন, মহাজাগতিক তারের তত্ত্বটি হয়তবা নির্ভেজাল ও নির্ভুল।

১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীরা জানান যে, মহাজাগতিক তারের ঘনত্ব ব্ল্যাক-হোলের চাইতেও অত্যন্ত বেশী যার গাণিতিক প্রকাশ হল 10^{21} গ্রাম/সি সি। অর্থাৎ ১ ঘন সেঃ মিঃ তারের ভর হল ১০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, গ্রাম। ব্ল্যাক-হোলে যেমন বস্তুসমূহ অতিশয় অসাধারণ মাত্রার ঘনত্ব নিয়ে জড়াজড়ি করে অবস্থান করে তার চাইতে বেশী ঘনত্ব নিয়ে বস্তুভর অবস্থান করে এই মহাজাগতিক তার গুলোতে।

উপরের আলোচনা হতে আমরা মহাজাগতিক তারের অস্তিত্ব, তার বিজ্ঞানভিত্তিক যথার্থতা, মহাবিশ্বের সংগঠনে তার অবদান ইত্যাদি বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছি। পৃথিবীর বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানী ও সর্বাধুনিক কম্পিউটারের সিদ্ধান্তসমূহকে আমরা যদি গ্রহণ করি তবে দেখতে পাই যে, যদিও এখন পর্যন্ত হাতে চাক্ষুষ প্রমাণ আসেনি, তথাপি কসমিক ষ্ট্রীং বা মহাজাগতিক তার যে রয়েছে - এই সিদ্ধান্তে জগৎ বিজ্ঞানীদের এক সুবিশাল অংশই অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত। মহাজগতের ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসমূহের পারিপার্শ্বিকতা, ব্যবহার ও বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। ব্ল্যাক-হোল মূলতঃ একই নীতিতে নিজের মধ্যে বস্তু সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানীগণ আজ ব্ল্যাক-হোল এবং বিশেষভাবে

www.pathagar.com

মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউণ্ড এর অস্তিত্বের দিকে নজর দিয়ে কসমিক ষ্ট্রীং -এর অস্তিত্বের সম্পর্কে দৃঢ়তা পোষণ করছেন। মহাজাগতিক তার নেই এবং না থাকার যথেষ্ট প্রতিকূল কারণ রয়েছে , এমন কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হয়ত আমরা মেনে নিতে পারি যে কসমিক ষ্ট্রীং এর অস্তিত্ব সত্য। তাছাড়া ফের্মি গবেষক দলের গবেষণালব্ধ ফলাফল শুধু বিজ্ঞানীগণ মেনেই নেয়নি – জগৎ-বিজ্ঞানীদের কাছে এই বিষয়টি হল আশি দশকের সবচাইতে প্রিয় গবেষণার বিষয়। Cosmic Strings are likely to become the darlings of physicists as they are an exotic subject with immense possibilities.[২২০]

আমরা আমাদের এই প্রবন্ধে ষ্ট্রীং রয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা যেভাবে অনুমান করেছেন সেভাবেই রয়েছে বলে ধরে নিয়ে আলোচনার পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রবেশ করব।

কোরআনের পাতা খুলে দেখুন। ৫১:৭ আয়াতখানি ক্ষুদ্র তিন শব্দের একটি শপথের বাণী। ব্যবহৃত শব্দ 'সামায়া'(السماء) মহাবিশ্ব সংক্রান্ত ধারণার সমানুপাতিক। 'যাতা'(ذات) শব্দটি দ্বারা প্রাপ্ত, সমৃদ্ধ, কিংবা ধারণ করা জাতীয় অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন এর ব্যবহার ক্রিয়ার ভাব প্রকাশক বা Infinitive হিসাবে হয়ে থাকে, তখন তার বিশেষ অর্থ আসে অতিশয় তীব্রভাবে, ক্রুদ্ধ এবং হিংস্রভাবে চেপে ধরা (throttle savagely). তীব্রভাবে চেপে ধরা – অর্থাৎ সংকুচিত করা বা হওয়ার একটি অর্থ ফুটে উঠে। শেষ শব্দটি হল 'হুবুক' (حبك) যার অর্থ হল – অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বুনন সৃষ্টি করা, ভারসাম্যের সাথে অথচ আলগাভাবে ঝুলা, একত্রে সংলগ্ন করে ঘন ও সুদৃঢ় করা, আটক করে ও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা, সুতা বা রশিকে পাক দেয়া, কটিবন্ধের মত হওয়া। একত্রে বিজড়িত করা বা হওয়া আংগুর গাছের লতানো মূল, সরু ফালি, চাবুক, কুণ্ডলীকৃত ব্যাণ্ড, একটি সুতা বা তার, লম্বা পুচ্ছ ইত্যাদি (Weave skilfully, unite firmly, loop, fasten tightly, twist a thread, be gridled, interweave, firm, strong, texture, vineroot & strap.)[২২১]

আমরা এই অর্থগুলোর মাঝে মহাজাগতিক তারের একটা পরিষ্কার চিত্র খুঁজে পাই। মহাজাগতিক তার অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই গ্যালাক্সিদের বুনন সৃষ্টি করে। বুনন শিল্পে তাঁতের মাকু কিংবা সুতার পাল্লাগুলো একবার এদিক অন্যবার ওদিক এবং একবার উপর অন্যবার নীচ হয় ; এই প্রক্রিয়াটি একটি সম-স্পন্দনের তরংগ চিত্র ছাড়া কিছু নয়। মহাজাগতিক তারেরও রয়েছে একটি সুদক্ষ তরঙ্গ প্রকৃতি। এই তারের অদৃশ্য বুনন শক্তির স্বরূপ দৃশ্য মহাবিশ্বে বস্তুর অস্তিত্ব আমরা যেমনভাবে দেখছি , তেমন হওয়া সম্ভব হয়েছে। শব্দটির ভারসাম্যের সাথে আলগাভাবে ঝুলার অর্থও মহাজাগতিক তারের গুণাগুণে বর্তমান রয়েছে। মহাজগৎ ব্যবস্থায় এই তারগুলো

www.pathagar.com

অবলম্বনহীনভাবে ভারসাম্যের সাথেই ঝুলছে সময় ও দূরত্বের মহা শূন্যতায়। শব্দটির অন্য আর একটি অর্থ হল, কোন কিছু একত্রে জমিয়ে আনা এবং সংলগ্নে করা, ঘন করা, সুদৃঢ় করা যা মহাজাগতিক তারের এক অতিশয় প্রকট চরিত্র। মহাজাগতিক তার উল্লিখিত অর্থের মতই অটল ও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে সৃষ্টির আদিলগ্নে আদি অগ্নিগোলকের শক্তি ও পদার্থকে ; পরবর্তীতে গ্যালাক্সি সৃষ্টির জন্য গ্যাস ও আন্ত-নাক্ষত্রিক বস্তু-বিস্তারকে। শব্দটির অন্য আর একটি অর্থ হল সুতা বা রশিকে পাক দেয়া। এই অর্থটিতে এই শব্দের নেপথ্যে একটি সুতা বা রশি, অর্থাৎ আমরা যাকে মহাজাগতিক তার বলি তার অনুরূপ অস্তিত্বের ইংগিত বিদ্যমান। তা ছাড়াও হুবুক -এর অন্য একটি শব্দার্থ Strap -এর অর্থ সরু ফালি চাবুক, কুণ্ডলীকৃত ব্যাণ্ড, সর্বশেষে একটি সুতা বা তার (a string) হওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সুতা বা তারের দ্বারা ধারণকৃত আকাশ অঞ্চলের 'শপথ', এই আয়াত দ্বারা কসমিক ষ্ট্রীং বা অনুরূপ অস্তিত্বের প্রস্তাবের বিষয়টি সুদৃঢ় করে (strap এর অর্থ CHAMNERS 20 (twenty) century Dictionary অনুযায়ী)। একইভাবে মহাজাগতিক তারের অন্যান্য বাহ্যিক গুণাগুণ সমূহকে পরিপূর্ণভাবে নির্দেশ করার স্বপক্ষে শব্দটির আরো একটি অর্থ হল 'কটিবন্ধের মত হওয়া'। এর মধ্য দিয়ে আমরা 'হুবুক' কে স্বার্থকভাবে মহাজাগতিক তার অথবা অনুরূপ গুণ মানের কোন অস্তিত্বের আনুপাতিক হতে দেখি। আমরা বলতে পারি যে ৫১ঃ৭ আয়াতটি এমনি কোন জটিল ধারণার প্রস্তাব করে।

এতক্ষণে পূর্ণ আয়াতটির অর্থ করলে আমরা পাই , - শপথ সে আকাশ অঞ্চলের যা 'হুবুক' এর মধ্যে ধারণকৃত। হুবুক -এর সে ভাবার্থ আসে আমরা যদি তা গ্রহণ করি, তবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ কসমিক ষ্ট্রীং বা অনুরূপ কোন অস্তিত্বের মাঝে ধারণাকৃত আকাশ অঞ্চলের শপথ করছেন যা মূলতঃ গ্যালাক্সি কিংবা গুচ্ছ গ্যালাক্সি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ক্ষুদ্র এই শপথটিতে আকাশের সংগঠনের ধারণা এবং মহাজাগতিক তারসমূহের প্রকাশ অতিশয় নির্ভেজাল যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে যায়। মহাকাশের সংগঠনের এই চিত্রটি সম্পর্কে কোরআনে মনীষা যে সম্পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন, আমরা তারই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি।

আমাদের নিশ্চিতি আরো সুদৃঢ় হয়, যখন আমরা প্রচলিত অনুবাদসমূহের প্রতি মনোযোগ প্রদান করি। আয়াতটির অনুবাদে এই 'হুবুক' শব্দটিকে কেউ কেউ 'কক্ষপথ' কিংবা 'আসমানে বহু পথ' ইত্যাদি অর্থে প্রকাশ করেছেন। অথচ মজার বিষয়টি এই যে, বিখ্যাত বিখ্যাত অভিধানগুলোর কোনটিতে শব্দটির অর্থ এমনিভাবে করেনি যেভাবে প্রচলিত অনুবাদসমূহে করা আছে। আভিধানিক অর্থের সংগে এই বৈষম্য অবশ্যই প্রমাণ করে যে, প্রচলিত যে সকল অর্থ ধরে নেয়া হয়েছে , 'হুবুক' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ তার বাইরে অন্য কিছুকে নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

এর একটা যথাযোগ্য কারণও রয়েছে। কোরআনের জ্ঞানমালাকে আমরা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রকাশ পেতে দেখি। জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কারগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে দেখা যাবে যে, যে সকল বিষয়গুলোর সঙ্গে কোরআন সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছে , তারা একবারে প্রকাশিত হয়ে পড়েনি। সময়ের দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে যেমন আবিষ্কারের প্রকাশ ঘটেছে , তেমনি হারে কোরআনের বিজ্ঞানজাত তথ্যসমূহও মানুষের সামনে অবয়ব উন্মোচন করেছে। আমার মনে হয়, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর গ্রন্থের বাণীর সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণেয়ক অন্বয়কে সকল যুগেই 'ল্যাণ্ডমার্ক' করে প্রকাশ করে থাকেন, যেন মানুষ তার উপলব্ধি ক্ষেত্রে এই সকল তথ্য প্রমাণের শিক্ষা পেতে পারে। ৮০ এর দশকে যে কসমিক স্ট্রীং বা মহাজাগতিক তারের জোয়ার এল, তা যদি প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে কোন ধর্মগ্রন্থ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে, তবে এমন ঘটনাটি ইতিহাসের গায়ে অবশ্যই 'ল্যাণ্ডমার্কের' সৃষ্টি করে। ৩০ দশকের বিজ্ঞান চিন্তায় আগত ব্ল্যাক হোল সত্তর দশকে আবিষ্কারের পর ৮০' এর দশকের শেষাংশে 'দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব – ১' এর দ্বারা কোরআনের আয়াতে নির্ণীত হবার পর যে সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে তা ইতিহাসের গায়ে অবশ্যই ল্যাণ্ডমার্কের উদাহরণ। সুদূর অতীতে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল, আজকের বর্তমান ও আগামী ভবিষ্যতের জটিল বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে যদি সে গ্রন্থটি অতিশয় স্বার্থকভাবে বর্ণনা করে থাকে ও তার সত্যতা বিচার করা যায়, – তবে এমনি কোন ঘটনাই হবে এক একটি 'ল্যাণ্ডমার্ক'। হয়তবা মহাজাগতিক তার এমনি কোন ল্যাণ্ডমার্ক হবার অপেক্ষায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে দূরত্ব বা শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, তারই কোন একটি স্বাক্ষর হবার বিষয় হয়ে রয়েছে ৫১ঃ৭ আয়াতের শব্দ 'হুবুক' এর অনুবাদ। এর অর্থ 'পথ' না হওয়া সত্ত্বেও তাকে পথ বা কক্ষপথ হিসাবে তরজমা করা হয়েছে। এর কারণ, এই শব্দের অর্থের অনুপাতে আকাশে কোন্ অস্তিত্ব রয়েছে , তা আশি দশকের পূর্বে মানুষের জানবার কথা নয়। অজ্ঞাত এই বিষয়টির অনুবাদ করতে গিয়ে মানুষ সম্ভাব্য অর্থটিই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই যুক্তির সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি – মহাবিজ্ঞ আল্লাহ ৫১ঃ৭ আয়াতে এমন আকাশ অঞ্চলের শপথ করেছেন যা আয়াতটির শব্দার্থ অনুযায়ী একটি সূতা বা রশি যা কোমরবন্ধের ন্যায় আলগা হয়ে ভারসাম্যের সাথে ঝুলে, যা বস্তুদের একত্র করে, একত্রিত বস্তু–শক্তিকে কঠোরভাবে ঘনায়ন করে এবং আবদ্ধ করে কিংবা সংলগ্ন করে রাখে ; এই সূতা বা তার দক্ষতার সাথে তরঙ্গায়িত হয় যেমন তাঁত বুননের মাকু করে থাকে। এই সকল ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য যে কসমিক স্ট্রীং –এরই রয়েছে তার কথা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। আমরা বলতে পারি মহাজাগতিক তার 'হুবুক' এর শক্তিতে ধারণকৃত 'সামায়া' বা আকাশ কিংবা গ্যালাক্সি বা গুচ্ছ–গ্যালাক্সির শপথই এই আয়াতের বিষয়বস্তু। মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

তাঁর এই শপথে দ্ব্যর্থহীনভাবে কসমিক ষ্ট্রীং –এর অস্তিত্ব এবং তার শাসনে মহাবিশ্বের সংগঠনের চিত্রটিই পেশ করে আল–কোরআনের মাহাত্মকে নির্দেশ করছেন। একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, আল–কোরআন কসমিক ষ্ট্রীং কিংবা তার অনুরূপ কোন অস্তিত্বকে প্রতিভাত করে ও সমর্থন দেয়।

এ প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার চলুন আমরা ৩১ঃ১০ কিংবা ১৩ঃ২ আয়াত দুটির পর্যালোচনা করি। উভয় ক্ষেত্রেই কোরআনের প্রস্তাব, -"আল্লাহ ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্ব) স্থাপন করিয়াছেন অবলম্বন ব্যতীত, – তোমরা কি তাহা দেখিতেছনা" ? ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে 'বিগাইরী ইমাদ' (بغير عمد) শব্দ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ। 'ইমাদ' শব্দের অর্থ খুটি বা অবলম্বন। প্রচলিত রীতিতে 'গাইর' এর পূর্বে যখন 'বে' বসে তখন তার অর্থ হয় ছাড়া বা ব্যতীত। কিন্তু 'গাইর' শব্দের আরো একটি অপ্রচলিত অর্থ রয়েছে যা হল diminution এবং যখন এ শব্দের পূর্বে 'বে' অব্যয়টি সংযুক্ত করা হয় – তখন তার অর্থটি হতে পারে diminutive/ diminuted/ diminished যার বংগানুবাদ হল – অতিক্ষুদ্র বা অতিসংকুচিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত আকারযুক্ত। এ অর্থটি গ্রহণ করা হলে ১৩ঃ২ কিংবা ৩১ঃ১০ আয়াতাংশের অর্থ করা যায় – আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সমুচ্চ বা প্রসারিত করেছেন এক অতিসংকুচিত বা অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত আকারযুক্ত এমন এক প্রকার অবলম্বন দ্বারা যা প্রকারান্তরে অদৃশ্য, এবং এই অদৃশ্য অস্তিত্বটি মূলতঃ তার বস্তুরভরের অতি সংকোচনজনিত হ্রাসপ্রাপ্তির কারণেই। 'গাইর' শব্দের ক্রিয়াসূচক বা ইনফিনিভ শব্দ 'ইগারাত' (يغارة) এর অর্থ হল কোন রশিকে পাকানো কিংবা প্যাঁচানো।[২২২] আমরা যদি এই অর্থটি গ্রহণ করি – তবে শব্দমূল 'গাইর' এর মধ্যে একটি রশি বা সুতার অস্তিত্বকে প্রচ্ছন্নভাবে দেখতে পাই। তখন ৩১ঃ১০ কিংবা ১৩ঃ২ আয়াতের অর্থও এই দাঁড়ায় যে, 'আকাশ বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও তা সমুচ্চ বা প্রসারিত করা জন্য আল্লাহ এমন এক প্রকারের রশি বা সুতার অবলম্বন নিয়েছেন যা অতিশয় সংকোচন ও হ্রাসপ্রাপ্ত আকারের কারণে দৃষ্টির অগম্য ও অদৃশ্য অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। ফলতঃ অবলম্বনবিহীন আকাশকে (মহাবিশ্বকে) সুউচ্চে ধারণ অর্থাৎ সুপ্রসারিত করার বিষয়টি যেমন একাধারে সত্য হয়ে পড়েছে , অনুরূপভাবে সত্য হয়ে এসেছে কোরআনের ধারণায় বর্ণিত মহাজাগতিক তারসমূহ কিংবা অনুরূপ অস্তিত্বের দাবীটিও। অর্থ্যৎ মহাজাগতিক তারের প্রবক্তাগণ যে অস্তিত্বের হিসাব নিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন – অসম্ভব নয় যে বিষয়টি একদিন বিজ্ঞানের উপাত্তে প্রমাণিত সত্য হয়ে আমাদের সম্মুখে কোরআনের দাবীর সত্যতাকে বাস্তব করে তুলবে।

www.pathagar.com

বিগ-ব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মহাবিশ্বের আজকের চেনা রূপ এবং এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টির মূলে বিজ্ঞানীগণ যে কসমিক স্ট্রীং বা মহাজাগতিক তারের দৃঢ় প্রত্যয় পেশ করে থাকেন, সেই মহাজাগতিক তার নিজেই কিন্তু অদৃশ্য। বিজ্ঞান যতই প্রযুক্তি লাভ করুক, যতই উন্নততর হউক এই তার চিরদিনই থেকে যাবে মানুষের চক্ষুসীমার বাইরে অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা হয়ে। যে কসমিক তার সারা মহাবিশ্বের সৃষ্টির মৌলিক কৃতিত্বের দাবীদার, সেই তারটি নিজেই চিরদিনের জন্য অদৃশ্য থেকে কোরআনের অদৃশ্যবাদের দাবীর প্রতি অতিশয় সুদৃঢ় সমর্থন জানায়। সমর্থন জানায় তা নিরাকার আল্লাহর অদৃশ্য অস্তিত্বের মহাসত্যতার প্রতি। ব্ল্যাক হোল, কসমিক স্ট্রীং এই সব বিজ্ঞানের অতি দুরূহ ও জটিল অস্তিত্বগুলো আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যায়, - "এই সমস্তই প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদের আহ্বান করে তাহা মিথ্যা" (৩১:৩০)।

'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। ইহকাল ও পরকালের প্রশংসা তাঁহারই ; বিধান তাঁহারই , তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে (২৮:৭০)। তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে , তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর (১০:১০১), জানিয়া রাখ আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্ব) ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই আল্লাহর। যাহারা আল্লাহর অংশরূপে অপরকে আহ্বান করে তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারাতো শুধু অনুমানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে (১০:৬৬)। অতঃপর (আল্লাহ) তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করিবেন কেয়ামতের দিনে, নিশ্চই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত (৫৮:৭)। প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক, তিনি কি উহাদের অক্ষম উপাস্যগুলির মত? অথচ উহারা আল্লাহর সহিত বহু অংশীদার স্থাপন করিয়াছে। বল, উহাদের পরিচয় দাও। তোমরা কি এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যাহা তিনি জানেন না? (১৩:৩৩)। সেদিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে (২৪:২৪)। সেদিন আল্লাহ তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহই সত্যের প্রকাশক (২৪:২৫)।

---

২০৩ । Sputnik, Oct 1987.
২০৪ । Light Upon Light - Md Ferdous Khan
২০৫ । ১ মাইক্রন = ১/১০০০ মিঃ মিঃ।
২০৬ । The Stars - Roger Hall.
২০৭ । National Geographic Vol - 145 No 5, 1974.
২০৮ । Galaxies and Quasars - Kaufmann.
২০৯ । মহাকালের ঠিকানা – অমল দাস গুপ্ত।

www.pathagar.com

২১০ । দেশ, ২৩ জুলাই' ৮৮।

২১১ । সুস্পষ্ট গ্রন্থ 'লাওহে মাহফুজে' রক্ষিত ; লাওহে মাহফুজের অর্থ বিদ্যুৎ বা আলো সংরক্ষক, অর্থদৃষ্টে মনে হয়, সুস্পষ্ট কিতাব' বিদ্যুৎ চৌম্বকত্বের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা সংরক্ষিত আছে। বলা দরকার যে মানুষ নূতনভাবে সৃষ্টি করতে পারে না, সৃষ্টকে আবিষ্কার করে থাকে মাত্র। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শব্দ, ছবি ইত্যাদি ধারণ ও সংরক্ষণের বাস্তবতা আমাদেরকে স্রষ্টার দ্বারা অধিকতর উন্নত পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে একটি সহজ ও স্বাভাবিক নির্দেশ প্রদান করে যায়।

২১২ । Nature, Spirituality and Science - Sukhraj Tarneja.

২১৩ । The Evidence of God in Expanding Universe.

২১৪ । Science in the USSR Vol -2 1989, (Statement by Andre Linde Lebedev Physics Institute, USSR).

২১৫ । Carl Sagan.

২১৬ । Race Against Time - Vasili Zakarchenko.

২১৭ । Science Report, Jul, 1988 (India).

২১৮ । দেশ, ২ জুলাই, ১৯৮৮ (ইন্ডিয়া)।

২১৯ । Science in USSR, ISSN 6203 - 4638 No 6, 1988.

২২০ । Science Report Jul, 1988.

২২১ । Arabic English Dictionary - F. Steingass.

www.pathagar.com

১৩
সৌরজগতের ধারণা

খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হবার সময় গ্রহদের সম্পর্কে মানুষের কি ধারণা ছিল, তা জানেন কি?

তৎকালীন বিজ্ঞান এবং বিশ্ববাসী এদের সংখ্যা জানত মাত্র ৫টি। তখনকার পৃথিবী প্রাচীন ব্যবিলনবাসীদের অনুসরণে এই পাঁচটি গ্রহের সাথে চন্দ্র ও সূর্যকে যুক্ত করে সৌভাগ্যসূচক সপ্তদেবতার পূজা-অর্চনার একটি ধারা সৃষ্টি করেছিল। জগৎ সংসারের রক্ষক ও বিধায়ক হিসাবে কল্পনা করে উল্লিখিত পাঁচ গ্রহের সংগে চন্দ্র সূর্যের নাম যুক্ত করে কল্পিত সাতটি প্রধান দেবতার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন জীবনের সাতটি দিন উৎসর্গ করে একটি সপ্তাহের সৃষ্টি করা হয়, যার সাতটি দিনই সাত দেবতার নামানুসারে শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র নামে ধার্য করা হয়।[২২৩] খ্রীষ্টীয় সাত শতকের মানুষ ঠিক এই সিদ্ধান্তটিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। এভাবে প্রাচীন ইতিহাস খ্রীষ্টীয় সাত শতকের মানুষের জ্ঞানে কেবল পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকার তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করে যায়। ১৬ শতকের মাঝামাঝি কোপার্নিকাসের রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী 'হেলিওসেন্ট্রিক থিওরী' সর্বপ্রথম পৃথিবীকে একটি গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করে। ১৮ শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত বিজ্ঞান এই গ্রহের সংখ্যাকে ৬টি বলেই জেনেছে। ১৭৮১ সালে স্যার উইলিয়াম হার্শেলের 'ইউরেনাস' আবিষ্কারের ফলে এতদিনের দৃশ্য সৌর পরিবারে নতুন আর একটি গ্রহের সংযোগ ঘটে। অতঃপর ১৮৪৬ সালে নেপচুন ও ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সৌর পরিবারের গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল নয়টিতে। আজ পর্যন্ত আমরা এই ৯টি গ্রহের সৌর ব্যবস্থার কথাই জানি।

সেই সাত শতাব্দীর পাঁচটি গ্রহে বিশ্বাসী দুনিয়ায় ঐশী প্রত্যাদেশ রূপে প্রাপ্ত কোরআন আমাদের সৌরজগতের গ্রহদের সংখ্যা কয়টি সে সম্পর্কে একটি তথ্য দান করেছিল। ১৪০০ বছর পর লব্ধ বাস্তবতায় অতি উৎকর্ষ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা প্রাপ্ত গ্রহের সংখ্যা এবং কোরআনের প্রস্তাব – এই দু'টির মাঝে অন্বয় ও বৈষম্য কোরআনের স্বর্গীয় সত্যতা বিচার করবার জন্য এক প্রত্যক্ষ মীমাংসা হতে পারে। সুদূর অতীতে বসে কোরআন সৌরপরিবারের যে চিত্র দিয়েছিল, তার মাপকাঠিতে কোরআনকে পরখ করে দেখার প্রয়াসে এই প্রবন্ধের আলোচনা মেলে ধরতে চাই।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, গ্রহ-নক্ষত্রের পার্থক্যের জ্ঞান মানুষের কাছে আসে গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের পর। মূল শব্দটি গ্রীক পণ্ডিতদের দেয়া

www.pathagar.com

'প্লেনিটি, (Planete) থেকে ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হবার কথাও আমরা অবগত হয়েছি। প্লেনিটির অর্থ হল পরিভ্রমণকারী। পশ্চাৎ পৃষ্ঠের নক্ষত্র খচিত আকাশ দৃশ্যতঃ স্থির এবং তাদের তুলনায় গ্রহদের দ্রুত স্থান পরিবর্তন করার কারণে ঐ যুগের মানুষ বিশাল আকাশে মাত্র ৫টি সঞ্চালনশীল স্বর্গীয় বস্তুর সন্ধান জানতে পেরে তাদের নামকরণের সময় বিশেষ সঞ্চালন গুণাগুণের অর্থটিকে সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই রূপ নামকরণ করেছিল বলে ইতিহাস জানিয়ে যায়।[২২৪]

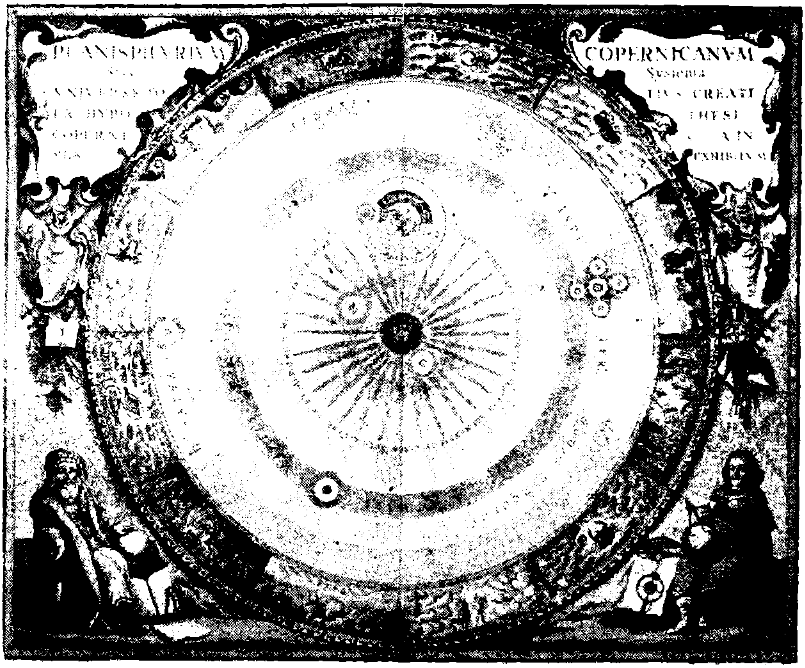

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মানুষ শুধুমাত্র ৬টি গ্রহের কথাই জানতো। গ্যালিলিওর অবলোকনের ভিত্তিতে এই চিত্রটি ১৯৬১ সনে অঙ্কন করা হয়েছিল।

যে যুগে মানুষ গ্রহদেরকে তাদের গ্রহ গুণাগুণে না চিনে অন্যভাবে জানত, যে যুগের মানুষ সৌর পরিবারের কোন ধারণাই রাখত না, সেই অজ্ঞতম যুগে কোরআন এসে তার অতি গুরুগম্ভীর, চৌকস ও জ্ঞানময় প্রস্তাবে এমন এক সৌরব্যবস্থার ধারণা

www.pathagar.com

প্রদান করল যে, শতাব্দীর আজকের জ্ঞানও তার তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমরা আল-কোরআনের ১২ নং সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে সেখানে সৌরজগতের একটি ধারণা পেয়ে যাই – "স্মরণকর, ইউসুফ তদীয় পিতাকে বলিয়াছিল, হে আমার জনক! আমি একাদশ গ্রহকে, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দেখিয়াছি আমার প্রতি সেজদা নত অবস্থায়" (১২ঃ৪)। আমি এই এগারোটি গ্রহ, একটি সূর্য এবং একটি চন্দ্র সমৃদ্ধ সৌরপরিবারের চিত্রটিই তুলে ধরতে চাই এখানে। এই বক্তব্যের কাছে আজকের দিন পর্যন্ত বিজ্ঞান কি করে কত দূর পিছিয়ে রয়েছে তাও আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করব। তার পূর্বে আয়াতটির প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য তফসীরসমূহের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বলা হয়ে থাকে, ব্যবহৃত শব্দ 'কাওকাব' ১১ সংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে হজরত ইউসুফের ১১ ভাইদের এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপমায় হযরত ইউসুফের পিতা মাতার কথা বুঝানো হয়েছে। এই বিষয়টির সঙ্গে একই সূরার ১০০ নম্বর আয়াত সংযুক্ত হওয়া বিষয়টি দৃঢ়তা পেয়েছে। হযরত ইউসুফের ভাষ্যে সুস্পষ্টতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে যে, পিতা-মাতা ও ১১ ভাইকে যখন হযরত ইউসুফ রাজদরবারে স্থান দিলেন সম্মান ও বিনয়ের সঙ্গে, তখন তারা হযরত ইউসুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের অনুভবে নতজানু কুর্ণিশ জানিয়েছিল এবং তাকেই কোরআনের ভাষ্যে হযরত ইউসুফের স্বপ্ন-দর্শনের ফলাফল হিসাবে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। অতএব, তরজমাকারীগণের 'কাওকাব' শব্দের রূপকে ব্যবহৃত ১১টি ভাইয়ের উদ্ধৃতি যথার্থই গ্রহণযোগ্যতার দাবী রাখে।

কিন্তু এই রূপক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত 'কাওকাব' এর আর কোন অর্থ থাকতে পারে কি? হতে পারে কি ১২ঃ৪ আয়াতের প্রচলিত অর্থের বাইরে আর কোন ব্যাখ্যা?

ফিরে চলুন ৩ঃ৭ আয়াতের দিকে। প্রস্তাব এসেছে, "তিনিই, যিনি তোমাকে দান করিয়াছেন জ্ঞানময় গ্রন্থখানি, যাহার মধ্যে রহিয়াছে সুস্পষ্ট নির্দেশ যাহা এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, আরও রহিয়াছে কতিপয় রূপক .... যাহাদের মনে কুটিলতা আছে, তাহারাই এই রূপক ও ভিন্নার্থক আয়াতসমূহ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে .... অথচ প্রকৃতপক্ষে এই সবের অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেন না।" অতএব, কোরআনের রায় অনুসারে বলা যায় যে, রূপক শব্দ ও বাক্যগুলোর বাহ্য অর্থকরণের বাইরেও অন্য বিবিধ অর্থ থাকা সম্ভব; এগুলো নিয়ে মানুষ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকারের মত পোষণ করার সম্ভাবনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহর জ্ঞানেই থেকে যাবার ধারণাটিও এই আয়াতের প্রতিষ্ঠিত ভাষ্য।

www.pathagar.com

যে কোন বিধর্মী, স্বধর্মী অনুবাদককেই মেনে নিতে হবে যে, কোরআনের বর্ণনাশৈলীর মধ্যে সবচাইতে যে কয়টি বিষয় অতিশয় চমকপ্রদ, তাদের একটি হল শব্দ ও আয়াতের অর্থের বহুমুখিতা এবং যুগোপযোগিতা রক্ষা করে যাওয়ার অতিশয় নিপুণতা। এ বিষয়টির উপর ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে এবং নতুন করে কোনভাবে বলবার আর দরকার নেই। আমরা সহজেই বলতে পারি যে, অন্য অনেক আয়াতের ন্যায় ১২ঃ৪ আয়াতের ক্ষেত্রেও একাধিক অর্থ নির্দেশনার সম্ভাবনা কোনভাবেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এখানে একটা যুক্তির আশ্রয় অবশ্যই নেয়া চলে যে, কোরআনের বর্ণনায় এমন অসংখ্য তথ্য রয়েছে যাদের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশ কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর ধারা বর্ণনায় সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ সংক্রান্ত ইতিহাস বর্ণনাতেও এমনি অনেক তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের একটি হয়ে আসে এই ১২ঃ৪ আয়াতটি। একটি অতিশয় সংগত বর্ণনায় খাপ খাওয়ানোর পর নিজে নিজেই আয়াতটি সম্ভবত মানুষের জ্ঞান গ্রাহ্য তথ্যের অতীত কোন সত্যের নির্দেশ করে থাকতে পারে। হতে পারে তা সঠিক গ্রহ-নক্ষত্র সমৃদ্ধ সৌরপরিবারের বাইরের কিছু কিংবা হতে পারে তা সৌরজগতের সম্পর্কে একটি তথ্য নির্দেশক জ্ঞানও। কি হতে পারে তার অর্থ?

আমি তাকেই সৌর পরিবারের চিত্র হিসাবে এখানে চিহ্নিত করছি। এর অবশ্যই সংগত যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ সৌরজগতের অত্যন্ত কাছাকাছি একটি চিত্র এখানে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ হযরত ইউসুফকে যদি মানুষজাতির প্রতিনিধি ধরা হয়, তবে সূর্য, চন্দ্র ও ১১টি গ্রহের সেজদা বা আনুগত্যের এই অর্থ হতে পারে যে, আমাদের এই সৌর দুনিয়া মহাবিশ্বের অতিশয় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও জীবনের উপযোগিতা তথা মানুষ জাতির সুখময় বসবাসের সকল ব্যবস্থা সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদা অনুগত থাকবে এবং সেবা দান করবে। পূর্ববর্তী আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত, "ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত" এই আয়াতাংশটি এইরূপ একটি ধারণায় উপনীত হওয়ার জোর সায় দেয়। অর্থাৎ আল্লাহ সম্পূর্ণ নতুন তথ্য প্রদান করেছেন, যে তথ্যটি কোরআনের এই আয়াত নাযেল হওয়ার পূর্বে কোন মানুষ অবহিত ছিল না। এই প্রত্যয়টি আমরা ১২ঃ৩ আয়াতের শেষ অংশেই পেয়ে যাই। হযরত ইউসুফের ১১ ভাই , পিতা-মাতার তথ্যটি একটি ইতিহাসঘটিত ব্যাপার যা মানুষ জাতির কাছে কোরআন অবতীর্ণ হবার আগেও হয়ত জানা থাকতে পারে। তাহলে কি সেই সম্পূর্ণ নতুন তথ্যটি যা মানুষ এর আগে কখনো জানত না? তা হল সৌরপরিবার এবং তার সুনির্দিষ্ট গ্রহ সংখ্যা। ১২ঃ৫ আয়াতেও এমনি আরো একটি যুক্তি পাওয়া যায়। এই আয়াতে, স্বপ্ন দর্শনে প্রাপ্ত ১১টি গ্রহের সংখ্যা সম্মিলিত

www.pathagar.com

সৌরজগতের সেজদাবনত হওয়ার বিষয়টি হযরত ইউসুফের ভ্রাতা তথা মানুষ জাতিকে তখন না জানানোর জন্য আল্লাহর নির্দেশ দানের তথ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত বহন করে। এই আয়তাংশও ১২ঃ৪ আয়াতে সৌর জগতের ধারণার বিষয়টিকে জোরদার করে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন, গ্যালিলিওর ভাগ্যহীনতার কথা। পৃথিবী সূর্যের চার পাশে ঘুরে , এমনি একটি সত্য ধারণায় সমর্থন জানানোর জন্য চার্চের ধর্মযাজকগণ তাকে অকথ্য অত্যাচার করেছিল। সমস্ত মানুষ যেখানে ৫টি গ্রহের সুদৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস বিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাদেরকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত, সে সময়ে তাদের সংখ্যায় ১১টির দাবী আনলে কথিত প্রস্তাবের কি পরিণতি হতে পারত, তার হাজার বছর পরের গ্যালিলিওর 'হোলি ইনকুইজিশন' কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার হৃদয়বিদারক ঘটনা হতেই বুঝতে পারা যায়। আর সে বিষয়ে বুঝি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে দিয়ে ১২ঃ৫ আয়াত জানিয়ে যায় যে, কোরআন অবতীর্ণ হবার সময়ে গ্রহের সঠিক সংখ্যা জোর দিয়ে প্রকাশ করা অনুচিত, কারণ সময় তার নিজস্ব প্রকৃতিতে সত্য তথ্যটি উদঘাটন করে নেবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা। তারপর ১০০ নম্বর আয়াতে দেখা যায়, পিতা-মাতা ১১ ভাইবিশিষ্ট পরিবারটি হযরত ইউসুফের দরবারস্থিত ও আসনপ্রাপ্ত হয়েছেন যার অর্থ হতে পারে কোনদিন হয়তবা ১১ সদস্যবিশিষ্ট সৌরপরিবারের সুনিশ্চিত তথ্য মানুষের হাতে এসে পৌছাবেই। ১২ ঃ ১০০ আয়াতের একটি অংশ আমাদের মনযোগ আকর্ষণের দাবী করে, "আমার পালনকর্তা ইহাকে (স্বপ্ন) সত্যে পরিণত করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ যদি হযরত ইউসুফের ১১ ভাইকে নির্দেশ করার জন্য ১১টি 'কাওকাব', এবং পিতা ও মাতাকে সূর্য ও চন্দ্রের উপমায় কোরআনে উপস্থাপন করে থাকেন তাহলে আমরা এক কঠিন বিপত্তির মুখোমুখি হই। আমরা জানি যে হযরত ইউসুফের পিতা একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন এবং স্বপ্ন দর্শনের সময় হযরত ইউসুফ নবুয়ত্ত লাভ করেন নাই। চন্দ্র সূর্য হযরত ইউসুফের পিতা-মাতার উপমা হলে এখানে যে বির্তকের সৃষ্টি হয়, তা হ'ল— প্রথমতঃ একজন নবী কর্তৃক একজন অ-নবীর প্রতি অবনত-শির হওয়ার যুক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ একজন পিতা কর্তৃক পুত্রের সম্মানে আনত মস্তক হওয়ার অপ্রাসংঙ্গিক বিধানে কোরআনের সম্মতি যা সঙ্গত কারণেই গ্রহনযোগ্যতা হারায়। অন্যপক্ষে 'কাওকাব' শব্দে রূপায়িত ১১টি ভাই -এর জন্য ১১ নক্ষত্র কিংবা ১১ গ্রহের উপমা কোনক্রমেই জোরালোভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় না, কারণ স্বপ্নের উপমা হিসাবে ১১টি 'কাওকাব' একটি পুতঃপবিত্র ধারণার সাথে বিসংশ্লিষ্ট হয়ে আসে, সেখানে ১০টি ভাই ছিল দুরভিসন্ধিকারী ও খলপ্রকৃতির। ১০০ নম্বর আয়াতে "আমার পালনকর্তা ইহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন" -এর অর্থ করা যায় যে, নবীর স্বপ্ন-দর্শনে প্রাপ্ত সূর্য ও চন্দ্র পরিবারের ১১ সদস্য বিশিষ্ট গ্রহদের (কাওকাব) অস্তিত্বই একদিন বাস্তব সত্যে পরিণত হয়ে এই আয়াতের স্বার্থকতার বিষয়টি প্রোজ্জ্বল করবে। অর্থাৎ দৃষ্ট স্বপ্নের মত বাস্তবের ১১টি গ্রহবিশিষ্ট সৌরপরিবারের প্রস্তাবটি একটি

www.pathagar.com

সম্ভাবনার জানালায় উঁকি দিয়ে উঠে। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায় — "আমার পালনকর্তা উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন" অর্থটি লেখক জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন কি না। এর উত্তর সুস্পষ্টভাবে - "না"; কারণ রূপক অর্থে ১১ জন ভাই এর ধারণা বৈধ হিসাবে গ্রহণ করার সাথে সাথে ১১টি গ্রহের দাবীকেও এনে দাঁড় করানো যায় এই জন্য যে, কোরআনের বর্ণনা এক সুদীর্ঘ কালের পরিমাপে; বর্তমান বিজ্ঞান যে ভাবে প্রত্যাশা করছে - তা যদি কখনো বাস্তবে পরিণত হয় — তবে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মানব গোষ্ঠীর জন্য কোরআনের বাণীর এই ধারণাটিই অধিকতর গ্রহণীয় হবে। অর্থাৎ আমার প্রভূ উহা সত্যে পরিণত করিবেন (ভবিষ্যৎ বাচক) এই রকম অর্থকরণের দ্বারা কোরআনের বাণীর গতি-প্রকৃতি বিঘ্নিত হবে। উপরে পেশকৃত যুক্তিসমূহের আলোকে আমরা যদি এই ১২ ঃ ৪ আয়াতকে সৌরজগতের ধারণা-প্রস্তাব করেছে বলে ধরে নেই , তবে সম্ভবত তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা আমাদের প্রকল্পে চন্দ্র-সূর্য ছাড়া ১১ গ্রহবিশিষ্ট একটি সৌরজগতের চিত্র উক্ত ১২ ঃ ৪ আয়াতে পেশ করা হয়েছে বলে ধরে নিয়ে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে চাই।

কিন্তু আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী সৌরজগৎ এগার গ্রহ-সদস্যের নয়, আমরা এ পর্যন্ত মাত্র ৯টি গ্রহের কথাই জানি। তাহলে কি আল-কোরআন বিজ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে গেল? মিথ্যা হয়ে গেল কি কোরআনে মহান আল্লাহর ঘোষিত চ্যালেঞ্জ - "ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে (১২ঃ১১১)। তাঁহার মহাবাণী অবশ্যই সত্য (৬ঃ৭৩)। আল্লার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই - উহা এক মহা সাফল্য" (১০ঃ৬৪)? এই প্রেক্ষাপটে কোরআনকে ভুল প্রমাণিত করবার দুর্বার উৎসাহে যদি কোন ব্যক্তি প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকেন, তবে তার উদ্দেশে এবারও বলছি - দুঃখিত, মহান আল্লাহ এমন কোন আবেগকে নির্ণয় করে বুঝি কোরআনেই গেঁথে দিয়েছেন তার জবাব - "দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসংগতি প্রত্যক্ষ করিবে না" (৬৭ঃ৩)। আল্লাহর প্রজ্ঞাময় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এই কোরআনে সংবেদিত সৌরজগৎ সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ক জ্ঞানটিও এমনি চ্যালেঞ্জের মহিমায় উদ্ভাসিত একটি বিশুদ্ধ সত্য বই কিছুই নয়। আমাদের ইপ্সিত মীমাংসায় পৌঁছার লক্ষ্যে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ প্রদান করব।

আমরা আবার ফিরে যেতে চাই ১২ঃ৪ আয়াতে। উল্লেখ্য যে, কোরআনের এই আয়াতের প্রচলিত অনুবাদসমূহে 'কাওকাব' শব্দটি গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা শুধু নক্ষত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকটি অনুবাদকে পাশাপাশি এনে তুলনা করলেই আপনি শব্দটির প্রকৃত অর্থের বিষয়ে একটা দোটানায় পড়বেন। ব্যবহৃত শব্দে 'কাওকাব' (كوكب) এর আভিধানিক অর্থ হল গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ।[২২৫] আমরা অবগত রয়েছি যে, কোরআনের বর্ণনায় একটি অদ্ভুত অনির্দিষ্টতার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে , কিন্তু এর কোথাও অনিশ্চয়তার অবকাশ কিংবা সিদ্ধান্তে দোটানা পরিস্থিতি

www.pathagar.com

নেই। আমরা যদি উল্লিখিত 'কাওকাব' শব্দটির উভধর্মী অর্থ গ্রহণ করি, তবে এর অর্থটি দাঁড়ায় যে, হযরত ইউসুফ ১১টি গ্রহ ও নক্ষত্র, একটি সূর্য ও একটি চন্দ্র দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সুস্পষ্টতা যেহেতু কোরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, শব্দটির অর্থ হয় ১১টি গ্রহ অথবা ১১টি নক্ষত্র এই দুয়ের যে কোন একটি হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, কোরআন 'কাওকাব' শব্দকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে সুনির্দিষ্ট করা আছে। ২৪ঃ৩৫ আয়াতটি লক্ষ্য করুন, - "আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের আলো। তাঁহার আলোর উপমা যেন একটি তাক যাহা কুলংগী, যাহার মধ্যে রহিয়াছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রহিয়াছে একটি কাঁচের পাত্রে। এই কাঁচের পাত্রের আবরণটি যেন একটি কাওকাব (গ্রহ) যাহা মোতির মত ঝকমক করিতেছে"। এই আয়াতের চিত্র বিচারে আমরা 'কাওকাবকে' কোরআন যে অর্থে ব্যবহার করেছে , তাকে কখনও নক্ষত্র বলতে পারি না। আলোক বিচ্ছুরণকারী প্রদীপকে মাঝখানে রেখে তার চতুরপার্শ্বে অবস্থানকারী কাঁচের পাত্র যা প্রদীপের আলোকে আলোকিত, সেই পর উৎস হতে প্রাপ্ত আলোকে ঝকমক করা কাঁচ পাত্রকে 'কাওকাব' -এর সাথে তুলনায় এনে কোরআন সুস্পষ্টভাবে শব্দটির গ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়কে সুনিশ্চিত করেছে। তা আরো নিশ্চিত হওয়া যায় উল্লিখিত "কাওকাব" শব্দটির উজ্জ্বলতা গুণ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত বিশ্লেষণ 'দুররি উ' (درى) এর ব্যবহার দ্বারা যার অর্থ হল প্রতিফলনজাত উজ্জ্বলতা বা ঝকমকে উজ্জ্বলতা (glittering)। কিন্তু এর পরের শব্দটি 'ইউক্কাদ' (يوقد) -এর ব্যবহার অত্যন্ত নির্দেশ জ্ঞাপক। কুলংগীর প্রদীপের প্রজ্জ্বলন বুঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (ইউক্কাদু) -এর মূল হল 'ওয়াক্কাদা' (وقد) যার অর্থ হল প্রজ্জ্বলিত করা, আগুন জালানোর জন্য ইন্দন যোগানো ইত্যাদি (ignite, light, burn, kindle etc)[২২৩]। অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে কোরআন মনীষা এ দুটি শব্দের ব্যবহারে সচেতন। আমরা দেখতে পাই - প্রদীপের চারিদিকে বেষ্টিত কাঁচের উজ্জ্বলতাকে বুঝাতে অন্য শব্দ 'দুররিউ' - এর ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট। এই 'দুররিউ' উজ্জ্বলতার সংগে সংশ্লিষ্ট এবং 'কাওকাবকে' নির্দেশ করে যদ্দারা এখানে 'কাওকাব' এর গ্রহের অর্থটি অতিশয় সুস্পষ্ট। আমরা তখন এই যুক্তিতে উপনীত হই , কোরআন অনুবাদে প্রচলিত তরজমাসমূহে যারা অন্ততঃ এই আয়াতের উল্লিখিত 'দুররিউ' এবং 'ইউক্কাদ' এর আভিধানিক ও প্রয়োগিক অর্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে আয়াতে ব্যবহৃত 'কাওকাব' শব্দের নক্ষত্র অর্থে অনুবাদ করেছেন, তারা অবশ্যই সঠিক তরজমা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য কোরআনে দু'এক স্থানে 'কাওকাব' শব্দের অর্থ সমষ্টিগত ব্যবহার পেয়ে গ্রহ ও নক্ষত্রের সম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করার দৃষ্টান্তও রয়েছে যা ২৪ঃ৩৫ আয়াতের প্রেক্ষাপটের মত নয়।

www.pathagar.com

এই ২৪ঃ৩৫ আয়াত আমাদেরকে সৌর ব্যবস্থার কিছুটা ইংগিতও প্রদান করে থাকে। প্রদীপ-সদৃশ সূর্যের চারিদিকে কাঁচের পাত্র সদৃশ গ্রহ এর ধারণাটি সহজভাবেই আসে। কিন্তু আমাদের প্রকল্প হল ১১টি গ্রহের হিসাব মিলানো। আমরা নবম গ্রহের অব্যাহতি পরে আর কোন গ্রহের কথা জানি না। অথচ কোরআনের ১১ গ্রহের প্রস্তাব কোনক্রমেই মিথ্যা হবার কথা নয়। আমি আশা করছি যে, সুধী পাঠকের কাছে এর হিসাব মিলিয়ে দেব। চলুন আমরা আরেক ধাপ সামনে এগিয়ে আসি।

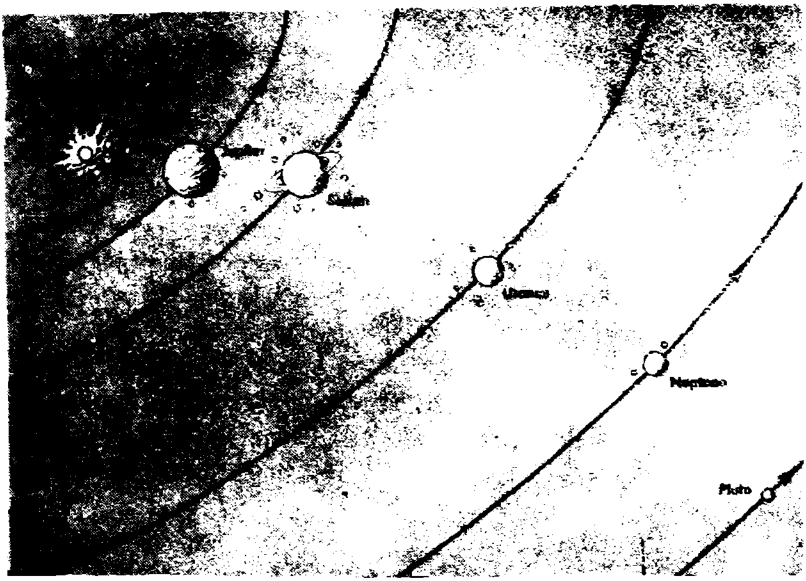

জানা সৌরজগত ৩৮ সৌর একক দূরত্বে অবস্থিত প্লুটো পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ব্যবস্থাটি গাণিতিকভাবে আরো অধিক দূরত্বে আরো অজানা গ্রহের সম্ভাবনার দাবী করে।

আপনারা হয়ত 'নিউট্রিনো' (neutrino) এর নাম শুনে থাকবেন। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামক তিনটি অতিক্ষুদ্র কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু হতে বিটা কণিকা নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিক পলি এটিকে 'নিউট্রিনো' নাম দিলেন। সূর্য হতে নির্গত নিউট্রিনোর দৃশ্য প্রবাহে (Ovserved flux of Solar neutrinos) এক প্রকার অসামঞ্জস্য সকল বিজ্ঞানীকে এক মহাভাবনায় ফেলেছে। নিউট্রিনোর গতি প্রবাহ কেন অনুমানকৃত পথ ছেড়ে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয় এবং তত্ত্বের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে, বিজ্ঞানীরা তার অনুসন্ধান

www.pathagar.com

চালাচ্ছেন। অনুরূপভাবে সৌরজগতের বড় বড় গ্রহগুলির দৃশ্য কক্ষপথ এবং অনুমেয় কক্ষপথের মধ্যে রয়েছে এক বৈষম্য। এই বৈষম্যের কারণ কি হতে পারে? জর্জ ও এ্যাবেল (George O Abell) – এর লেখা হতে এই উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন, There is as yet, no understanding of the discrepancy between the observed flux of solar neutrinos and that predicted by the best available theory. Discrepancy between observed and predicted motions of the major planets in our solar system may be due to the tenth planet.[২২৭]

বিজ্ঞানগীণ যে সকল তথ্য প্রমাণ ও উপাত্তের ভিত্তিতে এই দশম গ্রহের যুক্তি ডেকে আনেন, তা এই জন্য যে শুধুমাত্র পুটোর পর অতিকায় এক বা একাধিক গ্রহের অবস্থান বিবেচনা করলেই প্রাপ্ত সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। পারসিভাল লওয়েল (Percival Lowell) ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথের অস্থিরতা (perturbation of uranus orbit) দেখে তিনি ও তার দল যে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালান, যার ফলশ্রুতিতে একদিন (১৯৩০ সালে) পুটো আবিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীগণ পুটোর আবিষ্কার দ্বারাও ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথের অস্থিরতার ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। হিসাব করে দেখা যায়, পুটো পৃথিবীর মাত্র তিন শ' ভাগের একভাগ কিংবা তারও কম। অন্যপথে অনুমেয় গ্রহের ভর কমপক্ষে পৃথিবীর ১০ গুণ হওয়া চাই। পুটোর স্থান কিংবা তার অনেক বাইরে অনুমেয় গ্রহটি আবিষ্কৃত পুটোর চাইতে কমপক্ষে ৩০০০ গুণ বেশী না হলে উদ্ভুত সমস্যাগুলোর কোন সঠিক সমাধান দেয়া যায় না। তাই বিজ্ঞানীগণ জোর দাবী রাখেন, অজ্ঞাত গ্রহ বা Planet - 'X' অবশ্যই রয়েছে যার আকৃতি হচ্ছে বিশাল, অন্তত পুটোর তুলনায় তা অতিশয় বড়।[২২৮]

Partica Barnes Svarney তার Chronology of planetary Bombardent শীর্ষক প্রবন্ধে জানান যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধূমকেতুদের ফিরে ফিরে সৌরজগতে প্রবেশ করার নেপথ্যে planet - X এর কারসাজি থাকতে পারে। বিজ্ঞানীগণ এই প্লানেট এক্স -কে কিভাবে দেখে থাকেন, তা তার লেখা হতে দেখা যায়, Another theory points to planet - X as yet undiscovered member of our solar system believed to lie past the orbit of Neptune that rocks the inner Oort cloud . . . .planet X would have to have an extraordinary orbit to produce a 30 million years cycle.[২২৯]

আমাদের সৌরজগতের গণ্ডী-মধ্য-মেঘপুঞ্জ কোন এক অজ্ঞাত দর্শন গ্রহ কর্তৃক আন্দোলিত হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা, যার একটি সৌর বছর হবে ৩ কোটি বছরের বিশাল সময়ে আর সেই গ্রহ অবশ্যই হবে অতি দূর-দূরান্তের কোন অজ্ঞাত ঠিকানার অধিবাসী।

www.pathagar.com

"সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় পুটোর ভর পৃথিবীর ৩৮০ ভাগের এক ভাগ। এমন একটি ক্ষুদ্র গ্রহের পক্ষে ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথের বিচ্যুতি আনয়ন করা প্রশ্নাতীত। বিগত ২০০ বছরের ইতিহাসে আমরা মাত্র তিনটি গ্রহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আমাদের নিজদেরকে এ জিজ্ঞাসাটি করতে পারি - 'আমরা শীঘ্রই দশম গ্রহের আবিষ্কার আশা করতে পারি কি? এমন কোন আবিষ্কার খুব শীঘ্রই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, পুটোকে পশ্চাৎ পিঠের প্রায় দুই কোটি দৃশ্য সম-উজ্জ্বল ও অধিকতর উজ্জ্বল বস্তুদের মাঝ হতে খুঁজে নেয়া হয়েছে যাদের সিংহ ভাগই হল নক্ষত্র। সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, পুটোকে খুঁজে পাওয়ার অনুরূপভাবে এই কাংখিত দশম গ্রহকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই বস্তুটি যদি অতিশয় দূরবর্তী অঞ্চলের হয় তবে পশ্চাৎ পৃষ্ঠে অবস্থিত নক্ষত্রদের হতে তাকে পৃথক করে খুঁজে পাওয়া হবে এক অতি দুরূহ ব্যাপার। যাই হোক, পুটোর কক্ষপথ কোন কারণেই সৌর দুনিয়ার শেষ সীমা হতে পারে না" ।[২৩০]

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা অনুভব করি যে, 'দশম গ্রহ' নামক আজকের দিনের কল্পিত অস্তিত্বের মাঝে বিজ্ঞানীগণ তাদের বহু সমস্যার উত্তরকে খুঁজে পাবার প্রয়াসে রয়েছেন। বিজ্ঞানীদের এ সব বিবেচনায় কত দূর বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে? বিজ্ঞানীদের কল্পনা কতদূর সত্যাসত্যের উপর দাঁড় করানো? আপনারা হয়ত জানেন, Science is a purely mental construct, science is a method of thinking.[২৩১] বিজ্ঞান একটি নিখুঁত মানষিক সংগঠন, ভাববার একটি বিশেষ পদ্ধতি। পৃথিবীর সকল বড় বড় আবিষ্কারের ইতিহাসে এই সত্যটির যথার্থতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৬৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্থনী হিউইশ ও তার ছাত্রী জোসলীন বেল স্পন্দনশীল বেতার উৎস বা পালসার আবিষ্কার করে। ঠিক তারই কল্পনা করে অনুরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-চিত্র প্রদান করেছিলেন ফ্রিটজ জুইকি ৩০ দশকের গোড়ার দিকে, বস্তুটি আবিষ্কৃত হবার ৩৫ বছর পূর্বে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ব্ল্যাকহোল -এর অস্তিত্ব নিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ফরাসী বিজ্ঞানী লা প্লাস তার কল্পনা করেছিলেন, বর্তমান শতাব্দীর ৩০ দশকে তার সম্পর্কে মানুষ দ্বিধাদন্দ্বের সাথে এগিয়ে চলতে শুরু করে, ৬০ এর দশকে মানুষ এর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং ৭০ দশকের গোড়ায় তা মানুষের জ্ঞানচোখে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। অনুরূপ ইতিহাস বিজ্ঞানে আরো হাজার হাজার রয়েছে। বিজ্ঞানীগণের এমনি অনুমান পদ্ধতি যে পরিণামে বাস্তব হয়ে আসে তা ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়েও আমরা আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

প্লুটোর পর আর কোন গ্রহ থাকতে পারে না, এমনি ধারণা যারা পোষণ করেন, তাদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই – আমরা জ্ঞানের ও জানার চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছি কি? আমরা যদি এমন কিছু ভাবতে শুরু করি – তবে সে হবে আমাদের চরম অজ্ঞতার একটি বড় রকম পরিচয় Ian Ridpath এ বিষয়ে উত্তরটি দিয়েছেন – It would be foolish to think that we have final answers to ... questions ...... of the universe .... But, in say 5o years, our ideas may be completely different. In centuries to come, our present views of cosmology may seem as naive as those of the ancient Greeks do to us.[২৩২] এই মতামতের সত্যতা আমাদেরকে জ্ঞানের এক মহা বিস্তার বৈষম্যের অস্তিত্বটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে যায় যে, আমরা কোন অবস্থাতেই জানার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছিনি। সৌরজগৎ যে প্লুটোর পরেও বিস্তৃতি নিয়ে আছে , তার যুক্তিতে বিজ্ঞানীরা আজ তাই সুদৃঢ়।

এখানে সময়ের একটি মাপকাঠিও বিচার্য। ১৭৮১ সালে সর্বপ্রথম তদানীন্তত দৃশ্য সৌর ব্যবস্থার বাইরে ইউরেনাস নামক একটি গ্রহ রয়েছে – সে তথ্য জানলেন স্যার উইলিয়াম হার্শেল। ইউরেনাসের কক্ষ অস্থিরতার উপর অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এসে সুদীর্ঘ সময়ের পর আবিষ্কৃত হল নেপচুন ১৮৪৬ সালে, ৬৫ বছর পরে। নেপচুনের ভর ইউরেনাসের উপর অস্থিরতা সৃষ্টিতে যতদূর কার্যকর হওয়ার কথা, এর পরও দুই গ্রহের কক্ষপথ এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার পর প্রতীয়মান হয় যে, ইউরেনাসের কক্ষের অস্থিরতা সৃষ্টিকারী গ্রহ নেপচুন নয়, তার জন্য Planet - x এর ব্যাখ্যা করা হল। ১৯৩০ সালে নেপচুন আবিষ্কারের ৮৪ বছর পর খুঁজে পাওয়া গেল এক অতি দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফসল হিসাবে প্লুটোকে । কিন্তু হায়! প্লুটো যে সেই Planet-x নয়, বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে অতিশয় সুদৃঢ়। এখন ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ইত্যাদির আবিষ্কারের জন্য সময়ের পার্থক্যের যে প্রগমণ আমরা লক্ষ্য করি, তাতে দেখা যায়, দশম কোন গ্রহের আবিষ্কার একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময় ছাড়া তার পূর্বে সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি প্লুটোর পরেও গ্রহ থাকতে পারে। এই অনুমান বিজ্ঞানসিদ্ধ।

কেন এই বিশাল ব্যাপ্তির সময়ের প্রয়োজন পড়বে তার ব্যাখ্যা রয়েছে অনেক। অতিদূরবর্তী ধারণাকৃত গ্রহের সৌর বছর বিজ্ঞানীগণ ইতিমধ্যে অনুমান করেছেন যা অতিশয় বিশাল সময়কালের। দূরবর্তী আকাশের পানে টেলিস্কোপ তাক করার মধ্যে চুলচেরা পার্থক্যের জন্য এক অকল্পনীয় বিস্তারের ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে যার কারণে planet-x কিংবা যে কোন জ্ঞাত–অজ্ঞাত বস্তু অতি সহজেই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। গ্রহরা একটি নির্দিষ্ট পথে বা তলে অবস্থান করে। এই তলটি কোথায়, কত উচ্চতায় তার জন্য বিজ্ঞানীদেরকে কেবল তত্ত্ব ও অনুমানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

তারপর যদিও সেই তলকে খুঁজে পাওয়া গেল, যা অতিশয় দূরূহ ব্যাপার, তার পরও সেই অজ্ঞাত গ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে স্থানে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই বিন্দুটিতে প্লুটোর পুনঃ দর্শনের জন্য আমাদিগকে আরো অপেক্ষা করে থাকতে হবে কমপক্ষে ১৯০ বছর (১৯৮৮ সালের ভিত্তিতে)। অবস্থানজনিত কারণে যদি সেই অজ্ঞাত গ্রহ আমাদের নিকটবর্তী না হয় এবং অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কৃত না হয়, তবে নিকট ভবিষ্যতে তার আবিষ্কার সম্ভাবনা খুবই কম। গ্রহগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এমন যে, তারা কোন আলোক উৎক্ষেপণ করে না এবং অতিশয় দূর-দূরান্ত হতে নির্ণয়যোগ্য কোন প্রকার শব্দ বা আলোক তরঙ্গ প্রেরণ করে না। অতএব, প্লুটোর পরে কোন গ্রহ থাকলেও যে তা ধরা পড়বেই এমন কোন নিশ্চিত যুক্তি নেই।

আমরা দেখতে পাই – প্লুটোর পরবর্তী দুনিয়ায় কোন গ্রহ নেই এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ; কিন্তু থাকতে পারে, এই সপক্ষে অসংখ্য প্রমাণভিত্তিক যুক্তি রয়েছে। সুধী পাঠককে এবার আমি যুক্তি ও আবেগের বাইরে একটি অতি সাম্প্রতিক তথ্য অবগত করব। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা সাম্প্রতিকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আরো দুটি গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আঁচ করছে। জনৈক জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের একটি তথ্য আপনাদের সামনে পেশ করছি। তিনি ভারতে একটি প্রথম সারির পত্রিকা 'দেশ' – এ মহাবিশ্বের "তিন দুর্বোধ্য জ্যোতিষ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ... সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার একক (Astronomical unit) বলা হয়। আমাদের পরিচিত দূরত্বের মাপকাঠিতে এটি হল প্রায় ১৫ কোটি কিঃ মিঃ। আলোর গতিতে এই পথ অতিক্রম করতে লাগে ৮ মিনিট। সূর্য হতে বৃহস্পতির গড় দূরত্ব পাঁচ একক, শনিগ্রহের দূরত্ব নয় একক, ইউরেনাস উনিশ একক আর সবচাইতে দূরের জানা গ্রহ পুটোর প্রায় আটত্রিশ একক। এর বাইরে প্রায় এক'শ একক দূরত্বের মধ্যে আরো দুটি গ্রহের অস্তিত্ব অনেকেই অনুমান করেছেন, কিন্তু পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে এখনো কেউ প্রমাণ করতে পারেননি"।[২৩৩] অর্থাৎ বিজ্ঞান নিজেও কোরআনের দাবীকৃত ১১ গ্রহের সৌর ব্যবস্থার প্রতি আজ সমর্থন দিচ্ছে তার সর্বশেষ যোগ্যতা আর প্রযুক্তির সকল সাধ্য ক্ষমতায়।

সুধী পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের এই অধ্যায় এবং তার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কিছু যুক্তি এবং আলোচনা? আমি বলার প্রয়াস রেখেছি যে, বিজ্ঞানীদের কল্পনা ও বিশ্বাসের বিষয়টি অতিশয় সুদৃঢ় যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণে সিদ্ধ। আজ বিজ্ঞানীরা যা কিছু কল্পনায় এঁকেছেন, দিন যুগ আর কালের কোন এক পর্যায়ে তা সত্য ও বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। একইভাবে দূরের দুটি বর্ণিত অজ্ঞাত গ্রহ একদিন আবিষ্কৃত হবেই ; (জ্যোতির্বিদ্যার সমস্ত ইতিহাসই এ যুক্তির পৃষ্ঠপোষক)। তখন মানুষ কোরআন ও মানুষের আবিষ্কারের ফসলরূপ জ্ঞানের পার্থক্যে ইতিহাসের

www.pathagar.com

স্বাক্ষর হবার প্রত্যয়ে সংযোজিত হতে দেখবে আরো একটি প্রমাণ। সময় অবশ্যই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে যে, বিজ্ঞান বাস্তবিকই কোরআনের জ্ঞান হতে পিছিয়ে রয়েছে হাজার হাজার যোজন। যেদিন এই অজ্ঞাত দুই গ্রহ তাদের অস্তিত্বের উন্মোচন ঘটাবে, তখন হয়ত আমরা আজকের সময়ের মানুষের কেউই পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। হয়ত সেদিন আমার এই প্রবন্ধটি খ্যাতির শীর্ষে সুনাম কুড়াবে। সেইদিন আবারো প্রমাণিত হবে মহান আল্লাহর মহা সত্য বাণী - "এই গ্রন্থের বাণীসমূহের উপর কোন সন্দেহ নাই (২ঃ২)। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁহার নূর (জ্ঞানের আলোক) কে পূর্ণতা বিধান করিবেন" (৯ঃ৩২)।

সুধী পাঠক, আমরা আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছি , বাকী থেকে যাচ্ছে একটি বিনীত প্রতিবাদ। ডঃ মরিস বুকাইলি তার "দি বাইবেল দি কোরআন এণ্ড সায়েন্স" পুস্তকে ১২ ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে একটি অস্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হয়ে কোরআন সম্পর্কে একটি অমার্জিত মন্তব্য করেছেন যা অত্যন্ত অনুচিত। তিনি প্রস্তাবিত ১১সংখ্যক গ্রহের ধারণাকে কোরআন মনীষার একটি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন কাল্পনিক ধারণা বলে আখ্যা দিয়েছেন। আজকের দুনিয়ায় বিষয়টির নতুন করে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, আল-কোরআনে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য ও ধারণা সমূহ এক অতিশয় জ্ঞানী প্রতীতির অতি বিজ্ঞানপূর্ণ পরিকল্পনায় শুদ্ধ। কয়েক দফা কম্পিউটার কর্তৃক প্রমাণিত হবার পর কোরআনের যে বিজ্ঞতার সাথে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি , তার পরে ডঃ বুকাইলির এহেন মন্তব্য করার কোন সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি না। এই বই এর শর্ত - ১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টিকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করছি , আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে, এত উচ্চাংগের বর্ণনা পদ্ধতি ও তথ্য পরিবেশনার পাশে "নিছক ধারণা মাত্র" এমনি কোন প্রকার মন্তব্যের সুযোগ নেই। আজকের বিজ্ঞানের আরো দুটি গ্রহের বিশ্বাসটি অবশ্যই ১২ ঃ ৪ আয়াতের ১১ গ্রহের শর্ত পূরণ করে। ডঃ মরিস বুকাইলিই যেহেতু জ্ঞানের শেষ সনদ নয়, সেহেতু তার এ হেন উক্তির জন্য দুঃখিত হওয়া এবং বক্তব্যের সংশোধন সাধন করা উচিত। কোরআনের আয়াতে এর জবাব হল এই যে - "তাহারা যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নাই - তাহা অস্বীকার করে" (১০ঃ৩৯)।

আমরা যা নিশ্চিত নই , এমন কোন বিষয়ে আমাদের কিংবা ডঃ মরিস বুকাইলি - কারো উচিত হবেনা যে আমরা আমাদের অজ্ঞানতা কোরআনের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাদের সীমিত জ্ঞানের সিদ্ধান্তে অটল থাকি। আমাদের মনে রাখা উচিত - "আল-কোরআন কোন জ্যোতিষীর উক্তি নহে - যদি তোমরা বুঝিয়া থাক (৬৯ঃ৪২)। বরং উহা জগৎ সমূহের প্রভুর নিকট হইতে অবতীর্ণ (৬৯ঃ৪৩)। যদি মোহাম্মদ আমার উপর কোনরূপ বানাইয়া বলিত (৬৯ঃ৪৪), আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত

www.pathagar.com

কব্জা করিতাম (৬৯ঃ৪৫); তার পর তাহার জীবনী শিরাটি কর্তন করিয়া দিতাম" (৬৯ঃ৪৬)। এই টুক সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপরই। সে ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমাদের মত মানুষ কতটুকু সাবধানতার সাথে দেখা উচিত? আল্লাহর বাণীর উপমাকৌশলের আমরা কত দূরইবা বুঝতে সক্ষম রয়েছি? নীচের এই তথ্যপূর্ণ আয়াতখানি লক্ষ্য করুন ঃ-

"আমি মানুষের জন্য এই কোরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। অথচ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই তর্ক প্রিয়" (১৮ঃ৫৪)।

(ওহে মুহাম্মদ) "আমিতো তোমারই ভাষায়, কোরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার (১৯ঃ৯৭)। ইহা (কোরআন) মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য; যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে (১৪ঃ৫২)। নিশ্চয় নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কোন কিছু আল্লাহর কাছে অদৃশ্য নাই (৩ঃ৫)। কোরআন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক মহাসম্মানের বস্তু, তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে (৪৩ঃ৪৪)। কোরআন তোমাদিগের জ্ঞানচক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে ব্যক্তি দেখিতে পাইল - সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করিল (৬ঃ১০৪)। এই সব হইতেছে উপদেশ পূর্ণ বিবরণ, অতএব, যাহার ইচ্ছা, সে নিজ পালন কর্তার দিকের পথ গ্রহণ করুক" (৭৬ঃ২৯)।

---

২২৩ । Investigating the Earth - Hoghton Mifflin Company.
২২৪ । Junior Oxford Encyclopedia Vol - 3.
২২৫ । Elias Modern Dictionary - Elias A Elias.
২২৬ । Arabic English Dictionary - F. Stiengass..
২২৭ । Sky and Telescope Jul 1983.
২২৮ । Sky and Telescope Jan 1983.
২২৯ । Astronomy Jul 1983.
২৩০ । The Cambridge Atlas of Astronomy.
২৩১ । The Study of the Physical World - Cheronis, Parsons & Ronneberg
২৩২ । The Stars and Planets.
২৩৩ । দেশ - ৫৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২৩ জুলাই ৮৮।

www.pathagar.com

১৪

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

প্রখ্যাত বৃটিশ গাণিতিক ও দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেল প্রভুর (God) পিতৃপরিচয় খুঁজে পাননি বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, – স্রষ্টা একটি অলীক ধারণা। 'কারণ তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে যুক্তি এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সব কিছুই কারণের ফলাফল, পিতা হতে পুত্র, বৃক্ষ হতে ফল, জলীয় বাষ্প হতে বৃষ্টি – এমনি সব কারণের শেকলে বিশ্বসংসারের প্রতিটি ব্যবস্থা বাঁধা থাকতে দেখে তার কাছেও একটি গুরুতর প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছিল – আল্লাহর পিতা কে, অথবা স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছিল ? এই প্রশ্নের তিনি কোন গ্রহণযোগ্য জবাব পাননি। সমস্যাটির উত্তরহীনতার উপর ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন – স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। 'কিন্তু যখন প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক থিওরী শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়নি এমনি জিজ্ঞাসায় পৌঁছায়, তখন এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া যুক্তিসংগত হয়েছে কি' ?[১২৩] এই সুরটির মূলতঃ একটি আদিম উৎস রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে প্রাচীন সভ্যতার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব থেলাস, এক্‌জিমান্ডার (Anaximander), একজিমেনিস (Anximenis) প্রমুখ এই ধারণা প্রচার করতেন যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক গতি–প্রবাহের ফলশ্রুতিতে হয়েছিল – এতে অতিন্দ্রীয় কোন দিব্যহস্তের দান নেই। পীথাগোরাস সর্ব প্রথম গাণিতিক ব্যাখ্যার অবতারণা করে এই মতবাদকে সায় দিয়েছিলেন। পীথাগোরাসের এই অনুমোদন পরবর্তীতে লুসিপাস (Lucuppus) এবং ডেমোক্রিটাস (Democritus) –এর দ্বারা আরো শক্তিশালী ভিত পেয়ে বসে। আর তাদের সুরে সুরে তখনকার জনৈক বিখ্যাত রোমান কবি লাক্রিটাস (Lucretius) তার "Dercrum natura" নামক পুস্তকে এক অভিনব মতামত পোষণ করেন যে, অসংখ্য মহাবিশ্বে অসংখ্য পৃথিবী রয়েছে , এরা আপন হতে সৃষ্টি হয়, বৃদ্ধি পায়, জীবন চক্র পূর্ণ করে ও তারপরে বিলয়প্রাপ্ত হয়। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশূন্যচারী ইউরি গ্যাগারিন দম্ভভরে জানিয়েছিলেন – তনি উর্দ্ধগমনপূর্বক খোঁজ করে দেখেছেন, কোথাও তিনি কোন স্রষ্টার সন্ধান পাননি। আজকের বিজ্ঞানীরা এই উর্দ্ধগমনের দম্ভের কথাটি শুনে হাস্যরস না করে পারবেন না, ইউরি গ্যাগারিনের উর্দ্ধগমনটি মহাশূন্যের হিসাবে এত তুচ্ছ যে তাকে বিবেচনা করা যায় না – এ কথাটি কি তিনি জানতেন ?

সাম্প্রতিক তত্ত্ব 'ষ্টেডি–ষ্টেট থিওরী'র প্রবক্তাগণ দাবী করেছিলেন, মহাবিশ্বের কোন আরম্ভ ছিল না , এমনি থেকে শুধু অব্যাহত রয়েছে। সময় ও দূরত্বের

www.pathagar.com

মহাবিস্তার সমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষ শুধু অনুমানের চোখে যতদূর সম্ভব দেখেছে, সে জানেনা – সে এক উপসাগরীয় দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধিকর ধারণায় খাবি খাচ্ছে। দৃষ্টি যেখানে শেষ, সেখান হতে শুরু হয়েছে এক অসীম মহাসমুদ্র। কে জানে, সময়ের যে স্কেল দেখে মানুষ ভাবছে, মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিল না, হয়ত বা সে ধরে নেয় অসীম সময়, অন্য কোন সুবিশাল মহা-সময়-দূরত্ব – ধারার (Super space time continuum) একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র! জ্ঞানী পাঠক হয়ত অবগত রয়েছেন যে, আজকের বিজ্ঞান এমনি চিন্তা ভাবনায় বিভোর।

'ষ্টেডি ষ্টেট থিওরী'র পূর্বে 'বিশৃংখলা হতে সৃষ্টি' তত্ত্বটি বেশ প্রসার পেয়েছিল। স্যার জেমস এইচ জেইন এর মতে অমূর্ত্য বস্তু নিচয় হতে সৃষ্টি হয়েছিল আজকের মহাবিশ্ব এক বিশৃংখলার ভিতর দিয়ে। তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্বের টানাপড়েনে ১৯২৭ সালের প্রস্তাবিত 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' বা Big Bang Theory, ১৯৬৫ সনে এসে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আজকের বিশ্বে এটি এক নন্দিত তত্ত্ব যা অনুসরণ করলে বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির বিষয়সমূহ, জটিলতাসমূহ ও পরিবেশসমূহকে এক অদ্ভুত কৃতকার্যতার সাথে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। এই তত্ত্বধারণার সঠিকতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে American Geological Institute কর্তৃক পরিচালিত Earth Science Curriculum Project এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে, - Observational tests are far from complete to-day , but evidence is mounting strongly in favour of the evolutionary, Big bang theory.[২৩৬] এ পর্যন্ত সকল তত্ত্ব এবং তার সাথে সকল পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান, যদিও হয়ত এখনো অসম্পূর্ণতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার অপেক্ষায় – তবু জোর করেই বলা যায় যে, সৃষ্টি তত্ত্ব বিগ-ব্যাংগ -এর অনুকূলে অজস্র প্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী দাবী নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। বিশ্ব বিশ্রুত একজন বিজ্ঞানীর একটি মতামতে এই তত্ত্বের সঠিকতার দাবী ফুটে উঠে, ... An event commonly described as 'primordial fire ball' ; if this is correct , we are reeceiving information that takes us 99·9% of the way back in time to the beginning of the universe.[১৩৭] মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে বর্ণিত সেই আদি অগ্নিগোলক যদি সঠিক হয়, তবে আমরা যে সকল তথ্য পাচ্ছি , তা আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা ক্ষণটির দিকে সময়ের ৯৯.৯% ভাগ পিছনে নিয়ে যায় যেখান হতে প্রত্যক্ষ দর্শন করার মত আমরা মহা সৃষ্টির আদি পরিবেশকে অবলোকন করতে পারি।

যেভাবেই এর জন্ম হোক, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই – কারণ এটি রয়েছে। যেহেতু এর অস্তিত্ব রয়েছে, সেহেতু কোন না কোন সময়ে এর শুরু হতেই হবে । বিশাল এই সৃষ্টিকে দেখে, তার স্রষ্টার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি,

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে মানুষের এত সব চিন্তাভাবনা দেখে অবাক লাগে। গাছ হতে আপেল পড়তে দেখে মানুষ অভিকর্ষ বলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে , এও এক কারণ তত্ত্বের অনুমোদন । অথচ সমস্ত বিশ্বজোড়া অভিকর্ষ বলের এক প্রকট অস্তিত্ব দেখে মানুষ তার স্রষ্টার কথা ভাববার সুযোগ পায় না। এতবড় মহাবিশ্ব কোথা হতে এল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কারণ তত্ত্ব নীরবতা পালন করে, অনুমোদন দিয়ে দেয় – এটি এমনি হয়েছে , স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, বিশৃংখলা হতে সৃষ্টি হয়েছে , যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনের শাসনে আপনি শাসিত হচ্ছে আপনার হাতে । কত হাস্যকর।

যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানীদের মতে, – 'বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সম্ভাব্য চারটি সমাধান দেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ এই জড় প্রকৃতির জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন পড়েনি, সম্পূর্ণ শূন্য হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিশৃংখলা হতে এর উদ্ভব। তৃতীয়তঃ আদৌ এ বিশ্বের কোন গোড়াপত্তন হয়নি, অনাদিকাল হতে তা বিদ্যমান। চতুর্থতঃ একে যেভাবেই হোক সৃষ্টি করা হয়েছে।' [২৩৮]

প্রথম দুটি আপনার হিসাবেই বাদ পড়ে যাবে। এর কারণ , সমস্ত মহাবিশ্বের কতিপয় চরিত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনি অবগত রয়েছেন যে, মহাবিশ্বের পরিবেশে পৃথিবী এক অতি নাজুক ভারসাম্যহীনতা হতে প্রাপ্ত ভারসামের অতি অনিশ্চয়তায় বিরাজ করছে অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে ; বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অগম্য এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই অদৃশ্য এক স্রষ্টার বড় স্বাক্ষর। তৃতীয়টিতে যে অনাদিকাল হতে অবস্থান করা মহাবিশ্বের ধারণা দেয়া হয়েছে , তারও প্রান্তিক পর্যায়ে একটা শুরুর বা সৃষ্টির প্রশ্ন আসে – যা কখনো একে সৃষ্টি হয়েছিল, এই বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ কোন্ অজ্ঞাত জ্ঞান স্রষ্টা একদিন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন এমন প্রস্তাবটিই জোরালো হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

তাহলে আমরা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হই যে, এই পৃথিবী ও দৃশ্য–অদৃশ্য ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত এই বিশ্ব সংসার কোন এক স্রষ্টার শক্তিতে ও ইচ্ছায় তাঁরই দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। এখন একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় , কোন্ সে স্রষ্টা ? কি তার পরিচয় ?

স্রষ্টার প্রকাশ তাঁরই সৃষ্টিতে। তিনি পরিচয় দিয়েছেন কোন না ধর্ম কোন মতে। কোন সে ধর্মটি ? এমন ধর্ম আছে কি যা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় সৃষ্টি তত্ত্বকে পরম সঠিকতায় ব্যাখ্যা দেবে ? পদার্থ বিদ্যা, গণিত, রসায়ন ইত্যাদি সব বিজ্ঞানের অতি জটিল বিষয়গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এমন কোন সে ধর্ম যা হবে স্রষ্টার একমাত্র প্রকাশ ?

www.pathagar.com

তার নাম ইসলাম। এই ধর্মের আশ্চর্য ঐশী গ্রন্থে বহুবিধ তথ্যের পাশে রয়েছে মহা সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও। সকল স্রষ্টাই সৃষ্টিতে কিছু না কিছু চিহ্ন ফেলে যান যা অন্যদেরকে নির্মাতার স্বাক্ষর জানিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে In physics terminology , the universe contains a lot of information.[২৩৯] পদার্থ বিজ্ঞানের বিচারে মহাবিশ্ব তার মাঝে অনেক তথ্য ধরে রেখেছে , আমরা এই সকল প্রমাণের বিচার বিশ্লেষণ করে সৃষ্টির আদিক্ষণ নির্ণয় করতে পারি। বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের অন্বয় ও ঐক্য আমাদের সত্য স্রষ্টা ও প্রতিপালককে নির্ণয় করতে সাহায্য করে। পরবর্তী অনুধ্যায়সমূহে পাঠকের আমন্ত্রণ রইল।

---

১৩৪ । Donald Henry poter : The Evidence of God in Expanding universe.
২৩৫ । Encylopedia Britannica, Macropaedia Vol - 18.
২৩৬ । Investigating the Earth - Houghton Mifflin Company.
২৩৭ । Dawn of New Era- Sir Barnard Lovell.
২৩৮ । Frank Alen - The Evidence of God in Expanding Universe.
২৩৯ । The Edge of Eternity - John Gribbin.

www.pathagar.com

১৪ঃ১

সৃষ্টি তত্ত্ব ও বিভিন্ন পৌরাণিক মতবাদ

সহজাত প্রবৃত্তি মানুষকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করেছে - তার নিজের, মনোহর এই পৃথিবীর কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুটি কোনখানে, কখন, কার দ্বারা? কে সৃষ্টি করেছে এই মহাবিশ্ব এবং সেই স্রষ্টাই বা এলেন কোথা হতে? যেহেতু এ অধ্যায়ে আমরা শুধু মহাবিশ্ব সংক্রান্ত আলোচনায় সীমিত থাকব, সেহেতু মূল আলোচনায় ঢুকে পড়ার পূর্বে বিষয়টির উপর বিভিন্ন পৌরাণিক মতবাদগুলো একটু দেখে নিলে আমাদের অনুধাবন শক্তি জাগ্রত হবে এবং আমরা সহজভাবে সত্য ও মিথ্যা সনাক্ত করতে সক্ষম হব।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে অভিভূতকর পৌরাণিক গল্প রয়েছে প্রায় সকল ধর্ম মতেই। প্রাগৈতিহাসিক কাল হতেই এ বিষয়ে প্রচলিত রয়েছে অনেক শ্রুতিমধুর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগের চরম উৎকর্ষতাযুক্ত বর্ণনা সম্ভার। মানোমুগ্ধকর এই গল্পগুলো যে অত্যন্ত উর্বর মস্তিষ্ক ও ভাব-ব্যঞ্জনা প্রসূত তাতে যেমন কোন সন্দেহ নেই , সেগুলো যে সত্য বিবর্জিত এ বিষয়েও আপনার কোন সন্দেহ থাকবে না। এ প্রসংগে আমার বিনীত প্রস্তাব এই যে, কোন ধর্মমতকে খাটো করে দেখানোর কোন ইচ্ছাই আমার নেই এবং এমন কোন বিষয় হতে আমি অবশ্যই সংযত রয়েছি। তবে বিজ্ঞানের সাথে কোন ধর্মে সৃষ্টি কাহিনীর কতটুকু সম্পর্ক ও বৈষম্যে বিরাজ করে তা শুধু আমার আলোচনার স্বার্থে করা হবে।

প্রাচীন যুগের ব্যাবিলনবাসীদের কাহিনী দিয়ে শুরু করি। তাদের কাছে দেবতা শ্রেষ্ঠ বেলমারদুক (Bel - Marduck) ছিল এই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। একবার তিয়ামাত (Tiamat) নামক একটি অসুর প্রকৃতির ড্রাগন বেলমারদুককে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। যুদ্ধে তিয়ামাত পরাস্ত হয়। বেলমারদুক এই দুষ্ট ড্রাগনটিকে কেটে দুই টুকরা করে এক অংশে সৃষ্টি করে আকাশ, অন্য অংশে তৈরী করে পৃথিবী। হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'তিত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' আনুযায়ী প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিম জলে ডুব দিয়ে মাটি তুলে আনলেন। সেই মাটি তিনি ছড়িয়ে দিলেন জলের উপর ভাসমান পদ্মপাতায় - আর তা থেকেই পৃথিবী বেরিয়ে এল।[২৪০] প্রাচীন মিসরীয়দের মতে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে আদি সমুদ্র 'নূ' (Nu) হতে। পলিনেশীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী 'ঈশ্বর ট্যাংগোরা (Tangora) বড়শি দিয়ে মাছ যে ভাবে তুলে, তেমনি করে সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে টেনে তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তার বড়শির সূতা ছিঁড়ে যায়। এতে ইতিমধ্যে যে অংশটুকু ভাসতে পেরেছিল, সেইটুকু পানির উপরে থাকল স্থলভাগ হয়ে - বাদবাকী অংশটি সমুদ্রের জলের নীচে পড়ে থাকল।

www.pathagar.com

প্রাচীন চীনদের তাওবাদ (Taoism) অনুসারীগণের ধারণা ছিল চরম কারণাত্মক স্রষ্টা (First cause or absolute reason) 'তাও' সকল শক্তির উৎস। এক স্বতঃস্ফূর্ত গতির সৃষ্টি ধারায় তাও নিজকে প্রকাশ করতেন। সর্ব প্রথম তিনি আদিরূপ ইন (yin) এবং ইয়্যাং (yang) অথবা পজেটি-নেগেটিভ কিংবা স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বিপরীত কারণ বা শক্তি সৃষ্টি করেন। এমনি বিপরীত সৃষ্টি ধারায় ইন ও ইয়্যাং এর ধারাপ্রবাহে সৃষ্টি হয় স্বর্গলোক আকাশ ও ভূলোক পৃথিবী।[২৪১]

হিন্দুদের ছন্দোগ উপনিষদের 'মহাজাগতিক ডিম' বা 'কসমিক এগ' কাহিনীকে রিচার্ড ক্যারিংটন সবচাইতে চমকপ্রদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাহিনীটি হল, "আদিত্যই ব্রহ্মা। পূর্ব জগৎ অসৎ বা নামরূপহীন ছিল, ক্রমে তা সৎ এবং সূক্ষ্ম সত্তাবান ভিন্নরূপে পরিণত হয়। এক বছরকাল স্পন্দনহীন অবস্থায় থাকার পর সেই ডিম্ব বিভক্ত হয়ে যায়। ডিমের এক ভাগ রজতময় বা সাদা ও অন্যভাগ সুবর্ণময় বা হলুদ-স্বর্ণ রং আকার পেল। সেই রজতময় অংশই হল পৃথিবী আর সুবর্ণ অংশই হল দ্যুলোক ; পর্বতসমূহ হল জরায়ু, ধমনী হল নদী এবং সে জলই হল সমুদ্র। তারপর সেই ডিম্ব হতে উৎপন্ন হল সূর্য আর সাথে সাথে চারিদিকে উঠল উলুধ্বনি।[২৪২]

হিব্রু কাহিনী অনুযায়ী আদি সমুদ্র টেহোম (Tehom) ঈশ্বরের আদেশে দুই ভাগ হয়ে একভাগ উপরে উঠে যায় এবং স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করে। অন্যভাগ নীচে পৃথিবীকে ধারণ করে। উপরের ভাগকে বলা হয় উর্ধ্বজল (Superior water) এবং নীচের ভাগকে বলা হয় নিম্নজল (Inferior water)। স্রষ্টার স্বর্গীয় আসন এই উর্ধ্বজলে পাতা ছিল। এই জলের নিম্নে অবস্থান করত নক্ষত্র খচিত আকাশ (firmament)। আকাশের গঠন হল একটি উপুর করা গোলাকার বাটি গম্বুজসদৃশ। বড় বড় স্তম্ভের অবলম্বন দিয়ে স্রষ্টা এই আকাশ ধারণ করতেন। গোলাকার গম্বুজ সদৃশ আকাশের গায়ে ছিল জল প্রবেশ করবার ছিদ্র পথ বা flood gate। উর্ধ্বজল এই দরজা পথে প্রবেশ করে পৃথিবীতে বৃষ্টির আশীর্বাদ হয়ে নামত। নিম্নজলের উপর আবার পৃথিবী ভাসমান, সেও বড় বড় খুটির সাহায্যে। পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের অনেক নীচুতে এক গভীরতম প্রদেশে অবস্থান করত নারকীয় মৃত্যু-জগৎ সিওল (Sheol or nether world)। মানুষ মৃত্যুর পর চলে যেত সিওলে।

হিব্রুদের এ ধারণা পরবর্তীতে খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে পড়ে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলীতে যে ৩৯ খণ্ডকে বুঝায়, তার মধ্যে তৌরাতের পাঁচ খণ্ড বা পেন্টাটেক পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে এতে স্থান পেয়ে যায়। যাই হোক, বাইবেলের দৃষ্টিকোণ হতে আমরা সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে যতদূর অবগত হই তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

www.pathagar.com

"আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকারময় শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপর ছিল। তখন ঈশ্বর জলের উপরে অবস্থান করিতেছিলেন (অধ্যায় ১ বাণী ১,২)।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্ত হও' অমনি উহা আলোক উদ্ভাসিত হইল। ঈশ্বর সন্তুষ্টির সাথে দীপ্তি রূপ দেখিলেন এবং অন্ধকার হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি দীপ্তির নাম করিলেন দিবস, অন্ধকারের নাম দিলেন রজনী। অতঃপর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের পর প্রথম দিবস সৃষ্টি হইল (বাণী ৩-৫)।

'পরে ঈশ্বর বলিলেন, জলের মধ্যে গম্বুজ হউক এবং তা জলকে দুইভাগে ভাগ করুক। এইভাবে উর্ধ্বজল ও অধ্বঃজল পৃথক হইলে ঈশ্বর গম্বুজের নাম রাখিলেন আকাশমণ্ডল। অতঃপর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনটি আত্মপ্রকাশ করিল। (বাণী ৬-৮)।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশ মণ্ডলের নিম্নস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক। সেইরূপই ঘটিল। ঈশ্বর স্থলের নাম রাখিলেন ভূমি আর জলের নাম রাখিলেন সমুদ্র। ঈশ্বর ভূমিতে তৃণ, ওষুধি, পৃথক পৃথক জাতির ফলবৃক্ষ ইত্যাদির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাহাই হইল। ঈশ্বর দেখিলেন সকলই উত্তম হইয়াছে। অতঃপর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের মধ্য দিয়া তৃতীয় দিনের প্রকাশ ঘটিল (বাণী ৯-১৩)।

'পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসের পার্থক্যের জন্য আকাশের বিতানে আলোকমালা সৃষ্টি হউক ; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য ঋতুর জন্য এবং দিবস ও বছরের জন্য হউক এবং পৃথিবীকে আলোক দেয়ার জন্য আকাশে অবস্থান করুক। তাহাতে সেরূপই হইল। ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য তৈরী করিলেন মহাজ্যোতি এবং রাতের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য তৈরী করিলেন ক্ষুদ্র জ্যোতি এবং সৃষ্টি করিলেন নক্ষত্রমালা। তিনি ইহাদিগকে স্থাপিত করিলেন আকাশ বিতানে পৃথিবীকে দীপ্তি দেয়ার জন্য, দিন এবং রাতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আলো ও অন্ধকারকে পৃথক করার জন্য। ঈশ্বর অবলোকন করিলেন – বড়ই উত্তম হইয়াছে। সন্ধ্যা আসিল ও প্রাতঃকালে চতুর্থ দিবসের প্রকাশ ঘটিল (বাণী ঃ ১৪ –১৯)।

অতঃপর ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে মুখর হউক এবং ভূমির উর্ধ্বে আকাশের বিতানে পক্ষীগণ পাখা মেলুক। ঈশ্বরের সে ইচ্ছায় জলে সঞ্চালনশীল প্রাণীবর্গ ও খেচর পক্ষীকূল সৃষ্ট হইল। ঈশ্বর তাহাদের দেখিলেন, – বড়ই উত্তম হইতেছে। তিনি আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন – "তোমরা বৃদ্ধি পাইয়া বহুগুণ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর। পক্ষীগণের আধিক্য সৃষ্টি হউক"। এইভাবে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের মধ্য দিয়া পঞ্চম দিবসের প্রকাশ ঘটিল (বাণী – ২০ – ২৩)।

www.pathagar.com

পরে ঈশ্বর কহিলেন – ভূমি নানা প্রকার প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক। সেইরূপই হইল। ফলতঃ ঈশ্বর স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন ; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সকলই উত্তম। 'পরে ঈশ্বর কহিলেন – আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ; আর তাহারা সমুদ্রের বৎসদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে , পশুদের উপরে সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন পুরুষ ও স্ত্রী জাতিতে।

'পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন – তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর। ঈশ্বর আরো কহিলেন – দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষুধি ও যাবতীয় সজীব ফলোদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচরের যাবতীয় পশু এবং আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষুধি সকল দিলাম। তাহাতে সেরূপ হইল। পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপন করিলেন আর দেখিলেন, সে সকলই অতি উত্তম। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের পরে ষষ্ঠ দিবস প্রকাশিত হইল (বাণী ২৪ –৩১)।

এইরূপে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিবসে আপনার কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিবসকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।" (দ্বিতীয় অধ্যায় ১–৩)।

সৃষ্টি তত্ত্বের উপর এমনি পৌরাণিক কাহিনীর সংখ্যা অগণিত। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় বিভিন্ন বিশেষত্বে এই কাহিনীগুলো শ্রুতিমধুর। উপরে বর্ণিত কাহিনীগুলো সুধী পাঠককে বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনার মান নির্ণয়ে সাহায্য করবে আর বিজ্ঞানের সাথে এদের কতটুকু মিল-অমিল আছে , তার আলোকে সত্য ও মিথ্যা সনাক্ত করতে সাহায্য করবে ও পরিশেষে সত্য ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে পথ দেখাবে এমনি বিশ্বাসের ভিত্তি রচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী পাঠক সমাজকে পরবর্তী অনুধ্যায়ে আহ্বান করছি।

---

২৪০ । The story of our Earth - Richard Carrington.

২৪১ । Nature. Sprituality and Science - Sukhrj Tarneja.

২৪২ । বেদ উপনিষদের শ্রেষ্ঠ কাহিনী ঃ ভাবান্তর – 'সুধাংশু রনজন ঘোষ

২৪৩ । Revised Standard Version 1952.

www.pathagar.com

১৪ঃ২

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব
বা
Big Bang Theory

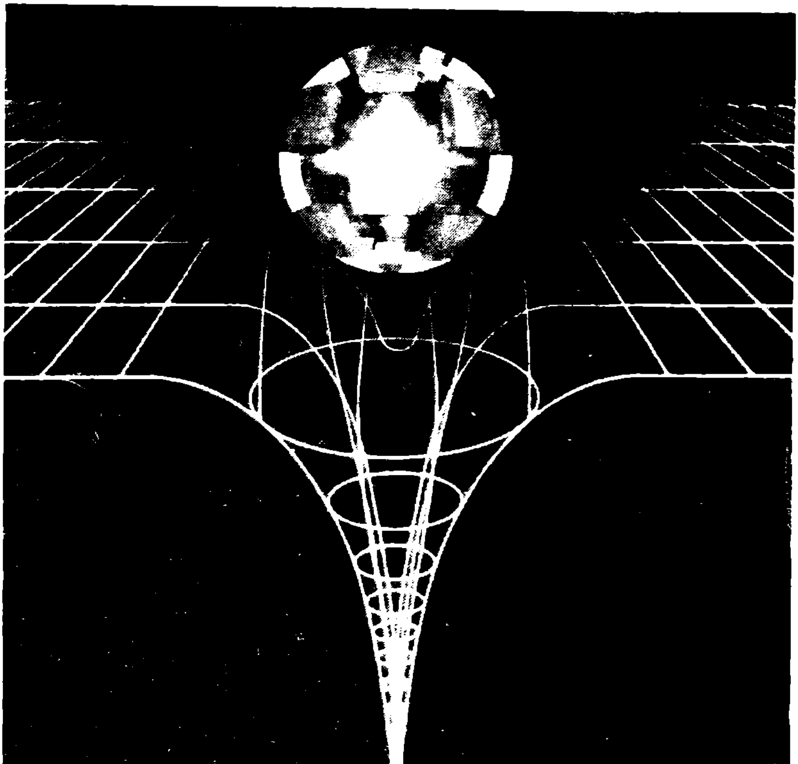

Big Bang জিয়োমেট্রি

www.pathagar.com

/ আজ হতে সম্ভবত ১৫ মহাপদ্মকাল আগের কথা। তখন শুধু বিরাজ করত শূন্যতা। কোথাও ছিল না কোন কিছু - না ছিল বস্তু, না ছিল শক্তি, না ছিল সময়ের কোন অস্তিত্ব। এমন এক শূন্য-অবস্থা-সময়ের পরিবেশে সহসা জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য সূক্ষ্ম সময়ে সংগঠিত হয় এক মহাবিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল বস্তু, শক্তি ও সময়। সে হতে ১৫টি মহাপদ্মকাল পাড়ি দিয়ে আমরা আজকের এ অবস্থানে এসে বিগত দিনের স্মৃতিকথা রোমন্থন করছি যা সেই চরম মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র। Is it not extra ordinary that the possibility of talking here this afternoon depends on events which were narrowly determined over 10,000 million years ago in the very earliest moments of the universe? [২৪৪]

তত্ত্ব অনুযায়ী মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে বিরাট অজ্ঞাত কোন শক্তি উৎস হতে সহসা ভাষা ও প্রকাশের অতীত এক বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ও তার ঘনায়ন ঘটে। সে সূক্ষ্ম বিন্দুটিই ছিল আদি মহাবিশ্ব যা আজ সম্প্রসারিত হতে হতে প্রায় ২০ মহাপদ্ম আলোক বছর ব্যাস সম্পন্ন মহা আকৃতি ধারণ করেছে। অথচ এত বড় একটা মহাপ্রশস্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষণে কতটুকু ছিল তা জানেন কি ? Scientists now calculate that everything in this universe grew out of a region many billions of times smaller than a single proton, one of the atom's basic particles.[২৪৫]

সৃষ্টিক্ষণে আদি মহাবিশ্ব অঞ্চল ছিল পদার্থের সূক্ষ্মতর পরমাণুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতম প্রোটন কণার চাইতেও শত সহস্র মহাপদ্ম গুণ ক্ষুদ্র। এ সময় মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল 10^{-33}cm (কারো কারো মতে 10^{-28} cm) অর্থাৎ এক লিখে তার পিঠে ৩৩টি শূন্য বসিয়ে যে বিপুল সংখ্যা হতে পারে, তা দিয়ে ১ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যকে ভাগ করলে যতদূর দৈর্ঘ্য পাওয়া সম্ভব, তার সমান। আকার হিসাবে এটি একটি পরমাণুর এক হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এই মহাক্ষুদ্র বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্ম নিতে সময় লেগেছিল 10^{-43} sec, অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ কাল। এই সূক্ষ্ম বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে সৃষ্টি হয়েছিল এক মহাবিস্তার উত্তাপ যার পরিমাপ ছিল 10^{32}K বা ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রী কেলভিন। জ্ঞাত সকল জ্ঞান ও তথ্যে অনুমান করা হয় যে, সহসা কোন এক মহাবিস্তার শক্তি হতে শক্তিপুঞ্জের এত তীব্র ঘনায় ঘটে যে, যুগপৎ কালে সংগঠিত হয় অবশ্যম্ভাবী সেই বিস্ফোরণ, আর ঠিক সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় এক মহাসম্প্রসারণ; ক্রমাগত বাতাসে ফুলে উঠতে থাকা বেলুনের ন্যায় মহাবিশ্ব আজ দুর্বার শক্তিতে অসীমের পানে ছুটে চলেছে সে সৃষ্টির ক্ষণ হতে।

www.pathagar.com

শুনতে অবাক করা হলেও বিজ্ঞানের সর্বসাধ্য নির্ভুল তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ সকল ডাটাগুলো আমাদের কল্পনার সব চাইতে চমকপ্রদ রূপকথার কাহিনী হতেও বিস্ময়কর!

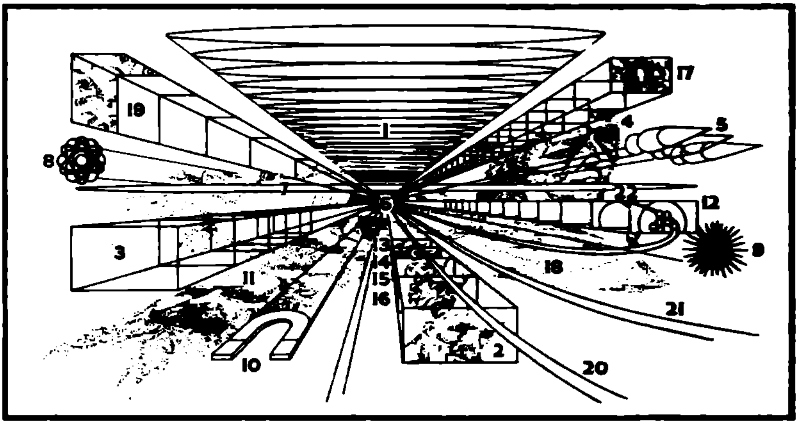

মহাবিস্ফোরণের রেখচিত্র: 1. সৃষ্টির প্রতিটি অংশ একটি অন্যটি হতে পিছিয়ে যাচ্ছে। 2. আল্ট্রাডেন্স ও আল্ট্রাস্মল বিন্দু হতে সম্প্রসারিত হচ্ছে বস্তু ও শক্তি। 3. Back ground Radiation হিসাবে অবশিষ্ট 3K সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজ করছে। 4. প্রথমে ৪টি মৌলিক শক্তি একত্রিত ছিল। 5. সৃষ্টির আদিতে অভিকর্ষ পৃথক হয়ে যায়। 6. Planck Time 10^{-43} sec: মূল সৃষ্টি ১ সেকেন্ডের দশ ভাগের একভাগ, তার হাজার ভাগ, তার নিযুত (মিলিয়ন) ভাগ, তার মহাপদ্ম (বিলিয়ন) ভাগ, তার অধিমহাপদ্ম (ট্রিলিয়ন) ভাগ এবং তারও অধিমহাপদ্ম ভাগ সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। 7. আকস্মিক মহাসম্প্রসারণ (Inflationary epoch) 8. Strong Force প্রোটন ও নিউট্রনে বন্ধন শক্তি দান করে, 9. Weak Force -এর radiative decay, 10. Electromagnatic Force, 12. কোয়ার্কের আবির্ভাব, 17. গ্যালাক্সি ও সম্প্রসারণ, 18. অভিকর্ষ বলের সৃষ্টি জোড়া শাসন।

যে সময় এই মহাসৃষ্টি প্রকাশ পায় – অর্থাৎ, বিস্ফোরণের সে ক্ষণটিকে বিজ্ঞানীগণ বলেন শূন্য সময় বা Time Zero। শূন্য সময়ে শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ অধ্যুষিত সূক্ষ্ম বিন্দু অর্থাৎ যে আদি ক্ষুদে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল, তার নাম বিজ্ঞানের পরিভাষায় আদি অগ্নি-গোলক বা Primordial fire-ball. আদি অগ্নি-গোলকে ধারণকৃত শক্তি পরবর্তীতে জটিল পদার্থবিদ্যার নিয়ম নীতি অনুসারে দৃশ্য ও

www.pathagar.com

অদৃশ্য পদার্থ সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান প্রযুক্তিতে সুপার কম্পিউটার চক্রাদির সহায়তায় মানুষ আজ এ ব্যাপারে নানা জটিল প্রশ্নের সূক্ষ্ম ও গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছ। মানুষের জ্ঞান আজ মানুষক ফ্রেড-হয়েলের বাণীতে হুঁশিয়ার করে দিয়ে যায় - there is an enormous intelligence abroad in the universe- লোকাতীতে এক মহাজ্ঞনের মহাবিস্তৃতির কথা আজ বিজ্ঞানমনে অতিশয় জরুরী ভাবনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একদম শূন্য অবস্থা হতে কি করে মহাবিশ্বের জন্ম সম্ভব হয় - এককালে তা ছিল এক অপ্রতিরোধ্য প্রশ্ন। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান তাকে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার চোখে দেখে থাকে ; প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ এখন একদম শূন্য হতে মহাবিশ্বে সৃষ্টির দুর্লঙ্ঘ্য, প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছে সম্ভাবনায় ও বাস্তবতায়। To day, however the creation of everything from nothing may no longer be an insurmountable problem. To begin with the creation of universe out of nothing seemed violate flagrantly the law of conservation of matter and energy, and perhaps to require a supernatural intervention.[২৪৬]

বিজ্ঞানীগণ আজ বুঝতে পেরেছেন যে, একদম শূন্য হতে সৃষ্টি বিষয়ক ধারণা বা Big Bang Theory প্রথম দিকে কেবল 'ষ্টেডি-ষ্টেট'বাদী পদার্থ বিজ্ঞানীগণের অনমনীয় গ্রহণহীনতা ও বিরোধিতার কারণেই এতদিন মানুষের মনে আদরের আসন গড়ে তুলতে বিলম্ব করেছে ; যদিও কিনা ষ্টেডি-ষ্টেট' তত্ত্বের অসংখ্য ভুল ও অসামর্থ্যতার কথা সম্পর্কে তারা নিজেরাই সচেতন। আজকের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, একদম শূন্য হতে সৃষ্টি যা আপাতঃ দৃশ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচলিত সকল নিয়ম কানুনকে ঘোরতরভাবে লংঘন করে - সেও সম্ভব ; তবে এই সম্ভাবনাটি শুধুমাত্র এক অতিদ্রীয় মহাশক্তির হস্তক্ষেপ ও প্রভাবকে কার্যক্ষেত্রে আনয়নের দ্বারাই ব্যাখ্যাযোগ্য।

আদিতে অর্থাৎ শূন্য সময়ের পূর্বে কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না, একদম শূন্য হতে শক্তির মহা বিস্ফোরণজাত ঘটনায় জন্ম নেয়া মহাবিশ্বের ধারণা সর্ব প্রথম যিনি পেশ করেছিলেন, তিনি হলেন জর্জ ল্য মেইড্র (Joerges Lemaitre, ১৮৯৪-১৯৬৬) একজন বেলজিয়াম জগৎ-বিজ্ঞানবিদ। ১৯২৭ সালে তার পেশকৃত প্রস্তাবনায় মহাবিশ্ব জন্মের যে সময়-কাল দেখানো হয়েছিল, তা ভুলক্রমে পৃথিবীর বয়সের চাইতে কম হওয়ায় অনেক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সাল প্রস্তাবিত 'ষ্টেডি-ষ্টেট' (Steady State) তত্ত্বের প্রবক্তাগণের দ্বারা তত্ত্বটি বানচাল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

১৯৫০ সালে রেডিও এ্যাষ্ট্রোনোমি এসে স্টেডি–স্টেট তত্ত্বকে হাটিয়ে দেয়। ১৯৬০ সালে 'দুর্বল বেতার ধ্বনি' (Feeble radio hiss) মহাবিস্ফোরণের অস্তিত্বকে জোরালো করে তোলে ও সবশেষে ১৯৬৫ সালে পশ্চাদপট বিকিরণ বা ব্যাক–গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন (২·৭ কেলভিন) আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান বিশ্ব এক নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছায় যার ফলশ্রুতিতে বিগ–ব্যাংগ তত্ত্বের সত্যতা ধ্রুবক হিসাবে জগৎবাসীর কাছে এসে হাজির হয়।[২৪৭]

বিগ ব্যাংগ – এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'টি সত্য আত্মপ্রকাশ করে প্রথমটি হল, আদি বস্তু মূলতঃ শূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, শূন্য হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা অতিন্দ্রীয় কোন মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞতাকে কারণস্থলে দাঁড় করিয়েই কেবল সম্ভবপর ; আর কোন ভাবেই নয়। বিগ–ব্যাংগ তত্ত্বের এই ধারণার পূর্বে বিজ্ঞানজগতে যে সকল তত্ত্বকথা নানা জটিলতার বির্তকে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাদের একটির প্রবক্তা ছিলেন স্যার জেমস্ এইচ জিনস (Sir James H. Jeans)। ১৯২৮ সালে এই বৃটিশ পদার্থবিদ তার Astronomy and Cosmogny বই এ লিখেন যে, All celestial objects originated by a process of fragmentation : of nebulae out of chaos, of stars out of nebulae of planets out of stars and of satellites out of planets.[২৪৮]

অর্থাৎ মহাজাগতিক বস্তুর জন্ম ও বিবর্তন ধারাটি খণ্ডায়ন প্রক্রিয়ায় অমূর্ত বস্তুর বিশৃংখল অবস্থা হতে সৃষ্টি হয় নীহারিকা ; তারপর নীহারিকা থেকে জন্ম নেয় নক্ষত্র, নক্ষত্র হতে জন্ম নেয় গ্রহ, গ্রহ হতে জন্ম নেয় উপগ্রহ। এই মতবাদ ১৯৪৮ সালে ষ্টেডি–ষ্টেড মতবাদ প্রস্তাবিত হবার পূর্বে একচেটিয়া রাজত্ব করে। প্রণিধানযোগ্য যে, Chaos শব্দটি যে বিশৃংখল ও অমূর্ত বস্তুর ধারণা দেয় – সে বস্তুগুলোর জন্যও মূলতঃ একটি সৃষ্টির ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যা–হোক অসংখ্য ভুল ও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সঠিক তত্ত্বের স্থানকে এই সকল তত্ত্ব দখল করে রাখতে পেরেছিল অতিশয় সহজভাবেই। ১৯৪৮ সালে থমাস গোল্ড, হারম্যান বণ্ডি, ফ্রেড–হোলি প্রমুখদের দাবীকৃত ষ্টেডিষ্টেট তত্ত্বে প্রস্তাব করা হয় যে, মহাবিশ্বের কখনো কোন আরম্ভ ছিল না, এ শুধু অনাদিকাল হতে অবস্থান করেছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে আপন হতে পদার্থ তৈরী হত এবং তা মহাবিশ্বের শূন্য স্থানকে ভরে দিত আর এরূপ হত বলেই সকল সময় আমরা সৃষ্টিকে একইরূপে ও অপরিবর্তনশীল দেখতে পাই যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের দৃশ্যপটে দৃশ্যতঃ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।[২৪৯] এই যুক্তি ১৯৫০ হতে ক্রমে ক্রমে দুর্বল হতে হতে ১৯৬৫–এ এসে নির্মূল হয়ে যায়। এখানে একটি অপূর্ণাংগতা সহজভাবে চোখে পড়ে যে, অনাদিকাল হতে যে সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে, তারও কোন না কোনভাবে কোন দিন সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন আসে। তারপর এমনি হতে

www.pathagar.com

সৃষ্টি হওয়া পদার্থ দ্বারা সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের শূন্যস্থান পূরণ করার যুক্তি এবং কি করে পদার্থ তৈরী হয়, কোথা হতে তৈরী হয় এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বানচাল হয়ে যায়।

বিগ-ব্যাংগ প্রবর্তকগণ এসে প্রস্তাব করে বিশ্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব। বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্বের জন্মকে ৪টি পর্যায়কালে ভাগ করেন। প্রথমটি হল হাড্রনিক ইরা (Hadronic Era). প্রায় ১৫ মহাপদ্ম বছর পূর্বে শূন্য সময়ের পর যে মুহূর্তে সম্প্রসারণ শুরু হয়, তখন হতে মহাবিশ্বের বয়স যখন মাত্র 10^{-43} সেকেণ্ড[২৫০] তখনকার সময়কে বিজ্ঞানীগণ 'প্লাঙ্ক টাইম' নামে অভিহিত করেন। এই সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10^{32} ডিগ্রী কেলভিন। তাপমাত্রা ক্রমাগত কমতে কমতে যখন 10^{27} ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছে, তখন মহাবিশ্বের বয়স বেড়ে দাড়ায় 10^{-32} সেকেণ্ড, তখন পর্যন্তও অভিকর্ষ ছাড়া আমাদের জানা সকল শক্তিসমূহ একত্রীভূত ছিল এবং একটি অন্যটি হতে পৃথক করার কোন উপায় ছিল না, তবে এই সময়ের শেষ ভাগে সম্ভবতঃ বস্তুর ক্ষুদ্র কণা 'কোয়ার্কের' আবির্ভাব ঘটে এবং পারমাণবিক শক্তি অন্য দুটি অর্থাৎ দুর্বল-মিথস্ক্রিয়া এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক-মিথস্ক্রিয়া হতে আলাদাভাবে চেনার উপায় ছিল। মহাবিশ্বের বয়স যখন 10^{-8} হতে 10^{-6} সেকেণ্ড, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া (Weak interaction) এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক-মিথস্ক্রিয়া (Electromagnetic interaction) এই দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। তখন তাপমাত্রা নেমে আসে 10^{17} ও 10^{13} ডিগ্রী কেলভিন-এর মধ্যে। ১৯৮২ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্ট্রো-ফিজিষ্ট জে রিচার্ড গট (J. Richard Gott, III) প্লাঙ্ক টাইম বা চরম সময়ের চরম ঘনত্ব (Planck density) কে তাত্ত্বিক ও গাণিতিকভাবে বের করে দেখিয়েছেন যে, তা ছিল প্রায় 3×10^{93} গ্রাম/সিসি। এই পর্যায়কালের শেষ ভাগে ক্ষুদে মহাবিশ্বের ঘনত্ব নেমে আসে 10^{14} গ্রাম/সিসি।[২৫১]

দ্বিতীয় পর্যায়কালের নাম হল 'লেপটনিক ইরা' (Leptonic Era) যার বিস্তৃতি হাড্রনিক ইরার অব্যাহিত পর হতে যখন মহাবিশ্বের বয়স ১০ সেকেণ্ড। এর তাপমাত্রা ক্রম ছিল। 10^{10} কেলভিন এবং ঘনত্ব 10^{4} গ্রাম/সি সি। তখনকার শিশুবিশ্বের পদার্থের নিয়ম ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সমমানের বিকিরণ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

তৃতীয় পর্যায়কালের নাম হল 'রেডিয়েটিভ ইরা' (Radiative era)। এর পর্যায়কাল ছিল ১১তম সেকেণ্ড হতে ১০ লক্ষ বছর পর্যন্ত। এই সময়ের বৈশিষ্ট হল যে, বিকিরণ শক্তি হতে পদার্থ এবং পদার্থ হতে বিকিরণ শক্তি যুগপৎ তৈরী হত।[২৫২] সর্ব প্রথম এই পর্যায়কালে প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরী হতে থাকে যা এই পর্যায়ের শেষের দিকেই শুধু সম্ভব হয়। উত্তপ্ত মিশ্রণে লবণ, পানি, চিনি,

www.pathagar.com

ও ফিটকিরি যেমন এক হয়ে মিশে থাকে, কিন্তু উত্তাপ কমার সাথে সাথে বস্তুদের পৃথক পৃথক কেলাস তৈরী হয় এবং বস্তুভাগ থিতিয়ে পড়ে, তেমন নীতিতে এই পর্যায়কালের শেষভাগে পদার্থ গঠিত হতে থাকে এবং বেশীরভাগ শক্তি পদার্থে আটকা পড়ে ও কমভাগ শক্তি বিকিরণ হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বের সর্বখানে।

রেডিয়েটিভ ইরার অব্যাহতির পর শুরু হয় 'ষ্টেলার ইরা' (Stcallar Ear) বা মহাজাগতিক কাল। এটা আনুমানিক ১০ মহাপদ্ম বছর হতে ১৫ মহাপদ্ম বছর। এর বর্তমান গড় বস্তু ঘনত্ব মাত্রা 10^{-28} গ্রাম/সি সি এবং তাপমাত্রা 2.7 ডিগ্রী কেলভিন। এই পর্যায়কালের শুরুতে গ্যালাক্সি গুচ্ছ তৈরী হতে আরাম্ভ করে।

'রেডিয়েটিভ ইরাতে' নবীন মহাবিশ্বের বয়স যখন প্রায় এক লক্ষ বছর, তখন মহাবিশ্বে বিরাজ করত এক অবস্থা – যখন বস্তু এবং বিকিরণ শক্তি ছিল সমান সমান। তখন তাপমাত্রা ছিল ১০,০০০ ডিগ্রী কেলভিন। এই সময় মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব ছিল 10^{-21} গ্রাম / সি সি হতে 10^{-20} গ্রাম / সি সি। এই পর্যায়ের আরো পূর্বে নবীন মহাবিশ্বে তখন আলো আর আলো, আলোর বন্যায় ভাসছিল সমস্ত সৃষ্টি, সেই আলোর ঘনত্ব ছিল পদার্থের ঘনত্বের চাইতেও বেশী।[২৫৩] মহা-বিস্ফোরণজাত সম্প্রসারণের নেশায় মহাবিশ্ব ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ফলতঃ তার তাপমাত্রা নেমে যেতে থাকে দ্রুত হতে দ্রুততর। বস্তুর সংগে প্রতিবস্তুর বিক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট বস্তুপুঞ্জ ক্রমাগত শৃংখলায়িত হতে থাকে এবং জগত সৃষ্টির গোড়াপত্তন করে। লয়প্রাপ্ত বস্তুকণার শক্তি পশ্চাতপিঠ বিকিরণ হিসাবে সমস্ত মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পরে। "আজকের ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ পরিবেশে দঁড়িয়ে আমরা সূর্যদের (নক্ষত্র) মৃদু হারে ঔজ্জ্বল্য হারানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বজগতের মুছে যাওয়া উজ্জ্বলতার কথা স্মরণ করতে পারি"।[২৫৪] এই মুছে যাওয়া উজ্জ্বলতা মূলতঃ 2.7 কেলভিন তাপমাত্রায় আমাদের জানা মহাবিশ্বের সর্বত্র পশ্চৎপিঠ বিকিরণ হয়ে বিরাজ করছে আর এক মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টির আদি দিনক্ষণ ও পরিবেশকে খুঁজে পাবার জন্য মানুষের কাছে একটি উপলক্ষ্য

www.pathagar.com

হয়ে অপেক্ষা করছে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৫ সনে তার (background radiation) উদঘাটন মানুষের জ্ঞান জিজ্ঞাসায় এক নুতন দুয়ার খুলে দিল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল একটি – স্রষ্টা কোথায় ? কে এই স্রষ্টা ? কি ভাবে তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করলেন? একেবারে শূন্য হতে কি করে বস্তু তৈরী হল? বর্তমান বিশ্বের প্রথমসারির বিজ্ঞানী ডেভিড আতকাজ ও হেঞ্জ পেজেলের (David Atkaz and Heinz Pazel Rockfeller University) একটি প্রশ্ন হল যে, বিজ্ঞানীগণ যে 'আদি অগ্নি গোলকের' সংকুচিত অতিকায় ঘনত্বসম্পন্ন বস্তুদের কথা বলে থাকেন সৃষ্টির ক্ষণে – এই সকল বস্তু এলো কোথা হতে? The question arises, where did that came from ? ..... This is a question we can not answer.[২৫৫] এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার জবাব আমাদের কাছে নেই। আতকাজ ও পেজেলের এই আত্মজিজ্ঞাসা এবং স্বগতোক্তি বিজ্ঞান-প্রজ্ঞায় একটি অসহায় হতাশার গন্ধ ছড়ায়। স্যার বার্নাড লোভেল বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, – 'এ সম্পর্কে কোন অনুমানকৃত মন্তব্যই করা চলে না – তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে পারমাণবিক পদার্থ বিদ্যা ও অভিকর্ষ বিদ্যা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক তত্ত্বসমূহ ভেঙ্গে পড়ে নিস্ক্রিয়তায়। আমরা জানি না সৃষ্টিগতভাবেই একি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পথে এক দূর্লংঘ্য অন্তরায়, না কি এর ব্যাখ্যার জন্য আগত দিনে আরো তত্ত্বজ্ঞান আবিষ্কারের অপেক্ষায় পৃথিবীবাসীকে পথ চেয়ে দিন গুণতে হবে।[২৫৬]

বিজ্ঞান মনে যখন শত হতাশার বায়ু উদভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করে, তখন তাদেরই কেউ এসে সৃষ্টার কথা বলেন। জোর করে দাবী করেন যে, অতিন্দ্রীয় কোন হস্তক্ষেপ অর্থাৎ কোন মহাশক্তিশালী স্রষ্টার উদ্ধৃতি সহযোগেই কেবল এ সমস্যার ব্যাখ্যা সম্ভব। কল্পনায় যখনই স্রষ্টা এসে দাঁড়ায় একটি অব্যাখ্যিত সত্যের মীমাংসার জন্য, তখনই আর একটি প্রশ্নের সামনাসামনি হয় মানুষ – Does that mean that the universe is not the result of chance ? have cosmologists rediscovered God?[২৫৬] জগৎ বিজ্ঞানীগণ কি পুনরায় স্রষ্টাকেই আবিষ্কার

www.pathagar.com

করলেন? হয়তবা তাই। It is possible that the beginning can only be explained by a rediscovery of God.[২৫৭] জগৎ সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘোরতর সমস্যাটি কেবল এক মহাশক্তিধর একক সত্বা "স্রষ্টার" উপস্থিতিকে সমস্যা স্থলে আনয়নের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব – আর কোনভাবে তার কোন উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোন সে স্রষ্টা ? আমরা পরবর্তীতে তাঁর পরিচয় নেব। তার পূর্বে আতকাজ ও পেঞ্জেলের জিজ্ঞাসার সুরে আল-কোরআনের দু'টি জিজ্ঞাসাকে ডেকে আনতে চাই – "তাহারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হইয়াছে অথবা নিজেরাই তাহারা নিজদিগকে সৃজন করিয়াছে? (৫২ঃ৩৫)। অথবা তাহারাই এই গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? (৫২ঃ৩৬)। উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি দাসের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে" (৩৪ঃ৯)।

২৪৪। Dawn of a New Era - Sir Barnard Lovell.
২৪৫। National Geographic vol 163 No. 6 June - 1983.
২৪৬। Alan Mac Robert : Sky and Telescope Mar 83.
২৪৭। The World Reference Encyclopedia - Foreworeded by Profssor J.K.Galbraith.
২৪৮। Encyclopedia Britannica (Macropaedia) Vol - 18.
২৪৯। Stars and Planets - Ian Ridpath.
২৫০। ১ সেকেণ্ডকে ১ এর পর ৪৩টি শূন্য সহযোগ গঠিত সংখ্যায় ভাগ করলে যে সময়কাল পাওয়া যায় তার সমান।
২৫১। Sky and Telescope Mar - 1983.
২৫২। To The Edge of Eternity - John Gribbin.
২৫৩। The Encyclopedia Britannica (Macropaedia) Vol - 18
২৫৪। The Primeval Atmos (1931) - Abde Lemaitrè.
২৫৫। Sky & Telescope Mar 1983.
২৫৬। The Dawn of a New Era - S.B. Lovell.
২৫৭। To The Edge of Eternity - John Gribdin.

www.pathagar.com

১৪ঃ৩

ছয় দিবসের বিতর্ক ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের কোরানিক ব্যাখ্যা

আপনি বিস্মিত হবেন কি যদি বলা হয় যে আল-কোরআন মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিষয়ে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যার সাথে আজকের উৎকর্ষতম বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের কোন সংঘাত নেই? শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, যেখানে সে আর পরবর্তী ব্যাখ্যা প্রদান করতে অসমর্থ হয়েছে – সে সকল সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসার জবাব কোরআন মনোমুগ্ধকর যুক্তি, তথ্য ও জ্ঞানে প্রকাশ করেছে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে। আর এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন একজন ভারতীয় বেদ-বাদী গবেষক, যিনি কয়েকটি ধর্মের শিক্ষাদীক্ষার তুল্যমানে বেদকে শীর্ষে স্থান দেয়ার হাজার যুক্তি রেখেছেন তারই লেখায়, – In an impressive and beautiful way The Quran explained almost forteen centuries ago, how the universe came into existence. The explanation of Quran stands as the most astonishing surprise to modern man[২৫৮] এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বর্ণনায় কোরআন আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত যে সকল তথ্য প্রদান করেছে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ মানুষের কাছে এক অতিশয় অবাক করা বিষয়! সুখরাজ তারনেজার এই উক্তির অর্থ কি দাঁড়ায়? আমরা তারই সন্ধান করব আমাদের বিবেচনার কাছে এই প্রবন্ধের আলোকে। তার আগে সুধী পাঠককে আবারো জানিয়ে রাখতে চাই যে, আল-কোরআনে ব্যবহৃত 'সামায়া' (. سماء) শব্দটি অতিশয় ব্যাপক। সীমিত অর্থে এর অনুবাদ করা হয়ে থাকলেও কোন পাঠক যে কোন অনুবাদ নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর ব্যবহারটি বিচার করলে সহজেই ধরে নিতে পারবেন যে, 'সামায়া' এর স্থির কোন অর্থ নেই। কখনো এর অর্থ হয় সংলগ্ন শূন্য বা মহাশূন্য, কখনো তা সৌরজগৎ, কখনো সমগ্র মহাবিশ্ব, কখনো দৃশ্য আকাশ, কখনো আদি মহাবিশ্ব, কখনো আঞ্চলিক বস্তু বিস্তার বা গ্যালাক্সি, কখনো বা বায়ুমণ্ডলীয় স্থানীয় অঞ্চল।

যাহোক, আমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরে আসছি। কোরআনের ৭ঃ৫৪; ১০ঃ৩; ১১ঃ৭; ২৫ঃ৫৯; ৫০ঃ৩৮ ইত্যাদি ও অনুরূপ আরো অনেক আয়াতে ৬দিনে সমস্ত বিশ্ব সংসার সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি স্বধর্মী বিধর্মী অনেকের

www.pathagar.com

মনেই এক বিরাট জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে, যেমনটি আমরা বাইবেলের অনুরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণের সন্দেহ ও অনুযোগ দেখতে পাই। বলে রাখা প্রয়োজন যে, বাইবেলে বিশ্ব সৃষ্টিতে ৬ দিনের দাবীর সাথে সপ্তম দিবসে স্রষ্টার 'সাবাথ' বা বিশ্রামের একটি বাড়তি তথ্য রয়েছে। আলোচনার পরিধির বাইরে হওয়া সত্ত্বেও মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, বাইবেল মূলতঃ ইঞ্জিল কিতাবের বিকৃত পুস্তক ; ইঞ্জিল কিতাব কোরআনের স্রষ্টা মহান আল্লাহর উৎস হতে উৎসরিত হয়েছিল বলেই ৬ দিবসের মিলটি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ রয়েছে।

জেনেসিসে ছয় দিবসের প্রস্তাব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সামনে বাইবেলের ভাবমূর্তিকে বিপন্ন করেছে অনেকখানি, কারণ ছয় দিবসে যে সৃষ্টি সম্ভব হয়নি - বিজ্ঞানের সুদৃঢ় প্রাপ্তির ভিত্তিতে তা চক্ষু বন্ধ করেই বলা যায়। এই বিসম্বাদটিকে পাড়ি দেয়ার জন্য অনেকেই ৬ দিবসের স্থানে মহাবিশ্ব ৬ মহাপদ্ম বছরে সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করতে প্রয়াস পান। পিটার ডব্লিউ স্টোনারের (ওয়েষ্টমণ্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান) একটি প্রবন্ধে দেখা যায় যে, তিনি মহাবিশ্বের বয়স ৬ মহাপদ্ম বছর বলে অনেকের দাবীকে ৬ দিবসে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যুক্তিটি দ্বারা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ আদি সৃষ্টির প্রতিটি দিবসের জন্য মহাপদ্ম বছরের হিসাবটি পাটিগণিতের সরল রীতিতে বোধগম্য। অনুরূপ প্রবণতা কোরআন বিশ্লেষণকারীগণের মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বুঝতে ও বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ৬টি দিনের প্রতিটি দিন ছিল অতিশয় বিশাল দিন।

ছয় দিবসে জগৎ সংসারের সৃষ্টি, এই ধারণার উপর অতি সঙ্গত কারণে বিজ্ঞান দ্রষ্টা ও খুঁত সন্ধানীদের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক – কারণ মহাবিশ্বের সৃষ্টি ৬ দিনের সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। তাহলে কি কোরআন মিথ্যা বলছে? ধরা পড়ে গেছে কোরআন? মহাবিশাল দম্ভের স্তম্ভ কি ভেঙ্গে পড়েছে তা হলে?

জ্বী না! অতি বিনীতভাবে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, অবশ্যই নয়। আমার এই আলোচনায় সুদৃঢ় যুক্তি ও নিশ্চিত তথ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, কোরআন বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যকে কিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রজ হয়ে কত স্বার্থকভাবে ব্যাখ্যা করে রেখেছে। এক অনন্য সাধারণ নির্ভুলতায় বিজ্ঞান অনুমোদিত সুদৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করানো রয়েছে এতদসম্পর্কে কোরআনের প্রস্তাবসমূহ।

৬ দিবস' সম্পর্কিত যে ভুল বুঝাবুঝির সুউচ্চ পাহাড় রচিত হয়েছে, – তা মূলতঃ অনুবাদকারীগণ ও ব্যাখ্যাকারীগণের সীমিত জ্ঞান এবং বিষয়টি সম্পর্কে

www.pathagar.com

অসজ্জাগ দৃষ্টির কারণই। আল–কোরআনের শব্দের বিশ্লেষণে যতটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তার স্থলে অবহেলাই মূলতঃ এই ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য দায়ী। কোরআনের যে সকল শব্দের অনুবাদ ও বিশ্লেষণে চরম ব্যর্থতার দাগ পড়েছে তাদের গোত্রীয় 'সামায়া' (سماء) আর্‌দ (الأرض) বুরুজ (بروج) ইত্যাদি শব্দের সাথে আরো একটি শব্দ হলো 'ইয়াওম' (يوم), যার অর্থ নির্বিচারে 'দিন' ধরে নিয়ে অনুবাদ–কারীগণ ৬ দিবসের একটা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বিশ্বজোড়া ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

কোরআন অনুবাদকারীগণের প্রায় সকলেই কোরআনে ব্যবহৃত 'ইয়াওম' শব্দের অর্থ 'দিবস' ধরে নিয়েছেন, কারণ আরবী রীতিতে এই শব্দটির দিন অর্থটিই অধিকতর প্রচলিত। কিন্তু কোরআন তার ভাষ্য ও ভাব বলয়ে নিজস্ব অর্থ সৃষ্টি করেছে এমন বহু উদাহরণ দেয়া যায়। এই বই এর শর্ত – ২ এর মূল প্রস্তাবটির উদ্ধৃতি সহযোগে এখানে পেশ করতে চাই যে, কোরআনে 'ইয়াওম' শব্দের ব্যবহার, এক অতি সূক্ষ্ম ও কৈশিক সময়মান হতে মধ্যম সময় কিংবা অতি বৃহৎ সময় ইত্যাদি সকল দৈর্ঘ্যের কাল–পর্যায়কে প্রকাশ করতে দেখা যায়। উদাহরস্বরূপ ৫৫ঃ২৯; ১০ঃ৯২; ২২ঃ৪৭; ৩২ঃ৫; ৭০ঃ৪ ইত্যাদি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে[২৫৯]। ৫৫ঃ২৯ ও ১০ঃ৯২ আয়াত দু'টি যেখানে একটি সূক্ষ্ম সময়ের ধারণা দেয়, সেখানে ২২ঃ৪৭ ও ৩২ঃ৫ আয়াত দু'টি হাজার বছর ও ৭০ঃ৪ আয়াতটি ৫০ হাজার বছরের তথ্য প্রকাশ করে। উল্লিখিত আয়াত–সমূহ আমাদেরকে জানতে সুযোগ দেয় যে, ৬ দিন বিষয়ক প্রস্তাব 'সিত্তাতি আইয়াম' হতে যে 'ইয়াওম' শব্দটি পাওয়া যায়, তা কোরআনের পরিভাষায় নির্দিষ্ট ও স্থির কোন অর্থ প্রকাশ করে না ; অতি অল্পক্ষণ হতে শুরু করে অতিশয় প্রশস্ত যে কোন সময়কাল এই 'ইয়াওম' শব্দের কোরআনিক অর্থ পরিধির আওতাভুক্ত। অতএব, ৬ দিনের সৃষ্টি নিয়ে যে বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে – তার ভিতটি মূলতঃ কোন শক্তিশালী ভূমির উপর দাঁড় করানো তর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে না। আমরা বলতে পারি, আল–কোরআনের 'সিত্তাতি আইয়াম' বা ছয় দিবস মূলতঃ ছয়টি পর্যায়কালের ধারণাকে বুঝতে নির্দেশ দেয় যার ব্যাপ্তিকাল অতি সূক্ষ্ম সময় হতে অতি বৃহৎ সময় পর্যন্ত যে কোনটিই হতে পারে।

ডঃ মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত The Bible The Quran and Science পুস্তকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 'ইয়াওম' এর অর্থ অতিশয় বড় সময়কাল বলে যুক্তি আনার চেষ্টা করেছেন। জনাব ইউসুফ আলীর বিখ্যাৎ তফসীরে 'ইয়াওম' শব্দের একদিন এর অর্থ সুদীর্ঘ সময়কাল বা বহুযুগের একটি দীর্ঘ–বিস্তার সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির ক্রমধারায় যে দীর্ঘসূত্রী সময়ের ব্যাপকতা রয়েছে – সম্ভবতঃ এই বিষয়টিই তাদেরকে 'ইয়াওম' শব্দের অর্থ বহু যুগ, সুদীর্ঘকাল কিংবা সময়ের এক

www.pathagar.com

বিরাট পর্যায়কে বুঝতে পথ দেখিয়েছে। এই বিষয়ের উপর আমি দ্বিমত পোষণ করছি ,– কারণ এই ব্যাখ্যাগুলো অনেকটা বাইবেলের 'সাবাথ' বা সপ্তম দিবসে স্রষ্টার বিশ্রাম নেয়ার ধারণার কাছাকাছি বিশ্বাসের মতই মনে হয়। আমার মনে হয় – মহাবিজ্ঞ ও মহাকুশলী আল্লার নিপুণতা, অকল্পনীয় ক্ষমতা তাঁকে বিশাল বিস্তার 'ইয়াওম' বা অতিশয় বৃহৎ ছয় দিনের সীমাবদ্ধতার অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করে ; হতে পারে তা ছয়টি সূক্ষ্ম পর্যায়কাল, হতে পারে তা ছয়টি অতি বড় পর্যায়কাল, কিংবা হতে পারে তা সূক্ষ্ম, মধ্যম ও বিশাল পর্যায়কালের সমন্বয়ে গঠিত ছয়টি সময়কাল। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, শেষ প্রস্তাবটিই সম্ভবতঃ অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার দাবী রাখে। কারণ 'ইয়াওম' শব্দটির বিশ্লেষণে আমরা ইতিমধ্যে অবগত রয়েছি যে, কোরআন 'ইয়াওম' বলতে অতি সূক্ষ্ম সময়, মধ্যম সময় ও বিশাল সময় ইত্যাদি সকলকেই অন্তর্ভূক্ত করে ; একচেটিয়াভাবে অতি বড় কিংবা অতি ছোট কোন সময় কালকে নয়। আবার কোরআনের বাণীসমূহের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক একটি আয়াতের উদ্ধৃতিও দেয়া যেতে পারে এখানে, – তোমার প্রভুর বাণীসমূহ বাস্তবতায় ও মধ্যম পন্থায় পরিপূর্ণ ; – তাঁহার বাণরি কোন পরিবর্তনকারী নাই" (৬ঃ১১৫)। আল্লার নিজ বাণী সম্পর্কিত এই সনদ ও 'ইয়াওম' এর ব্যবহার চিত্র আমাদেরকে জানায় যে, সৃষ্টির সময়কালের প্রস্তাবিত ৬টি দিন সূক্ষ্ম সময়কাল, মধ্যম সময়কাল ও অতি বড় সময়কালের সমন্বয় গঠিত ৬টি পর্যায় হওয়া সম্ভব। আর এই মধ্যম পন্থার সিদ্ধান্ত যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে আশ্চর্যজনকভাবে বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে আমরা কোরআনে মুদ্রিত থাকতে দেখি। বিষয়টি একটুপরেই আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়াবে।

৭ঃ৫৪; ১০ঃ৩; ১১ঃ৭; ২৫ঃ৫৯; ৫০ঃ৩৮ ইত্যাদি আয়াতের যে কোন একটি তুলে নিন। এই আয়াত কয়টিতে সৃষ্টির পর্যায়কাল সংক্রান্ত যে ধারণা আমরা পাই তা হল এই যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির জন্য সর্বমোট সময়কালের সংখ্যা হল ৬টি।[২৬০] কিন্তু ৪১ঃ৯ আয়াতরি দিকে চোখ পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, পৃথিবী সৃষ্টির জন্য আল্লার পক্ষ হতে নির্ধারিত পরিমাণ হল দুটি সময়কাল। এই তথ্যগুলো পাশাপাশি সাজালে 'সায়ামা' অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য যে সময় কাল পাওয়া যায় – তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টি।

যখন আমরা এই পর্যায়কাল সংখ্যা চারটি পাই – তখন বিজ্ঞান আর কোরআনের তথ্য এক হয়ে যায়। কি করে তা সামান্য পরেই আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এতদ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে ৪১ঃ৯ আয়াতে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য ২টি সময়কালের প্রস্তাব এসেছে ; ৪১ঃ১০ আয়াতে পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা বিধানের জন্য দাবী এসেছে ৪টি সময়কালের এবং ৪১ঃ১২ আয়াতে আকাশ তথা মহাবিশ্বের একটি বিশেষ অবস্থার জন্য আরো দু'টি সময় পর্যায়ে প্রস্তাব এসেছে। মনে রাখা উচিত যে এই সময়কালগুলো কোন ক্রমেই একটি ক্রমধারার নির্দেশ করে না ; পৃথক

www.pathagar.com

পৃথক অবস্থার পৃথক পৃথক বিবরণ হিসাবে আমরা তাদের বিচার করতে পারি – তার বেশী নয়। যে বিষয়টি আমি তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে, মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী সৃষ্টির সমষ্টিকাল হল ৬টি যার মধ্যে পৃথিবীকে আমরা যেভাবে যে অবস্থানে পেয়েছি, মহাবিশ্ব পরিস্থিতি হতে তাকে পৃথক করে এনে রূপদান করার জন্য ব্যয়িত সময়কাল হল ২টি। উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু সৃষ্টির বিষয়টি খালাক্ব (خلق) শব্দটি সহযোগে পেশ করা হয়েছে, সেহেতু আমরা সাধারণ পাটিগণিতের হিসাবের আশ্রয়ে বলতে পারি যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায়কাল সম্ভবতঃ কোরআনের পরিভাষায় ৪টি[২৬১]।

এই ধারণায় উপনীত হওয়ার পেছনে যে সকল যুক্তি আনা যায় তা হল, মহাবিশ্ব (সামায়া) ও পৃথিবী এই দুই এর সৃষ্টির সমষ্টি পর্যায়কাল যেখানে সকল ক্ষেত্রে ৬টি ঘোষণা করা হয়েছে – সেখানে ৪১ঃ৯ আয়াত দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টির পর্যায়কালটি পৃথক করে ফেলা হয়েছে। আপনি কোরআনের কোথাও মহাবিশ্ব (সামায়া)–কে এককভাবে সৃষ্টি করতে ৬টি পর্যায়কাল ব্যয়িত হয়েছে, তা দেখতে পাবেন না। পৃথিবী সৃষ্টির কাল পর্যায়সমূহকে পৃথক করে নেয়ার মাঝে সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে যায় যে, 'সামায়া' বা মহাবিশ্বের জন্য অবশিষ্ট থাকছে আর ৪টি কাল পর্যায়। ৪১ঃ১০ ও ১ঃ১২ আয়াতে আরো দু'টি প্রস্তাব এসেছে যেখানে বলা হয়েছে,–পৃথিবীর আবাস যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য ৪টি ও মহাবিশ্বকে নিয়মিত করার জন্য ২টি সময়কাল ব্যয় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৪১ঃ১০ ও ১২ আয়াত দু'টি, অন্যান্য ৭ঃ৫৪; ১০ঃ৩; ১১ঃ৭; ২৫ঃ৫৯; ৩২ঃ৪; ৫০ঃ৩৮ ইত্যাদি আয়াত (যেখানে ৬টি সময়ে সৃষ্টি হওয়ার প্রস্তাব এসেছে) এবং ৪১ঃ৯ আয়াত (যেখানে ২টি সময়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে) এ দুই প্রেক্ষাপট, পরিবেশ কিংবা প্রস্তাবের আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অতএব, আমরা বলতে পারি, ৪টি সময় পর্যায়ে বিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে কোরআনী নির্দেশ রয়েছে।

অনেকেই হয়ত বলবেন – "জোর করে হিসাব মিলিয়ে দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে" মাত্র। কোরআন কি বলতে চায় যে, যখন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় – তখন পৃথিবী ছিল না? আমার এ বই এর শর্ত–২ এর প্রতি আবারো আলোকপাত করতে চাই। কোরআন পাঠকের জন্য ৪১ঃ৯, ১০,১১,১২, এই আয়াত চারটি একসাথে একটি জটিল সমস্যা। তবে আয়াত চারটির বিন্যাস হতেই বুঝা যায় যে এরা কোন প্রকার ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং কোরআনের ধারাবাহিকতা যে কখনো অনিশ্চিত হতে পারে তা আপনারা উল্লিখিত শর্তের দাবী অনুসারে এই চারটি আয়াতে দেখবার সুযোগ পাবেন।[২৬২] আমাদের মনে অনুভব সৃষ্টি হয় যে, এই চারটি আয়াতের মধ্যে যেন একটি পরস্পর বিরোধিতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, যেখানে ৯ ও ১০ আয়াতের স্থানে ১১ ও ১২ আয়াতকে বসিয়ে দিলে যেন আপাতঃ দৃশ্যে তা মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি অনুভব করেন কি যে মহান আল্লাহ ভুল করেন না? ৪১ঃ১১ আয়াতের যে সুক্ষা

www.pathagar.com

(ثم) শব্দটি মূলতঃ এই বিরোধ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে হয়, তার অর্থ অতঃপর, তখন, এতদভিন্ন, ইত্যাদি পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহারকে উহ্য করে রাখা হয়েছে। সেই শব্দটি হল 'তৎ–কারণে' বা 'তৎজন্য'। অনুবাদের সময় অতঃপর শব্দটি না প্রয়োগ করে তার পরিবর্তে 'তৎকারণে' ব্যবহার করলে 'অতঃপর' ব্যবহারে যে সমস্যাটি সৃষ্টি হয় অর্থের সেই সমস্যাটি আর থাকে না।

কিন্তু তার পরেও একটি সমস্যা থেকে যায় – তা হল, পৃথিবী কখন সৃষ্টি হয়েছিল ? সুনির্দিষ্টভাবে তা কোথাও উল্লেখ নেই। তবে ৪১ঃ১১ আয়াতে একটি জটিল প্রস্তাব বিচার্য – 'তৎকারণে তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন যাহা ছিল ধোঁয়া–সমষ্টি। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন – তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল – আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া'। এখন আমরা যদি ২১ঃ৩০ আয়াতের দিকে তাকাই তাহলে সেখানে দেখতে পাই যে, –'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কি লক্ষ্য করে না যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল একটি একক গলিত বস্তুপিণ্ডে ? অতঃপর আমি উহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছি"। এই আয়াতের উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, ৪১ঃ১১ আয়াতে যে আকাশ ধোঁয়া অবস্থায় ছিল – তার মাঝে ছিল পৃথিবীর অস্তিত্ব। আল্লাহর আহ্বানে তারা কেবল পৃথক হয়ে যায়। 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া' – এই শব্দ কয়টি সৃষ্টির জন্য বিধিবদ্ধ আইনের শৃংখলাকে অনুগতভাবে মান্য করবার একটি প্রতিশ্রুতি। আমরা এই দুই আয়াত দৃশ্যে অন্ততঃ নির্ভয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহর এই আহ্বানের পূর্বে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল আকাশ তথা মহাবিশ্বের ধূম্রপুঞ্জে (দুখান) কিংবা' একক গলিত পিণ্ডে' (রাতাক) – এই দুই এর যে কোন একটিতে। এখন সমস্যাটি হল খুঁজে বের করা – কোন অস্তিত্ব হতে পৃথিবী পৃথক হয়ে তার স্ব অবস্থান আগমন করে? আমরা অবশ্যই তা খুঁজে পেতে পারি ২১ঃ৩০ কিংবা ৪১ঃ১১ এই দু'টির যে কোন আয়াত হতে।

২১ঃ৩০ আয়াতের প্রেক্ষপট আমাদেরকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির অতি আদীম ইতিহাসের দিকে টেনে নেয়। রাতাক (رتق) ও ফাতাক (فتق) শব্দ দুটি আদি অগ্নিগোলকের পরিবেশ ও সৃষ্টি লগ্নে বিরাজমান পরিস্থিতি সমূহের মূল্যায়ণ করে। রাতাক শব্দের অর্থ হল পরিপূরণ করা, মেরামত করা, সেলাই করা, বয়ন করা, একত্রে মোড়ানো, ঝালাই করা, একত্রে জোড়া দেয়া, বিজড়িত থাকা (Mend, restore, stitch together, patching, darn, solder, cement) ইত্যাদি [২৬৩] ডঃ মরিস বুকাইলী এর অর্থ দ্রবীভূতকরণ, গলানো অথবা উপাদানসমূহ একত্রিত করে একটা সামগ্রিক সমজাতীয় বস্তুতে পরিণত হওয়ার কাজকে নির্দেশ করেছেন। যাহোক অর্থদৃষ্টে রাতকান পরিস্থিতি সম্বলিত মহাবিশ্বটি আদিতে এমন একটি একত্রীভূত শক্তি পদার্থের অস্তিত্ব হিসাবে আবির্ভাব হয় যার উপাদান সমূহ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে

www.pathagar.com

মন্ডিত অবস্থায় ছিল যেমন ঝালাই কার্যে ব্যবহৃত উপাদান যে অবস্থায় বিগলিত ও মিশ্র একক অবস্থায় বিরাজ করে প্রকারান্তরে যা অতি সক্রিয়, অতিঘন ও অতিশক্ত বস্তু-শক্তি পিন্ডেরই নামান্তর। আমরা যখন পরবর্তী ফাতাক (فتق) শব্দটিকে এর সাথে আনয়ন করি, তখন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য এসে হাজির হয়। ফাতাক শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল খণ্ডিত হওয়া, বিদীর্ণ করা, বিস্ফোরণ ঘটানো (Split, break off, burst etc)। ডঃ মরিস বুকাইলি ফাতাক শব্দটি একটি পিণ্ডাকৃতির অতিঘন ও সংমিশ্রিত গোলকের বিভাজন অর্থের দাবী করেছেন যা হতে "রাতকান ফাফাতাকনা " - এই শব্দগুলোর মধ্যে আমরা একটি একক পিণ্ডাকৃতির সংমিশ্রিত গলিত উপাদানভূত অতিঘন অস্তিত্বের ধারণা পাই যা primordial fire-ball এর কাছাকাছি এবং যার রয়েছে একটি বিস্ফোরণের শর্ত। তা হলে এই দুইটি শব্দের সংমিশ্রিত অর্থ হতে আমরা অনুবাদ করতে পারি যে, - সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কি প্রত্যক্ষ করে না যে পৃথিবী সমেত মহাবিশ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল একটি অতিশক্ত ঘনীভূত ও গলানো উপাদানে পরস্পর পরস্পরের সহিত সন্নিবিষ্ট জমাটবদ্ধ একটি পিণ্ডাকৃতির শক্ত অবস্থায়, অতঃপর আমি তাহাকে খণ্ডায়িত করিয়াছি এক বিস্ফোরণের দ্বারা'। আয়াতটিতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হতে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ্ ২১ঃ৩০ আয়াত দ্বারা মানুষকে জানাতে চাচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডল তথা মহাবিশ্ব এমন একটি অবস্থায় ছিল যখন তার বস্তুমণ্ডল ছিল সক্রিয়, শক্ত ও ঘনীভূত এবং পরস্পর বিজড়িত একক অস্তিত্ব — তারা একত্রে জড়াজড়ি করেছিল একটি পিণ্ডাকৃতির বস্তুতে, তারপর তা বিস্ফোরণ ও বিদীর্ণকরণ প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত হয়ে যায়। সেখানেও ছিল পৃথিবী - ঐ সব বস্তুপিণ্ডের সাথে জড়াজড়ি করে। উল্লেখ্য যে রাতাক শব্দের আভিধানিক ইংরেজী ও বাংলা অর্থ সমূহ Primordial fireball কে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করে কিনা এমন প্রশ্ন আসতে পারে। বলে রাখা দরকার যে, এই শব্দার্থ সমূহ সম্পূর্ণভাবে আদি অগ্নিগোলকের ধারণা না দিলেও কিছু আসে যায় না, এজন্য যে অত্যাধুনিক এই আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি রেখে সদূর অতিতে যেমন রাতাক শব্দের অর্থ করা হয়নি, তেমনি অতিপ্রাচীন অনুবাদেও এই আয়াতের শব্দ ও বাক্যের আবেগ বাদ পড়েনি। মহাবিশ্বের আদি শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থভর যে একটি একক সত্ত্বায় ধৃত ছিল এবং সবকিছুই যে একসাথে মন্ডিত ও বিগলিত কিংবা বিজড়িত অবস্থায় ছিল তা খুব সহজভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আদি অগ্নিগোলকে শক্তি ও পদার্থ যে একত্রে জড়াজড়ি করে বিগলিত অবস্থায় ও যুগ্ম অবস্থায় একে অন্যের অস্তিত্বের মাঝে অতিশয় উত্তাপের কারণে মিশ্র, বিগলিত ও ঝালাইকৃত ছিল এবং এই সহ অবস্থানটি ছিল যেন সূক্ষ্ম পরিমাপগত বুননকার্যের প্রতিটি সূক্ষ্ম তন্তুর বন্ধন কর্মেরই অনুরূপ — যেন সুনির্দিষ্ট সৃঙ্খলা, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ, আঁটসাট মজবুত অতিঘন যেন ঝালাইকরা— একটির মাঝে অন্যটি। এই তথ্যগুলো যে নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আদিম অগ্নি গোলক বা Primordial fireball অথবা সমজাতীয়

www.pathagar.com

পরিবেশের ধারণা দেয় – তা বিতর্কের উর্ধ্বে। এই আয়াতের বিশ্লেষণে আমরা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব বা Big Bang Theory এর মূল শর্তকে অত্যন্ত সফলতার সাথে আবিষ্কার করি এবং আমরা বলতে পারি, কোরআন 'বিগ–ব্যাংগ' অথবা অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিষয়টি নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করে।

উপরের আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি যে, ২১ঃ৩০ আয়াতে যে পরিবেশ ফুটে উঠেছে সেখান হতে পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি – এই বিষয়টি কোরআন বিশুদ্ধ এবং তা যে বিজ্ঞান বিশুদ্ধ তথ্য, তাও আমরা পূর্ববর্তী অনুধ্যায় হতে অবগত রয়েছি। তা হলে বাকী থাকে ৪১ঃ১১ আয়াত। লক্ষ্য করুন "এতদভিন্ন/তৎকারণে তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগ দিলেন, তখন উহা ছিল ধোঁয়াপুঞ্জ, তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন – আসো ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তাহারা বলিল – আমরা স্বেচ্ছায় অনুগতভাবে আসিলাম"।

কোরআনে কথিত ধোঁয়াপুঞ্জ আমাদেরকে নীহারিকা বা গ্যালাক্সির কথা মনে করিয়ে দেয়। আয়াতটি হতে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় যে, নীহারিকার ধোঁয়াপুঞ্জ হতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ২১ঃ৩০ আয়াতের যে পরিবেশে মহাবিশ্ব একটি ঘনবস্তুপিণ্ডে জড়াজড়ি করে অবস্থান করছিল – এই ৪১ঃ১১ আয়াতের প্রস্তাব তার অনেক অনেক পরের ঘটনা। মহাবিশ্বের ধারায় তখন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছে, গ্যালাক্সি হতে নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে যা বিবর্তনের সর্বশেষ ধারা-পরিস্থিতির নির্দেশ দান করে। মহাবিশ্বের বিবর্তন ধারায় ধোঁয়াপঞ্জের মাঝখান হতে পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়টি বিজ্ঞানভিত্তিক। এই পুস্তকের শর্ত–২ এর আলোকে যদি আমরা ধরে নেই যে আল–কোরআনের আয়াত বিন্যাস রীতিতে ধারাবাহিকতা থাকতেও পারে আবার তা লংঘিতও হতে পারে – তবে আমরা ৪১ সুরায় ৯,১০,১১ ও ১২ আয়াতগুলোতে কোন বিরোধ থাকতে দেখি না। আবার ৪১ঃ১১ আয়াতে 'সুম্মা' শব্দটি অতঃপর অর্থের পরিবের্ত তার 'তৎকারণে' অর্থকে যদি গ্রহণ করা হয়- সে বিরোধ একেবারে বিলীন হয়ে পড়ে। আমরা তখন দেখতে পাই – কোরআন পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ নতুন সময়কালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করছে যা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালীন সময় বা পর্যায়কালগুলো হতে ভিন্ন ও অনেক পরের ঘটনা।

তখন প্রশ্ন হবার সুযোগ থেকে যায় যে, ৪১ঃ১১ আয়াতে পৃথিবীর প্রতি আল্লার আহ্বান পৃথিবীর সৃষ্টি হবার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে হয়ত, কিন্তু আকাশকে উদ্দেশ্য করে যে, আহ্বান – "তিনি উহাকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বলিলেন, – তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া"

www.pathagar.com

(৪১ঃ১১)– এর অর্থ কি? পৃথিবীর ন্যায় আকাশের প্রতি এই আহ্বান কিসের? পৃথিবীর ন্যায় আকাশকেও কি সৃষ্টি করার প্রস্তাব হয়েছে এই আয়াতে?

সম্ভবতঃ তাও হতে পারে — হতে পারে এটি গ্যালাক্সি সৃষ্টির সময়কে নির্দেশ করে। মহাবিশ্বের বিবর্তন ধারার যে পর্যায়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয়, সেই পর্যায়ে এই সব গ্যাস নিয়মের সুনিদৃষ্ট শাসনে একত্রিত হয়ে নীহারিকার জন্ম দিতে থাকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতটি সৃষ্টিতে বিধিবদ্ধ আইনের সুস্পষ্ট দিকটিকে তুলে ধরে। বিধিবদ্ধ এই সব আইনের শাসনে বস্তুর গ্যাসীয় সম্মিলন হতে সৃষ্ট গ্যালাক্সি ও তৎপরবর্তীকালে গ্যালাক্সি বা নীহারিকা হতে জন্ম নেয়া অতিকায় নক্ষত্র এবং তা হতে পৃথিবী ও অনুরূপ গ্রহাদির জন্ম এই তিনের যে পর্যায়কাল তা যত বড়ই হোক না কেন, মহাবিশ্ব ও মহাকালের পরিমাপে তা একই কালপর্যায়ভূক্ত যা হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের কাল। হতে পারে যে এই আয়াতে গ্যালাক্সি বা নীহারিকার জন্ম নেয়ার বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে ; হতে পারে যে এই আয়াতটি গ্যালাক্সিসমূহের, মহাবিশ্বের এবং পৃথিবীসমূহের প্রাকৃতিক আইনাবলীর সুনির্দিষ্টতার দিকটিকে ইংগিত করেছে।

আমার এতক্ষণের আলোচনায় শুধু একটিমাত্র সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে পৃথিবীর সৃষ্টি যে যুগপৎ ঘটনা নয় - সেই বিষয়ে কোরআনের অনুমোদন আছে কিনা - তা বিচার করা। আমরা দেখতে পাই - কোরআন অনুমোদন করে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষণ হতে অনেক পরবর্তীকালে পৃথিবীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা তখন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য যে ৬টি সময়কালের কথা বলা হয়েছে সে হিসাবে শুধু মহাবিশ্ব সৃষ্টির মোট পর্যায়কাল দাঁড়ায় কোরআন অনুমোদিভাবে ৪টি। উল্লেখিত চারটি পর্যায়কালকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে দেখা হয়, তা আমরা একটু পরেই জানার সুযোগ পাব। তার আগে জ্ঞানী পাঠকের সামনে পৃথিবী সৃষ্টির দুটি পর্যায়কালকে বিশ্লেষণ করতে চাই।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথিবী ও সমগোত্রীয় গ্রহাদির জন্ম হয়েছিল একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ এবং আদিতে সূর্য সৃষ্টির প্রাথমিক ঘটনাসমূহ হতে। সবচাইতে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, সূর্য সৃষ্টির ক্ষণে ঘনীভূত গ্যাস সমষ্টি হতে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়া গ্যাস পিণ্ডগলো সূর্য পরিবারের গ্রহ-উপগ্রহের প্রাথমিক বস্তু ভিত্তি স্থাপন করে। অনুমান করা হয়, আজ হতে প্রায় ৪৫০–৫০০ কোটি বছর পূর্বে কোন সুপার নোভা বিস্ফোরণ হতে ছিটকে পড়া ভারী মৌলের কণিকা সম্ভার যখন

www.pathagar.com

সৌর রাজ্যে ঢুকে পড়ে, তখন তাদের কতক সূর্য অভিকর্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সূর্য কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত অবস্থায় ধাবমান হওয়ার এক পর্যায়ে নিকটবর্তী গ্রহগুলোতে (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল) ঐ সকল ভারী মৌল ছড়িয়ে যায় এবং আজকের যে পৃথিবীর সাথে আমরা পরিচিত, এমন একটি পৃথিবী রচনার গোড়াপত্তন করে। সে হিসাবে আদি সৃষ্টি অর্থাৎ মহাবিশ্বের জন্মক্ষণটি পৃথিবীর জন্মের বহুগুণ পূর্বের কোন সময়ের নির্দেশ করে। আমরা জানি যে, যে সময়ে মহাজাগতিক পর্যায়কাল বা Stellar era শুরু হয়, তখন হতে বিভিন্ন বলের প্রভাবে (বিশেষভাবে অভিকর্ষ) গ্যালাক্সিসমূহ দানা বাঁধতে শুরু করে। গ্যালাক্সিদের গঠন প্রক্রিয়ার দৃশ্যপটই ৪১ঃ১১ আয়াতে প্রতিবেদিত হতে আমরা দেখতে পাই। গ্যালাক্সির গঠন শুরু হয় যে কালে, সে কালেই পাশাপাশি ঘটতে থাকে আরো একটি ঘটনা – সে হল নক্ষত্রের জন্ম। নক্ষত্রের জন্মের পাশাপাশি ঘটে আরো একটি ঘটনা – গ্রহসমূহের জন্য আদি গ্যাসপিণ্ডের জন্ম। গ্যালাক্সির জন্ম, নক্ষত্রের জন্ম, গ্রহসমূহের আদি গ্যাসপিণ্ডের জন্ম যুগপৎ ঘটনা বলা যায়। বিশেষতঃ তারা সকলেই তখন মহাবিশ্বের একই রকম পরিবেশ হতে জন্ম নিতে থাকে। এখন আমরা যাকে পৃথিবী বলে জেনেছি এমন একটি গ্রহ কিন্তু শুধুমাত্র কথিত সে আদি গ্যাসপিণ্ড হতেই জন্ম নিতে পারে না, তার আবাসযোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ও জীবন সৃষ্টির জন্য চাই ভারী মৌল যা কেবল উল্লিখিত সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলেই সৃষ্টি হতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণটি জীবন উপযোগী গ্রহ সৃষ্টির জন্য এক অপরিহার্য শর্ত। তার জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা অবশ্যই এক ভিন্নরূপ পরিবেশ যার সংগে বর্ণিত মহাজাগতিক পরিবেশের কোন মিল নাই। মহাজাগতিক পরিবেশ হল ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়ামের পরিবেশ ; আর সুপারনোভা বিস্ফোরণ হল সমস্ত জ্ঞাত মৌল ও যৌগ সৃষ্টির পরিবেশ। অর্থাৎ অত্যন্ত সঙ্গত কারনেই বলা যায়, ৪১ঃ৯ আয়াতে প্রস্তাবিত ২টি পর্যায় কাল পৃথিবীর মত গ্রহ সৃষ্টির জন্য এক অপরিহার্য শর্ত এবং এতদবিষয়ে খুব সার্থক ভাবেই কোরআনের দাবী সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে ফুটে উঠে।

এবার আমি প্রিয় পাঠককে পূর্বোল্লিখিত ৪টি পর্যায়কালের ব্যাখ্যা প্রদান করব। তার পূর্বে আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করতে চাই আপনার জ্ঞান জিজ্ঞাসাকে। প্রশ্নটি হল – বিজ্ঞান কি করে জানল মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী এমনিভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল ? এর প্রমাণ কি ? এর জবাব দিয়েছিন বিজ্ঞানীগণ, The central axiom of the 20th century epic is that the universe must have been formed by natural laws which are still discoverable today.[২৬৪] বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এক প্রিয় ও স্বতঃশিদ্ধ শ্লোগান হল যে, – মহাবিশ্ব অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের অধীনে সৃষ্টি হয়েছে যার প্রমাণ প্রকৃতিতে আজো সন্ধান করে পাওয়া যায়। Scientists have taken the universe as it is now and extrapolated backward in time as

www.pathagar.com

far as they could, using their knowledge of the behaviour of matter and radiation to do so. জগৎ বিজ্ঞানীগণ আজকের এই বিশ্ব যেভাবে আছে, তার ভিত্তিতে বস্তুর ধর্ম ও বিকিরণ শক্তির উপরে নির্ভর করে বিপরীত গণনায় সেই পেছনে ফেলে আসা অজ্ঞাত সময়কে সুদক্ষ গণিতের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে খুঁজে পেয়েছেন, বিজ্ঞানীগণ আজ এই প্রাপ্তির বিষয়ে কোন আড়াল রাখতে চান না।

তত্ত্ব যেভাবে বিজ্ঞানীদেরকে পেছনে নিয়ে যায় এবং তার ভিত্তিতে ল্যাবরেটরীতে যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী মহাবিশ্বের সৃষ্টির পর্যায়কালকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, এই বিভাজান সময় বা বয়সের নয় – মহাবিশ্বের পরিস্থিতি এবং তদসাপেক্ষে বস্তু ও শক্তির বিভিন্নকার্যকরী গুণাগুণভিত্তিক। বিভাজনের এই চিত্রটি নিম্নের প্রদত্ত ছকে পেশ করা গেল[২৬৫]।

Name of Era	Duration		Temp		Density		Size of universe
	From	Upto	From	Upto	From	Upto	
Hadronic	10^{-43} sec	10^{-4} sec	10^{32}k	10^{12}k	$3x10^{92}$gm/cc	10^{14}gm/cc	10^{-33}cm dia across
Leptionic		10th sec		10^{10}k		10^{4}gm/cc	
Radiative		10^{6}yrs		10^{4}k		10^{-21}gm/cc	
Stellar		15 billion years		2.7k		10^{-28}gm/cc	20billion light yrs dia across

Remarks : 3 Subdivisions of HADRONIC era

a. Planck time : 10^{-43} sec.

b. Appearance of Quarks between 10^{-35} to 10^{-32} sec.

c. Appearance of basic particles by 10^{-6} sec.

www.pathagar.com

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল-কোরআনে 'ইয়াওম' (يوم) শব্দের বিস্তৃতি অতি সূক্ষ্ম সময় হতে শুরু করে মধ্যম সময় ও অতিবৃহৎ সময় ইত্যাদি সব কিছুকেই অন্তর্ভূক্ত করে। যে চারটি সময়কালের পরিচয় এখানে দেয়া হল, তাতে আমরা অতিশয় সূক্ষ্ম সময় (10^{-43} বা ১০ কোটিকে কোটি দিয়ে গুণ করে তার কোটি গুণ, তারও কোটি গুণ তারও কোটি গুণ এবং তারও কোটি কোটি গুণ সংখ্যা দ্বারা ১ সেকেণ্ড সময়কে ভাগ করলে যে সময় পাওয়া সম্ভব তার সমান (ইহা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব), মধ্যম সময় (রেডিয়েটিভ ইরা ১০ লক্ষ বছর), বৃহৎ সময় (১৫ মহাপদ্ম) - ইত্যাদি সকলেরই সংমিশ্রণ দেখি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রদত্ত চারটি সময় পর্যায় আর কোরআনের চারটি পর্যায়কাল হুবহু মিলে যায়।

এবার আমি বিরুদ্ধবাদীদের আহ্বান করছি। তাদের অনেকেই হয়ত কটাক্ষ করে বলবেন, ধর্মান্ধ লেখক তার খেয়ালখুশিমত বিজ্ঞানের চারটি পর্যায়কালকে মিলিয়ে দেয়ার সকল প্রচেষ্টা করে দৈবাৎ কারণে সার্থক হয়ে পড়েছে , ৬টি সময় পর্যায়ের হিসাব নিলে অবশ্যই কোরআন ধরা পড়ে যেত। এমনি কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমি বিনীতভাবে পেশ করব যে, ৪টি পর্যায়ের যে হিসাব আমি দেখিয়েছি তা কোনভাবেই যে জোর করে মিলিয়ে দেয়া নয়, তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই চারটি সময়কালের সিদ্ধান্ত আল-কোরআনের কোথাও সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়নি, এতদসত্ত্বেও কোরআনিক বক্তব্যের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করেই তা গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও যদি তা অস্বীকার করতে হয়, তবে আমরা ৬টি সময়-পর্যায়ের হিসাবই মিলিয়ে পেতে পারি বিজ্ঞানের রায় অনুযায়ী এক ও অভিন্নভাবে। উপরে "হ্যাড্রোনিক ইরার" তিনটি বিভজনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমরা যদি হ্যাড্রোনিক ইরাকে এককভাবে গ্রহণ না করে এর তিনটি ভাগকে গ্রহণ করি তবে অন্য তিনটি পর্যায়কালের সাথে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞান অনুমোদিত নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির সর্বমোট পর্যায়কাল-সংখ্যা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে কোরআন অনুমোদিত ৬টি পর্যায়ে এসেই স্থির হয়। বলুন কোনটি অস্বীকার করবেন? বিজ্ঞান? যদি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট তথ্য আপনার হাতে না থাকে তবে আপনাকে উপায়হীনভাবে কোরআন মেনে নিতে হবে, কারণ বিজ্ঞান যে কোরআনের সত্যকেই প্রকাশ করে রেখেছে।

তার পরেও আপনার সন্দেহ আছে কি? আল-কোরআনে নির্দেশিত ৬টি পর্যায়কাল যে একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে আজকের ভুবনে বিরাজ করছে, তার আরো একটি অত্যন্ত সুদৃঢ় প্রমাণ একটি ভিন্ন অথচ নির্ভরযোগ্য উৎস হতে নীচে প্রদান করা হল।[২৬৬]

www.pathagar.com

	Epoch	Corresponding time	Details
1.	Planck time	10^{-43} sec	Temp 10^{32}k, Physics starts, Gravity broken free, size of universe 10^{-28} cm diameter across, exquisitely hot energy.
2.	Inflationary	10^{-35} sec	Temp10^{17}k, size of universe 10^{-24}cm diameter across to a soft ball (or orange size) lasts upto 10^{-32} sec. Quarks appear, matter, antimatter, radiation are a bubbling opaque stew.
3.	Formation of proton & neutron	10^{-6}sec	Temp 10^{13}k, Solar system size universe, existence of matter over antimatter after annihilation; quarks bind into protons and neutrons.
4.	Formation of nucli	3 minutes	Temp 10^{9}k, protons, neutrons fuze into nucli.
5.	Formation of matter & separation of radiation.	10^{5} year	Temp 3000k, formation of atoms, Separation of radiation from matter.
6.	Familiar universe	10^{9} year uptill today	Temp 15k to 2.7k Quasars. galzxies, nebulae, stars, planets; size of universe 15 to 20 billion light years across.

www.pathagar.com

উপরে প্রদর্শিত পর্যায় বা Epoch গুলো বস্তু ও শক্তির প্রকৃতি, ধর্ম বা গুণাগুণের উপর ভিত্তি করেই কেবল বিভাজিত হয়েছে। এখানে তাও উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতিটি পর্যায়কাল কোন না কোন সৃষ্টি বিষয়ক চরিত্রে প্রদর্শিত এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন পর্যায়ের বিভাজনের জন্য একমাত্র প্রশস্ত উপায় যার কোন বিকল্প নেই। 'প্লাঙ্ক টাইম' বা সূচনা ক্ষণে পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক আইন-কানুনের

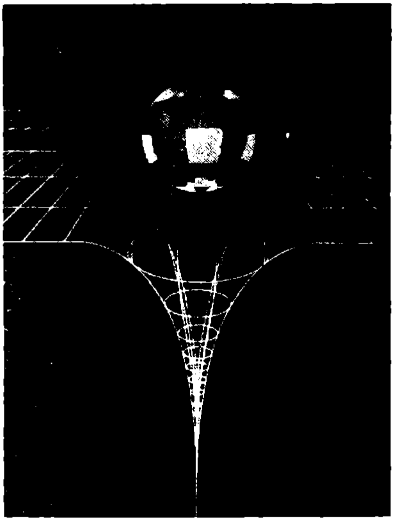

"ক"

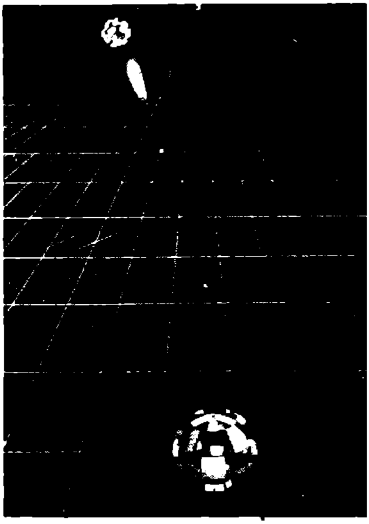

"খ"

ক। *প্রথম ইয়াওম — প্লাঙ্ক টাইম। সৃষ্টির এ ক্ষণটি ছিল ১ সেকেন্ডকে ১ মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে তাকে বিলিয়ন দিয়ে পরে ট্রিলিয়ন দিয়ে ও সর্বশেষে জিলিয়ন দিয়ে ভাগ করলে যে অতিক্ষুদ্র সময়মিতি পাওয়া যায় তার সমান। এই সময়ের অস্তিত্ব অনুমান অসম্ভব — তা শুধু তাত্ত্বিক ভাবেই প্রকাশ যোগ্য। এই সময়ের Physics ছিল অতিশয় সরল। তাপমাত্রা* $10^{32}k$

খ। *দ্বিতীয় ইয়াওম বা Inflationary Epoch; সময় দৈর্ঘ্য* 10^{-35} *হতে* 10^{-32} *sec. এক অতি অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া প্রোটনের চাইতেও আকৃতিতে কয়েক সহস্র লক্ষ বিলিয়ন ক্ষুদ্র এক মহাবিশ্বকে কামলা লেবুর সমান আকৃতি দান করে। এসময় বস্তু, প্রতিবস্তু, শক্তি এক অস্বাভাবিক ফুটন্ত শক্তি তরলে একত্রিত ছিল। তাপমাত্রা* 10^{27} *k.*

www.pathagar.com

গোড়াপত্তন ঘটে, মহাবিশ্বের আদি জন্মের সূচনা হয়। তখন কোন পদার্থ ছিল না ; ছিল শুধু অজ্ঞাত বা শূন্য উৎস হতে উত্তপ্ত শক্তি, সে ছিল ***প্রথম ইয়াত্তম বা প্রথম পর্যায়কাল,*** তার জন্য যে সময় লেগেছিল, তার দৈর্ঘ্য ছিল এক সেকেণ্ড সময়ের দশ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, ভাগের এক ভাগ (10^{-43} sec)। তারপর শুরু হয় অতিতীব্র সম্প্রসারণ ক্ষণ বা ইনফ্লেশনারী ইপক: যা শুরু হয় 10^{-35} sec সেঃ এবং শেষ হয় 10^{-32} সেঃ। এই সময় বস্তুর আদি ভিত্তি কোয়ার্কের জন্ম হয়। কোয়ার্ক হল বস্তুর, জ্ঞাত সবচাইতে ক্ষুদ্র মৌলিক কণা, প্রোটনের আকারে চাইতেও বহুগুণ ক্ষুদ্র (10^{-24} সেঃ মিঃ ব্যাস; অর্থাৎ ১ সেঃ মিঃ এর হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ)। এ হল ***দ্বিতীয় 'ইয়াত্তম'।*** তারপর মহাবিশ্বের বয়স বেড়ে হয় 10^{-6} সেঃ বা ১ সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এই সময় মহাবিশ্বের আকার হয় সৌরজগতের সমান ; এই পর্যায়ে কোয়ার্ক হতে প্রোটন ও নিউট্রণের গঠন হয়। বস্তু ও প্রতি বস্তুর ধ্বংসলীলা শেষে উদ্বৃত্ত বস্তু বেঁচে থাকে যা এই মহাবিশ্বের আদি পদার্থ ভর। সময়ের এই পর্যায় হল ***তৃতীয় 'ইয়াওম'*** ।

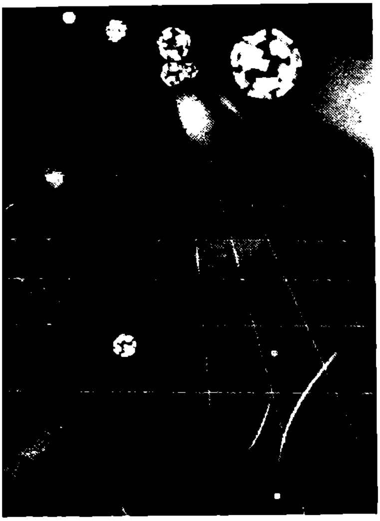

"গ"

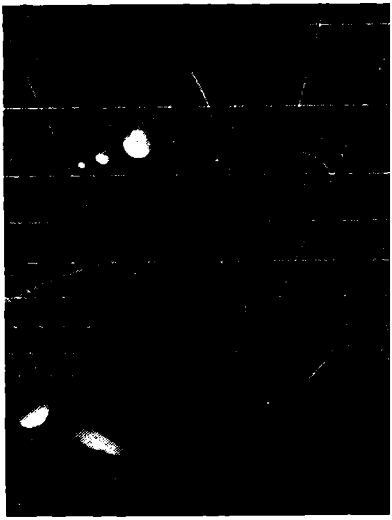

"ঘ"

গ। তৃতীয় ইয়াওম। সময়ের পরিমাণ ১ সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ। এ সময় strong ও weak force আলাদা হয়ে যায়। কোয়ার্ক হতে প্রোটন ও নিউট্রন তৈরী হয়। তখন মহাবিশ্বের আকৃতি ছিল সৌর জগতের সমান। তাপ মাত্রা $10^{13}k$

www.pathagar.com

ঘ। চতুর্থ ইয়াওম। সময় দৈর্ঘ্য ৩ মিনিট। প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বস্তুর নিউক্লিয়াস গঠণ করে। তাপমাত্রা $10^9 k$

সময় বেড়ে এতক্ষণে ৩ মিনিট কাল ; ততক্ষণে প্রোটন ও নিউট্রণে আবির্ভাব ঘটে এক অদৃশ্য বাঁধনের। এই পর্যায়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। এ হল ***চতুর্থ 'ইয়াওম'*** । সময় গড়িয়ে এরপর হতে থাকে ঘন্টা, দিন, মাস, বছর, যুগ এবং এভাবে ১০ লক্ষ বছর। এ সময়ে ইলেকট্রন এসে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বৃত্ত রচনা করেছে; এ হল ***পঞ্চম 'ইয়াওম'*** ।এই পর্যায়েই কেবল সর্ব প্রথম জ্ঞাত ও

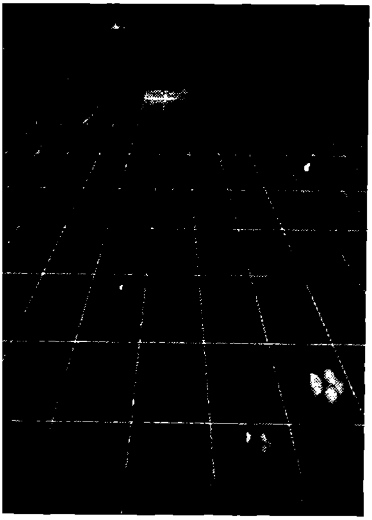

"ঙ"

"চ"

ঙ। পঞ্চম ইয়াওম। সময় দৈর্ঘ্য ৩ মিঃ হতে ৫ লক্ষ বৎসর। নিউক্লিয়াসের চার পাশে ইলেক্ট্রন এসে বৃত্ত রচনা করে। সৃষ্টির ইতিহাসে এ সময়ে সর্ব প্রথম স্বয়ং সম্পূর্ণ পদার্থের মৌলিক কণিকা সৃষ্টি হয়। বিকিরণ শক্তি পদার্থ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং আলো মুক্তভাবে চলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা $10^3 k$

চ। ষষ্ট ইয়াওম। পদার্থ ও অভিকর্ষ গ্যালক্সি, সুপার গ্যালাক্সি, কোয়াসার, ব্ল্যাকহোল, নক্ষত্র, গ্রহ ও জীবন সৃষ্টি ও প্রতিপালণের পরিবেশ তৈরী করে। মহাবিশ্বের আকৃতি ২০ মহাপদ্ম আলোক বৎসর। তাপমাত্রা $3k$. আমরা এ সময়ের অধিবাসী।

www.pathagar.com

পরিণত বস্তুর গোড়া পত্তন ঘটে। তারপর দশ লক্ষ বছরের সীমা রেখা পেরিয়ে মহাবিশ্ব প্রবেশ করে মহাপদ্ম বছরের মহাকালের হিসাবে। গঠিত পদার্থ দুর্বোধ্য বল অভিকর্ষ যা জন্মলগ্নেই পৃথক হয়ে পড়েছিল, - তার শাসনে দানা বাঁধতে থাকে ; হাইড্রোজেন হিলিয়ামের ৩ঃ১ অনুপাতে গঠিত হতে থাকে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্রহ, জীবন এবং সংসার ; এ হল সেই ***ষষ্ঠ 'ইয়াওম'*** । ইয়াওম বা কাল-পর্যায়ের এই বিভাজন যেন পূর্ণিমার আকাশের আলতো পূর্ণ চাঁদের মত সহজ দৃশ্য ; স্বাতন্ত্রে ও বৈশিষ্ট্যে আমাদের শ্রদ্ধা-বিধুর নরম হৃদয় পল্লবে একবার অনুভব মধুর প্রেমময় হাতের ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়ে যেন বলে যায়, - "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে এক মাত্র তিনিই আল্লাহ (৬ঃ৩)। তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব হে মানুষ ! বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় ফিরিয়া চলিয়াছ" ? (৪০ঃ৬২)।

"ওহে মানুষ। কোন বস্তু তোমাকে তোমার রব (পালন কর্তা) হইতে মোহান্ধ করিয়া রাখিয়াছে? (৮২ঃ৬) স্মরণ কর তোমার প্রভু প্রতিপালকের অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি। আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন স্রষ্টা আছে কি যে তোমাদিগকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিজিক (জীবিকা) দান করে? তিনি ব্যতীত যে আর কোন ইলাহ নাই। অতএব, তোমরা কোন ভ্রান্তির পানে ছুটিয়া চলিলে ? (৩৫ঃ৩)। এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া, কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নহে , আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি উহারা জানিত (২৯ঃ৬৪)। এই তো সঠিক সত্য দিন, সুতরাং যাহারা ইচ্ছা নিজ পালন কর্তার সকাশে ঠিকানা খুঁজিয়া লউক" (৭৮ঃ৩৯)।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আরো একটি মূল্যবান তথ্য পেশ করতে চাই। ৪১ঃ১২ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন যেখানে আকাশমণ্ডলী তথা মহাবিশ্বকে ২টি সময়-কালে নিয়মিত করার প্রস্তাব এসেছে। আপনারা বিস্মিত হবেন যে, এটিও কোরানিক সত্যতা যাচায়ের আরো একটি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। আপনারা অবগত আছেন যে, হাড্রনিক ও লেপটনিক পর্যায়গুলোতে কোন বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। ১১তম সেকেণ্ড হতে ১০ লক্ষ বছর পরিসরের যে রেডিএটিভ ইরার কথা আমরা পূর্ববর্তী অনুধ্যায়ে পাঠ করেছি, কেবল সে সময়ই বস্তুর গঠন সম্ভব হয়। অতঃপর রেডিএটিভ ইরাতে গঠিত বস্তুসমেত মহাবিশ্বকে ষ্টেলার ইরা বা নাক্ষত্রিক পর্যায়কালে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু নিচয় গঠন করতে দেখি। বস্তু গঠনের পরই পদার্থবিদ্যাবিষয়ক শৃংখলা সৃষ্টি হতে থাকে। রেডিএটিভ ইরাতে সে শৃংখলা ছিল ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

ও মূল পদার্থ কণিকা গঠন সংক্রান্ত এবং ষ্টেলার ইরাতে সে শৃংখলা ছিল গঠিত সমষ্টিগত পদার্থস্তুপ এর সামগ্রিক শৃংখলা সংক্রান্ত। অর্থাৎ এ দুই পর্যায়কালেই শুধু মহাবিশ্ব নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিণ হয়েছে। আর ঠিক এই বক্তব্যটিকেই কত সঠিকভাবে আমরা আবিষ্কার করতে পাই আল-কোরআনের বাণী প্রজ্ঞায় - "অতঃপর তিনি দুই-কাল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত করিলেন সপ্ত (অথবা বহু) আকাশ, প্রত্যেক আকাশে প্রেরণ করিলেন তাঁহার নির্দেশাবলী" (৪১ঃ১২)। আমরা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করি যে, যে দিক হতে অবলোকন করি, সে দিক হতেই কোরআনকে বিজ্ঞানের প্রকাশক হয়ে থাকতে দেখি।

আমাদের বিস্ময়কে চরমভাবে জাগ্রত করে এখানে একটি সত্যকে পুনঃশ্চ প্রমাণিত হতে দেখতে পাই। আমরা যখন মহাবিশ্বের বয়সের পর্যায়কালকে বিজ্ঞানের তথ্য অবলম্বনে ৪টি করে দেখি, তখন যেমন কোরআন উদারভাবে এর স্বীকৃতি দেয় - তেমনি যখন আমরা কোরআনের দাবী অনুযায়ী ৬টি পর্যায়কে বিবেচনা করি, তখনো একই উৎস হতে একই তথ্য বিজ্ঞানের সুদৃঢ়তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ৬টি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে কোরআনের দাবী পূরণ করে। কোরআনের বাণীর এই স্বতঃসিদ্ধতা ও ক্ষয়হীনতা আমাদিগকে মনে করিয়ে দেয় - "আল্লার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, উহা এক মহা সাফল্য" (১০ঃ৬৪)।

২৫৮। Nature, Spirituality and Science - Sukhraj Tarneja.

২৫৯। সুধী পাঠক, অনুগ্রহ করে কোরআন অথবা অনুবাদ হতে ইয়াওম শব্দটির ব্যবহার দেখে নেবেন। আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যায় বলে উদ্ধৃতি দেয়া হল না।

২৬০। উল্লিখিত আয়াতসমূহে "সামায়া" শব্দকে অবশ্যই মহাবিশ্ব অর্থে পাঠ করতে হবে। কোরানিক পরিভাষায় 'আরদ' শব্দটির এক এবং বহুবচনে ব্যবহার প্রশস্ত (দ্রষ্টব্যঃ ভিন জগতের জীবন)।

২৬১। সম্ভবতঃ ৪টি এমন একটি প্রস্তাব করার পেছনে মূল কারণ হল - ৪টি পর্যায়কালের প্রস্তাব সরাসরি কোরআনে কোথাও নেই ; তবে আমি যে সহজ পাটিগণিতের রীতিতে চারটি কালপর্যায়ের সিদ্ধান্তে এসেছি, তা সহজবোধ্য। আমি অবশ্যই দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থী, যেন কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত ভুল, ভ্রান্তির কারণে কোন মিথ্যা কিংবা কোন প্রকার অন্যায় কোরআনের সত্যতা ও ভাবমূর্তির বিরুদ্ধবাদ না হয়ে দাড়ায়।

২৬২। এই বিষয়ে ডঃ মরিস বুকাইলিও অনুরূপ মতামত পোষণ করেন।

২৬৩। F. Steingass.

২৬৪। The Quest for order, James S. Trefil, Dialogue 1,1984.

২৬৫। The Cambridge Atlas of Astronomy.

২৬৬। National Geographic Vol 161 No. 2 Feb. 1982.

www.pathagar.com

১৪ঃ৪

টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম ও প্রাইমোরডিয়াল ফায়ার বল, বিজ্ঞানের অসামর্থ্য ও কোরআনের প্রজ্ঞা।

" ওহে মানুষ ! তোমরাতো ইতিমধ্যেই অবগত রহিয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে - তবু কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ? " (৫৬ঃ৬২)।

কি বলতে চায় কোরআন ? প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ অবগত রয়েছে। কিসের সৃষ্টি - মানুষ, জীবজন্তু , পৃথিবী না বিশ্বব্রহ্মান্ড ?

আপনার বিস্ময়ে তাক লাগিয়ে কোরআন এই ক্ষুদ্র আয়াতে এক মহা তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে যায়। সুধী পাঠক, আপনি অবগত আছেন কি যে আল-কোরআন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অতি নিখুঁত বিশ্লেষণ দিয়েছে ?

উল্লিখিত আয়াতের ব্যবহৃত শব্দ 'নাশআত'(النشأة) এর প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সৃষ্টি, মূল, অস্তিত্বলাভ করা বা উদ্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, জন্মানো, এই জগৎ এবং পরবর্তী জগৎ ইত্যাদি (Creation , origin, what springs up, shows itself, grows, this world and the world to come)[২৬৭]। আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে জগৎ সৃষ্টির প্রথম ঘটনাটিই এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করবে - এমনি একটি সম্ভাবনাও বিবেচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এ আয়াতের বক্তব্য হতে পেয়ে থাকি। অন্যভাবে বলতে পারি - যাঁর নিকট হতে এই কোরআনের জ্ঞান, তিনি যে মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিষয়টি বিবেচনা করে রেখেছেন, এবং মানুষ যে এ বিষয়ে অবগত হতে পারবে - এ বিষয়টিও যিনি অবগত আছেন, সে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ এই আয়াতের আলোকে মানুষের অনুধাবন ও অনুভবকে জাগ্রত করতে চাইছেন। এ আয়াতের দাবী - "তোমরা কি অনুধাবন করিবে না" ? - তা এ প্রবন্ধেরও একটি জিজ্ঞাসা হয়ে থাকুক, আলোচনা শেষে আমি সুধী পাঠকের কাছেই এর জবাব চাইব। এখন আমরা অন্যদিকে মোড় নিতে চাই।

ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন যে, শূন্য সময়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, যখন সময় গড়িয়ে 10^{-43} sec তখনই এক বিপুল শক্তি-বস্তু ভর অতিশয়

www.pathagar.com

সংকুচিত অবস্থা হতে বিস্ফোরিত হয়ে আদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিলনা – এবং সর্ব প্রথম যখন কিছু অর্থাৎ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হল, এ দুই এর ব্যবধান হল ১ সেকেন্ডকে দশ কোটি, তার কোটি গুণ, তার কোটি গুণ, তার কোটি গুণ, তার কোটি গুণ, তার কোটি গুণ একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে সময় হতে পারে, তার সমান ; অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধ্যের অতীত এত অসীম সূক্ষ্ম সময়ে এত বড় মহাবিশ্ব সংসারের জন্ম সূচিত হয়েছিল। মহা বিশ্বের যখন জন্ম সূচিত হয়, ঠিক তার পূর্ব পলে (মুহূর্তের চেয়েও অনেক অনেক সূক্ষ্ম) কোন প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না, অথচ এটাই সত্য যে এভাবেই মহা বিশ্বের জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞান তার আজকের সকল বিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে বিষয়টিকে এমনিভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

প্রশ্ন আসে – অতি দুর্লঙ্ঘ্য প্রশ্ন – Where did that (the young universe) come from ?" হতাশার মহাসমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে তার বিপুল রাগ–ভৈরব গর্জনের প্রত্যুত্তরে David Atkatz এবং Heinz Pagels (Rockfeller University) এর ভাষায় বিজ্ঞান শুধু নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় – this is a question we cannot answer [২৬৮] – হায় ! এই প্রশ্নের উত্তর যে আমাদের জানা নেই !

এই হতাশ প্রাণ বিজ্ঞানীদের দুঃখের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমারও একবার বলতে ইচ্ছা হয় – হায়, তারা যদি আল–কোরআনের প্রতি চোখ বুলাত ! তারা দেখত, এই প্রশ্নেরও একটি গ্রহণযোগ্য জবাব রয়েছে।

এখন আমরা কোরআনকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা অনুরুপ কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য কতটুকু প্রশস্ত রয়েছে , তা প্রত্যক্ষ করব। তার পূর্বে বলে নিতে চাই যে, – "অপ্রমাণিত আইন বা নীতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের সৃষ্টি" [২৬৯]। একইভাবে যা প্রমাণিত সত্য নয় , তাকেও সত্য হিসাবে বিবেচনা করে মূল লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পিতভাবে আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধান্ত পেতে পারি। এত কোন সিদ্ধান্ত সত্য কিংবা অসত্য তা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

আমরা আমাদের বিশ্লেষণের সুবিধার্থে একটি সাময়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই। মনে করুন, আমরা কেউই কোরআনে পেশকৃত তথ্য সমূহে বিশ্বাসী নই। [২৭০] এখন এই বিশ্বাসহীন অবস্থা হতে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের মাধ্যমে আমরা যদি একটি বিশ্বাস–দৃঢ় অবস্থায় পৌছতে পারি – তা হলে অবশ্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কোরআনকে। এখন আমাদের সিদ্ধান্তের খাতিরে ধরে নিতে হবে যে, কোরআন যা

www.pathagar.com

বলেছে , তা সবই সত্য; অন্যথায় আমরা আমাদের প্রকল্পকে স্বার্থক করতে ব্যর্থ হব।

আইনষ্টাইনের সমীকরণ $E = mc^2$ একটি প্রমাণিত সত্য। এই সমীকরণ অনুযায়ী ১ কেজি ভরে নিহিত শক্তির পরিমাপ হল ঃ-

$$E = 1 \times (3 \times 10^8)^2$$
$$= 9 \times 10^{16} \text{ Joules}$$
$$= 10^{17} \text{ Jouls}$$

বিপরীতভাবে বলতে গেলে 9×10^{16} Joules পরিমাণ শক্তিকে ঘণায়ন করলে কেবল ১ কেজি পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব করা হবে। অতএব David Atkaz and Heinz pagels এর আদিম বস্তু ভর সম্পর্কিত প্রশ্ন – Where did that come from' এর উত্তরে অন্ততঃ এইটুকু বলতে পারা যায় যে, কোন অসীম শক্তি–উৎস হতে অচিন্তনীয় পরিমাণের শক্তিকে সেইসময়ে সেই বিন্দুতে ঘণায়ন করে একদম শূন্য আস্থায় বস্তু সৃষ্টি সম্ভব। আমাদের এই সম্ভাবনার বিষয়টিকে আমরা সিদ্ধান্ত – ক হিসাবে বিবেচনা করব।

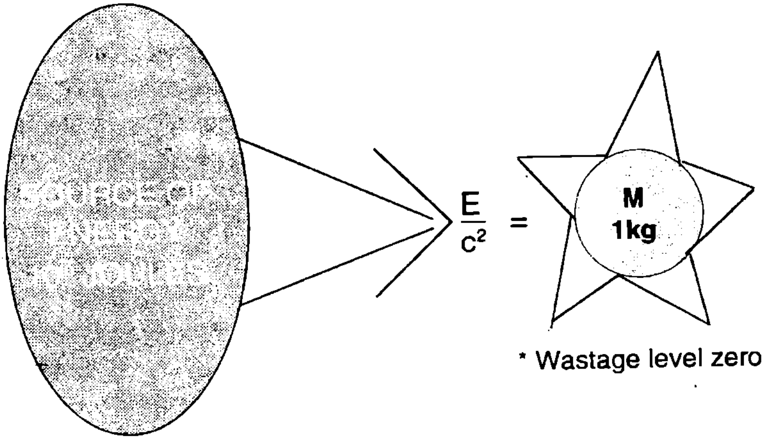

সিদ্ধান্ত–ক। অতিবৃহৎ শক্তি উৎস হতে শক্তির ঘনায়ন প্রক্রিয়ায় পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব।

www.pathagar.com

এখন আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত 'ক' যে কোন ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া তাত্ত্বিক বিষয় নয়, অসংখ্য প্রমাণ আজকের ব্যবহারিক দুনিয়ায় বর্তমান। তাবৎ বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে যা কিছু আছে, বিজ্ঞানীরা তাদেরকে মূলতঃ দুটি ভাগ করেছেন – পদার্থ ও শক্তি। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পদার্থ ও শক্তি একেবারে ভিন্ন ধরণের জিনিষ, পদার্থ থেকে শক্তিতে বা শক্তি থেকে পদার্থে পরিবর্তন নৈব নৈবচ। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বিশ্বে কথাটি একেবারে অচল। পদার্থের নিত্যতার সূত্র এবং শক্তির নিত্যতার সূত্র এ দুইই যে নিখুঁত কোন সূত্র ছিল না, মানুষ সে সম্পর্কে সচেতন হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। এই বোমার মধ্যে ইউরেনিয়াম -235 এবং পুটোনিয়াম -239 নামক পদার্থ রয়েছে। তাদের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যখন বিভাজন শুরু হয়, তখন সে বিক্রিয়ায় সমষ্টি বস্তুর ভর সামান্য কমে যায়। এই অদৃশ্য ভরই বিস্ফোরণের প্রচন্ড শক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। একই উদাহরণ দেয়া যায় সূর্যের বেলায়। প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সূর্যকে কার্যক্ষম রাখে এবং এ প্রক্রিয়ায় সূর্যের ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ভর অদৃশ্য হয়ে যায় – ভরটি পরিণত হয় শক্তিতে। এই শক্তি ভাসিয়ে রাখে তাপ ও অন্যান্য বিকিরণ শক্তিতে সমস্ত সৌর দুনিয়া।

কিন্তু শক্তিকে পদার্থ হিসাবে রূপান্তরিত করা যায় কি ?

শক্তিকে পদার্থ হিসাবে রূপান্তরিত করার বিষয়টিও কিন্তু আর কোন কল্পকাহিনী নয়। বাস্তবে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল গামা-রশ্মি থেকে পজিট্রন-ইলেকট্রন জোড় উৎপত্তির ঘটনায় । গামা রশ্মি এক ধরণের শক্তি – আলো, এক্স-রে ইত্যাদির সমজাতীয় । পরীক্ষাগারে পদার্থের সঙ্গে গামা-রশ্মির সংঘাত ঘটিয়ে দেখা গেল যে, ঐ রশ্মির শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, আর একই সাথে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড় জন্ম নিয়েছে। এই জোড়ের দুটি কণার যে মোট ভর, গামা রশ্মির ফোটনে তার সমতুল্য শক্তির সমান শক্তি বা তার চেয়ে বেশী শক্তি থাকলেই এই জোড়ের উৎপত্তি সম্ভব। এই শক্তি যদি বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত শক্তি প্রকাশ পায় উৎপন্ন শক্তি কণা দুটির কোন একটির গতিশক্তি রূপে। একটি পজিট্রন ও একটি ইলেকট্রনের মোট ভরের সমতুল্য শক্তি হল ১.০২ মেগাইলেকট্রিক ভোল্ট (Mev) অর্থাৎ ১০.২ লক্ষ ইলেকট্রিক ভোল্ট। সিজিয়াম-সি নামক তেজস্ক্রিয়ার পদার্থ থেকে নির্গত গামা রশ্মির ফোটনে থাকে ২.৬২ মেগা ইলেকট্রিক ভোল্ট শক্তি। এই রশ্মি হতে পজিট্রন-ইলেকট্রন জোড়ের উৎপত্তি হলে অতিরিক্ত শক্তির পরিমাণ হয় (২.৬২ – ১.০২) = ১.৬ মেঃ ইঃ ভোল্ট। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উৎপন্ন পজিট্রনের গতির সর্বোচ্চ শক্তির পরিমাণ ১.৬ মেঃ ইঃ ভোল্ট। এমনিভাবে প্রোটন-এন্টি প্রোটন জোড় তৈরী সম্ভব। ১৯৫৫ সনে বিভাট্রন নামক

www.pathagar.com

ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন গুচ্ছকে অত্যন্ত গতিশীল করে এবং সেই শক্তি সম্পন্ন প্রোটন গুচ্ছকে তাম্র খন্ডের উপর নিক্ষেপ করে চেম্বারলেন, সেগ্রে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখান যে, প্রোটন-এন্টিপ্রোটন জোড় উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে । পরবর্তীকালে আরো শক্তিশালী প্রোটন গুচ্ছ ব্যবহার করে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে ডয়টেরণ-এন্টিডয়টেরণ জোড়। ডয়টেরণ হল হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, ডয়টেরিয়ামের নিউক্লিয়াস যা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত একটি স্থায়ী পদার্থ।[২৭১]

উপরের আলোচনা হতে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে গৃহীত সিদ্ধান্ত 'ক' অর্থাৎ শক্তি, আলোক রশ্মি বা বিকিরণ শক্তি হতে পদার্থ তথা বিপুল শক্তি হতে বিপুল পদার্থ সৃষ্টির বিষয়টি একটি বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা বহন করে।

বস্তুগত অস্তিত্ব হিসাবে একদম শূন্য অথচ শক্তিগত অস্তিত্ব হিসাবে বিপুল কোন শক্তিকে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করণের দ্বারা শক্তিকে বস্তুতে রূপান্তর করা যায় - এ বিষয়টি বিজ্ঞান অনুমোদিত ও প্রমাণিত সত্যও বটে। শূন্য সময়ে বস্তু ও শক্তির অস্তিত্ব শূন্য ধরে নেয়া হয় - আর এখানেই আমরা সবচাইতে বড় সমস্যার মোকাবেলা করি। যেহেতু মহাবিশ্বের আদি পদার্থ সম্পূর্ণ শূন্য হতে একটি বস্তুগত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে - সেহেতু অবশ্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে, এই বিতর্কিত পদার্থ একটি আদি শক্তি হতে উদ্ভূত , অন্যথায় কোনভাবেই তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যায় পৌছা সম্ভব নয়। এমন ধারণায় পৌছার সবচাইতে বড় কারণ হল যে, The central axiom of the 29th century epic is that the universe must have been formed by natural laws which are still discoverable to-day.[২৭২] যে ভাবে মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছে, সেগুলিই প্রাকৃতিক আইন ; এবং এই আইনগুলি এখনো প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ God must guide us in accordance with our laws so that we can understand Him.[২৭৩] অর্থাৎ প্রভূ আমাদেরকে আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক আইন কানুনের দ্বারাই পরিচালিত করে থাকেন যেন আমরা তাঁকে বুঝতে সমর্থ্য হই। এই দুটি মতামতের আলোকে আমরা শূন্য সময়ের অব্যাখ্যিত শূন্যতাকে আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক আইন কানুনের দ্বারা বিচার করতে পারি। আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক আইন 'একদম শূন্য' হতে বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সমর্থন দেয় ; তবে এই "একদম শূন্য " এর অর্থ শুধু বস্তুগত অর্থেই সীমাবদ্ধ। এর পিছনে অবশ্যই একটি শক্তিকে আনতে হবে ($m = \frac{e}{c^2}$) অন্যথায় আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক আইন $E = mc^2$ এখানে কোন ব্যাখ্যাই প্রদান করতে সমর্থ নয়। তা হলে শূন্য সময় অথবা তৎপূর্বে " কিছুই ছিলনা অথচ সে আদিম শূন্যতা হতে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে" - এই ধারণাতে পৌছালে যে ব্যাখ্যাহীনতা সৃষ্টি হয়, সেই ব্যাখ্যাহীনতায়

www.pathagar.com

একটি অসীম শক্তিধর বহিঃশক্তির (Foreign power) কল্পনা করলে উদ্ভূত সকল ব্যাখ্যা শূন্যতার একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা চলে। আমরা মনে করি আল-কোরআনের প্রবক্তা মহাশক্তিশালী আল্লাহ্ তা'লাই এই অসীম বহিঃ শক্তি এবং তিনি শূন্য সময়ে কিংবা তৎপূর্বেও একটি শক্তি উৎস হিসাবে বিরাজমান ছিলেন এবং তিনিই প্রাকৃতিক আইন $E = mc^2$ অথবা তার অনুরূপ কোন পদ্ধতিতে একদম শূন্য হতে বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সুধী পাঠকের কাছে এ হোক সিদ্ধান্ত – খ।

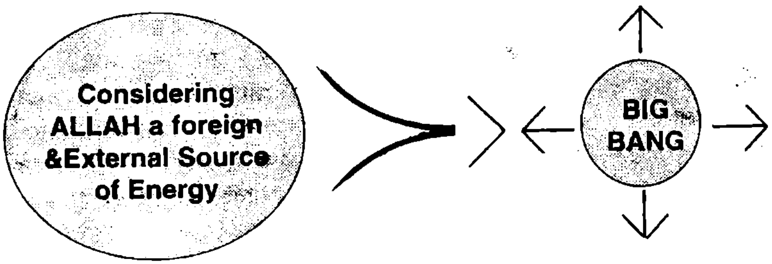

সিদ্ধান্ত-খ। স্রষ্টাকে একটি বহিঃজাগতিক অতিশক্তিশালী উৎস হিসাবে বিবেচনা করলে Big Bang এর সম্ভাব্যতা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

আমাদের সিদ্ধান্ত 'খ' কি শুধু অনুমানকৃত ধারণা ? এর পিছনে শক্তিশালী কোন ব্যাখ্যা আছে কি ?

এর জবাব এক্ষুণি তুলে ধরছি। আল-কোরআনের পাতায় ফিরে আসুন।"তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন ? (২৯ঃ১৯)। বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন" (২৯ঃ২০)।

www.pathagar.com

২৯ঃ২০ আয়াতের দিকে চেয়ে অনেকেই অবাক হতে পারেন যে, লেখক এভাবে কোথা হতে ব্যাখ্যা নিয়ে এল ? আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি - এই হল এর সঠিক অনুবাদ। ব্যবহৃত শব্দ সায়ির (سير) এর অর্থ ভ্রমণ করা ইত্যাদির পাশাপাশি আর একটি অর্থ হল (Sight)। Noun হিসাবে অর্থ দৃষ্টিশক্তি, দৃষ্টিক্ষেত্র, দৃশ্য ইত্যাদি এবং verb হিসাবে অর্থ দেখা বা দেখতে পাওয়া ; দর্শন যন্ত্রের কলকব্জা যথা বিন্যস্ত করা ইত্যাদি । এখন আমরা ২৯ঃ২০ আয়াতের ব্যবহৃত দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণ নেয়ার চেষ্টা করব। ব্যবহৃত শব্দ বাদায়া (بدا) এর অর্থ হল সর্ব প্রথম কোন কিছু করা বা সৃষ্টি করা, আরম্ভ করা ইত্যাদি (Do a thing the first , be the first to do, make a beginning, create, do first before any thing else, beginning, begin, commence.[২৭৪] অন্য শব্দ 'খালক (خلق) এর অর্থ ইতিমধ্যেই আমরা অবগত আছি যে এমন কিছু সৃষ্টি করা যা পূর্বে ছিল না ; সঠিক ওজনের অনুপাতে সৃষ্টি করা ইত্যাদি। বাদায়াল খালকি (بدا الخلق) সহযোগে যে প্রস্তাব হতে পারে, তা হল সম্পূর্ণ নূতনভাবে অর্থাৎ অস্তিত্বে আনয়ন জাত সৃষ্টির সূচনা করা। আমরা বলতে পারি, ২৯ঃ২০ আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দান করছেন যেন মানুষ পৃথিবীতে অনুসন্ধান পূর্বক উদ্‌ঘাটন করে যে, কিভাবে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। বিষয়টিকে সংযুক্ত করুন সেই পূর্বোল্লিখিত ৫৬ঃ৬২ আয়াতের সঙ্গে - "ওহে মানুষ, তোমরাতো ইতিমধ্যেই অবগত রহিয়াছ , প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে ." আমরা এখানে দেখতে পাই , ২৯ঃ২০ আয়াতটি কিভাবে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে যে পৃথিবীতে তথ্য রয়েছে , তার দলিল প্রদান করে আর একই আয়াত এবং ৫৬ঃ৬২ আয়াত আমাদের জানিয়ে যায় যে , এই তথ্যগুলি জানা সম্ভব ; মানুষ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। আয়াত দুটি যেন ঠিক ২৭২ ও ২৭৩ নম্বর টীকায় প্রদত্ত বিজ্ঞানীগণের অনুমানের পেছনে একটি দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে এসে দাঁড়ায়।

যাই হউক, আমরা যে শূন্য হতে সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সে প্রসঙ্গে এসে কো'রআনের ২৯ঃ২০ আয়াতে প্রয়োগিত "বাদায়া" ও "খালকা" শব্দ দুটি হতে জানতে পারি যে কোরআনের স্রষ্টা যা অস্তিত্বে নেই এমন সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। অনুরূপ তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে ১০ঃ৪ ; ২৭ঃ৬৪ ; ২৯ঃ১৯ ; ৩০ঃ১১ ; ৩০ঃ২৭ ইত্যাদি আরো বহু আয়াতে। অর্থাৎ আমরা দেখি, আমাদের পূর্ববর্তী গৃহীত সিদ্ধান্ত "খ" অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য কারণে স্বার্থক।

এতক্ষণ আমরা জেনেছি - আল্লাহ্ নামক একটি অসীম ও বহিঃশক্তি (External) শূন্য অস্তিত্ব হতে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখন আমরা দেখতে চাইব - তিনি কি করে সৃষ্টি করে থাকেন। সুধী পাঠককে আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক আইনাবলীর দ্বারাই এই সব ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি - এর

www.pathagar.com

জন্য কোন অনুমান বা প্রকল্পিত সিদ্ধান্তের (hypothesis) প্রয়োজন পড়ে না, বস্তু জগতের আইন কানুনের দ্বারা আমরা সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

এখন লক্ষ্য করুন কোরআনের ৫১ঃ৪৭ আয়াতের দিকে । প্রস্তাব এসেছে - "আমি বিশ্ব ব্রহ্মান্ড (আকাশ মন্ডলী) সৃষ্টি করিয়াছি শক্তি বলে" । অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিরই গোড়াপত্তন ঘটেছে শক্তি হতে । সিদ্ধান্ত 'ক' এ ফিরে চলুন, একদম শূন্য হতেও বস্তু সৃষ্টি সম্ভব। এই মহা বিশ্বকেও প্রকৃতির আইন-কানুনে সৃষ্টি হতে হয়েছে। বিজ্ঞান যে শক্তির ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয় - কোরআনের বিজ্ঞতা এসে সে শূন্যতাটি পূর্ণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ একদম শূন্য হতে সৃষ্টির সম্ভাব্যতার বিষয়ে কোরআন ও বিজ্ঞানে আমরা কোন মতান্তর দেখছি না। উপরন্তু মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে "আদি বস্তু কোথা হতে এল" এ প্রশ্নের জবাব যেখানে বিজ্ঞান দিতে ব্যর্থ হয়েছে - সেখানে কোরআন এসে বিষয়টিকে প্রাকৃতিক আইনাবলীর নিয়ম কানুনেই বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ মহাবিশ্বকে শক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। এ হল আমাদের সিদ্ধান্ত - গ ।

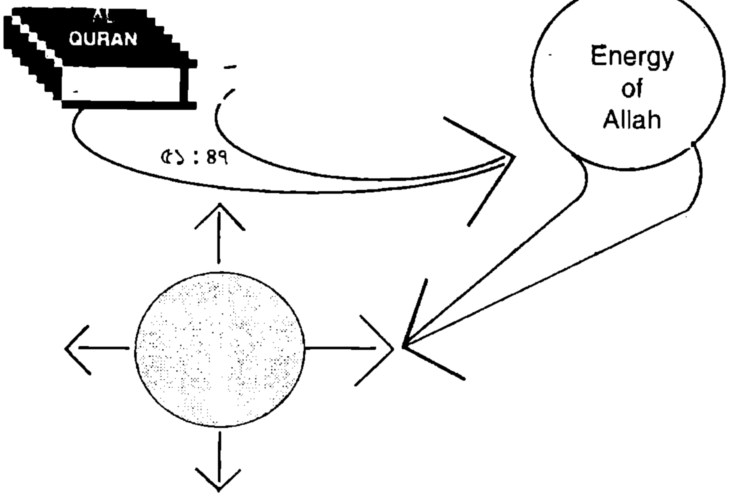

সিদ্ধান্ত - গ। শক্তি বা Energy হতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং যুগপৎ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াটি মূলতঃ কোরআনেরই প্রস্তাব।

www.pathagar.com

আল্লাহ কি করে তাঁর শক্তিকে বস্তুতে পরিণত করেছেন জানেন কি ? এর ব্যাখ্যাও রয়েছে কোরআনে। তার পূর্বে আমরা কোরআনের আয়াতের আলোকে আল্লাহর শক্তিকে সনাক্ত করতে চাই। লক্ষ্য করুন ঃ –

১। আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী (২ঃ২২৮)।

২। তিনি ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিবান (৩০ঃ৫৪)।

৩। তথাপি তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী (১৩ঃ১৩)।

৪। উহারা আল্লাহর যথোচিৎ মর্যাদা উপলব্ধি করে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী (২২ঃ৭৪)।

৫। তোমার প্রতিপালক মহাশক্তিবান ও মহাক্ষমতাশালী (১১ঃ৬৬)।

অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর মহাশক্তি, সর্বপ্রকার শক্তি, সব কিছুর উপর শক্তি ইত্যাদি ও তাদের আনুপাতিক ধারণা পাই ১৫ঃ৮৬ ; ২৬ঃ৯ ; ২৬ঃ১৭৫ ; ৩১ঃ২৭ ; ৮ঃ৪১ ; ৮ঃ৪৯ ; ৮ঃ৬৩ ; ১৩ঃ১৬ ; ৫৭ঃ২ এবং অনুরূপ আরো বহু আয়াতে। এই সব আয়াতের শক্তি বা ক্ষমতা বুঝবার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই।

শক্তি বা ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য "ক্বাভিও, ক্বাদির, আজিজ" (القوى-القوى-القدير) ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যাদের প্রত্যেকটি আল্লাহর গুণবাচক নাম। লক্ষ্যনীয় যে, প্রতিটি শব্দের মূল সরাসরি শক্তি বা (energy) কে নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ২২ঃ৭৪ আয়াতের ব্যবহৃত ক্বাভিও আজিজ (قوى عزيز) শব্দ দুটির কথা ধরা যাক। 'ক্বাভিও' শব্দটির অর্থ হল অতিশয় তীব্র, প্রচন্ড, যৎপরোনাস্তি জোরালো তীব্র , শক্তিবান, ক্ষমতাবান (Vigorously strong, severe, violent, intense, powerful, mighty , potent)[২৭৫]। শব্দটির সঙ্গে যখন নির্দেশ সূচক 'আল' সংযুক্ত হয় – তখন তা চরমতার অর্থে – (of superlative degree) প্রকাশ পায়। এই শব্দটির বিশেষণ হল 'ক্বাওয়াত (قوة) যার অর্থ হল শক্তি, ক্ষমতা (force, might, power)। অন্যশব্দ 'আজিজ' (عزيز) এর মূল হল 'আজ্জায' (عزز) যার অর্থ ক্বাভিও এর অনুরূপ ; অর্থাৎ শব্দ দুটি সমার্থক। তা হলে একই অর্থের দুটি শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করার কারণ কি হতে পারে ? মূলতঃ তা "শক্তির উপরে শক্তি" এমনি কোন ধারণা দেয়। ক্বাভিও এর সঙ্গে আজিজ বিশেষণটি সংযুক্ত হলে ক্বাভিও-র পরমতা গুণকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর শক্তির বিষয়ে যে প্রস্তাব

www.pathagar.com

এসেছে , তা মূলতঃ একটি গাণিতিক ধারণার মত – শক্তির উপর শক্তি বা x^{nx} (x to the power ^{nx}) অর্থাৎ জ্ঞানের অগম্য শক্তি, যার প্রকাশ নেই।

অনুরূপভাবে ৩০ঃ৫৪ আয়াতের প্রতি তাকালে দেখা যাবে যে, দুটি শব্দ এসেছে যা হল 'আলিমুল ক্বাদির' (العليم القدير) । এখানে ব্যবহৃত আল (ال) নির্দেশকটি চরমাত্মক গুণাগুণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখতে পাই , দাবী করা হচ্ছে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ; আর তাঁর সর্বশক্তি গুণাগুণটি গুণান্বিত হয়েছে তার সর্ব-চরম জ্ঞানের প্রশস্ততা দ্বারা। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান হল চরম বিজ্ঞতা যুক্ত কিংবা বিজ্ঞানধর্মী।

তাহলে আমরা দেখি, আল্লাহর রয়েছে অসীম- বিস্তার বিজ্ঞান-জাত শক্তি এবং তিনি তাঁর জ্ঞানে ও শক্তিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এই সৃষ্টি করবার প্রক্রিয়াটি হল আদিম শূন্যতা হতে শক্তি দ্বারা সর্বপ্রথম অস্তিত্বে আনয়ন করার মাধ্যমে। ২৪ঃ৩৫ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন – "আল্লাহ আকাশ সমূহ (মহাবিশ্ব) ও পৃথিবীর আলো . . . . . .আলোর উপর আলো .....।"

কোরআনের আয়াতের বহুমুখীতা ও এ বই এর শর্ত –২ এর আলোকে আমি পরিবেশিত 'নূরুন আলা নূর' বা জ্যোতির উপর জ্যোতি – এই আয়াতাংশকে প্রেক্ষাপট হতে পৃথক করে নিতে চাই। উল্লেখ থাকে যে ২৪ঃ৩৫ আয়াতখানি কোরআনের রহস্যপূর্ণ আয়াত সমূহের একটি। আয়াতটির একটি বিশেষত্ব এই যে, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের আলো, জ্যোতি বা electeomagnrtic energy অথবা তার চাইতে নিপুণ শক্তি সম্পন্ন কোন প্রকাশ।[২৭৬] আল্লাহর এই 'আলোর উপর আলো' ধারণাটি আলোকের ঘনায়ন প্রক্রিয়ার সমানুতিক ; যেমনটি আমরা সৃষ্টি তত্ত্বের বিকিরণ পর্যায়কালে দেখতে পাই যে, আলোকের ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্বের চাইতেও বেশী। ইতিমধ্যেই আমরা সিদ্ধান্ত 'ক -এর শেষে এই সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা সম্পর্কিত আলোচনায় দেখতে পেয়েছি যে, ইলেক্ট্রোমেগানটিভ শক্তি বা আলোক শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। তা হলে আমরা কি বলতে পারি যে, আল্লাহ হয়তবা তাঁর নূর বা আলো বা জ্যোতিকে তাঁর মহাপ্রশস্ত শক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত 'গ' এ প্রদত্ত যুক্তির অনুরূপ কোন উপায়ে বস্তু জগতের গোড়া পত্তন করেছেন ? আপনার উত্তর অবশ্যই তার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য । এই বিষয়টি হউক আমাদের সিদ্ধান্ত – ঘ।

এখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হব। প্রশ্নটি হল, আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছিল যে, আদি বস্তু অস্তিত্বে প্রকাশিত হওয়ার জন্য যতটুকু সময় নিয়েছিল – সে এক সূক্ষ্ম সময়। তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় যে, শূন্য সময়ের পরে ১ সেকেন্ডের ১০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, ভাগ সময়ে (10^{-43} sec)

www.pathagar.com

আদি বস্তু অস্তিত্বে আগমন করে অথচ শূন্য সময়ে কিন্তু বস্তুর কোন অস্তিত্ব ছিল না ; অর্থাৎ বস্তুকে হয় 10^{-43} তম সেকেন্ডে কিংবা শূন্য সময় (time zero) ও 10^{-43} সেকেন্ডের মাঝামাঝি কোন সময়ে সৃষ্টি হতে হয়েছে যা অনুমান করা কখনো সম্ভব নয়। প্রশ্নটি হল, জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য এত সূক্ষ্ম সময়ে কি করে এই বিরাট মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব হল ? তত্ত্বজ্ঞান বিষয়টিকে সমর্থন দিচ্ছে – কিন্তু এর কোন বাস্তবতা সম্ভব কি ?

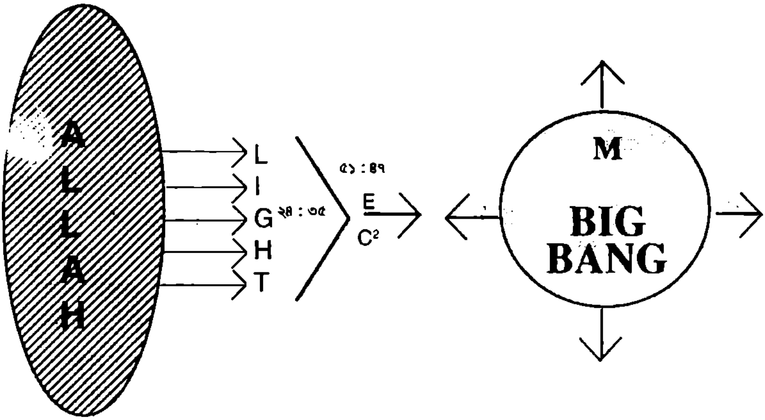

সিদ্ধান্ত – ঘ। এই মহাবিশ্ব আল্লাহরই নূর বা আলোর প্রকাশরূপ (২৪ঃ৩৫) এবং তিনি শক্তি হতে আদিতে সম্প্রসারণমুখী মহাবিশ্ব তৈরী করেছেন (৫১ঃ৪৭); $E=mc^2$ এর তত্ত্ব এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

আল-কোরআন তাকেও সম্ভব বলে বিচার করেছে। লক্ষ্য করুন,-সেই সত্ত্বাই আকাশ সমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন "হও" অমনি তাহা হইয়া যায়" (৬ঃ৭৩)। ব্যবহৃত শব্দ 'কুন ফাইয়া কুন' (كـن فيـكـون) একটি যুগপৎ ঘটনার প্রকাশক যা একটি দ্রুতি (speed) এর সাথে তুল্য। এখন আল্লাহর এই আদেশের দ্রুতি কেমন, তাও দেখার সুযোগ রয়েছে কোরআনে –"আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায় – একবার ব্যতীত নহে"

www.pathagar.com

(৫৪:৫০) । প্রাপ্ত সকল তরজমা ও তফসীরে এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'লামাখা' এর অর্থ করেছে "চোখের পলক", অর্থাৎ আল্লাহর আদেশটি চোখের পলক ফেলতেই কার্যকরী হয়। কিন্তু চোখের পলক ফেলার জন্য যে সময় দরকার, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং বিশেষভাবে সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অবশ্যই তাকে বলতে হবে যে 'অনেক বড় সময় বা সুবিশাল সময়'। সৃষ্টি তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা দেখি অতিশয় সূক্ষ্ম সময়ে সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছিল। 'লামাখ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল আলোর ঝলক, দ্রুত দৃষ্টি (Flash, glance , snatch of a hasty look, wink)[২৭৭]। শব্দটির সঙ্গে 'কাফ' (ك) হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে ; এতে যে অর্থটি প্রকাশ পায় তা হল, আলোর ঝলকের ন্যায় , দ্রুত দৃষ্টি প্রবাহিত হওয়ার মত যা নামান্তরে আলোরই গতি ; অর্থাৎ আল্লাহর আদেশটি এই আয়াত দৃষ্টে কমপক্ষে আলোর বেগের মত চরম গতিসম্পন্ন।

সৃষ্টি বিষয়ে আল্লাহর দ্রুতি কিরূপ, তার আরো সুস্পষ্ট দলিল পেশ করা যায়। "সেই সত্ত্বাই আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সমতায়। তিনি যখন ইচ্ছা করেন – 'হও' – অমনি তাহা হইয়া যায়" (৬:৭৩)। অনুরূপ প্রস্তাব এসেছে ২:১১৭; ৩৬:৮২; ১৬:৪৯ এবং আরো কিছু আয়াতে। ব্যবহৃত শব্দ 'আরাদ' (اراد) এর অর্থ ইচ্ছা করা আকাংখা করা কিন্তু অন্য একটি শব্দ 'ইয়াকুল' (يقول) এর যথোচিত অর্থ বেশীর ভাগ অনুবাদেই অনুপস্থিত। সকলেই একবাক্যে একে 'বলা' অর্থে ধরে নিয়ে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এই আয়াতগুলির প্রেক্ষাপটে এর অন্য আর একটি অর্থ চিন্তা করাই (think)[২৭৮] অধিকতর প্রশস্ত। আমরা যদি এ অর্থটি গ্রহণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আল্লাহর যখন কোন সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি শুধু তা মনে করেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করেন – অমনি তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহর কাজ করার পদ্ধতি তাঁর মননশীলতার দ্রুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা আমাদের মনের দ্রুতি সম্পর্কে জানি – আলোর গতির চাইতেও অনেক বেশী দ্রুততার সাথে মন চলে। মহান আল্লাহর মননশীলতার দ্রুতি মানুষের চাইতে অপরিমেয় গুণ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, বলা যায়, আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে আলোর গতি কিংবা মননশীলতার গতির চাইতেও বেশী দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে সক্ষম। এমন কোন দ্রুতিতে যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি সেই বিতর্কিত 10^{-43} তম সেকেণ্ডে কিংবা শূন্য সময় ও তার মাঝামাঝি কোন অদৃশ্য সময়ে মহাবিশ্বকে তাঁর অচিন্তনীয় শক্তি দ্বারা আমরা যে সকল প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে পরিচিত, তেমনি কোন শৃংখলায় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন। এ হোক আমাদের সিদ্ধান্ত – ৬।

www.pathagar.com

১৫ . ৩৫ ; ২৩ . ৯ ; ২৩ . ১৭৫ ; ৫৭ : ২ ইত্যাদি

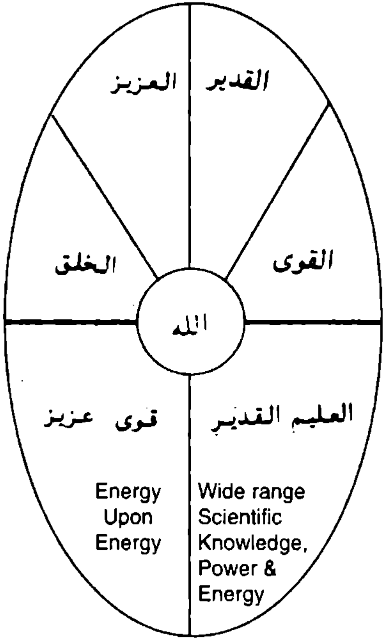

Allah is a vigorously Strong, violent, intense, powerful, mighty, potent Source of Energy.

QURANIE MODEL OF BIG BANG

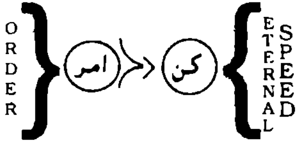

সিদ্ধান্ত - ৬

প্রাপ্ত সমুদয় তত্ত্ব ও কোরানিক তথ্য স্বীকৃতি দেয় যে, একমাত্র মহান আল্লাহই Big Bang এর মত এটা অতি অসাধারণ পন্থায় বিশ্বব্রমাণ্ড সৃষ্টি করার যোগ্যতা রাখেন।

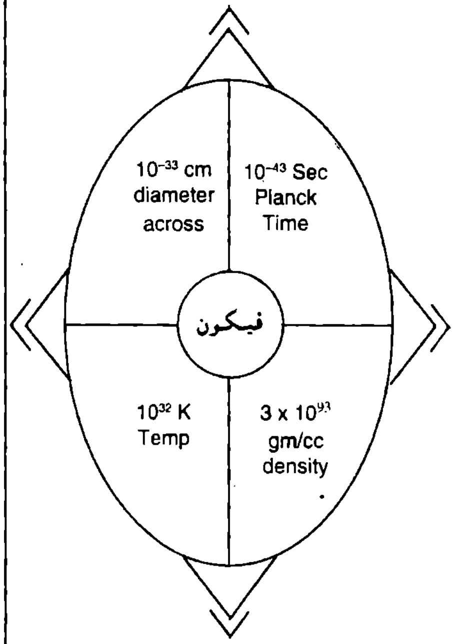

Big Bang & Expansion

www.pathagar.com

প্রচলিত পদার্থ সম্পর্কিত আইন-কানুন আমাদের জানায় যে, এক পদার্থ হতে অন্য পদার্থ, পদার্থ হতে শক্তি কিংবা শক্তি হতে পদার্থ সৃষ্টির ঘটনাটি অপরিমেয় তাপশক্তির সাথে জড়িত। আমরা প্লাঙ্ক টাইমে তাপমাত্রার যে ক্রম দেখি, তা হল 10^{-32} ডিগ্রী কেলভিন[২৭৯] বা দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কেলভিন। আল্লাহর শক্তি হতে যখন পদার্থ অস্তিত্বের গোড়পত্তন ঘটে – তখন এই অসীম মাত্রার তাপশক্তি বেরিয়ে পড়ে ; প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান এই পরিমিতিকে কোন স্কেলে ফেলে বিচার করতে পারে না, শুধু বলে যায়, – To begain with creation of the universe out of nothing seemed to flagrantly violet the law of conservation of matter and energy and perhaps to require a supernatural intervention[২৮০] এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তিকে এই সব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য ডেকে আনতেই হয়। এবং তখনই শুধু , It is possible that the beginning can be explained only by a rediscovery of God.[২৮১] সৃষ্টির শুরু বিষয়ক জটিলতার একটি ব্যাখ্যা মিলে যদি কিনা আমরা স্রষ্টাকে সমস্যাস্থলে স্থাপন করতে পারি।

আমরা এখন আমাদের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সমূহের বিচার করলে পাই যে, আমাদের জানা প্রাকৃতিক আইন বা আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণের শর্ত অনুযায়ী কোন শক্তি হতে চরম শূন্যতায় বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব (সিদ্ধান্ত-ক)। একদম শূন্য হতে সৃষ্টির বিষয়টি যে জটিলতা নিয়ে বিরাজমান, তার শূন্যতায় যখন কোরআনের প্রস্তাব অনুযায়ী আল্লাহকে টেনে আনা হয় – তখন অভূতপূর্ব ভাবে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান এসে দাঁড়ায় আমাদের হাতে, যার বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণ সম্মতি রয়েছে (সিদ্ধান্ত-খ)। সেই আল্লাহ অসীম শক্তির আধার এবং তিনি তাঁর শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন (সিদ্ধান্ত -গ) । এ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সম্ভবতঃ তাঁর নূর বা আলোকে পদার্থে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়েছিল (সিদ্ধান্ত -ঘ)। সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি আলোর চাইতে দ্রুততর মানুষের মননশীলতা অপেক্ষাও দ্রুত ছিল (সিদ্ধান্ত - ঙ) বলে 10^{-43} তম সেকেণ্ডের মত সূক্ষ্ম সময়ে অথবা শূন্য সময় হতে তার মধ্যে যে বস্তু-অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রচলিত পদার্থ বিদ্যার রীতি অনুযায়ী সেই শক্তি যখন ঘনীভূত হয়ে পদার্থ সৃষ্টি করে, তা নির্গত করে এক মহা বিস্তার তাপশক্তি। এভাবে আমরা দেখি, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাংগ থিওরীর প্রত্যেকটি অব্যাখ্যিত জটিলতাই কোরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এখন টীকা নম্বর ২৭০ এর প্রেক্ষাপটে প্রত্যাবর্তন করব। প্রকল্পটির শুরুতেই ধরে নেয়া হয়েছিল যে, আমরা কোরআনে বিশ্বাস করিনা। কিন্তু কোরআনের তথ্য সমূহ যেভাবে বিজ্ঞানের অতিশয় সংকট পূর্ণ ও অব্যাখ্যিত বিষয়গুলোকে পদার্থ বিজ্ঞানের জানা রীতি নীতির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করতে দেখি এবং যখন দেখি যে বিন্দু

www.pathagar.com

বিষর্গ পরিমাণেও কোন অসংগতি, অযৌক্তিকতা ও অবিজ্ঞানের আশ্রয় কোরআন গ্রহণতো করেনিই , বরং অতিশয় সূক্ষ্মতায়, সুদৃঢ়তায় ও বিজ্ঞতায় সকল সমস্যার একটি বিজ্ঞানপূর্ণ গ্রহণযোগ্য সমাধান দিচ্ছে এবং পথ নির্দেশ করছে , তখন আমরা অসহায় ভাবেই বলতে বাধ্য হই যে, - "এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য (৩১ঃ৩০)। তিনি সত্য সহকারে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা পূর্বতন কিতাব সমূহের সত্যতার প্রমাণ করে (৩ঃ৩)। এই কোরআন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা একটি পথ নির্দেশ ও করুণা" (৭ঃ২০৩)।

আমাদের জানার বিষয় ও বিস্মৃত হবার ক্ষেত্রগুলি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানীগণ আমাদেরকে আরো মজার ও বিস্ময়কর তথ্যাদি জানিয়ে যায় এই সৃষ্টি তত্ত্বের উপর। আদি বস্তুতে অধ্যুষিত আদি অগ্নি-গোলক (primordial fire ball) এর সৃষ্টির মধ্যে এসেছে এক অতি বিস্ময়কর ও সংকেটপূর্ণ পরিমাণ মিতি। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আজ বিশ্বাস করা হয় যে, আদি অগ্নি গোলকের মধ্যে বস্তু ও অবস্থার যে অনুপাত প্রাথমিক অবস্থায় নির্ধারিত হয়েছিল, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণ ব্যতিক্রম হলে এই চেনা বিশ্ব আজকের চেহারায় বর্তমান থাকত না। নক্ষত্র জীবনে আমরা যে ভারসাম্য ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করি - অর্থাৎ ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়ামের এই যে অনুপাত, তা আদি অগ্নি গোলকের প্রকৃতিতে সামান্য পরিবর্তন ঘটলে আর বজায় থাকত না। যদি কোন পারমাণবিক শক্তি অন্য একটি হতে সামান্য একটু বেশী হত, তখন সমস্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের একটি আইসোটোপে পরিণত হত ; নক্ষত্র সমূহ হয়ে পড়ত বিস্ফোরন্মুখ পদার্থস্তুপ, সূর্যের মত কোন নক্ষত্র কখনো জন্ম লাভ করত না, ঘটত না জীবনের উন্মেষ। ১৯৭৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টিফেন হকিং তাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণ করেন যে, আদি অগ্নি গোলকের সম্প্রসারণ যদি অযুত-কোটি ভাগের এক ভাগ (One part in a million million) বেশী হত, তবে মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু এতদিনে অদৃশ্য হয়ে যেত; অভিকর্ষ বল কখনোই গ্যাসমালা একত্রিত করে নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সির জন্ম দিতে সক্ষম হত না ; যদি এই সম্প্রসারণ অযুত কোটি ভাগের এক ভাগ কম হত - তাহলে অভিকর্ষ বল মহাবিশ্বকে ১ মহাপদ্ম বৎসর বয়সকাল হবার পূর্বেই ধ্বংস করে ফেলত। These things are to me immensely strange. Is it not extra ordinary that the possibility of taking here this afternoon depends on events which were very narrowly determined over 10,000 million years ago in the very earliest moments of the universe ?[২৮২] স্যার বার্নার্ড লোভেলের দেয়া এই সব তথ্য হতে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাই - সে হল, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালে সূক্ষ্ম পরিমাপ জ্ঞানের বিষয়টি। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালীন অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতে এই পরিমাপ মিতির বিষয়টি কোরআন ব্যাখ্যা করতে পারে কি? আপনার

www.pathagar.com

অনুধাবনকে জাগ্রত করে লক্ষ্য করুন, - "উহারা কি নিজেদের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য?" (৩০:৮) কিংবা "সেই সত্তাই মহাবিশ্ব (আকাশ সমূহ) ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সমতায় (৬:৭৩)। আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাপ" (১৩:৮)। ব্যবহৃত শব্দ খাল্‌কা যা অস্তিত্ব দান জাত সৃষ্টিকে বুঝায়, তার বিশেষ আর একটি অর্থ হল ওজন ও অনুপাত দ্বারা প্রস্তাবিত সৃষ্টির নির্ধারণ করা (determine by weight and measure) অর্থাৎ 'খাল্‌কা' দ্বারা যে সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে, সে প্রস্তাবটি কোরআনের পরিভাষায় এমন এক সৃষ্টি, যার মধ্যে পরিমাণ ও অনুপাতের বিবেচনা অপরিহার্য। অর্থাৎ ষ্টিফেন হকিং এর পরিমাণ ধারণার বিষয়টি কোরআন ব্যাখ্যা করে।

কোরআনের তথ্যের সূক্ষ্মতা ও সঠিকতার আরো একটি বিস্ময়কর প্রমাণ মিলে এর শব্দ নির্বাচনে। প্রথম অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই বিষয়টির উপর একটি বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। বুরুজ শব্দের সঙ্গে জায়লা এর ব্যবহার ভিন্ন কোথাও খাল্‌ক শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। আমরা মানুষ 'জায়লা' কে খাল্‌কা অর্থে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হইনি, বিগত কয়েকশত বৎসর ধরে এই ভুলটা করে যাচ্ছি। একটি বারও যদি কোথাও এই 'জায়লার' স্থলে 'খাল্‌কা' শব্দটি ব্যবহার হত, তবে সময়-দূরত্ব ক্রম-ধারার কৈশিক বিচার বিশ্লেষণে বিতর্কিত হয়ে পড়ত কোরআনের সত্যতার বিষয়টি, গোটা মানুষ জাতির সকল বিজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা উৎসরিত বিবেচনা সত্ত্বেও যে ভুলটি এ ক্ষেত্রে শত শত বৎসর ধরে করা হয়েছে, সেটি যদি কোরআন মনীষা করতেন, তা হলে কোরআন অন্ততঃ একটি স্থানে হলেও বৈপরীত্বের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত।

বিগ ব্যাংগ বা সৃষ্টি তত্ত্বের অনেকগুলি বড় প্রমাণের সর্বপ্রধান একটি হল যে, মহা বিস্ফোরণের সাথে সাথে সৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটে, আর যে মুহূর্তে সৃষ্টি অস্তিত্বে আসে, সে মুহূর্ত হতেই তা সম্প্রসারিত হতে শুরু করে; অর্থাৎ আদি সৃষ্টি এবং মহা বিশ্বের মহা সম্প্রসারণ একটি যুগপৎ ঘটনা। এই চিত্রটি লক্ষ্য করুন ৫১:৪৭ আয়াতের মাঝে - " আমি মহাবিশ্ব (আকাশ) সৃষ্টি করিয়াছি শক্তি বলে ; আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি" কত অদ্ভুত সঙ্গতি ও কত নির্ভুলতা।

আরো অনেক সূক্ষ্ম ও জটিলতর প্রমাণের দিকগুলি রয়েছে যা প্রমাণ করবে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য প্রদান করে রেখেছেন আল কোরআনের পাতায় আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে। আলোচনার কলেবরকে সীমিত রাখবার প্রয়োজনে আমি আর কোন তথ্য সংবেদিত করা হতে বিরত থেকে

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তি করছি সেই ৫৬ঃ৬২ আয়াতের "- ওহে মানুষ! তোমরাতো ইতিমধ্যেই অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে - তবু কি তোমরা অনুধাবন করিবে না" ? এ প্রশ্নের জবাব শুরুতেই সুধী পাঠকের উত্তর হতে পাবার কথা ছিল। আপনি দেবেন এর কোন উত্তর ?

আপনার উত্তর আপনারই বিজ্ঞতার কাছে নীত হউক। শুধু শ্রবণ করুন মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ - "তিনি, যিনি স্তরে স্তরে অগণিত আকাশ ('সাবায়া'কে অসংখ্য অর্থে ধরা হয়েছে) সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে কখনো কোন অসংগতি দেখিতে পাইবে না। তোমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেখিয়া লও, তেমন কিছু দেখিতে পাইতেছ কি? তোমার দৃষ্টিকে আবারো বুলাইয়া লও এবং আবারো ; তোমরা দৃষ্টি তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করিবে ক্লান্ত, ব্যর্থ, বিমর্ষিত ও লজ্জিত হয়ে (৬৭ঃ৩,৪)।

কোরআনের এই দুনিয়া জোড়া চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে গোটা মানব জাতির বিগত দেড় হাজার বৎসরের নীরবতাই সবচাইতে বড় প্রমাণ যে - "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই - উহা এক মহা সাফল্য" (১০ঃ৬৪)।

---

২৬৭ । Arabic English Dictionary - F. Steingass.
২৬৮ । Alan Mac Robert, Sky & Telescope, Mar'83.
২৬৯ । Donald Henry Poter - The Evidence of God in Expanding Universe.
২৭০ । যারা কোরআনে বিশ্বাস করেন না, তাদের সমতলে নেমে, তাদের বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার মাত্রাজ্ঞানে সমস্যাটিকে বিবেচনা করতঃ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই।
২৭১ । শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান সেপ্টেম্বর-অক্টোবর - ১৯৮৮।
২৭২ । James S. Trefil -The Quest for Order, Dialogue No. 63.1/1984.
২৭৩ । Reinhard Breuer (West German) 2/1989 ISSN 0303 -4638 Science in the USSR.
২৭৪ । F. Steingass.
২৭৫ । Elias A Elias & ED. E. Elias.
২৭৬ । আল্লাহর শক্তিকে Electromagntic energy হিসাবে বিচার করা উচিৎ হবে না। মূলতঃ তাঁর শক্তি আমাদের জ্ঞাত কোন মাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়। আলোচনা সহজবোধ্য ও কাছাকাছি একটি ধারণায় পাঠকের জ্ঞানকে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই জ্ঞাত সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণটি বেছে নেয়া হয়েছে মাত্র।
২৭৭ । Elias A Elias & ED Elias.
২৭৮ । F. Steingass.
২৭৯ । The Cambridge Atlas of Astronomy.
২৮০ । Alan Mac Robert - Sky & Telescope March '83.
২৮১ । To the Edge of Eternity - John Gribbin.
২৮২ । Dawn of a New Era - Sir Barnard Lovell.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিনয় পর্ব

www.pathagar.com

শেষের কথা – ১

আপনি ইচ্ছা করলে প্রশ্নটি আনতে পারেন – আল্লার স্রষ্টা কে ?

তাত্ত্বিকভাবে এটি কোনক্রমেই অসংগত কোন প্রশ্ন নয়। আমরা আমাদের জ্ঞাত সব কিছুরই একজন সৃজনকারী দেখতে পাই। সুতরাং বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের সে বিখ্যাত জিজ্ঞাসাটি – প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছিল, এমনি একটি প্রশ্নে প্রভুর সমর্থনকারীগণ বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। উপায়হীনভাবে ডোনাল্ড হেনরী পোটারের মত করে বলে, – "যখন প্রায় প্রতিটি বৈজ্ঞানিক থিউরী শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়নি এমনি একটি অবস্থায় পৌছায়, তখন এমনি প্রশ্নের জবাব চাওয়া যুক্তিসংগত নয়" । আমাদের বা হেনরী পোটারের এর চাইতে ভাল আর কোন যুক্তিবাদ জানা নেই বলেই এমনিভাবে বলতে হয়।

কিন্তু আমার মতে, যে কোন মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর মৌলিক তথ্য প্রমাণেই হওয়া উচিৎ , যুক্তি তর্কে নয়। আল্লাহর স্রষ্টা থাকা উচিত কিংবা উচিত নয়, এ প্রশ্নের উৎসটি কি ? স্বাভাবিক ভাবেই বলবেন, সব কিছুর স্রষ্টা আছে, থাকে যা প্রকৃতির একটি ধরা-বাঁধা আইন। প্রকৃতি কি ? প্রকৃতি একটি সৃষ্টি। তাহলে জ্ঞাত আইনাবলীর আলোকে যে বিশ্লেষণ দেয়া যায় – তা স্বাভাবিকভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সীমারেখা নির্দেশ করে। আমরা তখন আর সৃষ্টির আইনে স্রষ্টার পরিমাপ করতে পারি না। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা থাকতেই হবে – এ হল সৃষ্টির মাঝে ব্যবস্থিত আইন, স্রষ্টার জন্য নয়।

তারপরেও ধরুন বার্ট্র্যান্ড রাসেল বেঁকে বসলেন, বললেন ,– যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা থাকতে হয়, তাহলে আল্লাহর ক্ষেত্রেও একজন থাকতে হবে – অন্যথায় আল্লাহর অস্তিত্বের দাবী টিকছে না। বার্ট্র্যান্ড রাসেলকে আমি তখন প্রশ্ন করব , – স্রষ্টা বলতে কি বুঝেন ? রাইট ব্রাদারস উড়োজাহাজের আবিষ্কার কর্তা ও নির্মাতা ছিলেন; স্রষ্টা হতেন, যদি উড়োজাহাজ তৈরীর যাবতীয় উপাদান তারা নিজেরা মৌলিকভাবে সৃষ্টিপূর্বক উড়োজাহাজটি বানাতেন। কোন নির্মাতাই স্রষ্টা নন, এবং আমরা প্রকৃতই কোন স্রষ্টার সংগে পরিচিত নই [২৮৩]। স্রষ্টা ও নির্মাতার পার্থক্যটা কি, সে মৌলিক জিজ্ঞাসাটা যার কাছে সুস্পষ্ট নয় – সে বার্ট্র্যান্ড রাসেল আল্লাহ বা প্রভুর পিতা কে এমন একটি শিশুসুলভ জিজ্ঞাসা এনে শুধু তার তথাকথিত বিশাল জ্ঞানের পাশে অজ্ঞতার কলংকটাই টেনে আনলেন , এর বেশী কিছু নয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ কিংবা অজ্ঞ যা-ই তার পরিচয় হোক বার্ট্র্যান্ড রাসেল কতদূর জ্ঞানলাভ করতে পারেন ? কতটুকু হতে পারে তার জ্ঞানের দৌরাত্ম্য ?

হায়! তিনি যদি আসলেই জানতেন, তবে অসহায় হয়ে পড়তেন নিজের কাছেই। মেনে নিতেন, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ এর চাইতে বেশী জানতে পারে না। তার একটি ছোট চিত্র তুলে ধরছি অতি সংক্ষিপ্তভাবে। চলুন মহাবিশ্ব নয়, ছায়াপথ নয়, গ্যালাক্সি নয়, নক্ষত্র নয়, পৃথিবী নয়, - আমরা একটি ক্ষুদ্রতম দর্শনযোগ্য লবণের দানাকে সম্পূর্ণ ও সফলভাবে জানবার যোগ্যতা রাখি কি না। এমন একটি লবণের কণায় সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এটম সংখ্যা হল 10^{16} অর্থাৎ 10,000,000,000,000,000। আমরা যদি লবণ দানাটিকে জানতে চাই, তবে এর সাথে প্রতিটি এটমের ত্রি-মাত্রিক ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে হবে (প্রকৃতপক্ষে জানবার মত আরো অনেক তথ্য রয়েছে, তবে উদাহরণটির খাতিরে মাত্র একটি সহজ ডাটা গ্রহণ করা হল)। এখন আমাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা এর চাইতে কম কিংবা বেশী ? আমাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা তার নিউরনের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন কোষ এক একটি তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। আদর্শ মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা 10^{11} বা 100,000,000,000 এর বেশী নয়। তার সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রায় ১০০০টি dendrites প্রতিটি কোষের সংগে যা এমনিভাবে কার্যক্রম করে যে, মস্তিষ্কের তথ্য ধারণ ক্ষমতা dendrites সংযোগ প্রাপ্ত নিউরনের সংখ্যার হাজার গুণে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বার্ট্র্যান্ড রাসেলের মস্তিষ্কে কতটুকু জ্ঞান আঁটা সম্ভব, তা $10^{11} \times 1000 = 10^{14}$ টি তথ্যের সমানুপাতিক। আর এতবড় সংখ্যাটি লবণের কথিত কণিকাটির মধ্যস্থিত এটমের সংখ্যার একশত ভাগের মাত্র ১ ভাগ।

আরো একটু গভীরতায় যাওয়া যাক। লবণের কেলাসিত হবার তথ্য আমরা সকলেই জানি। নির্দোষ লবণ কেলাসিত হয়ে থাকে এমনি একটা বিন্যাসে যে, প্রতিটি ক্লোরিন ও সোডিয়ামের এটম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়,- অর্থাৎ এদের কেলাসন এক অজ্ঞাত আইনের শৃখংলা মেনে চলে। সম্পূর্ণ নির্দোষ লবণের একটি বিন্দু কেলাস তার এটম শৃখংলায় এমন এক পদ্ধতি মেনে চলে যে, প্রতিটি এটম তার বন্ধন বিন্যাসে প্রায় ১০টি তথ্য তরঙ্গ (bit of information) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলতঃ একটি সাধারণ লবণ কেলাস কণা সর্বনিম্ন যে সংখ্যক তথ্য ধারণ করে, তা বার্ট্র্যান্ড রাসেলের মস্তিষ্ক ধারণযোগ্য তথ্য বা জ্ঞানের অপেক্ষা হাজার গুণ বৃহৎ ($10^{16} \times 10$)। অর্থাৎ কোন কারণেই আল্লাহ কে, কি তার পরিচয়, তাঁর কোন স্রষ্টা থাকা দরকার কি না - এ সব বিষয়ে কোন প্রকার সমাধান কোন রাসেলেরই বোধগম্য হবার কথা নয়। স্রষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে জানবার জন্য সর্ব প্রয়োজন তাঁর সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝা। সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি এই বিশাল-বিপুল মহাবিশ্ব আদি অন্তহীন অনন্ত অসীম নক্ষত্র-নীহারিকা

www.pathagar.com

অধ্যুষিত এক বিশালতাকে। To understand such a universe, we would need a brain at least as massive as the universe [২৮৪]। প্রশ্নটি কি করতে

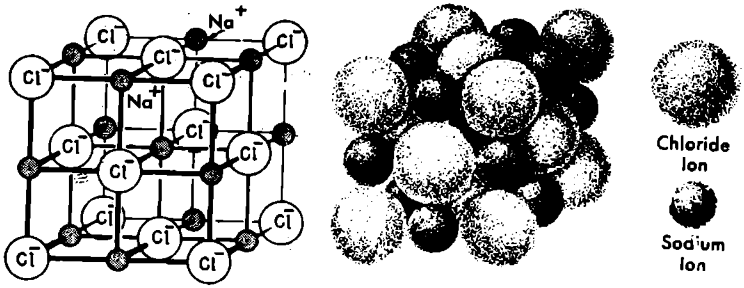

লবনের কেলাস। ক্ষুদ্রতম লবন কণায় ধারণযোগ্য তথ্য সংখ্যা 10^{17}. এই পরিমাণ তথ্য ধারণের জন্য পূর্ণ উপযোগিতায় এক হাজার বার্ট্রান্ড রাসেলের মস্তিষ্কের প্রয়োজন।

পারি যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে বুঝতে কত বিশাল মস্তিষ্কের প্রয়োজন?" সৃষ্টিগতভাবেই আমরা এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার কোন সম্ভাবনার কথা জানি না।

শত অনারাধ্য হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকে আমাদের মেনে নিতে হয় – কারণ তার কোন বিকল্প নেই। অনুরূপভাবেই আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে যে, আল্লাহর কোন স্রষ্টা নেই, থাকবার সম্ভাবনা নেই, প্রয়োজন নেই, ব্যাখ্যা নেই, যুক্তি নেই। "দৃষ্টি তাঁহাকে দর্শন করে না – তিনি দৃষ্টিসমূহকে দর্শন করেন (৬ঃ১০৩)। তিনি আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে ? (ওহে মানুষ) তোমরা কোথায় ছুটিয়া চলিলে ? (১০ঃ৩২)। উহারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না – বরং উহাদিগকেই সৃষ্টি করা হয় (১৬ঃ২০), সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তাহারই মত যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ? তব কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না? (১৬ঃ১৭)। উহারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব, এবং পুনরুত্থান কখন হইবে সেই বিষয়ে তাহাদের কোন

www.pathagar.com

চেতনা নাই (১৬ঃ২১)। তোমাদের উপাস্য তো শুধু এক এবং একক আল্লাহ" (১৬ঃ২২)।

---

২৮৩ । সৃষ্টির দাবী আল কোরআন ব্যতীত আর কোন ধর্মগ্রন্থে এত সুদৃঢ় প্রত্যয়ে দেখা যায় না। আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি বাইবেল, বেদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক পার্থক্যের বিচারে। কোরআন অবতীর্ণ হবার সময় সর্বপ্রথম আয়াতের বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুণ - "পাঠ কর সে প্রভূর নামে যিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করিয়াছন" (৯৬-১)। এ রকম অনেক আয়াতের দাবীর মৌলিকতা সুস্পষ্টভাবে এমন কিছু সৃষ্টির বিষয়কে নিয়ে যা পূর্বে কখনো ছিলনা।

২৮৪ । Broca's Brain - Carl Sagan.

www.pathagar.com

শেষের কথা – ২

এডুয়ার্ড ফ্রেডকিন। শতধা জ্ঞানে উদ্ভাসিত বিশ্বজোড়া এক নাম। তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কম্পিউটার বিজ্ঞানে মহাপ্রশস্ত এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি তথ্য বা information নিয়ে এক অতি বিতর্কিত তত্ত্বের অবতারণা করলেন – "ডিজিটাল ফিজিক্স" যার মূল বক্তব্য হল সৃষ্টিতে আদি ও সর্ব মূল বস্তুকণা কোয়ার্কের চাইতেও এই 'ইনফরমেশন ' হল একটি মৌলিক অস্তিত্ব, আর কোয়ার্ক বা ডি এন এ গুলো মূলতঃ অতি ক্ষুদ্র যুগ্ম ও সমন্বিত তথ্যকণা ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রেডকিনের জগতে একটি ইঁদুর মূলতঃ একটি বিশাল বিস্তার তথ্যকণাদের পদ্ধতিগত সমষ্টি মাত্র। যে কোন ধর্মে অবিশ্বাসী ফ্রেডকিন বিশ্বাস করেন, "This particular universe we have is a consequence of something.... intelligence" "আর এই ধারণাকৃত বুদ্ধি – বিস্তার যদি স্রষ্টা বা God হন, তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেকটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনাকে কোন না কোন 'বিট' দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, যাতে তাঁর আগোচরে কোন তথ্য না হারিয়ে যায়, কোন ঘটনা না ঘটে। এডুয়ার্ড ফ্রেডকিনের এই সিদ্ধান্ত কোন অনুমানকৃত বুদ্ধিবৃত্তির খেয়াল খুশীর মতামত নয় – তার "কম্পিউটার জিনিয়াস" সন্ধান করে দেখেছে "The universe is analogous to a computer program designed to answer a question " [২৮৫] মহাবিশ্বটি একটি কম্পিউটারের প্রোগ্রামের মত, এর প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কণায় কণায় তথ্য পুরে দেয়া আছে এবং এই তথ্যগুলো সময় ও সুযোগে কম্পিউটারের মত তথ্য সরবরাহ করবে।

ফ্রেডকিনের কথাগুলো সত্য কি সত্য নয়, এই বিশাল জিজ্ঞাসা আমাদের কাছে কোনভাবেও সুস্পষ্ট জবারের প্রত্যাশা করে না। কারণ সৃষ্টিগতভাবেই আমরা এ সকল প্রশ্নের জবাব দিতে অসমর্থ। কিন্তু তার বক্তব্যগুলো কিছু সম্ভাবনার দাবী জানায় আমাদেরকে। আমরা যা করছি , পৃথিবীতে যা ঘটছে – এ সবগুলো ঘটনাই কি সৃষ্টিতে সঞ্চিত হয়ে থাকছে এক অদৃশ্য স্মৃতিফলকে ? সম্ভাবনার এই দিকটি নিয়ে ভাবনা করছেন আজ ফ্রেডকিন একা নয়, তিনি শুধু অনেক জনের মধ্যে বিশেষ একজন মাত্র। ভাবনার এই উন্মুক্ত সম্ভাবনার জানালায় উঁকি দিয়ে তাকায়, আল-কোরআনের বাণী মঞ্জুষা – "সেদিন (পুনরুত্থান দিবস) আল্লাহ্ সকলকে পুনরায় উত্থিত করিয়া তাহাদিগকে অবগত করিবেন তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। আল্লাহ্ উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন আর তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়েরই সম্যক দ্রষ্টা (৫৮ঃ৬) নিশ্চয়ই আমি আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করিতেছি। সেদিন মানুষ তার

www.pathagar.com

কৃতকর্মের স্বরূপ দেখিতে পাইবে যাহা সে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলিবে – 'হায়'। আমরা যদি মাটির সংগে মিশিয়া যাইতাম (৭৮ঃ৪০)। নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে সংরক্ষণকারী (৮৬ঃ৪) প্রত্যেক আত্মাই জানিবে যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে (৮২ঃ৫)। সেদিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের রসনা, তাহাদিগের হস্ত, তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে (২৪ঃ২৪) ; সেদিন সকল তথ্য তাহাদিগের নিকট হইতে বিলুপ্ত করা হইবে এবং ইহারা একে অপরকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে না (২৮ঃ৬৬) । আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব। অতঃপর সেই গুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলায় পরিণত করিব" (২৫ঃ২৩)।

সময়ের অদৃশ্য সুড়ংগে ফেলে যাওয়া আমাদের ঘটনাগুলো ফ্রেডকিনের "বিটে বিটে" গচ্ছিত হচ্ছে। হারিয়ে যাবে না ওরা । হারিয়ে যাবে শুধু আমাদের দেহ শবগুলো, বেঁচে থাকবে প্রাণ, মৃত্যুর তোরণ পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে আরেক অচেনা জগতে, তারপর একদিন হবে পুনরুত্থান। সেদিন আবার অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনি। "উহারা বলে, অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে যখন সে পচিয়া গলিয়া যাইবে? (৩৬ঃ৭৮)। বল – উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনি যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত (৩৬ঃ৭৯)। তোমাদিগের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান , একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ (৩১ঃ২৮)। দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা (আজ) যাহা বলিতেছ তাহার জন্য (২১ঃ১৮)। নিশ্চয়ই বিচার দিবস নির্ধারিত রহিয়াছে (৭৮ঃ১৭)। এই তো সঠিক সত্য দিন, সুতরাং যাহার ইচ্ছা নিজ পালনকর্তার সকাশে ঠিকানা খুঁজিয়া নিক" (৭৮ঃ৩৯)।

---

২৮৫ । Dialogue - 2/1989

www.pathagar.com

www.pathagar.com